গ্রীষ্মের তান্ডব শুরু হয়েছে মাত্র। আকাশে তেজস্বী সূর্য। রোদের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পিচ ঢালা রাস্তা, ফুটপাত। শাহবাগ জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলার ফ্যানগুলো দ্রুত গতিতে ঘুরছে। চারপাশে পিনপতন নীরবতা। ভ্যাপ্সা গরমে ঘেমে নেয়েই চাকরির বই ঘাটছে বিভিন্ন বয়সের পাঠক। গ্রন্থাগারের একদম কোণার দিকে বিরক্ত ভঙ্গিতে

বসে আছে নীরা। সামনে রাখা বইয়ের এক-আধ পাতা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল,‘ তুই কি তোর পাগলামোটা বন্ধ করবি না নমু? এভাবে আর কতদিন? সহ্যের একটা সীমা থাকা উচিত। তোর কি বিরক্ত লাগে না?’

নম্রতা জবাব দেয় না। সামনে থাকা চির পরিচিত ফিলোসোফির বইটি আবারও উলটে পালটে দেখে।

বইয়ের মলাটের নিচের দিকটায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নীরা এবার চেতে উঠে বলল,

‘ আর কতবার দেখবি এই বই? তিন বছর ধরে তো দেখছিস। কিছু পেয়েছিস?’

নীরার উঁচু স্বরে কয়েক জোড়া বিরক্ত চোখ তাদের ওপর এসে পড়ল। নীরা ঝটপট গলার স্বর নিচু করল। চাপা ফিসফিসিয়ে বলল,‘

নমু? পাগলামো করিস না। আজকালকার যুগে এমনটা শুধুই কল্পনা। কেন এতো সিরিয়াস হচ্ছিস বল তো? তিনটা বছরে কী থেকে কী হয়ে গিয়েছিস জানিস? একবার তাকিয়ে দেখেছিস নিজেকে? এটা ১৯১৯ নয় এটা ২০১৯। বুঝার চেষ্টা কর একটু।'

নম্রতা জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের বইটা নির্দিষ্ট জায়গায় খুব

যত্ন করে রাখল। ডানহাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে খুব যত্ন করে ছুঁয়ে দিল বইটার গা। সাথে সাথেই বুকের ভেতর উথলে উঠল এক দলা কান্না। নম্রতা মুখ ফুলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। এদিকে ওদিক তাকিয়ে চোখের জল গড়ানো আটকাল। আর কত কাঁদবে সে? প্রতিটি দিন তো এমনই হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তই তো নিঃশ্বাস আটকে আটকেই বেঁচে

থাকছে সে। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। নম্রতার কাঁধে আলতো স্পর্শ করে বলল,‘ ক্লাস টাইম হয়ে গিয়েছে দোস্ত। এবার তো চল। আর কতক্ষণ থাকবি?’

নম্রতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ হুম। চল।’

কথাটা বলেও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকে নম্রতা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ফিলোসোফির ময়লা

হয়ে আসা মলাটটির দিকে। তারপর ধীর, গম্ভীর পায়ে বেরিয়ে যায়। নীরা খানিক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ছোট্ট বেলার উচ্ছল বান্ধবীটির এমন বদলে যাওয়া দেখে বুকের ভেতর চিনচিন ব্যথা করে উঠে। মনটা সেই অজ্ঞাত পুরুষের প্রতি ভয়ানক রাগে ফুঁসে ওঠে। পরমুহূর্তেই নিভে যায়। কে জানে? আদৌ সে পুরুষ নাকি কোনো

মহিলা?ভার্সিটি ক্লাস শেষে রোকেয়া হলের দিকে হাঁটছিল নম্রতা আর নীরা। বরাবরের মতোই চুপচাপ নম্রতা নীরার গল্প ঝুড়ির নীরব শ্রোতা। নীরা ছোট থেকেই কম কথা বলা মেয়ে আর নম্রতা চঞ্চল। কিন্তু সেই ইন্সিডেন্টের পর অদ্ভুতভাবেই বদলে গেল সব। নম্রতার চঞ্চলতা শরৎ-এর শিউলির মতোই ঝড়ে পড়ল। দুই বান্ধবীর মধ্যে তৈরি

হলো বিস্তর নীরবতা। সেই নিশ্চুপতা দূর করতেই ইন্ট্রোবার্ট নীরা নিজেকে প্রকাশ করতে শিখল। নম্রতাকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নম্রতার আটকে থাকা মনটা আর সচল হলো না। হাজারও ব্যস্ততা আর হাসি-মজার মাঝেও এক চিলতে উদাসীনতা তার চোখে-মুখে দৃঢ় বসতি গেঁড়ে বসল। সেই দৃঢ় বসতিকে নাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা

কি নীরার আছে? রোকেয়া হলের প্রধান ফটকের কাছে আসতেই হঠাৎ-ই দাঁড়িয়ে পড়ল নম্রতা। নীরা নম্রতা থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। পিছন ফিরে ভ্রু কুঁচকাল। বলল,‘ কি রে? দাঁড়িয়ে পড়লি যে? কি হয়েছে?’

নম্রতা জবাব না দিয়ে ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির হাতে দশ-

বারোটা পাতলা নীল রঙের কাগজ। রোল করে ধরে রেখেছে হাতে। নীরা জবাব না পেয়ে নম্রতার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটির হাতের দিকে তাকাল। তারপর নরম কণ্ঠে ডাকল,

‘ নমু?’

নম্রতা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে তাকাল। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ কিছু না। চল।’নীরা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে মাথা নাড়ল। নম্রতার গোপন রাখা অশ্রুগুলো যে আজও বেহায়ার মতো ঝড়বে তা বেশ বুঝতে পারছে নীরা। এমনটাই তো দেখে আসছে দিনের পর দিন। এক-দুই সপ্তাহ ঠিকঠাক যায় তারপর আবারও শুরু হয় নম্রতার ধুঁকে ধুঁকে কান্না। আচ্ছা? এতো বড় মেয়ের কি এতো আবেগ সাজে?

নীরার আপ্লুত মস্তিষ্ক উত্তর দেয়, ছোট-বড় কি? মেয়ে মানেই তো আবেগের আঁটখানা।হলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় কাজগুলো বেশ স্বাভাবিকভাবেই করল নম্রতা। গোসল-খাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এলালো। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর পরই উপলব্ধি করল, সে ভীষণ ক্লান্ত। শরীরের ভারটা বোধ হয় আর বয়ে চলা যাচ্ছে না।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বুকে জমিয়ে রাখা কান্নাগুলো উথলে উথলে উঠছে। নম্রতা ফ্যানের সুইচ অন করে আগাগোড়া কাঁথা মুড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত চোখজোড়া বন্ধ করতেই বুকে অসহনীয় এক ব্যথা চিনচিন করে উঠল। নম্রতা হুড়মুড় করে উঠে বসল। টেবিলের ড্রয়ারে থাকা পুরোনো ডায়েরিটা বের করেই বুকে চেপে ধরল। গলাটা খানিক

কাঁপছে তার। বোধ হয় কান্না পাচ্ছে। নম্রতা বিছানার সাথে লাগোয়া দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। চোখদুটো বুজে নিয়ে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিল। ডায়েরিটাকে আরো শক্ত করে চেপে ধরল বুকে। মনের কার্ণিশে ভেসে উঠল প্রায় চারবছর আগের অদ্ভুত সুন্দর দিনগুলোর কথা।তখন কতটা চঞ্চল ছিল নম্রতা! ২০১৫ সাল। মাত্রই কলেজে পা

রেখেছে নম্রতা। দীর্ঘ সময় গার্লস স্কুলে কাটানো মেয়েগুলো যেমন কলেজে উঠেই পাখা মেলে দেয় আকাশে। ঠিক তেমনভাবেই পাখা ছড়িয়েছিল নম্রতা। ক্লাসে, বাইরে, বান্ধবীদের আড্ডায় দুষ্টুমিতে ছেয়ে গিয়েছিল সে। কিভাবে কিভাবে একদল ছেলে বন্ধুও জুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু কারো সাথেই তেমন একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠে নি।

উকিল বাবার দুই মেয়ের বড়জনই ছিল নম্রতা। ছোটবোন নন্দিতা তখন ক্লাস ওয়ানের গন্ডিতে পা দিয়েছে মাত্র। বাবার আদুরে হওয়ায় বাড়িতে তখন অবাধ স্বাধীনতা। সকালে কলেজের নামে বেরিয়ে সন্ধ্যা পাঁচটার আগে বাসায় ফিরে গেলেই সব দোষ মাফ। নম্রতারা তখন শাহবাগেই থাকত। তাদের ধানমন্ডির বাড়িটা কমপ্লিট হয় নি তখনও।সে

বছরই বান্ধবীদের সঙ্গ পেয়ে জাহাঙ্গীরনগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সরোবর চষে বেড়ানো হলো তার। বাসায় বেশ কয়েকবার জব্বর বকুনিও খেলো। 'ভালো মেয়ে'র পদবীটা সরে গিয়ে দুষ্ট, ফাজিল মেয়ের পদবীগুলোও সেবছরই পাওয়া হলো। এই দুষ্টুমি ভরা জীবনটাতে হঠাৎই একদিন ঘটনাপ্রবাহতা এলো। কলেজ ফাঁকি

দিয়ে বান্ধবীরা গিয়ে বসল শাহবাগ জাতীয় গ্রন্থগারে। সেইসময় নম্রতা ব্যতীত বান্ধবীদের প্রায় সবারই বয়ফ্রেন্ড ছিল। নম্রতা প্রেম-ভালোবাসা পছন্দ করে না তেমনটাও নয়। বরং প্রেম নিয়ে নম্রতার ছিল অন্যরকম বিলাসিতা। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা সামনাসামনি প্রেম তো সবাই করে। নম্রতার ইচ্ছে সে 'চিঠি প্রেম' করবে। একদম সেই

আগের যুগের মতো। সপ্তাহে একটা চিঠি পাওয়া। ধুরু ধুরু বুকে সেই চিঠি পড়া। বুক ভরা আবেগ নিয়ে চিঠি লেখা, অপেক্ষা করা। আরো কত কী! নম্রতার এমন উদ্ভট কথায় হেসে কূল পেত না নীরা। সেবারও তাই হলো। নীরা হাসতে হাসতে বলল,‘ ধুর! এমনও হয় নাকি? ওসব শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। এটা তোর মান্ধাতার আমল না দোস্ত। ২০১৫

সাল। এখন প্রথম দিন প্রেম করেই দ্বিতীয় দিনে বন্ধুদের ফাঁকা বাসা খুঁজে ছেলেরা। সেই যুগে এসে চিঠি প্রেম? তাও আবার না দেখে? ইম্পসিবল। ওমন ছেলে বাংলাদেশে ক্যান? এই পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ।'

নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বলল,

' একদম ফাউল আলাপ করবি না বলছি। প্রেম করতে হলে চিঠি

প্রেমই করব। তবু না দেখে। একদম পুরাতন যুগের মতো। আমাদের যোগাযোগের শুধু একটা সোর্সই থাকবে তা হলো চিঠি। ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ কিচ্ছু না। একটা চিঠি পাওয়ার আশায় ক্যালেন্ডারের দিন গুণবো। আর যখন সেই আকাঙ্ক্ষিত চিঠিটা পাবো তখন এক মুঠো স্বর্গীয় সুখ

আছড়ে পড়বে আমার বুকে। ভাবতে পারছিস?’

নীরা বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তাচ্ছিল্য ভরে হাসল। মাথা নেড়ে বলল,‘ পাচ্ছি। তুই যে দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছিস তা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি আমি। শোন দোস্ত, এগ্লা আগলা স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর। এই আধুনিক যুগে এসে। যোগাযোগের এতো এতো উপকরণ

থাকা সত্ত্বেও কোনো ছেলে একটা চিঠি পাওয়ার আশায় বসে থাকবে না। আগে প্রেম করার আর কোনো রাস্তা ছিল না বলে চিঠি চালান হতো। এখন সেই সমস্যা নেই। যে জিনিসটা সহজেই পাওয়া যাচ্ছে তার জন্য এতো অপেক্ষা কেনো?’

নম্রতা উৎসাহ নিয়ে বলল,‘ তুই বুঝতে পারছিস না। সহজ জিনিস তো সবাই পায়। ভালোবাসা এতোটা

সহজ হয়ে গিয়েছে বলেই তো এখন আর তার মূল্য নাই। প্রথমবার দেখা হলো। দ্বিতীয়বার দেখা হতেই বলে দিল ‘আই লাভ ইউ’। মানে কোনো ফিলিংস নাই। বলতে হয় বলে বলছে। বলতে না হলে বলতো না। ‘আই লাভ ইউ’ শব্দটা যোগাযোগের সহজলভ্যতার জন্যই এতোটা ঠুনকো আর সস্তা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার প্রেম হবে ইউনিক। চিঠিতে

দু’জনের আবেগ থাকবে। অপেক্ষা থাকবে। এক চিঠিই বারবার পড়ার আকুতি থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে বন্ধন। যোগসূত্র।’

নীরা হাতজোড় করে নিচু স্বরে বলল,

‘ আমারে ক্ষেমা দে মা। এইসব পাগলা আলাপ দয়া কইরা আর করিস না। মানুষ তোরে পাবনায় দিয়ে আইবো। জীবনটা সিনেমা না

দোস্ত। তুই তো রীতিমতো বাংলা সিনেমা রচনা করে ফেলছিস।’

নম্রতা ফুঁসে উঠে বলল,‘ ঠাডাইয়া লাগামু এক চড়। তোর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না করলে করিস না। জোর করছে কে? চিঠি প্রেম হবে কি হবে না তা আগেই কি করে বলিস তুই? আগে তো চেষ্টা করে দেখি নাকি?’

নীরা সন্দিহান গলায় বলল,

‘ চেষ্টা? তা কী করে চেষ্টে করবি তুই?’

নম্রতা দুর্বোধ্য হাসল। নোটবুক থেকে একটা নীল রঙের কাগজ টেনে নিয়ে বলল,

‘ এইভাবে।’

নীরা বুঝতে না পেরে বলল,

‘ মানে?’

নম্রতা জবাব দিল না। নীল কাগজের মসৃণ জমিনে একের পর এক

অগোছালো শব্দগুচ্ছ সাজাতে লাগল। তার প্রথম সম্বোধনটা ছিল এমন, প্রিয়....!তোমায় সম্মোধন করার জন্য চমৎকার কোনো শব্দ এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না আমার। তাই সম্মোধনটা উহ্য রাখছি। তুমি তো জানো, নীরবতাতেই মিশে থাকে হাজারও আকুতি, হাজারো ভালোবাসা। তাই এই নীরবতা থেকেই নাহয় খুঁজে নাও সেই নাম।

চমৎকার সেই সম্বোধন। যে সম্বোধনে কেঁপে উঠবে তোমার বুক। ঠোঁটে ফুঁটবে তৃপ্তির হাসি। আচ্ছা? তুমি-আমি দুজনেই কি এক? যদি একই হই তাহলে কি তোমার স্বপ্নগুলোও আমার স্বপ্নের মতো ধোঁয়াসে? ভীষণ অগোছালো এই মনটা কি হঠাৎ হঠাৎই ভীষণ অভিমানে আমার মতো আরো খানিকটা অগোছালো হয়ে যায়?

আমার হয়। খুব করে হয়, জানো? হঠাৎ করে চমকে উঠি। হঠাৎ করেই কান্না পায়। বুকে ব্যাথা হয় তারসাথে অসহনীয় এক শূন্যতা। সেই শূন্য মনে খা খা দুপুর নেমে আসে কখনো বা নামে গাঢ় বর্ষা। দুপুরের প্রখরতায় পুড়ে তামাটে হয় এই মন। বর্ষায় হয় আপ্লুত.... রক্তেভেজা বাণ। বুকের কোথায় যেন তীক্ষ্ণ ব্যাথা হয়। অযথায় কান্নাগুলো

গলায় এসে আটকে যায়। ছন্নছাড়া বাতাসে উড়ে চলে লম্বা চুল। উদাসী চোখদুটো বারবার পাতা ঝাপটায় কিন্তু অপেক্ষাটা ফুরায় না। মন বলে এইতো আসবে। এখনই তো সময়। কিন্তু...আসে না। কি আসে না? কেন আসে না? জানি না। শুধু জানি অপেক্ষাটা ফুরায় না। এই অপেক্ষাটা বুঝি নির্বীক, অমর? এই অপেক্ষার হয়তো মৃত্যু নেই। আমি এই

অপেক্ষাটার একটা নাম দিয়েছি, জানো? এই অপেক্ষাটার নাম হলো —" Pain Of Expect"আমার ছোট থেকেই খুব ইচ্ছে একজন পত্র মিতা হবে আমার। একদম পুরাতন দিনের মতো। আচ্ছা? তুমি কি অনেক আগের যুগের চিঠি প্রেমের গল্পগুলো শুনেছ? সেখানে একটা চিঠিকে ঘিরে প্রেমিক-প্রেমিকার কত আবেগ, কত অনুভূতি থাকে দেখেছ? রোজ কারো

চিঠির জন্য অপেক্ষা। কাঁপা কাঁপা বুকে সেই চিঠি পড়া। ঘুমহীন চোখ দুটো চিঠির পাতায় নিবদ্ধ করে প্রত্যেকটি অক্ষর বুকের মাঝে গেঁথে নেওয়া। ইশ! কী অনুভূতি! আজকালকার সহজলভ্য দিনগুলোতে এমন একজন দুষ্প্রাপ্য বন্ধু কি সত্যিই পাওয়া যায়? পাওয়া গেলে আমি পেতে চাই। খুব করে পেতে চাই জানো? প্রেম না হোক, শুধুই

বন্ধুত্ব হোক।কেউ একজন আমার চিঠির অপেক্ষা করুক। চলতে থাকুক তার আমার নীল চিরকুটের গল্প। এই অাধুনিক জগৎ-টাতে সবার অগোচরে তুমি-আমি চিঠি দেওয়া নেওয়া করব। তুমি আমায় জানবে না। আমি তোমায় জানব না। চিঠিতে কোনো সম্বোধন থাকবে না। শুধু থাকবে এক আকাশ আবেগ, এক ঝুড়ি কথা আর ছোট্ট একটা

আদুরে নাম। তারপর.....অনেক অনেকদিন পর যখন দু'জন দু'জনকে খুব করে চাইব। ঠিক তখন আমাদের দেখা হবে। বিষয়টা মজার না?

হয়তো মজার, হয়তো নয়। তোমার কাছে মজার লাগছে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে আমি তোমার চিঠির অপেক্ষায় রইলাম। সেই তুমিটা কে হবে জানি না। তবে

এটুকু জানি সেই তুমিটা আমার ‘সে’ হবে। আজ এতটুকুই।

ইতি

শ্যামলতা

চিঠিটা পড়ে নিয়ে চোখ কপালে তুলল নীরা। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল,‘ তুই সিরিয়াসলি চিঠি লিখে ফেললি?’

‘ ফেললাম।’

‘ এবার কি করবি?’

‘ সেটা তো দেখতেই পাবি।’

‘ তুই তো ফর্সা। তাহলে ইতি শ্যামলতা লিখলি কেন?’

নম্রতা হেসে বলল,

‘ নামটা সুন্দর লাগে তাই।’

কথা বলতে বলতেই পাশের সারি থেকে দর্শনের একটা মোটা বই নিয়ে তার মলাটের মাঝে চিঠিটা রেখে দিল নম্রতা। নম্রতার কাজে প্রথম দফায় স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে

হেসে ফেলল নীরা। হাসতে হাসতে বলল,

‘ পাগল তুই? এখন লাইব্রেরিতে এসে ক’জন মানুষ বই পড়ে শুনি? যে যার মতো বই এনে যার যার বই পড়ে। এসব বই পড়ার সময় কই? তারওপর এই মোটা দর্শনের বই? মলাটের নিচে? কারো চোখেই পড়বে না তোর চিঠি। আর পড়লেও

হাসতে হাসতে মরে যাবে।’নম্রতা হেসে বলল,

‘ মরলে মরল। বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের মাঝে একজন হাসতে হাসতে মরে গেলে দেশের অর্থনীতিতে ভয়ানক কোনো ক্ষতি হবে না।’

নীরা হঠাৎ-ই গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ আর যদি কোনো মেয়ে ফাজলামো করে?’

নম্রতা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল,
‘ চিঠি পড়েই বুঝতে পারব।’
সেদিন চিঠি রেখে এসে উত্তেজনায় ঘুম হলো না নম্রতার। নীরাকে ফোন দিয়ে বারবার জ্বালাতে লাগল। মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল একটাই প্রশ্ন, কি হবে? কি হবে? আদৌ কি কারো চোখে পড়বে?সারারাত উত্তেজনায় ছটফট করে ভোর চারটার দিকে ঘুমুতে গেল নম্রতা। কলেজে তখন

ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। পরীক্ষার আগের দিনের ক্লাসটা তখন ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ। সারা বছর টু টু করে ঘুরে বেড়ানো নম্রতাদের জন্য শীট, নোট কালেক্ট করার সেই এক মোক্ষম সময়। কিন্তু নম্রতার মাথায় পরীক্ষার চিন্তা খেলল না। পরীক্ষার প্রতি সেনসেটিভ নম্রতা গ্রীষ্মের ঝুম বৃষ্টি মাথায় করে কলেজে গেল ঠিক, কিন্তু দু'মিনিটও

টিকল না। ক্লাসরুমের পেছন দরজা দিয়ে নীরাকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলো। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে নয়টার দিকে শাহাবাগ গ্রন্থাগারে গিয়ে পৌঁছাল তারা। গ্রন্থাগার তখন মাত্রই খুলেছে। নম্রতা উত্তেজনা নিয়ে দ্বিতীয় তলার দিকে ছুট লাগাল। নীরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল,' এতোদিন আমার শুধু সন্দেহ ছিল। আজ প্রমাণ হয়ে গেল যে তুই

মারাত্মক পাগল। কাল বিকেলে মাত্র চিঠি লিখলি। আজই উত্তর পেয়ে যাবি? তোর কি ধারণা? মানুষ তোর চিঠির জন্য হা-হুতাশ করে মরে যাচ্ছে?'

নীরার কথায় নম্রতার উৎসাহ খানিক মিইয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাল থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়ল। কম্পিত হাতে ফিলোসোফির বইটা উঠিয়ে

কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। নীরা তাড়া দিয়ে বলল,

‘ কি রে? দেখ জলদি। এসেছে তোর চিঠি?’

নম্রতা চাপা উত্তেজনা নিয়ে বলল,

‘ যদি না থাকে?’

‘ যদি নয়। সত্যিই থাকবে না। সবাই তো আর তোর মতো পাগল নয় যে বই না পড়ে বইয়ের ভেতর চিঠি খুঁজে বেড়াবে। তবু দেখ।

কথায় আছে, মনের শান্তিই বড় শান্তি।’

নম্রতা মলাটের নিচে চিঠির খোঁজ করল। তার নিজের লেখা চিঠি ব্যতিত ভিন্ন কোনো চিঠি পাওয়া গেল না। নীরা গুজগুজ করে বলল, ‘ বলেছিলাম পাবি না। শুধু শুধু ক্লাসটা মিস করলি। স্যার নিশ্চয় কত্তকিছু দাগিয়ে দিয়েছে। পরশু পরীক্ষায় কী লিখব আমরা?’নম্রতা

জবাব দিল না। বৃষ্টি ভেজা চুপসানো মুখ নিয়েই বাড়ি ফিরলো। অসময়ের বৃষ্টিতে ভেজায় পরের দিনই ভয়ানক জ্বরে কাহিল হলো। জ্বর আর পরীক্ষার চাপে চিঠির কথা বেমালুম ভুলে গেল নম্রতা। প্রায় এক সপ্তাহ পর, পরীক্ষা শেষে বান্ধবীদের সাথে ফুসকা খেতে বসে চট করেই মনে পড়ে গেল তার সেই নীল চিরকুটের কথা। ফুসকা ফেলে নীরাকে নিয়ে

আবারও হাজির হলো গ্রন্থগারের বারান্দায়। ফুসকা ফেলে আসায় নীরা তখন মহা বিরক্ত। এই মাথা পাগল মেয়েটা তার বন্ধু হওয়ায় বিরক্তির বহরটা যেন আরও খানিকটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ওপর বিরক্ত হওয়া চলে না। এরা মানুষের বিরক্তি বা রাগকে যেমন পাত্তা দেয় না। ঠিক তেমনই অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে

মান-প্রাণ সব হারালেও বিরক্ত হয় না। নম্রতা হলো সেই ধরনের মানুষ। তার ওপর বিরক্ত হওয়া সাজে না। নম্রতা এবারও আশাহত হলো। ফিলোসফির বইটির দিকে কিছুক্ষণ বিরক্ত ভরে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল। মাথা নেড়ে বলল,' চিঠির জবাব না এলে নাই। এই চিঠিটা এখানেই থাকুক। আমার আবেগময় সুন্দর চিঠিটা এই বইকে

উৎসর্গ করলাম। চল, আজ তোকে ডাবল প্লেট ফুসকা খাওয়াব।’

নীরা বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ ফুসকা খাওয়াবি মানে? তোর মন খারাপ লাগছে না?’

‘ না, লাগছে না। আমাদের ছোট্ট জীবনটাতে ছোট্ট ছোট্ট বিষয় নিয়ে মন খারাপ করতে নেই। বাবা বলে, Life is a beautiful flower. We should feel it’s fragrance. এই

যে চিঠি বিষয়ক সুন্দর ঝামেলাটা হয়ে গেল? এটাও সেই বিউটিফুল ফ্লাওয়ারেরই অংশ। আই হ্যাভ টু ফিল ইট।'নম্রতা সর্বদা প্রাণোচ্ছল, প্রাণোবন্ত মেয়ে। তার সতেরো বছরের জীবনে কখনোই তাকে দীর্ঘসময় চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায় নি। সবসময় ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি আটকে রাখা তার স্বভাব। অল্পতে উত্তেজিত হওয়া,

অল্পতে খুশি হওয়া, প্রাণ খোলে হাসা আর আড্ডা জমানোর গুণে সে সর্বদাই আকর্ষণীয়া। নম্রতার স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী ‘চিঠি’ বিষয়ক ব্যাপারটাও তার মনে খুব একটা দাগ আঁকতে পারল না। পড়াশোনা, বন্ধুবান্ধব, দুষ্টামো আর পাগলামো ভরা জীবনে ওই ক্ষুদ্র চিঠিটা দীর্ঘক্ষণ জায়গা দখল করে রাখতে পারল না। নম্রতা চিঠির

কথাটা বেমালুম ভুলে বসল। যথারীতি ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষা শেষ হয়ে সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস শুরু হলো।কলেজের সিনিয়র সিটিজেন হতে পেরে তারা তখন মহাখুশি। বান্ধবীরা মিলে হৈ-হৈ করে টিউশনি করা। ফুসকার দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দেওয়া তখন নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। ঠিক এমন একটা সময়েই ঝড়টা এলো।

এই মৃদু, শান্ত ঝড়েই এলোমেলো হয়ে গেলো নম্রতা। একদিন ইংরেজি টিউশনি শেষ করে শাহবাগ গ্রন্থাগারে গিয়ে বসল বান্ধবীরা। উদ্দেশ্য, নিরিবিলিতে ক্লাস নোট আর এসাইনমেন্ট কমপ্লিট করা। বান্ধবীরা সবাই নোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেই নম্রতার অসচেতন চোখ দুটো ওই চির পরিচিত বইটির ওপর গিয়ে পড়ল। নিতান্ত কৌতূহল বশত উঠে

গিয়ে বইটা তুলে নিলো সে। মলাটের নিচে নিজ হাতে লেখা নীল চিরকুটের খোঁজ নিতেই চমকে উঠল নম্রতা। নীল কাগজের পরিবর্তে সাধারণ সাদা কাগজে লেখা সম্বোধনহীন ছোট্ট এক চিঠি ওঠে এলো হাতে। সেখানে গুটি গুটি সুন্দর অক্ষরে লেখা,‘ আপনি কি পাগল নাকি নিতান্তই কিশোরী একজন? পাগল বোধ হয় নন।

আমার জানা মতে, পাগলেরা সাজিয়ে গুছিয়ে চিঠি লিখতে জানে না। কিন্তু কিশোরীরা জানে। যুবতীদের থেকে কিশোরীদের চিঠি লেখার গুণটা পাকা। তাদের মাথায় থাকা উদ্ভট চিন্তাগুলোও ভীষণ পাকা। যেমন আপনার এই চিঠি প্রেমের উদ্ভট ভাবনাটা! উদ্ভট বললাম বলে মন খারাপ করলেন? মন খারাপ করবেন না। এই

ভাবনাটা সত্যিই উদ্ভট বৈ অন্য কিছু নয়। আজকের যুগে এসে এভাবে বন্ধুত্ব বা প্রেম করার সাহস কারো হবে বলে মনে হয় না। হয়তো মাথাতেও আনবে না। তবে মাঝে মাঝে উদ্ভট কিছু করতে খারাপ লাগে না। যেমনটা আমি করছি। আপনার এই উদ্ভট চিঠির উদ্ভট জবাব দিচ্ছি। আমার মতো মানুষ অজ্ঞাত এক কিশোরীকে চিঠি লিখছে

তা আমার নিজের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না!’

চিঠিটা এক নিঃশ্বাস দু-তিনবার পরে ফেলল নম্রতা। সারা শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। প্রায় তিন সপ্তাহ পর সেই আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা হাতে পেয়ে গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না তার। নম্রতা কিছুক্ষণ থম ধরে দাঁড়িয়ে থেকে লাফিয়ে উঠল। কয়েকজোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তার

ওপর পড়তেই চাপা ফিসফিসিয়ে বলে উঠল নীরা,‘ এই নমু? কি করছিস? সবাই দেখছে।’

নীরার কথায় চারপাশের খেয়াল হলো নম্রতার। চারদিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হাসল। তারপর বই হাতে কোণার এক টেবিলে চেয়ার টেনে বসল। বুকের পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে হৃদপিণ্ড। তার চিঠির জবাব এসেছে, এই সাধারণ কথাটা

বিশ্বাস করতেই তার খুব বেগ পেতে হচ্ছে। নম্রতা সাদা কাগজে লেখা চিঠিটা টেবিলের উপর মেলে রাখল। কয়েক মুহূর্তে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আনন্দিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নোট বুকের মাঝে ভাঁজ করে রাখা নীল কাগজটা টেনে নিয়ে লিখতে বসল। কিন্তু বিস্ময় নিয়ে উপলব্ধি করল, তার হাঁত কাঁপছে। মাথাটা ফাঁকা আর গোলমেলে লাগছে।

মাথার ভেতর গোছানো, সুন্দর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নম্রতা দু'হাতে মুখ চেপে বসে রইল। মাথাটাকে একটু শান্ত করে লিখতে শুরু করল কয়েক লাইনের সম্বোধনহীন চিঠি,' আপনাকে কী বলে সম্বোধন করা যায় বলুন তো? প্রথমবার 'প্রিয়' সম্বোধন করেছিলাম। এবার সেই ভরসাটাও পাচ্ছি না। এভাবে 'আপনি' 'আপনি'

সম্বোধন করে আমায় ঘাবড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয়? আর সাদা পাতায় কেন লিখেছেন? নীল চিরকুট কি কখনো সাদা পাতায় লেখা যায়? নীল চিরকুট সবসময় নীল কাগজেই লিখতে হয় এটাই নিয়ম। আর নিচে ইতি ওতি কিছুই তো লেখেন নি। একটা চিঠিতে এতো এতো ভুল করা মানুষটি কি-না আমায় কিশোরী মেয়ের উদ্ভট

চিন্তাভাবনার কারখানা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, এ তো ভারি অন্যায়!

ইতি

শ্যামলতা 'লেখা শেষে দু-বার পড়ে নিয়ে চিঠিটা মলাটের ভাঁজে রেখে দিল নম্রতা। আর সাদা কাগজে লেখা চিঠিটা খুব যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিলো। বাসায় এসে চিঠিটাকে ডায়েরির পাতায় আঠা দিয়ে লাগাল। চিঠির কোণায় দুটো

লাল গোলাপের পাঁপড়ি লাগিয়ে তাতে লিখল, ‘শ্যামলতা ও সে’। তারপর থেকে শুরু হলো নতুন চিঠির অপেক্ষা। কিন্তু অপেক্ষাময় দিনগুলো যেন আর কাটে না। কলেজ শেষে রোজ একবার গ্রন্থাগারে খোঁজ নেওয়ার পরও চিঠির সন্ধান মেলে না। অপেক্ষা করতে করতে নম্রতা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঠিক তখনই দ্বিতীয়

চিঠিটা এলো। নম্রতাকে দু-দুটো সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়ে সাদা কাগজের মাঝখানে গুটি গুটি অক্ষরে দুই লাইনের একটা চিঠি লিখল অপরিচিত সেই 'সে'।' সত্যিই! এ তো ভারি অন্যায়। কিন্তু আমার যে নীল রঙা কাগজ নেই। এখন উপায়? আমাকে কি তবে চিঠি খেলা থেকে বহিষ্কৃত করা হবে?'

সেই দুই লাইনের চিঠিই অসংখ্যবার পড়ল নম্রতা। প্রথম দিকটাই বিরক্ত হলেও পরমুহূর্তে বেশ লাগল। এই চিঠির জন্য অপেক্ষামান অনুভূতিই তো চাইছিল সে। এখন সেই আকাঙ্ক্ষিত অনুভূতির জন্য নিশ্চয় বিরক্ত হওয়া চলে না? নম্রতা অনেক ভেবে চিন্তে লিখল,‘ না। আপাতত বহিষ্কার করা হচ্ছে না। তবে আপনার এই ভয়াবহ অপরাধের

জন্য আপনাকে ভয়ানক এক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমিময় শাস্তি। এই শাস্তিতে আপনি টাপনি নিষিদ্ধ নগরীর শব্দ। পত্রমিতাকে কেউ কখনো "আপনি" বলে সম্বোধন করেছে শুনেছেন কখনো? আচ্ছা? আপনাকে কি এখন বন্ধু বলে সম্বোধন করা যায়? অনেকটা আগের যুগের পত্রমিতার মতো?ছোটবেলায় দাদির কাছে পত্রমিতাকে ঘিরে

অজস্র গল্প শুনেছি। আমার দাদাভাই আর দাদির সম্পর্কটা হয়েছিল মূলত চিঠি-পত্রকে কেন্দ্র করে। দাদি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে তখন "পত্রমিতালী" বলে একটা সংখ্যা ছিল। একদিন দাদির সই দুষ্টুমি করে সেই পত্রমিতালীতে দাদির নাম ঠিকানা দিয়ে দিল। কিন্তু সপ্তাহব্যাপী কোনো চিঠিপত্র এলো না। সেখান থেকে চিঠি না এলেও চিঠি এলো

অন্য একটা ঠিকানা থেকে। দাদুর ভাষ্যমতে সেটা ছিল দাদাভাই কতৃক ভুল ঠিকানায় চিঠি। ভুল চিঠিতে কিন্তু কোনো রোমান্টিসিজম ছিল না। চিঠিটা ছিল দাদাভাইয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা যাওয়ার দুঃসংবাদ বহন করা দুঃখী দুঃখী চিঠি। আমার দাদি ছিল অল্পবয়স্কা আবেগী মেয়ে।দাদাভাইয়ের দুঃখে সে এমনই ব্যথিত হলো যে,

দাদাভাইয়ের ঠিকানায় আবেগমাখা সান্ত্বনাপত্র পাঠিয়ে দিল। তারপরই শুরু হলো চিঠিচালান ভালোবাসা। প্রায় একবছর পর, দাদাভাই ঢাকা থেকে রাজশাহী দাদুর বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। সেই বিয়েতে ওকালতি করার জন্য নাকি ঘটককে বিস্তর টাকা খাইয়েছিলেন দাদাভাই। আপনি ভাবতে পারছেন? সেই এতো এতো বছর আগে চুপি

চুপি প্রেম করে বিয়ে করে ফেললেন তাঁরা। কেউ সেই প্রেমের খবর জানল না। বুঝল না। ব্যাপারটা মজার না? আমি রং-নাম্বারে প্রেমের গল্প শুনেছি কিন্তু এভাবে চিঠি প্রেমের গল্প একদম নতুন। আচ্ছা? তাদের প্রেমটাকে কী নাম দেওয়া যায়, বলুন তো? রং-নাম্বারের সাথে মিলিয়ে রং-লেটার?

বিঃদ্রঃ আপনি কিন্তু এবারও ইতিতে কিছু লেখেন নি। এবার আমি আপনাকে কী বলে সম্বোধন করি বলুন তো?

ইতি

শ্যামলতা ‘চিঠিটা লিখে বার কয়েক চোখ বুলাল নম্রতা। তারপর কম্পিত হৃদয়ে চিঠিটা রেখে দিল নির্দিষ্ট বইয়ের মলাটের নিচে। বাকিটা সময় সেই অপরিচিত ‘সে’ এর থেকে

পাওয়া দুই লাইনের চিঠিটা হাতে নিয়ে থম মেরে বসে রইলো। নোট বুক আর এসাইনমেন্টের পাতাগুলো ফ্যানের কৃত্রিম বাতাসে চঞ্চল হয়ে উঠল। নম্রতার খুশির জোয়ার যেন তাদের মাঝে প্রাণ দিল। বাতাসের ঝাপটায় উলোটপালোট হতে লাগল পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আনমনা নম্রতার কাছে বইয়ের পাতার উড়োউড়োর শব্দটাকে হঠাৎ-ই ভীষণ মাদকীয়

বলে বোধ হতে লাগল। সেই সাথে মাথায় উঁকি দিয়ে গেল অদ্ভুত এক প্রশ্ন, ‘ আচ্ছা? পত্রমিতার ‘সে’ নামক লোকটা যদি টাক পড়া বৃদ্ধ কোন লোক হয়, তবে? বা রাস্তার কোনো ছাইপাঁশ বেয়াদব ছেলে?’ মস্তিষ্কের করা যুক্তিসংগত প্রশ্নটা মনের কাছে খুব একটা পাত্তা পেলো না। সেই অপরিচিত মানুষটি যেমনই হোক সে যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন

মানুষ তা বেশ বুঝতে পারছে নম্রতা। লাইনের ভাঁজে ভাঁজেই ফুটে উঠছে লোকটির প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ববোধ। এটা কি শুধুই নম্রতার ভ্রান্ত ধারণা? হলে হোক। এই ভ্রান্ত ধারণা মেনে নিতেই যেহেতু ভালো লাগছে তাহলে এই ভ্রান্ত ধারণাতে কোনো সমস্যা নেই। মানুষের ছোট্ট জীবনটাতে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকলে ক্ষতি নেই। ভ্রান্ত ধারণাকে বুকে আগলে

ধরে খানিকটা খুশি আর খানিকটা স্বপ্ন দেখাতেও ক্ষতি নেই। পত্রপ্রণয়ের তৃতীয় চিঠিটা এবার দু'সপ্তাহের মাথাতেও হাতে পেলো না নম্রতা। প্রতিদিন কলেজ শেষে গ্রন্থগারের পরিচিত বইটিতে ডুব দিয়ে ব্যর্থ হয়েও খুব একটা মন খারাপ হলো না নম্রতার। বরং তার উচ্ছল প্রাণে জোয়ার এলো। ফুলে ফেঁপে উঠলো হাসি-তামাশাময়

জীবন। অবসরে চিঠির জবাবে অপরিচিত ব্যক্তিটি কী কী লিখতে পারে সেই ভাবনায় আকণ্ঠ ডুবে রইলো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চমৎকার এক রবীন্দ্র সংগীতও গেয়ে ফেলল নম্রতা। বিস্ময়কর ভাবে পুরষ্কার হিসেবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘দূরবীন’ বইটাও হাতে পেয়ে গেল। আহ! সেদিন

নম্রতার কি আনন্দ। অল্পতে খুশি হয়ে যাওয়া নম্রতা সেদিন বান্ধবীদের পেছনে বিস্তর টাকা উড়াল। এক মাসের হাত খরচ আর জমানো টাকাগুলো শেষ করে মনের সুখে গান ধরল,‘ তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে

আমায় শুধু ক্ষণেক-তরে।

আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে

আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥’এই গানটা সেদিন ওই টাইম-টেবিলহীন অপরিচিত ব্যক্তিটিকে ভেবে গেয়েছিল নম্রতা। নীরার ভাষায়, সেই গানের মতো আবেগময় গান নাকি পৃথিবীতে দ্বিতীয়জন গাইতে

পারে নাই। কথাটা শুনে প্রচুর হেসেছিল নম্রতা। তার দামফাটা, প্রাণখোলা হাসির মাঝেও সেই লোকটির ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল মাথায়। পত্রপ্রণয়ের তৃতীয় চিঠিটা এলো ঠিক ষোল দিনের মাথায়। এবারও সম্বোধনহীন গুটি গুটি অক্ষরে লেখা চিঠি। কিন্তু এবার আর সাদা নয় গাঢ় নীল রঙা পাতার মাঝ বরাবর দুই থেকে তিন লাইনের

ছোট্ট এক চিঠি। নম্রতা ভেবে পায় না এই লোক এতো ছোট চিঠি লিখে কিভাবে? এর মাথায় কি এতো এতো কথা কিলবিল করে না? এই লোকটা কি স্বল্পভাষী? উঁহু, নম্রতা তো তাকে কথা বলতে দেখেনি। শুধু লিখতে দেখেছে। তাই লোকটিকে স্বল্পভাষী বলা যায় না। লেখার সাথে মিলিয়ে স্বল্পলেখ্য বলা যায়। নম্রতা আবারও চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়ল।

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে গালের সাথে চেপে ধরে সুখী সুখী দৃষ্টিতে তাকাল। খোলা চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে উড়ে এসে আছড়ে পড়তে লাগল চিঠিতে। দুই-তিন লাইনের চিঠিটাই আনমনা হয়ে পড়তে লাগল নম্রতা।‘ “রং-লেটার লাভ স্টোরি! বাহ! ইন্টারেস্টিং তো। কিছু কিছু সম্পর্ক সম্বোধনহীন হলে মন্দ হয় না শ্যামলতা। আপনার-আমার

সম্পর্কটা না-হয় সম্বোধনহীনই হোক। আর হ্যাঁ, আপনার দেওয়া শাস্তিটা আমি মাথা পেতে নিলাম। কোনো একদিন প্রয়োজন হলে সে শাস্তির সত্যিকার প্রতিফলন ঘটাব। তুমিময় শাস্তির আগে চিঠিগুলো একবার আপনিময় হোক।'

এটুকু পড়েই খুশিতে ঝুমঝুম করে উঠল নম্রতা। ছোট্ট একটু লেখাতে এতো আকর্ষণ কী করে ঢেলে দেয়

এই লোক? লোকটির কাছে কি চিঠি-মাদক ধরনের কিছু আছে? নম্রতা প্রলম্বিত শ্বাস ছাড়ে। সেই পত্রপ্রণয়ের স্বল্পলেখ্য মানুষটি যে মনে করে সাদার বদলে নীল কাগজে চিঠি লিখেছে তাতেই নম্রতার খুশি যেন আর ধরে না। তারমানে, লোকটিও সময় করে তার মতোই চিঠিগুলোর কথা ভাবছে? ইশ! বেঁচে থাকা এতো আনন্দের

কেন? অপেক্ষাগুলো এতো মিষ্টি কেন? আনন্দিত নম্রতা এবার খুশিমনে চিঠি লেখায় মন দিল। নীল কাগজের মসৃণ জমিনে কিশোরী আবেগের ঘটটা যেন উল্টে দিল। এক-দু শব্দ করে লিখে ফেলল দীর্ঘ এক চিঠি,‘ সম্বোধনহীন চিঠি! বাহ রে! সম্বোধনহীন চিঠি লিখলে কিভাবে বুঝবো আপনার আর আমার সম্পর্কটা ঠিক কেমন?

আমরা কি বন্ধু নাকি জীবনপথে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া দু'জন আগুন্তকঃ মাত্র?

আচ্ছা? আপনি কখনো জ্যোৎস্না আলোয় স্নান করেছেন? আমি ছেলেবেলায় একটা উপন্যাসে পড়েছিলাম খুবই অদ্ভুত এক ছেলে জ্যোৎস্না রাতে ছাঁদের পাটাতনে লম্বালম্বি শুয়ে জ্যোৎস্না বিলাশ করতো। তার সারা শরীরময়

জ্যোৎস্নার মিষ্টি আলো ঝলমল করতো। একদম সিনেমার জ্যোৎস্নার মতো নীল দেখাতো তার গোটা শরীর। মাঝরাতের ঠান্ডা, শান্ত ঝিরিঝিরে বাতাসে কেঁপে উঠতো ছেলেটির উসকোখুসকো চুল। আমারও খুব ইচ্ছে জ্যোৎস্না স্নান করার। কিন্তু আম্মুর জন্য হচ্ছে না। মেয়েদের তো একা একা ছাঁদে থাকা বারণ তাই। আচ্ছা?আপনারও কি

রাতে ছাঁদে উঠা বারন? যদি বারণ না হয় তাহলে একদিন গভীর রাতে জ্যোৎস্না স্নান করবেন। তারপর সেই পূঙ্খানুপুঙ্খ অনুভূতিগুলো আমায় জানাবেন। কি, জানাবেন তো? আমিও অবশ্য জ্যোৎস্না স্নান করব। কিন্তু সে তো অনেক দেরী। জ্যোৎস্না বিলাস সবসময় একা একা করতে হয়। তবে পাশে যদি প্রিয়তম কেউ থাকতে চায় তাহলে অবশ্য দু'জন

থাকার নিয়ম আছে। কথায় আছে না? এভ্রিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। কিন্তু দু'য়ের অধিক থাকলে কিছুতেই জ্যোৎস্না বিলাস হয় না। সেটা ইংরেজি কম্পোজিশন 'দি মুনলিট নাইট' হয়ে যায়। আমি তো ছাঁদে একা যেতে ভয় পাই তাই বরের জন্য অপেক্ষা করছি। বিয়ের পর বরের সাথে জ্যোৎস্না স্নান করব। সুন্দর টলমলে জ্যোৎস্না

থাকবে সেদিন। বিশাল আকাশটিতে থালার মতো হলদেটে এক চাঁদ থাকবে।আমার গাঁয়ে থাকবে সাদা পাতলা এক শাড়ি। হাত ভরা লাল চুড়ি আর চোখ ভরা মায়াবী ঘন কাজল। ছাঁদের একপাশে একটি বেলীফুলের গাছ লাগাব সেখানে দু-একটা ঝড়া বেলীফুল ঝলমল করে ওঠবে। আমি খোলা লম্বা চুলগুলো ছাঁদের পাটাতনে ছড়িয়ে দিয়ে

আকাশ দেখব। ঝিরিঝিরি বাতাসে আমার চুলগুলো উড়বে। বাতাসটা ভরে যাবে বেলীফুলের অদ্ভুত সুন্দর ঘ্রাণে। আমার পাশে শুয়ে থাকা প্রিয়তম হাতে হাত রেখে আবেগভরা কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বলবে, ”শুনছো জ্যোৎস্না রাণী? আমি তোমাকে মায়াবী জ্যোৎস্নার মতো ভালোবাসি।” আহা! স্বপ্নটা সুন্দর না?বিঃদ্রঃ আপনি কি ভূতে ভয়

পান? ভয় বাতিক থাকলে আমায় জানাতে পারেন। আমি দারুণ সব সূরা জানি। ওগুলো শুনলে ভূত দৌঁড়ে পালাবে।

ইতি

শ্যামলতা ‘

চিঠিটা লিখে জোরে শ্বাস টানল নম্রতা। কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে চিঠির দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল, এমন সুপ্ত স্বপ্নের কথাগুলো কি এভাবে

লিখে ফেলাটা ঠিক হলো? লোকটা আমায় কী ভাববে? পরমুহূর্তেই অস্বস্তিটা উবে গেল নম্রতার। মনে পড়ে গেল চির চিরন্তন বাক্য, একদম অপরিচিত মানুষ ছাড়া মনের সুপ্ত কথা প্রকাশ করে আরাম নেই। অপরিচিত মানুষ থেকে অনুভূতি নিয়ে কাটাছেঁড়ার আঘাত পাওয়ার ভয় নেই। তারা শুধু শুনে, ভাবে তারপর ভুলে যায়। তার

পত্রমিতার 'সে' ও-তো তার অপরিচিত কেউই। ভীষণ অপরিচিত 'সে'। তার কাছে অনুভূতি প্রকাশে ভয় নেই। একটুও না।সন্ধ্যার আযান পড়ছে। দূরে কোথাও সুকরুণ সুরে সৃষ্টিকর্তার গুণব্যঞ্জন করছেন স্রষ্টার প্রেমে কাতর মোয়াজ্জেম। কণ্ঠে তার মোলায়েম বিষণ্নতা। রোকেয়া হলে নম্রতার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটির সফেদ পর্দাটা হালকা-মৃদু কাঁপছে। ঘরের

ভেতর থাকা আলোটা টিম টিম করে জ্বলছে। জানালায় ভর করেছে একঝাঁক ফ্যাকাসে অন্ধকার। নম্রতা সেই বিকেল থেকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। হাতে পুরোনো, জীর্ণ ডায়েরি। চোখদুটো বোজা। ফ্যানের বাতাসে শুষ্ক চুলগুলো উড়ছে। চোখ বোজে রাখা নম্রতাকে দেখাচ্ছে গ্রীক দেবীদের মতো প্রসন্ন। নির্ভুল সুন্দর। ঠোঁটের

কোণায় তৃপ্তির হাসি। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। প্রথমে মৃদু স্বরে। তারপর গলার স্বর খানিকটা চড়া করে নম্রতাকে ডাকল,‘ এই নমু? ঘুমুচ্ছিস নাকি? আজান পড়ছে। বসে বসে কেউ ঘুমায়?’

নম্রতা চোখ মেলে তাকিয়ে স্বচ্ছ হাসল। কেমন সুখী সুখী দেখাল

তার চোখ-মুখ। নীরা সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ ঠিক আছিস?’

নম্রতা জোরালো শ্বাস ফেলে বলল,

‘ অবশ্যই।’

‘ মন ভালো?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল,

‘ খারাপ থাকার কথা ছিল নাকি?’

নীরা উত্তর দিল না। এতো বছরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এখনই নম্রতার

মন ভালো হয়ে যাওয়াটা উচিত কথা নয়। নীরা সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘ টিএসসিতে যাবি? অন্তু,রঞ্জন,ছোঁয়া,নাদিম সবাই আসছে টিএসসিতে। ব্যাপক আড্ডা হবে। চল না যাই।’

নীরা অবাক চোখে তাকাল। দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,

‘ পাগল? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অলমোস্ট সাতটা বাজে। এখন গেলে ফিরবি কখন? হল সুপার ধরে পেদাবে।’

নীরা ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বিছানায় বসল। কুটিল হাসি দিয়ে বলল,

‘ আরে ধুর! ওই মহিলার কী? আমি ম্যানেজ করে নেব। তবুও ঢুকতে না

দিলে, আজ রাতটা ছোঁয়াদের বাসায় থাকব। সমস্যা কই?’

নম্রতা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,‘ এতো কাহিনী করার কী দরকার দোস্ত? কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।’

পরমুহূর্তেই উৎসাহ নিয়ে বলল, ‘তুই কী জানিস? আজকের দিনে ওর থেকে চতুর্থ চিঠিটা পেয়েছিলাম আমি।’

নীরা হতাশ চোখে তাকাল। নম্রতার হাত টেনে ধরে বলল,

‘ অলরেডি তিনবার শুনে ফেলেছি বইন। আর না, প্লিজ। সবাই অপেক্ষা করছে। চল তো।’

নম্রতা উঠে দাঁড়াল। বাসায় পরে থাকা প্লাজুর ওপর স্কার্ট পরে টপস বদলে নিল। চুলগুলো উঁচুতে খোঁপা করে চোখে-মুখে পানি ছিঁটাল।

গলায় স্কার্ফ পেঁচিয়ে ব্যাগ হাতে নিতে নিতে বলল,

' বড্ড জ্বালাস তুই। চল।'নীরা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছিল। নম্রতাকে ডায়েরিটা ব্যাগে পুড়তে দেখে বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

' সব জায়গায় এই ডায়েরি না নিলে চলে না তোর? মানুষ জামাইরেও এমনে চিপকাই ধইরা থাকে না।

আর এটা রেডি হওয়া হইলো? একটু সাজগোজ কর।’

নম্রতা হাসল। নীরার মাথায় চাটি মেরে বলল,

‘ আড্ডা মারতে যাচ্ছি, বিয়ে করতে নয়। আর সেজেগুজে কী হবে? যার জন্য সাজব সে-ই তো হাওয়া। একবার খালি পাই। আমার সাজের ধরন দেখতে দেখতেই মরে যাবে শালা।’

নম্রতা মাথায় চাটি দেওয়ায় লিপস্টিক ল্যাপ্টে গালে গিয়ে লাগল নীরার। নীরা লিপস্টিক হাতে কিছুক্ষণ ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো বসে রইল। দাঁত কিরমির করে বলল,' আল্লার ওয়াস্তে তোর সেই পত্রমানবকে যদি একবার খুঁজে পাই। কসম, আমি নিজেই খুন করব তারে। ব্যাটার যন্ত্রণায় জীবনটা ত্যানা ত্যানা হয়ে গেল। কত্ত কষ্টে

মেকাপ করেছিলাম তোর কোনো ধারণা আছে?’

নম্রতা খিলখিল করে হেসে উঠল। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বলল, ‘ তুই না সাজলেও অন্তু তোর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবে। আয় জলদি।’

নম্রতার কথাটা কানে যেতেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল নীরা। পরমুহূর্তেই তীব্র অস্বস্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সংকুচিত মনে একটা কথায় ভাবতে লাগল, এই একটা নাম শুনেই এতো লজ্জা কেন পায় সে? অন্তু তো আলাদা কেউ নয়। রঞ্জন আর নাদিমের মতোই খুব কাছের একজন বন্ধু। তবে?

রাত বেশি নয়। মাত্রই সন্ধ্যা নেমেছে আকাশে। কোলাহলে পরিপূর্ণ টিএসসিতে দুটো ব্রেঞ্চ দখল করে বসে আছে অন্তু, রঞ্জন, নাদিম আর

নম্রতারা। সবার হাতেই গরম সমুচার প্লেট। ভ্যাপ্সা গরমেও পাশে রাখা ধোঁয়া ওঠা গরম চা। রঞ্জন সমুচায় কামড় দিয়ে গান ধরল,‘ তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা

মোর জানো না।

তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা।

‘

নাদিম গিটারে টুনটান শব্দ তুলেই মুখ কুঁচকাল। শার্টের কলার ঝেড়ে বলল,

‘ শালার গরমের জ্বালায় বাঁচি না বাল। শইল জ্বইলা যাইতাছে।’

ছোঁয়া কপাল কুঁচকে বলল,

‘ ভাষা ঠিক কর। এসব থার্ডক্লাস শব্দ আমার সামনে বলবি না।’

ছোঁয়ার কথায় আকাশ থেকে পড়ল নাদিম। বলল,

‘ আমি তোর ভাষার কোন বা....’
ছোঁয়া চেঁচিয়ে উঠে বলল,
‘ আবার!’
নাদিম গলা পর্যন্ত উঠে আসা শব্দটা গিলে নিল। মুখ কুঁচকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিরবির করে বলল,
‘ তোর প্রফেসার বাপের খাইঁসটে জ্ঞান দেখাস সারাদিন। ভাল্লাগে না বাল। যা কইলাম না।’

ছোঁয়া ফুঁসে ওঠে বলল,‘ তুই আবার বললি। আর খাইঁসটে কী? ছিঃ বমি আসছে আমার। এতো বাজে কথা বলিস তুই!’

ছোঁয়ার কথায় নাদিমের মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। মানে কী? এই মাইয়া বলে কী? সে কী এমন বলল যার জন্য তাকে বমি করে দিতে হবে? একটা সিম্পল কথা নিয়ে এতো লাফালাফি! কিভাবে পারে এই

মেয়ে? এই মেয়েকে তো দিনে রাতে থাপড়ানো উচিত। অসহ্য! অন্তু সমুচায় কামড় দিতে দিতে উদাস কণ্ঠে বলল,

‘ ওরে ছাড় তো। রঞ্জন গান ধরবে। তুই সুর তোল। পুরাই ছ্যাকা টাইপ গান , বুঝলি? অর্নাস থার্ড ইয়ারে উঠেও যদি জুনিয়রদের প্রেমলীলা দেখেই বুড়া হতে হয় তাহলে এই জীবন রেখে লাভ কী? এই নমু?

তোদের কী একটুও মায়া হয় না? বন্ধু সিঙ্গেল থাকতে থাকতে ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। একটা মেয়ে টেয়ে তো খুঁজে দিতে পারিস, নাকি? স্বার্থপর।'নম্রতা সরু চোখে তাকাল। হাতের কাপটা পাশে রেখে ডান পায়ের জুতোটা খুলে নিয়ে বলল,

' জুতো দেখছস? মাইর না খাবার চাইলে স্বার্থপর বলবি না। এই তিন

বছরে কম ট্রাই করছি? তোর তো কোনোটাতেই মন ভরে না।’

অন্ত কিছু বলার আগেই লাফিয়ে উঠলো নীরা। আশেপাশে তাকিয়ে কিছু একটা লক্ষ্য করে বলল,

‘ আশেপাশে বহুত মেয়ে আছে দোস্ত। তুই খালি চুজ কর। পটাই দেওয়ার দায়িত্ব আমাগো। যেমনেই হোক পটামু। যা।’অন্ত আহত দৃষ্টিতে তাকাল। সেই দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ

উপেক্ষা করে এদিক-ওদিক থাকা মেয়েদের নিয়ে পর্যালোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল নীরা। অন্তর চোখে-মুখে ফুটে উঠলো হতাশার ছাপ। ভার্সিটির প্রথম বছর থেকে নীরার প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন করে আসছে অন্ত। সেই দুর্বলতা গত দু'বছরে জীবন-মরণ ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে কিন্তু নীরা নারাজ। প্রথম বছরটা নীরাকে উঠতে বসতে প্রোপোজ করেছে

অন্তু। নিজের আত্মসম্মানের জলাঞ্জলি দিয়েও নীরাকে ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারে নি। শেষমেশ, পরাজিত সৈনিকের মতো জিগ্যেস করেছে, কেন পছন্দ করিস না আমায়? কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে। একাধিক কারণও থাকতে পারে। বল শুনি। অন্য কোনো মেয়ে পটানোর আগে দোষগুলো ঠিকঠাক করা যায় কি-না

দেখি।' নীরা হাসিমুখেই উত্তর দিয়েছে, ' তুই আমার থেকে চার মাসের ছোট।' কথাটা শুনে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে ছিল অন্তু। নীরা কি তার সাথে মজা করছে? এমন একটা লেইম কারণে বার বার তাকে রিজেক্ট করা হচ্ছে? বিশ্বাস হয় না অন্তর। নম্রতার গানের সুরে ঘোর কাটল অন্তর। অতি সন্তপর্ণে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাসিমুখে নম্রতার

গানের আসরে মন দিল। নম্রতা তখন অন্তরা গাইছে। চোখ বোজে নিবিষ্ট মনে সুর তুলছে,‘ আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে,

শুধু তোমায় ভালোবেসে।

আমার দিনগুলো সব রং চিনেছে, তোমার কাছে এসে।

শুধু তোমায় ভালোবেসে।

তুমি চোখ মেললেই ফুল ফুটেছে
আমার ছাদে এসে,
ভোরের শিশির খুব ছোঁয়ে যায়,
তোমায় ভালোবেসে।
আমার একলা আকাশ থমকে গেছে
রাতের স্রোতে ভেসে,
শুধু তোমায় ভালোবেসে।'

নাদিম আলতো হাতে গিটার বাজাচ্ছে। সবাই নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। আশেপাশের অনেকেই কান খাঁড়া

করে শুনছে নম্রতার কিন্নরকণ্ঠী গান। গান শেষ করে চোখ মেলে তাকাল নম্রতা। দাঁত বের করে হেসে বলল,‘ যা গাইলাম। এখন হলো?’

কেউ জবাব দিল না। রঞ্জন অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘ দোস্ত! তুই যে কী পরিমাণ মারাত্মক গাইছিস, বুঝতে পারছিস? এতো আবেগ কোথা থেকে আসে

তোর গলায়? এর আগে তো এতোটা আবেগ দিয়ে গাস নি তুই। তবে? নতুন প্রেমে টেমে পড়ছিস নাকি?’

নম্রতা হাসলো। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল,

‘ ধুর! আমি আর প্রেম? পুরাতন প্রেমে মজে মজেই শেষ হয়ে যাচ্ছি। আর তুই বলছিস নতুন?’

নাদিম চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ পুরাতন প্রেম মানে কী? তুমি মামা ডুবে ডুবে জল খাও? আমাদের বলিস নি পর্যন্ত!’

নীরা সমুচার কোণা চিবোতে চিবোতে বলল,

‘ কেন? ওর ছ্যাঁকা খাওয়া কাহিনি শুনিস নাই? আজকেও তো ওর মন ভালো করতেই আড্ডা বসালি। তবু জানোস না?’

রঞ্জন অধৈর্য্য হয়ে বলল,‘ ছ্যাঁকা যে খাইছে তা জানি। কিন্তু পুরা কাহিনি জানি না। তোর এতো আবেগের পেছনে যদি ওই একটা মানুষ থাকে। তাহলে আমি ওই মানুষ সম্পর্কে জানতে চাই। শুরুটা কিভাবে? আর শেষটাই বা কী?’

সবাই উৎসাহ নিয়ে নম্রতার দিকে তাকাল। নম্রতা বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,

‘ শুরুটা হয়েছিল চিঠি দিয়ে। পত্রপ্রেম বলতে পারিস।’

অন্তু কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কলেজে ক্লাসমেট ছিল তোর? সেইম ইয়ার? বইয়ে বইয়ে পত্র বিনিময় টাইপ কিছু?’

নম্রতা হেসে বলল,

‘ নাহ্।’

ছোঁয়া চশমাটা ঠিক জায়গায় ঠেলে দিয়ে বলল,

‘ হোয়াট ইজ পত্রপ্রেম গাইস?’

নাদিম ফুঁসে ওঠে বলল,‘ ওই এই ইংরেজের বাচ্চারে চুপ করতে বল। ছোঁইয়ার বাচ্চা। বেশি কথা বললে চড় খাবি। যতটুকু বুঝবি ততটুকু মন দিয়া শোন। কথার মাঝে বাম হাত ঢুকাবি না।’

ছোঁয়া মুখ ফুলিয়ে বলল,

‘ আমার নাম ঠিক করে উচ্চারণ কর। আমার নাম ছুঁইয়া না ছোঁয়া। সুন্দর নাম।’

নাদিম ধারালো গলায় বলল,

‘ ওই তোরে চুপ করতে বলছি না? ছোঁয়া! সুন্দর নাম! এই সুন্দরের কী বুঝোস তুই? তোর নামটা টোটালি ক্ষেত!’

রঞ্জন ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল,

‘ চুপ কর তো তোরা। নমুকে বলতে দে। তাহলে শুরুটা কিভাবে? কলেজ সিনিয়র ছিল? বা স্কুল সিনিয়র?’

নাদিম কথা কেড়ে নিয়ে বলল,‘ বা পাশাপাশি বাড়ি। প্রতিবেশী ভাইয়া ছাইয়া?’

নম্রতা হেসে ফেলে বলল,

‘ ওসব কিছুই না।’

অন্তু অধৈর্য্য হয়ে বলল,

‘ তাহলে দেখলি কেমনে?’

‘ দেখি নি।’

নম্রতার বলা ছোট্ট শব্দটা কানে যেতেই চোখ বড় বড় করে তাকালো সবাই। শুধু নীরা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। রঞ্জন কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলল,

‘ দেখিস নি মানে? না দেখে প্রেম হয়?’

‘ হলো তো।’‘ আমি কিছু বুঝতেছি না। দেখিস নি তাহলে চিঠি পেলি

কিভাবে? কাহিনীটা কী? স্পষ্ট কর তো।’

নম্রতা ধীরে ধীরে কাহিনি বর্নণা করতে লাগল। তাদের তৃতীয় চিঠি প্রাপ্তির ঘটনা পর্যন্ত শুনেই আৎকে উঠল রঞ্জন। নাদিম চোখ কপালে তুলে বলল,

‘ এভাবেও প্রেম হয় নাকি? সত্যি ঘটেছে এমনটা?’

রঞ্জন ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল,

‘ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তারপর কী হলো? ব্যাটার চতুর্থ চিঠি কবে পেলি হাতে?’

নম্রতা হালকা হেসে আকাশের দিকে তাকাল। ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করে আঠায় লাগানো চতুর্থ চিঠির পৃষ্ঠাটা বের করল। বন্ধুদের দিকে এগিয়ে দিয়ে আবারও অতীতে ডুবলো।নম্রতার হাতে যখন চতুর্থ চিঠিটা এলো তখন কলেজে গ্রীষ্মের

ছুটি। বাসা থেকে বেরুনো একেবারেই নিষেধ। টিউশনিগুলোতেও সাময়িক ছুটি জারি করেছেন স্যারেরা। বাইরে বের হওয়ার অজুহাতের ঘট ফাঁকা। নম্রতা দিন-রাত ভূতের মতো পায়চারি করে আর ভাবে, কলেজগুলো এভাবে বন্ধ রাখার মানে কী? বছরে হাফ সময় যদি গ্রীষ্মের ছুটিই থাকে তাহলে

পড়াশোনাটা হবে কখন? নাহ্ সরকারি কলেজের এহেন দূর্দশা আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। গভীর রাতে বাবাকে ডেকে তুলে বা নীরাকে ফোন দিয়ে উঠিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আলোচনা করে নম্রতা, 'এইযে এতো টাকা দিয়ে টিউশনি করছি। লাভটা কী হচ্ছে? বছরের বেশির ভাগ সময় তো স্যারেরা গ্রীষ্মের ছুটিই কাটিয়ে ফেলছেন। গরম তো

বাসায় বসে থাকলেও করবে শশুর বাড়ি বেড়াতে গেলেও করবে। গরম হাওয়া খাওয়ার জন্য অন্যের টাকা মেরে স্যারদের শশুরবাড়ি বসে থাকার মানে কী?আমাদের বাপের টাকা কী নদীতে ভেসে এসেছে? আসে নি। তাহলে এতোকিছু সহ্য করা কেন? টাকা দিয়ে যেহেতু পড়ছি আমাদের উচিত প্রটেস্ট করা। হ্যাঁ কি না?’ নীরা আর

নম্রতার বাবা ঘুমে ঝিমুতে ঝিমুতে বলেন, ‘হ্যাঁ। অবশ্যই। লেটস প্রোটেস্ট।’ এভাবে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়ার পর ফট করেই একটা অজুহাত পেয়ে গেল নম্রতা। মাকে গিয়ে রঙিয়ে চঙিয়ে মিথ্যে বলে চলে গেল শাহাবাগ। দু’তলার নির্দিষ্ট বইটির মাঝে কাঙ্ক্ষিত চিঠিটাও পেয়ে গেল। নম্রতা উত্তেজনায় ছটফট করে চেয়ারে

গিয়ে বসল। গুটি গুটি অক্ষরে লেখা চিঠিটির দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে এলো। চিঠির এক জায়গায় চোখদুটো আঠার মতো আটকে রইলো। চিঠিতে লেখা,‘ আপনার স্বপ্নটা খুব সুন্দর শ্যামলতা। আমার কাছে জ্যোৎস্না বিলাস, বৃষ্টি বিলাস বড্ড ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। কারণহীন, অকারণ বলে মনে হয়। কিন্তু আপনার বর্ণনা আর উৎসাহ

দেখে কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে ছাঁদে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে। কাকতালীয়ভাবে আমাদের ছাঁদের কিনারায় একটি বকুল গাছ আছে। বকুলের সাথে আরো কিছু ফুল গাছ আছে। সবই আমার ছোটবোন নিদ্রার লাগানো। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সেই ফুলগুলোর ঘ্রাণ আমার ঘর পর্যন্ত এলেও কখনো খেয়াল করা হয় নি। আপনার চিঠি পড়ার

পর খেয়াল করলাম। আর সম্বোধনের কথা বলছিলেন। সম্বোধন কী কখনো সম্পর্কের নাম হয় শ্যামলতা? আমার তো মনে হয় না। মানুষ মাত্রই তো আগুন্তকঃ। জীবনপথে প্রত্যেকেই ক্লান্ত, অপরিচিত পথিক। তুমি আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

বিঃদ্রঃ আমি ভূতে ভয় করি না। যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই তাতে ভয়

কিসের? আর আপনি অতো সূরা জানলে রাতের ছাঁদে আপনারই বা অতো ভয় কিসের ম্যাডাম?’নম্রতা চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়ল। তার লেখা ‘তুমি’ শব্দটাই বুক জুড়ে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। কেন জানি ওই ‘তুমি’ শব্দটুকুই নম্রতার ভীষণ ভালো লাগতে লাগল। নম্রতার খুশি অবশ্য বেশিক্ষণ টিকল না। নম্রতার বলা মিথ্যে নিয়ে বাড়িতে

বিরাট দূর্দশা লেগে গেল। নম্রতা মাকে চুপিসারে বলেছিল,

‘ নীরাকে দেখতে এসেছে মা। আমি ওর বেস্টফ্রেন্ড হয়ে যদি না যাই। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায় না?’

নম্রতার মা উৎসাহ নিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন,

‘ছেলে কী করে?’

নম্রতা ফট করেই বলে ফেলেছিল,

‘এইতো জেলা জাজ।’নম্রতার বলা এই কথাটাই যেন কাল হলো। নম্রতার মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। নীরার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে জেলা জাজের সাথে? এতোবড় খবর কী চুপিসারে রাখা যায়? নম্রতা বেরিয়ে যেতেই পাশের বিল্ডিং-এ থাকা নীরার খালার কাছে কথা চালান করলেন নম্রতার মা। ভীষণ

বিনয়ী আর আনন্দিত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন,
‘ আপা? নীরার নাকি জেলা জাজের সাথে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মাশাআল্লাহ। শুনে ভীষণ ভালো লেগেছে।’নম্রতার মায়ের কথায় নীরার খালার মাথাতেও আকাশ ভেঙে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিলের মতো ছোট্ট ঘটনাটা তালের মতো বৃহৎ আকার ধারণ করলো।

নীরা আর নীরার মা ঘটনা শুনে হতভম্ব চোখে-মুখে বসে রইলেন। নম্রতার মিথ্যেটা খুবই ভয়ানকভাবে ধরা পড়ে গেল। এটুকু শুনে হু হা করে হেসে উঠল নম্রতার বন্ধুরা। রঞ্জন বলল,

‘ তুই তো সেইরকম বলদ ছিলি ছোটবেলায়। তারপর কী হয়েছিল? কেমন বাঁশ খেয়েছিলি? চিঠিপ্রেমের কাহিনী ফাঁস হয়ে গিয়েছিল নাকি

তখন?’নম্রতা হাসলো। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল,

‘ বলদ ছিলাম না। তবে এভাবে ধরা খেয়ে যাব চিন্তাও করিনি কখনো।’

অন্তু শার্টের কলার ঝাঁকিয়ে কলার ঠিক করলো। ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো,

‘ তারপর কী হলো? এই বাঁশেই প্রেমিক পুরুষের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার হয়ে গেল তোর?’

নম্রতা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল,

‘ আরে ধূর! তখন উদ্ধার হলে কী আজ এই অবস্থা হয় আমার? চরম বাঁশ খাওয়ার পর কিছুদিন চুপচাপ ছিলাম। তবে, আমাদের প্রেমটা মূলত সেখান থেকেই শুরু। প্রেম নয় হয়তো বন্ধুত্বের শুরু। তখন থেকেই ধীরে ধীরে পাল্টে যায় আমাদের চিঠির ধরন।’‘ বাপরে! তো

এতো প্রেম হঠাৎ উবে গেলো কীভাবে?’

নাদিম অবাক কণ্ঠে বলল,

‘ তুই সত্যি সত্যিই এই চিঠি-পত্রের সাথে প্রেম করে ফেললি? মানে, সত্যিই? ওই ব্যাটা যদি বুইড়া, টাকপড়া বা গাঞ্জা খোর হতো তো? ব্যাটার নাম কী?’

নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ জানি না।’

নীরা ব্যতিত বাকী সবাই চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ জানিস না মানে? তুই ওই ছেলের নামটা পর্যন্ত জানিস না? তোকে আমরা এতোটা বলদও ভাবি নি। তোর মতো বুদ্ধিমতি মেয়ে এমন বলদামো কেমনে করল?’

নম্রতা নিরাশ চোখে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। ক্লান্ত গলায় বলল,‘ কখনো জিগ্যেস করা হয় নি।

দু'জনের কেউ-ই প্রয়োজনবোধ করি নি। তবে কথায় কথায় একবার বলেছিল, তাদের পরিবারের সবার নামের প্রথম অক্ষর নাকি 'এন' দিয়ে শুরু। অদ্ভুতভাবে, একদম দাদার বাবা থেকে 'এন' রীতি চলে আসছে তাদের। সে হিসেবে ওর নাম 'এন' লেটার দিয়েই হওয়ার কথা।'

ছোঁয়া বোকা বোকা গলায় বলল,

‘ “এন” দিয়ে তো বাংলাদেশেই অসংখ্য নাম আছে। কিভাবে বুঝবি কোনটা ওই লোকের নাম? আমাদের নাদিমের নামও তো ‘এন’ দিয়ে। এই নাদিম? তুই কিছু করিস নি তো?’

নাদিম অত্যন্ত বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। ধমকে উঠে বলল,

‘ তোরে আল্লায় মুখস্থ করার গুণ ছাড়া আর কিছু দেয় নি। তোর আই

কিউ মাইনস জিরোর থেকেও কম। বালের কথা বলে অলওয়েজ।’ছোঁয়া ফুঁসে ওঠে কিছু বলবে তার আগেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো রঞ্জন,

‘ ছেলে কই পড়তো জানিস? প্লিজ এবার এটা বলিস না যে, ওই ব্যাটা কই পড়াশোনা করত সেটাও জানিস না তুই।’

নম্রতা অপরাধী চোখে তাকিয়ে থেকে চোখ নামাল। রঞ্জন আৎকে উঠে বলল,

‘ তারমানে তুই সত্যিই জানিস না?’

নাদিম হাত উল্টে হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ ওই পোলায় যে পড়াশোনা করত তারই বা কী গ্যারেন্টি আছে? আমার তো মনে হচ্ছে ওইটা কোনো পোলাই না। মাইয়া মানুষ ফাইজলামো করছে।’

নম্রতা ব্যস্ত গলায় বলল,‘ একদমই না। কোনো মেয়ে শুধু মজার ছলে গোটা আড়াই বছর নিয়ম করে চিঠি চালান করবে না। তাছাড়া, চিঠিতে থাকা আমাদের অনুভূতিগুলো সত্য ছিল। তোদের বোঝাতে পারছি না। তোরা ঠিক বুঝবি না। কিন্তু আমি বুঝি, আপাতত সেই সময়টাতে সে আমাকে ভালোবাসতো। কখনো কখনো আমার থেকেও বেশি

ভালোবাসতো। আর ও তখন স্টুডেন্টই ছিল। ঢাকারই কোনো ভার্সিটিতে পড়তো তখন।

অন্তু ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ তুই কী করে জানলি? আন্দাজই?’নম্রতা অন্তুর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আন্দাজই তো নয়। বিশ্বাসে। নম্রতার বিশ্বাস চিঠিতে লেখা একটা কথাও সে

মিথ্যে লিখে নি। সে মিথ্যে বলতে জানে না।

তখন বর্ষার মাঝামাঝি। নম্রতাদের চিঠি দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি তখন সপ্তাহে গড়িয়েছে। কখনো বা সপ্তাহে দুটো। শ্যামলতা ও সে- এর মাঝে তখন প্রেম না চললেও চলছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সম্বোধনের আপনি লেখা জায়গাটাতে তখন তুমিময় রাজত্ব। নম্রতার মাত্রই প্রি-টেস্ট

পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বর্ষার ঝুম বৃষ্টিতে বাইরে যাওয়া বারণ। নম্রতারা তখন তাদের ধানমন্ডির নতুন বাড়িটিতে থাকে। শাহবাগ থেকে ধানমন্ডির দূরত্ব খুব বেশি না হলেও এই বিশ্রী বর্ষাকালে অযথা জল-কাদা এক করার কোনো কারণ নেই। অন্তত মায়ের চোখে তো নেই-ই। সেই সময়টুকু ঘরে বসে পরীক্ষার শীট মুখস্থ করে, গলা

ছেড়ে গান গেয়ে, পুরোনো চিঠিগুলো পড়ে আর নিরন্তর ঝড়ে পড়া বৃষ্টিকন্যাদের নৃত্য দেখেই কেটে যায় নম্রতার। প্রি-টেস্ট পরীক্ষার পর এক সপ্তাহ জ্বর আরেক সপ্তাহ মায়ের কড়া ইন্সট্রাকশনের কারণে শাহবাগে যাওয়া হয়ে উঠলো না নম্রতার। তাদের উত্তাল চিঠি আদান-প্রদানে ভাটা পড়ল। প্রায় দুসপ্তাহ পর কলেজ আর টিউশনিতে যাওয়ার

অনুমতি পেয়েই শাহবাগে ছুটে গেল নম্রতা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেদিন ছিলো শনিবার। গ্রন্থাগারে ছুটির দিন। নম্রতার আর চিঠি পাওয়া হলো না। মন খারাপ নম্রতা মাঝরাতে ওঠে চিঠি লিখতে বসলো,‘ শুনো,

আজ আমার মনটা খুব খারাপ। এত্তো কাঁদতে ইচ্ছে

করছে কী বলব! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কী জানো? আমার মন খারাপের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। ভীষণ অগোছালো চিন্তা আজ মাথা জুড়ে। মানুষের বোধহয় বেঁচে থাকার জন্য সত্যিই একটা ভালোবাসার মানুষ প্রয়োজন, তাই না? যে মানুষটি শুধু আমার হবে। যাকে হারিয়ে ফেলার ভয় তাড়া করবে না। পৃথিবীর যেকোনো

কোণায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে থেকেও জানব আমার একজন মানুষ আছে। আমারই থাকবে। আমার কিশোরী মনটা যখন ভয়ানক মেঘে ঢেকে যাবে তখন আমি জানবো ওই মেঘগুলোর আড়ালে আমার নিজস্ব এক সূর্য আছে। নিজস্ব এক পুরুষ আছে। তাহলে আর কষ্ট করে পড়াশোনা করা লাগতো না। প্রি-টেস্ট পরীক্ষাটা যা খারাপ হয়েছে।

টেস্ট দিতে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। এই দুঃখ-কষ্টময় জীবন দিয়ে কী হবে বলো তো? বাবা-মা তো বিয়ের কথাও ভাবছে না। ধূর! কিচ্ছু ভালো লাগছে না।[বিঃদ্রঃ এতোদিন পর চিঠি পেলে। এই দিনগুলোতে মনে পড়েছিল আমায়?]

ইতি

শ্যামলতা ‘

এবারের চিঠির জবাবটা দু'দিনের মাথাতেই হাতে পেয়ে গেল নম্রতা। প্রথম দফায় বিস্মিত হলেও পরমুহূর্তেই খুশিতে ঝুমঝুম করে উঠলো। মনে মনে ভেবে নিলো, সেই মানুষটি হয়তো তাকেই ভাবছিল। তার চিঠির জন্যই ছটফট করছিলো নয়তো এতো তাড়াতাড়ি চিঠি পাওয়ার ভাগ্য কী নম্রতার হতো? নম্রতা চিঠি নিয়ে ফিরে গেল

বাসায়। পুরোটা সময় অদ্ভুত এক উত্তেজনা চেপে থাকল বুকজুড়ে । না-জানি কী আছে চিঠিতে! কী লিখেছে ওই অদ্ভুত লোকটি? নম্রতা বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে দরজা দিয়ে চিঠি খুললো। সাথে সাথেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো গুটি গুটি অক্ষরে লেখা আনন্দময় শব্দগুচ্ছ গুলো। চিঠির অদ্ভুত সুন্দর শব্দগুলো মিলেমিশে তৈরি হয়ে গেল কাল্পনিক

এক পুরুষালি মুখমন্ডল। গম্ভীর মুখভঙ্গিতে ধীরে ধীরে কথা বলছে সে। কথার মাঝে হাসছে। সেইসাথে হাসছে তার সুন্দর দুটো চোখ।‘

শ্যামলতা,

তুমি এতো পড়াচোর কেন, বল তো? তোমার লাস্ট চিঠিটা পড়ে কত্ত হেসেছি কোনো ধারণা আছে তোমার? প্রথম দফায় ভাবলাম বাচ্চা মেয়েটার এতো কষ্ট দূর করতে

একটা নিজস্ব পুরুষ মানুষ কিনে দেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু শেষটা পড়ে তো আমি হতভম্ব। ম্যাডাম যে পরীক্ষার ভয়ে পুরুষ মানুষ চাইছে সে তো আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।তবে, আমি কিন্তু পড়াশোনা ফাঁকি একদম পছন্দ করি না। আমি নিজেও ভীষণ পড়াকু তাই চাই আশেপাশের মানুষগুলোও ভীষণ পড়াকু হোক। আমার ইচ্ছে কী

জানো? আমার ইচ্ছে আমাদের ভার্সিটিরই টিচার হিসেবে জয়েন দেওয়া। আমার বাবার ইচ্ছেটাও ছিল তাই। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে বাবার ইচ্ছেটা আর পূরণ হয়ে উঠে নি।ভাইয়াও বাবার স্বপ্নটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নি। তাই টিচিং প্রফেশনের দিকে না ঝুঁকে নিজের ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে। এখন আমি আর নিদ্রাই বাবার

একমাত্র ভরসা। নিদ্রা কিন্তু তোমার মতোই পড়াচোর। পড়াশোনা নাকি তার মাথার ওপর দিয়ে যায়। আমাকে বলে, আমি নাকি রসকষহীন রোবট মানব। যার ভেতর শুধু একটাই সফটওয়্যার। পড়ো, পড়ো এবং পড়ো। কিন্তু তোমার কাছে এসে ব্যাপারটা ভিন্ন। আমার পৃথিবীতে হাতেগুণা মানুষদের মাঝে তুমি একজন যে

আমার বাইরেটা নয় ভেতরটা জানে। মস্তিষ্কের বাইরেও আমার যে একটা মন আছে তা তোমার সাথে কথা না হলে হয়তো ঠিকঠাক প্রকাশ পেতো না শ্যামলতা। এই যে তুমি পড়াশোনায় টালবাহানা করো। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয়, তোমার সাথে এমনটাই মানায়। তোমাকে ঠিক এমনটাই হওয়া উচিত। তোমার প্রাণোবন্ততার সাথে

তো এমনটাই সাজে। তাই বলে, পড়াশোনায় অবহেলা কিন্তু ঠিক নয়। মেয়েদের তো আরো নয়। তোমার না দেশ ঘুরে-বেড়ানোর শখ? পড়াশোনা না করলে সেই দেশ ঘোরাটা কী আদৌ হয়ে উঠবে? তোমার সেই নিজস্ব পুরুষ মানুষ যে তোমায় সেই স্বাধীনতাটুকু দিবেই দিবে। তারই বা কী গ্যারেন্টি আছে? তাছাড়া নিজেকে শিক্ষিত, মার্জিত,

আত্মবিশ্বাসী আর স্বাবলম্বী ভাবতেও তো অন্যরকম অনুভূতি হওয়ার কথা। আমার তো হয়। তোমার স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছে করে না? কোনো এক ঘরের কোণায় সংসারের যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে থাকা শ্যামলতাকে ভাবলেই তো দমবন্ধ লাগে। তোমার লাগে না?বিঃদ্রঃ তোমায় মনে পড়েছে কি-না জানি না। তবে বেশ কিছুদিন যাবৎ হঠাৎ-

ই আমার ঘরে বেলীফুলের সুবাস আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার আসছে। বেলীফুলরা হয়তো জেনে গিয়েছে, আজ আমার খুশি হওয়ার দিন! '

সেই দমবন্ধ করা শেষ লাইনগুলো পড়ে বিস্ময়ে, আনন্দে কেঁদে ফেললো নম্রতা। আর সেদিন থেকেই পড়াশোনার প্রতি আলাদা দৃষ্টি তৈরি হলো তার। মাথায় খেলে

গেল একটাই কথা। সত্যিই তো? পড়াশোনা করে স্বাবলম্বী না হলে কী করে চলবে তার? তার এতো এতো স্বপ্নগুলোকে পাখা দিতে ঠিকঠাক পড়াশোনা করা তো চাই-ই চাই। তাছাড়া তার 'সে' যে পড়তে ভালোবাসে। সে- এর ভালোবাসার জিনিসে নম্রতার এতো উদাসীনাতা মানায়? কক্ষনো না।

‘ বাপরে! এদিক বিবেচনা করলে ওই ব্যাটাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া যেতেই পারে। এক চিঠিতেই তোকে ঢাবির স্টুডেন্ট বানিয়ে ছেঁড়ে দিলো? এটা একটা কাজের কাজ হয়েছে। ব্যাটা হিপনোটিজম ভালো পারে। গুড!’

অন্তুর কথায় ঘোট কাটলো নম্রতার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসার চেষ্টা করলো। রঞ্জন হাতে থাকা কাগজের টুকরো

দিয়ে বাতাস করতে করতে বলল,‘ ব্যাটা বলল, সে ভার্সিটির টিচার হতে চায় আর তুই মেনে নিলি? মিথ্যাও তো বলতে পারে। পারে না?’

নাদিম চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ পোলায় সত্যি বললেও এতো অল্প ইনফরমেশনে কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পাবলিকে পড়তো নাকি প্রাইভেটে পড়তো সেটাও তো

জানিস না বাল। ঢাকাতেই তো কত্তোগুলো ইউনিভার্সিটি।’

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,

‘ মানে কী? তোরা কী ওকে খোঁজার পরিকল্পনা করছিস নাকি?’

নাদিম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ তো? খুঁজব না? ব্যাটায় আমাগো দোস্তরে ছ্যাকা দিয়া ব্যাকা বানিয়ে দিয়ে গেল আর আমরা চুপ থাকব? আপাতত দশ-বারোটা ঘুষিতে তার

প্রাপ্য। নমু? তুই তাকে খুঁজার চেষ্টা করিস নি কখনও?"‘ কিভাবে খুঁজবো, কোথায় খুঁজবো বুঝতেই পারি নি। নামটাও তো জানি না।’

‘ আচ্ছা। ওসব বাদ। বাকি গল্পটুকু বল। প্রেমের শুরুটা?’

নম্রতা কিছু বলবে তার আগেই উঠে দাঁড়ালো ছোঁয়া। তাড়াহুড়ো করে বলল,

‘ মাম্মা আমাকে নয়টার মধ্যে বাসায় থাকতে বলেছিল। এখন অলরেডি নয়টা বিশ বাজে। আই হ্যাভ টু গো।’

নাদিম খেঁকিয়ে বলে উঠল,

‘ তো যা না। তোরে এনে বসে থাকতে কইছে ক্যাডায়? সবসময় আজাইরা আলাপ বা..’

ছোঁয়া তেজ দেখিয়ে বলল,

‘ খবরদার বাকিটা উচ্চারণ করবি না। আর ক্যাডায় মানে কী? ভাষার কী ছিঁড়ি! তোর গার্লফ্রেন্ড তোকে সহ্য করে কিভাবে বুঝি না আমি। থার্ডক্লাস কথাবার্তা।’

নাদিম গোঁ নিয়ে বলল,‘ আল্লায় দিলে মুখটা আমার পার্সোনাল। আমার মুখ দিয়া আমার যেমনে মন চায় তেমনে কতা কমু। তোর বাপের কী? শালা ইংরেজ কোথাকার!’

ছোঁয়া কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। রঞ্জন শার্টটা টেনেটুনে ঠিক করে ওঠে দাঁড়াল। নম্রতাদের বন্ধু মহলে রঞ্জন সব থেকে সুদর্শন পুরুষ। গৌড়বর্ণ, সুঠাম দেহ। মাথা ভর্তি কোকরানো চুল। খাড়া নাকের নিচে পাতলা কালচে ঠোঁট। মুখভর্তি ছোট ছোট দাড়ির মেলা। সনাতন ধর্মাবলম্বী রঞ্জনের সবচেয়ে সুন্দর

দেখতে ওর চোখ। রঞ্জন ছাড়া গলায় বলল,

‘ চল তোরে রিক্সা করে দিই। একা যেতে পারবি? নাকি আমরা কেউ যাব সাথে?’

ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ পারব। তুই সাথে গেলেই বরং অস্বস্তি ফিল করব। মেয়েদের চোখে তো তুই মানুষ না। মিষ্টির দোকান।

হা করে তাকিয়ে থাকে। বিরক্তিকর।’

রঞ্জন হাসল। আবারও বসে পড়ে বলল,‘ তাহলে একাই যা। এখান থেকেই রিক্সা নে। অন্ত দেখ তো রিক্সা আছে নাকি আশেপাশে।’

ছোঁয়া রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এলো। ব্যস্ত গলায় বলল,

‘ আরে! তোদের তো একটা ইম্পোর্টেন্ট কথা বলায় হয় নি। মাম্মা তাদের বুটিক হাউজ থেকে ট্যুরের প্ল্যান করেছে। দে আর গুয়িং টু কক্সবাজার। তোরা কী যেতে চাস? হোটেল রেন্ট আর যাতায়াত খরচ ফ্রি।’

নাদিম ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ সারাদিন মাম্মা মাম্মা করছ কেন বাল? বাঙালী না তুই? খাঁটি

বাঙালিদের কখনো ম্যা ম্যা করতে শুনছিস? খুব তো ভাষা নিয়ে হাদিস মারো। আবার ম্যা ম্যা করো। আমার সামনে ম্যা ম্যা করতে এলে চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বাঙালী মাইয়া তুই। মায়েরে আম্মা ডাকবি। অলটারনেটিভ হিসেবে মা ডাকবি। ম্যা ম্যা আবার কী? আর আমরা কোনো ম্যা ম্যা-এর সাথে পিকনিকে যাব না। ভাগ তুই।’

ছোঁয়া ফুঁসে উঠল। রঞ্জন শান্ত গলায় বলল,‘ না-রে ছোঁয়া। আন্টি-আংকেলের সাথে পিকনিকে জয়েন করাটা কেমন দেখায় না? ওদের সাথে থাকলে ইঞ্জয়ও করতে পারব না ঠিকঠাক। গার্ডিয়ানরা সুযোগ পেলেই তো ওয়ান, টু-এর বাচ্চাদের মতো ট্রিট করে। কী লাভ শুধু শুধু সময় নষ্ট করে?’

‘ কিন্তু আব্বু আর মাম্মা কেউই তো যাচ্ছে না আমাদের সাথে। আমি শুধু আমাদের কথা বলছি। আমরা ছয়জন।’

অন্তর চোখদুটো উত্তেজনায় ধ্বক করে উঠল। উৎসাহ নিয়ে বলল,

‘ মানে? উনারে যাবে না কেন?’

‘ মাম্মাদের প্ল্যানটা লাস্ট মোমেন্টে এসে ওয়াক করে নি। হোটেল, গাড়ি সব বুক করা হয়ে গিয়েছে। আগামী

কালেরই প্ল্যান। কিন্তু আজ হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গিয়েছে। বুকিং ক্যান্সেলও করা যাচ্ছে না। আর করলেও মাম্মা আমার এবং আমার বন্ধুদের জন্য অফারটা ছেড়ে দিচ্ছেন। তোরা রাজি?'

নাদিম, অন্তু, রঞ্জন চেঁচিয়ে উঠে বলল,' অবিয়েসলি!'

নীরা বিরস মুখে বলল,

‘ বাসায় শুনলে কেলাবে। সম্ভব না। তোরা যা।’

নম্রতা সায় দিয়ে বলল,

‘ আমার বাসাতেও মানবে না বোধহয়। কতদিনের ট্রিপ?’

‘ তিনদিন।’

অন্তু মুখ ভার করে বলল,

‘ এটা কোনো কথা? গেলে ছয়জনই যাব। নয়তো একজনও না।’

রঞ্জন কুটিল হেসে বলল,

‘ সব্বাই যাচ্ছি। কাল সকাল সাতটাই দেখা হচ্ছে। এখন সবাই হলে গিয়ে ঘুমা।’

নীরা আৎকে উঠে বলল,

‘ আম্মু আমায় মেরে ফেলবে। তোরা যা প্লিজ। আমি যাব না।’

নম্রতা বিরবির করে বলল,

‘ আমারও মন ভালো নেই। আর আব্বু বোধহয় মানবে না।’

নাদিম গিটার হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

‘ ধুরু! বাসায় জানলে তো কাহিনী ঘটবে। জানাবি না। ব্যস!’

নীরা-নম্রতা চোখ বড় বড় করে বলল,‘ কী বলছিস?’

রঞ্জন তুড়ি বাজিয়ে বলল,

‘ সুন্দর আইডিয়া। তোদের বাপ-মা তো আর হলে এসে খোঁজ নিবে না। ফোনই করবে। আর ফোন তো

তোদের কাছেই থাকবে। তিনদিনেরই ব্যাপার। বাকিটা আমরা সামলে নিব। রিল্যাক্স।’

নীরা ভীত চোখে তাকাল। নাদিম নীরার মাথায় চাটি মেরে বলল,

‘ ভয় পাস না ভতী। ডর বাদুইরা কোথাকার। আমরা তো আছিই। সামলায় নিমু। কিন্তু তোগো ছাড়া যাইতাম না।’

নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজি হলো। ওদের দুই জনের জন্য সবার আনন্দ নষ্ট করার কোনো মানে নেই। তাছাড়া এই ইট-পাথরের শহর থেকে দূরে গিয়ে কষ্টের ভার যদি একটু লাঘব হয়, তাহলে ক্ষতি কী? আলোচনা শেষে রঞ্জু আর নাদিম নম্রতা-নীরাকে হলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা হলো। অন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে থাকে বিধায় ছোঁয়াকে বাসায়

পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়লো অন্তর ঘাঁড়ে। বন্ধুদের চেষ্টায় ক্ষণিকের জন্য অপরিচিত ‘সে’- কে ভুলে গেল নম্রতা। কিছুক্ষণের জন্য বুকভরে শ্বাস নিলো। নতুন করে ভাবার চেষ্টা করল। কিন্তু নিয়তি কী আদৌ তাই চায়?শহরে ভোর নেমেছে প্রায় দু’ ঘন্টা হলো। ঘড়িতে সাতটা কি আটটা বাজে। খানিকবাদেই গ্রীষ্মের সোনালি রোদে ঝলমল করে উঠবে

জনাকীর্ণ ঢাকা শহরের গাঁ। ধানমন্ডির ছয় নম্বর রোডে সাদা রঙের বিশাল বিল্ডিংয়ের পার্কিং-এ দাঁড়িয়ে আছে নম্রতার বন্ধুরা। তাদের সামনে কালো রঙের চমৎকার এক প্রাইভেট কার। সাদা একটা ন্যাকড়া দিয়ে নিরন্তর গাড়িটির গাঁ মুছে চলেছেন একজন ড্রাইভার। বিরসমুখী ড্রাইভারের গাঁয়ে ঝকঝকে সাদা ইউনিফর্ম।

চিমসে যাওয়া গাল দুটো লেগে আছে গালের দু'পাশের চ্যাপ্টা হাড়ে। থেবড়ানো নাকে হাজার টন বিরক্তি। ছোট ছোট চোখে মাত্রাতিরিক্ত প্রভূভক্তি। রঞ্জনের গায়ে কালো রঙের পোলো শার্ট। পরনে অফ হোয়াইট জিন্স। পায়ে ব্ল্যাক কেডস। পুরু ভ্রু জোড়া কুঞ্চিত।' শালা! এই অন্তু মরছেটা কই? খোঁজ-খবর নাই কোনো।'

নাদিম গিটারে সুর তোলার চেষ্টা করছিল। গায়ে পরা নীল-কালো চেকশার্টটির উপরের বোতামদুটো খোলা। ঘন চুলের এক গাছি পড়ে আছে কপালে। কাগজের মতো সাদা মুখে বিরক্তির ছাপ। রঞ্জনের কথায় কপালের চুলগুলোকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে গেইটের দিকে তাকাল নাদিম। নম্রতা ট্রলি ব্যাগের উপর গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। ফু দিয়ে

নিজের কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো উড়িয়ে দিতে দিতে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। ঠিক এমন সময় গেইট পেরিয়ে ভেতরে এলো অন্ত। কালো গায়ে ঝকঝকে সাদা রঙের টি-শার্ট। পরনে ছাই রঙের ঢিলাঢালা থ্রি কোয়াটার প্যান্ট। পিঠে ট্যুরিস্ট ব্যাগ। চুলগুলো খাঁড়া করে পেছন দিকে আঁচড়ানো। পেটানো, প্রশস্ত বুকের ছেলেটি ঘেমে অস্থির।

পার্কিং-এ বন্ধুদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো অন্ত। রাগান্বিত বন্ধুরা কিছু বলার আগেই ভুবন ভুলানো হাসি হাসল। গায়ের রং কালো হলেও নিজের হাসিটা যে মারাত্মক সুন্দর সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন অন্ত। শুধুমাত্র এই মায়াভরা, ইনোসেন্ট হাসিটার জন্যই অসংখ্যবার অঙ্ক স্যারের ভয়ানক মার থেকে বেঁচে গিয়েছে সে। সে

হাসলে আশেপাশের মেয়েরা যে বারবার ঘুরে তাকায় তা একটু বয়স হতেই নিজ জ্ঞানে বুঝে নিয়েছে অন্তু। কিন্তু হায় নিয়তি! একমাত্র নীরাকেই এই হাসির মায়ায় কাবু করতে পারল না সে। রঞ্জন দাঁতে দাঁত চেপে বলল,‘ শালা! এতোক্ষণ লাগে আসতে? আমরা হল থেকে চলে এলাম আর তুমি ধানমন্ডিতে থাকা সত্ত্বেও ঠিক টাইমে পৌঁছাতে

পারো না। খারাপ কথা মুখে আসছিল একখান।’

অন্তু বিগলিত হেসে বলল,

‘ আরে, বাসায় একটু ঝামেলা হইছিলো। আব্বায় হঠাৎ বাজারে পাঠাই দিছিল।’

কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকাল অন্তু। নম্রতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ কী রে? আরগুলা কই?’

নম্রতা সরু চোখে তাকাল। ভ্রু বাঁকিয়ে বলল,

‘ আরগুলা? নাকি নীরা?’

রঞ্জন হাসল। নাদিম গিটারে রোমান্টিক টুন দেওয়ার চেষ্টা করল। অন্তু মাথা চুলকে গরম চোখে তাকাল। কপট রাগ নিয়ে বলল,‘ খোঁচা মারস কেন হারামি? খালি নীরার কথা জিগ্যেস করব কেন?

ছোঁয়াও তো নাই। রওনা দিবি কখন?’

অন্তর প্রশ্নের মাঝেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ছোঁয়া আর নীরা। তাদের পেছনেই ছোঁয়ার বাবা-মা প্রফেসর সালাম হক এবং সিঁথি হক। ছোঁয়ার বাবা মার উপস্থিতিতে বন্ধুমহলের প্রশ্ন-উত্তর পর্বে ভাটা পড়ল। সবাই হঠাৎ করেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। প্রফেসর সালাম হক

ছেলে-মেয়েদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করে ড্রাইভারকে বিস্তর বোঝালেন। কিভাবে সাবধানে তাদের কক্সবাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন তার বিস্তর উপদেশ দিলেন। সিঁথি হক আর সালাম হকের খবরদারিতে ছোঁয়া ব্যতিত বাকি পাঁচজনেরই ভ্রু কুঁচকে এলো। নাদিম মুখ কাঁচুমাচু করে নিচু গলায় বলল,

‘ মামা? মনে তো হইতাছে আমরা কেজি স্কুলে পড়ি। প্রথম প্রথম স্কুল কী জিনিস দেখতে যাইতাছি। বাল! এতো ঢং-এর মানে কী?’রঞ্জন উত্তর দিল না। অন্তু মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ করে রইল। বাবা-মায়ের বাধ্য মেয়ে ছোঁয়া সময় নিয়ে বাবা-মার থেকে বিদায় নিলো। বন্ধুরা কুঁচকানো ভ্রু আর একরাশ অনিশ্চয়তা নিয়ে গাড়িতে উঠল।

গাড়ি যখন ধানমন্ডি ছেড়ে নারায়ণগঞ্জের রাস্তায় ছুটলো তখন সূর্যের যৌবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পথঘাট, পথচারী। প্রায় আধঘন্টা চলার পর থমথমে গলায় আদেশ করল রঞ্জন,

‘ মামা? গাড়ি ঘুরাও। আমরা কেরানীগঞ্জ যাব। পুরাতন ঢাকা।’

রঞ্জনের কথায় চরকির মতো ঘুরে এসে তার মুখের উপর স্থির হলো

পাঁচ জোড়া চোখ। বিস্মিত ড্যাবড্যাবে চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো রঞ্জন। কে, কী বুঝলো জানা নেই। নাদিম জোরের সাথে বলল,

‘ হ্যাঁ, হ্যাঁ। মামা গাড়ি ঘুরাও। কেরানীগঞ্জের রোড ধরো। পুরাতন ঢাকায় যামু।’

ওদের কথায় ড্রাইভার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে মহাপাপীদের সাথে

বসবাস করছে। এই পাপীদের সাথে বসে থেকে সে প্রচন্ড কুণ্ঠিত, লজ্জিত এবং রাগান্বিত। রঞ্জন আবারও বলল,

‘ কী হলো মামা? গাড়ি ঘুরাতে বললাম না?’ড্রাইভার ডাঁট হয়ে বসে রইল। চোখদুটো সামনের দিকে নিবদ্ধ। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে থমথমে কণ্ঠে বলল,

‘ ম্যাডাম কইছে, ডিরেক্ট কক্সবাজার যাবা। হেতেহুতে অযথা থামাইবা না। আমিও থামাইতাম না। সিদা কক্সবাজার যাওম। গাড়ি ঘুরামু ক্যান? ম্যাডাম তো কেরানীগঞ্জ যাইতে কয় নাই।’

অন্তু-রঞ্জন একে অপরের দিকে তাকাল। দু’জনের ভ্রুই কুঞ্চিত। নাদিম তিক্তমুখে বলল,

‘ একটু জোরে চালান মিয়া। এমনে ভ্যান গাড়ির মতো চালাইতাছেন ক্যান? আর একটা ফার্স্টক্লাস গান দেন। এভাবে কেউ ট্যুরে যায়?’

‘ গাড়ি ঠিক গতিতেই চলতাছে। ম্যাডাম কইছে গাড়ির গতি ত্রিশের উপরে না নিতে। আর গান দেওন যাইত না। ম্যাডাম কইছে গানে ফোকাস নষ্ট হয়। ফোকাস নষ্ট করুন যাইত না।’

বিরক্তিতে কুঁকড়ে উঠলো নাদিম। বিরবির করে বলল,‘ বাল যাইত না। অসহ্য! অসহ্য!’

অন্তু জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,

‘ পুরাতন ঢাকায় আমাদের এক বন্ধু আছে। সাথে যাবে। ওখান থেকে ওকে তুলে নিয়ে তারপর কক্সবাজার যাব। গাড়ি ঘুরান।’

ছোঁয়া কিছু বলবে তার আগেই চোখ রাঙাল নাদিম। যার অর্থ, কথা কবি তো চড়াই দাঁত ফেলাই দিমু! ড্রাইভার লাফিয়ে উঠে বলল,‘ ম্যাডাম তো কইছিল ছয়জন যাইবো। আপনারা কারে নিতে চাইতাছেন? আপনাগো হাব ভাব সুবিধার লাগে না তো। আমি ম্যাডামের অনুমতি ছাড়া কোনোহানে যাইতাম না।’

রাগে রঞ্জনের ফর্সা গাল দুটোতে লাল রঙের আভা ফুটে উঠল। ছোঁয়া ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। পেছনে নম্রতা, নীরা আর রঞ্জন। একদম পিছনের দিকটাই অন্তু আর নাদিম। রঞ্জন নম্রতার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিসিয়ে বলল,

‘ কেমন মুডে আছিস নমু?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাল। চোখদুটো ছোট ছোট করে বলল,‘ মানে?’

‘ এডভেঞ্চার মুড?’

‘ এনিটাইম।’

নম্রতা হাসল। রঞ্জন বাম চোখটা টিপে দিয়ে হাসল। নীরাকে ইশারা করে বলল,

‘ গ্যাঞ্জাম নাম্বার ৩।’

নম্রতা সেই কথাটাই নীরার কানে পৌঁছাল। হালকা গলা খাঁকারি দিয়ে নিচু গলায় বলল,

‘ গ্যাঞ্জাম নাম্বার ৩, হবে?’

নীরা চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। কোনো প্রশ্ন না করেই দুনিয়া অন্ধকার করে চেঁচিয়ে উঠল। নম্রতা অস্থির গলায় বলল,

‘ নীরু? কী হয়েছে? এমন করছিস কেন!’

নীরা দমবন্ধ গলায় বলল,‘ ব... মি। বমি পাচ্ছে। গাড়ি থামাও। নি..নিশ্বাস আটকে আছে আমার! ওয়াক...’

ড্রাইভার চোখ বড় বড় করে নীরার দিকে তাকাল। নীরার চোখ দুটো উল্টো যাওয়ার উপক্রম। কপালের আশেপাশে ঘাম। কি বিভৎস দৃশ্য। মেয়েটা মরে টরে যাবে না তো! নাদিম খেঁকিয়ে উঠে বলল,

‘ ওই মিয়া! থামাতে বলতাছে শুনো না? মাইয়ার কিছু হইলে তোমারে খাইছি।’

ড্রাইভার কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা-দন্দে থেকে গাড়ি থামাল। নম্রতা ছোঁয়ার গায়ে পর পর দুটো চড় বসিয়ে দিয়ে বলল,

‘ তোর ড্রাইভারকে বল একটা মেডিসিনের দোকান থেকে দুটো দুটো....’

এটুকু বলে থেমে গেল নম্রতা। অসহায় চোখে বন্ধুদের দিকে তাকাল। অন্তু ফট করে বলল,

‘ দুটো নাপা এক্সট্রা ট্যাবলেট আনতে বল।’

নম্রতা সাই দিয়ে বলল,

‘ হ্যাঁ। নাপা এক্সট্রা আনতে বল।’

পরক্ষণেই অবাক হয়ে বলল,

‘ অ্যা! নাপা এক্সট্রা!’

বন্ধুদের কার্যকলাপ দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ার অবস্থা ছোঁয়ার। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলল,

‘ হ্যাঁ? নাপা এক্সট্রা! নাপা এক্সট্রা দিয়ে...’

এটুকু বলতেই আবারও আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে বমির ভঙ্গিমা করল নীরা। ছোঁয়া আৎকে উঠল। মাথার চিন্তাশক্তি গুলিয়ে গেল। অন্তু ধমক দিয়ে বলল,‘ ওই তব্দা? তোর

ড্রাইভারকে ট্যাবলেট আনতে বলবি? নাকি থাপড়া খাবি? নীরুর কিছু হলে তোর দোষ।’

ছোঁয়া থতমত খেয়ে ড্রাইভারকে মেডিসিন কিনতে পাঠাল। ড্রাইভার একরাশ দ্বিধা আর বিরক্তি নিয়ে মেডিসিনের দোকান খুঁজতে গেল। নাদিম এতোক্ষণ চিন্তিত মুখে ম্যাগাজিন দিয়ে নীরার চোখে-মুখে হাওয়া দিচ্ছিল। ড্রাইভার নেমে

যেতেই থেমে গেল তার হাত। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে দেখল। তারপর ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। তার সাথে সাথে নেমে দাঁড়াল অন্তু,রঞ্জন। অসুস্থ নীরাও চোখের পলকে সুস্থ,সবল হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। ছোঁয়া হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল,‘ কী করছিস তোরা?

কোথায় যাচ্ছিস? গাড়ি থেকে নামছিস কেন? নীরা? তুই না অসুস্থ!’

সবাই উল্টো পথে দৌঁড় লাগাতে লাগাতে বলল,

‘ গ্যাঞ্জাম নাম্বার ৩, বলদ। এখনও বুঝস নাই?’

ছোঁয়া দিশেহারা কণ্ঠে বলল,

‘ কিন্তু কেন!’

নীরা উঁচু গলায় বলল,

‘ জানি না। আসলে আয় নয়তো তব্দার মতো বসে থাক।’বন্ধুদের থেকে জুতসই উত্তর না পেয়ে ব্যাগ কাঁধে নিজেও দৌঁড় লাগাল ছোঁয়া। বন্ধুদের হাবভাব বুঝতে না পেরে মাথা ভনভন করছে তার। আশ্চর্য! কী করতে চাইছে ওরা? ওরা কী ট্যুরে যাবে না? না গেলে বললেই হয়। এতো নাটক কেন? কিছুদূর আসার পর বাস ধরলো ওরা।

জনাকীর্ণ বাসে দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। বাসে কোনোরকম ঠেলেঠুলেই দাঁড়িয়ে পড়ল ছয়জন। এই কোণঠাসা বাসে ছোঁয়ার অবস্থা বেকাহিল। ঢাকার লোকাল বাসগুলোতে উঠার অভ্যাস তার নেই বললেই চলে। রঞ্জন বাসের দরজায় ঝুলে রইলো। ওদের তিনজনকে ঘিরে দাঁড়াল অন্ত আর নাদিম। কিছুক্ষণের মাঝেই আড্ডায় মজে

উঠল পাঁচজন।একপর্যায়ে গিয়ে পেছন থেকে মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক বাজে ভাবে স্পর্শ করল ছোঁয়ার স্পর্শকাতর স্থানে। ছোঁয়া অসহায় চোখে বন্ধুদের দিকে তাকাল। নাদিমের দিকে কিছুটা সরে আসার চেষ্টা করল। অন্তু নম্রতাকে ইশারা করতেই ছোঁয়ার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল নম্রতা। বাসে ঝাঁকি লাগতেই পেছনের দিকে হেলে পড়ে

দানবীয় ভাবে লোকটির পা মাড়িয়ে দিল নম্রতা। পেন্সিল হিলের ভয়ানক আঘাতে আর্তনাদ করে উঠল লোকটি। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কিছু বলবে তার আগেই অন্তু বলল,‘ আহা চাচা। বাসে উঠলে একটু আধটু ধাক্কা খেতেই হয়। ওমন চেঁচামেচি করলে তো চলে না।’

কিছুক্ষণ পর আবারও একই কাজ করল নম্রতা। লোকটি প্রতিবাদ করতেই নাদিম খেঁকিয়ে উঠে বলল,

‘ ফাইজলামি পাইছেন মিয়া? ধাক্কাধাক্কি সহ্য না হলে নাইমা যান। কেউ ইচ্ছে করে ধাক্কা দিব ক্যান আপনারে? এতো ফেচফেচ করতাছেন ক্যান?’

লোকটি আর কথা বাড়াল না। বন্ধুরা আবারও আড্ডায় মাতলো। দুপুরের

শেষ ভাগে কেরানীগঞ্জ গিয়ে পৌঁছাল তারা। সেখান থেকে পুরাতন ঢাকা। দুপুর আড়াইটার দিকে পুরাতন ঢাকার একটা রেস্টুরেন্টে পেট পুড়ে খাবার খেলো সবাই। ছোঁয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,‘ হেই গাইস? আই থিংক, আই এম ইঞ্জয়িং দিস ট্যুর!’

নাদিম বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আবার ইংরেজি মারাস। বাংলায় কথা কইতে পারিস না তুই? ইংরেজের বাচ্চা!’

নীরা হাই তুলতে তুলতে বলল,

‘ ঝগড়া রাখ। আমরা কী কক্সবাজার যাচ্ছি? নাকি যাচ্ছি না? এতো ঢং করে এখানে আসারই বা কারণ কী?’

রঞ্জন টিস্যু দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল,

‘ যাচ্ছি।’

‘ তাহলে গাড়ি ছাড়লাম কেন?’

অন্তু দাঁত কেলিয়ে বলল,

‘ ওইটা ট্যুর ছিল? ওই ড্রাইভারকে সাথে নিলে ট্যুরের বারোটা বাজত। আমরা কক্সবাজারে যাচ্ছি লঞ্চে করে। ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। পাঁচটায় লঞ্চ।’

ছোঁয়া আৎকে উঠে বলল,‘ লঞ্চ! আমি কখনো লঞ্চে উঠি নি। লঞ্চ

যদি ডুবে যায়? আর লঞ্চে করে কক্সবাজারে কিভাবে?’

নাদিম বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ সবাই যেভাবে যায় সেভাবে।’

নম্রতা খাবার চিবোতে চিবোতে বলল,

‘ যেতেই তো দু’দিন লাগবে। কক্সবাজার থাকব কখন?’

রঞ্জন ঠোঁট উল্টে বলল,

‘ তাই কী? কক্সবাজার তো বহুত গিয়েছি। এবার না হয় আশেপাশের জায়গাগুলোতেই বেশি থাকলাম। সদরঘাট থেকে হালুয়া ঘাট। ওখান থেকে দশটার লঞ্চে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম একরাত থেকে পরের দিন কুতুবদিয়া হয়ে কক্সবাজার। দুইদিনে যাব। একদিন কক্সবাজারে থাকব। চতুর্থদিন সড়কপথে ফিরে আসব।’

ছোঁয়া হা-হুতাশ করে বলল,‘ মাম্মা কে কী বলব? মাম্মা আমাকে মেরে ফেলবে।’

নাদিম বিরবির করে বলল,

‘ শুরু হইছে ম্যা ম্যা।’

সারাদিন পুরাতন ঢাকার এখানে সেখানে ঘুরে, আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিল নম্রতারা। সন্ধ্যা পাঁচটায় সদরঘাটে পৌঁছে নির্দিষ্ট লঞ্চে উঠল তারা। রঞ্জন দুটো কেবিন বুক

করেছে। একটা মেয়েদের জন্য। অন্যটি ছেলেদের জন্য। লঞ্চ সদরঘাট ছাড়লো সন্ধ্যা ছয়টার দিকে। ধীরে ধীরে দৃষ্টি সীমার আড়ালে পড়ল শহরের দূষিত বাতাস। সবাই যার যার মতো ফ্রেশ হয়ে বারান্দায় এসে বসলো রাত আটটার দিকে। কিছুক্ষণ আড্ডা চলার পর হঠাৎই মন খারাপ হয়ে গেল নম্রতার। বন্ধুদের রেখে ডায়েরি

হাতে ধীরে ধীরে নিচে নেমে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল সে। রাতের আকাশে মস্ত এক চাঁদ। দিগন্ত বিস্তৃত জলধারায় চকচকে জ্যোৎস্নার আলো। গা কাঁপানো তীব্র বাতাস। নম্রতা বুক ভরে শ্বাস নিলো। টলমলে অনুভূতি নিয়ে ডায়েরিটা খুলে পড়ার চেষ্টা করল। বুক ভরে চিঠির গায়ে থাকা সুঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল। নম্রতাদের প্রেমের এক

পর্যায়ে ‘সে’ নামক ব্যক্তিটি চিঠির গায়ে সুন্দর এক সুগন্ধি ব্যবহার করত। চিঠি খুলতেই অসাধারণ এক সুগন্ধে বুক ভরে আসত নম্রতার। নম্রতা জিগ্যেস করায় বলেছিল,‘ তুমি যে চিঠিগুলো অসংখ্যবার পড়ো ,জানি। চিঠিগুলো যখন খুলবে। এই গন্ধটা যখন নাকে লাগবে। ঠিক তখনই, আমার খুব কাছে থাকার অনুভূতি হবে তোমার। তাছাড়া! নীল

চিরকুটের সুগন্ধ কী সাধারণ কাগজের মতো সাধারণ হলে চলে? শ্যামলতাই বা বারবার কাগজের এই বিশ্রী গন্ধটা কেন নিবে? শ্যামলতা মানেই তো হাজারও বেলীর সৌরভ!’নম্রতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। চোখদুটো বোজে নিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিলো। ঠিক তখনই পেছন থেকে প্রচন্ড ধাক্কায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল নম্রতা। এক হাতে

রেলিং আঁকড়ে ধরে নিজেকে রক্ষা করলেও হাতের ডায়েরিটা গিয়ে পড়ল টলমলে নদীটিতে। নম্রতা আৎকে উঠলো। সারা শরীর কেঁপে উঠল। ডায়েরিটাকে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে দেখে মাথা ঘুরে উঠল তার। রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,‘ আমার ডায়েরি। নীরু! নীরু! আমার ডায়েরি। রঞ্জন!’

নম্রতাকে রেলিং-এর ঝুঁকে পড়তে দেখে পেছন থেকে শক্ত একটি হাত আকঁড়ে ধরল নম্রতার ডান হাত। বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ আরে! করছেন কী? পড়ে যাবেন তো!’শক্ত হাতের টানে রেলিং থেকে সরে দাঁড়াল নম্রতা। চোখে-মুখে আতঙ্ক। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অবিরাম জল। শরীরটা ভয়ানকভাবে কাঁপছে। নম্রতার ফ্যাকাশে মুখ দেখে

সামনে দাঁড়ানো শ্যামবর্ণ মানুষটি আৎকে উঠল। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, ‘ আপনি ঠিক আছেন?’নম্রতা হিংস্র দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ান মানুষটির দিকে তাকাল। শ্যামকায় দীর্ঘদেহী পুরুষ। শক্তপোক্ত গড়ন। পুরু ভ্রুজোড়ার নিচে গভীর দুটো চোখ। গায়ে বাদামী রঙের পাতলা শার্ট। হাতাদুটো কনুই পর্যন্ত গুটানো। ডানহাতে ল্যাপটপ। নম্রতা বাঘিনীর

মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটির ওপর। হাত থেকে ল্যাপটপটা ছিনিয়ে নিয়ে রেলিং-এ দুই দফা আছাড় লাগাল। শ্যামকায় মানুষটি বিস্ময়ে হতভম্ব। নম্রতা ল্যাপটপটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলতেই সম্বিৎ ফিরে এলো মানুষটির। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ভয়ানক গমগমে কণ্ঠে বলল,

‘ পাগল আপনি? কী করলেন এটা? আপনার কোনো ধারণা আছে?

আমার কত বড় ক্ষতি করলেন আপনি।'

ততক্ষণে নম্রতার বন্ধুরা নিচে নেমে এসেছে। নম্রতাকে এমন বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে বিস্মিত তারা। রঞ্জন আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,' নমু? ঠিক আছিস? কী হয়েছে? এভাবে কাঁপছিস কেন?'

নাদিম ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ এই শালায় কিছু করছে নাকি তোরে? ক খালি। এইহানেই পুঁইতা ফেলুম। কি হইছে?’

নাদিম আর রঞ্জনের উঁচু কণ্ঠে আরো কিছু যুবক পেছনে এসে দাঁড়াল। সামনের দিকে উঁকি দিয়ে কপাল কুঁচকে প্রশ্ন ছুঁড়লো তাদের একজন,

‘ এনিথিং রং আরফান? কি হয়েছে রে?’

রাগে স্তব্ধ আরফান রক্তলাল চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল।

‘ শী ড্যামেজড মাই ল্যাপটপ।’

‘ মানে?’‘ নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছে ল্যাপটপ। ভাবতে পারছিস? আমার রিসার্চের পুরো ফাইল ছিল ল্যাপটপে।’

‘ কিহ! কিন্তু কেন? এই মেয়ে? পাগল নাকি আপনি? আপনার কোনো ধারণা আছে কী করেছেন

আপনি? এসব পাগল ছাগলকে লঞ্চে উঠতে দেয় কে?’

নীরা ফুঁসে উঠে বলল,

‘ একদম ফালতু কথা বলবেন না। নমু অযথা হাঙ্গামা করার মেয়ে নয়। আপনার বন্ধু কী করেছে সেটা আগে বিবেচনা করুন। লঞ্চে উঠেও থার্ডক্লাস স্বভাব যায় না আপনাদের? দেখে তো ভদ্রলোকই মনে হচ্ছে। কী করেছেন আমার ফ্রেন্ডের সাথে?

বলুন।’দুই দলের মধ্যে তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল নম্রতা। মুহূর্তেই থেমে গেল হট্টগোল। সবাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল কান্নারত মেয়েটির চোখে-মুখে। নম্রতার বন্ধুরা অস্থির হয়ে উঠল। লঞ্চের পাটাতনে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা নম্রতার পাশে ধপ করে বসে পড়ল নীরা-ছোঁয়া। নম্রতা দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে

ডুকরে উঠছে। কান্নার শব্দটা বিশাল জলরাশিতে ঘুরেফিরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কী বিষাদময় সে কান্না! আরফানের বন্ধুরা কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দ্বিধা নিয়ে প্রশ্ন করল,

‘ কী হচ্ছে এসব দোস্ত? কাহিনীটা কী? কাঁদছে কেন এই মেয়ে?’

আরফান বিপন্ন কণ্ঠে বলল,‘ আমি কী করে বলব? কেবিনে যাচ্ছিলাম

হঠাৎ ইশতিয়াক ধাক্কা দিল। ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারি নি। উনার সাথে শরীরটা একটু লাগতেই দেখি নিচের দিকে ফিরে চিল্লাপাল্লা করছেন। ভাবলাম পড়ে যাচ্ছেন। হাত টেনে সরিয়ে আনতেই নাটক শুরু করল। উফ! আমার রিসার্চ রিপোর্ট!’

নীরা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ এই নমু? এভাবে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে? বল আমাদের।’

কান্নায় শ্বাস আটকে আসছে নম্রতার। জোরে জোরে শ্বাস টেনে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল নম্রতা। জড়ানো কণ্ঠে বলল,

‘ আম আমার ডায়েরি!’

এটুকু বলেই গগনবিহারী চিৎকারে কান্নায় ভেঙে পড়ল নম্রতা। অন্তু কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কী হয়েছে ডায়েরির?’

‘ পা পা পানিতে ফেলে দিয়েছে এই লোক।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,

‘ আমি! কখন!’

আরফানের বন্ধু কড়া মেজাজে বলল,‘ ফাজলামো পাইছেন নাকি? একটা ডায়েরির জন্য আপনি গোটা ল্যাপটপ ছুঁড়ে ফেলবেন? ল্যাপটপের দাম জানেন? একটা ল্যাপটপে কত

ইম্পোর্টেন্ট ডকুমেন্টস থাকতে পারে ধারণা আছে?’

এবার রেগে উঠল নাদিমও। খেঁকিয়ে উঠে বলল,

‘ একটা ডায়েরি মানে কী? আপনার ল্যাপটপ থেকে ওর ডায়েরি কম দামী নয়। ফিল দ্যা ইমোশন।’

রাগে মাথার ভেতরটা ধপধপ করছে আরফানের। নাদিমের কথায় রাগটা যেন দপ করে জ্বলে উঠল তার।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বলল,‘ আচ্ছা! আপনাদের কাছে নিজেদের বস্তাপঁচা আবেগ এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অন্যের.... ‘

এটুকু বলতেই অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে গেল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে হিংস্র বাঘিনীর মতো আরফানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল নম্রতা। হতভম্ব আরফান দু’পা পিছিয়ে দাঁড়াল। নম্রতার

হাঁতের আচঁড়ে কব্জির ওপর দিকটার চামড়া উঠে জ্বালাপোড়া করছে। রঞ্জন দু'হাতে জাপটে ধরে নম্রতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাল। নম্রতা চেঁচিয়ে উঠে বলল,' খবরদার বস্তাপঁচা আবেগ বলবেন না। আমার ডায়েরি আমার আবেগ নয়, ভালোবাসা।'

নীরা দু'হাতে মুখ চেপে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম

নম্রতাকে এমন উদ্ভট আচরণ করতে দেখছে সে। নম্রতার মতো বিচক্ষণ, প্রাণোবন্ত মেয়ে এমন গেঁয়ো, অসভ্য আচরণ কী করে করতে পারে? বিশ্বাস হয় না নীরার। কয়েকটা চিঠি আর কয়েকটা বছরে কী থেকে কী হয়ে গেল মেয়েটা? রঞ্জন নম্রতাকে জোরপূর্বক পাঁজাকোলে নিয়ে নিজেদের কেবিনের দিকে হাঁটা

দিল। যেতে যেতে আরফানকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘ সরি ভাইয়া। আসলে ও একটু ডিপ্রেসড।’

আরফান জবাব দিল না। আরফানের পাশে থাকা বন্ধুটি ঝাঁঝ নিয়ে বলল,

‘ নিজের ডিপ্রেসড গার্লফ্রেন্ডকে সামলায় রাখেন মিয়া। লঞ্চ না তো নাট্যশালা। নাটক শুরু করে দিছে একেকজন। আজাইরা।’

নাদিম খেঁকিয়ে উঠে বলল,‘ তুই সরি কইলি ক্যান? নমুর এই অবস্থা না থাকলে শালাগো দেইখা দিতাম আজকে।’

অতঃপর আবারও কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হলো। রঞ্জন দাঁড়িয়ে না থেকে নম্রতা, নীরাকে নিয়ে তিন তলায় নিজেদের কেবিনের দিকে রওনা দিল।

কেবিনের পাটাতনে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে নম্রতা। মাথাটা হাঁটুর ওপর নুয়ানো। কান্নার দামকে কিছুক্ষণ পর পরই কেঁপে উঠছে শরীর। কেবিনের দরজায় হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জন। তারপাশে চিন্তিত অন্তু। ছোঁয়া-নীরা বিছানার উপর বসে আছে। নাদিম বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখই থমথমে। স্তব্ধ

নীরবতাকে ঠেলে দিয়ে কথা বলে উঠল ছোঁয়া। হতাশ কণ্ঠে বলল,‘ কী একটা কাহিনী করে ফেলল নমু। ছিঃ মানুষ কী ভাবছে! এতোটা সীনক্রিয়েট করার কী প্রয়োজন ছিল? এমন গেঁয়ো আচরণ কী নমুর সাজে? আমাদের কতটা লো ম্যান্টালিটির ক্ষেত ভাবছে তারা।’

ছোঁয়ার কথার জবাবে টু শব্দটি পর্যন্ত করল না কেউ। কেবল কড়া

চোখে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভয়ানক রাগে ধমকে উঠল নাদিম, ‘ তুই তো জন্মগত ক্ষেত ম্যান্টালিটির মহিলা। বন্ধুর দুঃখে তোর মানসম্মানের প্রশ্ন আসছে। তোরে এই মুহূর্তে লঞ্চ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। নদীতে হাবুডুবু খেতে খেতে ম্যান্টালিটি বিচার করবি। বেয়াদব।’

নাদিমের কথায় নিভে গেল ছোঁয়া। বেচারী এতোদিক ভেবে বলেনি কথাগুলো। কী থেকে কী হয়ে গেল! বিরবির করে বলল,‘ লোকটা তো আর ইচ্ছে করে ডায়েরি ফেলে দেয় নি। ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছে। নমু যে তার ল্যাপটপটাই ফেলে দিল।’

নাদিম কপাল কুঁচকে বলল,

‘ তো? যেভাবেই ফেলুক। ফেলেছে তো? আর নমুই বা ইচ্ছে করে

ফেলল কোথায়? রাগের মাথায় ফেলে দিয়েছে। রাগ উঠলে মানুষ যেকোনো কিছু করতে পারে। অত ধরতে আছে? ওই শালাদের উচিত নমুর পা ধরে মাফ চাওয়া। এদের নামে আমি মামলা করব। মানহানির সাথে ডায়েরিহানির মামলা।’এমন একটা পরিস্থিতিতেও নাদিমের কথায় ঠোঁট চেপে হেসে ফেলল সবাই। নাদিম সব সময়ই এমন।

বন্ধুরা হাজার দোষ করলেও সব দোষ মাফ। এমনকি পরীক্ষায় নাম্বার কম পেয়ে বন্ধুদের মন খারাপ হয়ে গেলেও সব দোষ স্যারের। বন্ধুরা তো পরীক্ষা দিয়েছিলই শালার স্যার যদি নাম্বার না দেয় তাহলে বন্ধুদের কী দোষ? এসব স্যারকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া উচিত। নম্রতাকে হাজার বুঝানোর পরও যখন তার কান্নার

গতি কমলো না। তখন সবার মিলিত সিদ্ধান্তে একা ছেড়ে দেওয়া হলো তাকে। পাঁচজনে গিয়ে বসল বারান্দায়। কীভাবে নম্রতাকে স্বাভাবিক করা যায় তা নিয়ে চলল তুমুল আলোচনা। আধঘন্টা-একঘন্টার মাঝে কান্নার বেগ কিছুটা কমে এলো নম্রতার। বামপায়ে থাকা সাদা পায়েলটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুলে নিল হাতে।

পায়েলটাকে খুব যত্ন করে বুকের সাথে চেপে ধরে চোখ বোজল। দীর্ঘসময়ের কান্নায় মাথাটা ধপধপ করছে তার। চোখদুটো ভয়ানক জ্বলছে। সেই সাথে জ্বলছে অবুঝ, অভাগা মন।তখন এপ্রিল মাস চলছিল। বাংলায় বসন্ত। ঋতুরাজ সেবার রাজার মতোই দাপট নিয়ে এসেছিল নম্রতার জীবনে। ষোলো বসন্ত পেরিয়ে সতেরোতে এসে

সুগন্ধি ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছিল নম্রতার জীবন। নম্রতাদের প্রমালাপনের তখন প্রায় দেড় বছর চলে। কারো মুখে ভালোবাসার শব্দ উচ্চারিত না হলেও দু'জনেই জানে ভালোবাসাহীন শব্দগুলোর গভীরতা। ভালোবাসার স্পষ্ট প্রকাশও খুব বেশিদিন চাপা থাকতে পারল না। ওপাশের মানুষটি খামে পুড়ে পাঠাল উথাল-পাতাল প্রেম বার্তা। নম্রতার

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল মাত্র। প্রথম পরীক্ষাটা দিয়েই মা-বাবাকে ছাইপাঁশ বুঝিয়ে চলে গিয়েছিল শাহাবাগ।ক্লান্ত শরীরে এক ঝাঁক আশা নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল চির পরিচিত বইটি। প্রত্যাশিত চিঠিটা পেয়ে বুক ভরা উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে। বাড়ি ফিরে চিঠিটা খুলেই চমকে উঠেছিল নম্রতা। লজ্জায় লাল

হয়েছিল। আবেগে কেঁদে-কেটে চোখ ফুলিয়েছিল। অপরিচিত মানুষটার সেই প্রেমময় চিঠি পড়লে আজও একই রকম কেঁপে কেঁপে উঠে নম্রতা। পাগল করা অনুভূতিতে দমবন্ধ হয়ে আসে। আচ্ছা? কী এমন মেশানো ছিল সেই চিঠিতে? নম্রতা জানে না। কিন্তু সেই চিঠিটা পড়লে আজও রাতে ঘুম হয় না। চিঠির শব্দবানে আহত হয়ে ঘুম

কাতর নম্রতার রাতের ঘুম হারাম হয়। সারাটা রাত ক্ষণে ক্ষণে চিঠিটা পড়ে কেঁদে বুক ভাসায়। আবার কখনো লাজুক হাসিতে মত্ত হয়। নম্রতা চিঠির লাইনগুলো মনে করার চেষ্টা করল। মুহূর্তেই মুখস্থ হয়ে যাওয়া লেখাগুলো চোখের পাটাতনে স্পষ্ট হয়,' প্রিয়.....

চলো একবার প্রেমে পড়ি। অদ্ভুত নীল ব্যথায় মড়িয়া হয়ে উঠি দুটো

প্রাণ। দিনশেষে তুমি একটু কাঁদো। চোখের নিচে ছড়িয়ে পড়া কাজল রেখায়, আমি একটু মুগ্ধ হই। দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে হঠাৎ দেখা হলে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেভাবেই আমার রুক্ষ বুকটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আমার বুকে চলা নিত্য দিনকার টানাপোড়েন, চেনা জানা ঝড়গুলো একবারের জন্য হলেও থেমে যাক। তোমার

কান্নাভেজা ফোলা চোখে একটি বার আমি ডুবে যাই। লাল-নীল ব্যথাগুলো রক্তে রক্তে ঘুরে বেড়াক। তোমাকে পাওয়ার তীব্র বাসনায় আমি একটু ছিন্নভিন্ন হই। তোমাকে দেখার আকুতিতে চোখের ঘুমগুলো মুক্তি পাক। তোমাকে হারানোর ভয়ে গভীর রাতে আমার পুরুষ চোখে জল নামুক। চলো শ্যামলতা, আমরা একবার প্রেমে পড়ি। মারাত্মক প্রেমে

আহত হয়ে যাই দুজনেই। প্রেমময় ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠি।

ইতি

শ্যামলতার ব্যক্তিগত সে ‘সেই চিঠিতেই প্রথম নিজের সম্বোধনে কিছু একটা লিখছিল সেই মানুষটি। চিঠির সাথে কসটেপে আটকে দিয়েছিল অসম্ভব সুন্দর এক পায়েল। সেই সাথে ছিল কয়েকটি চ্যাপ্টা হয়ে থাকা বেলীফুল। কী তীব্র

সুগন্ধ ছিল সেই বেলীফুলের। নম্রতা সারারাত নাকের কাছে নিয়ে বসেছিল সেই চিঠি। পায়েলটা পায়ে জড়িয়ে অযথায় ঘুরে বেড়িয়েছে পুরো ঘর জুড়ে। যখনই পায়েলে রিনঝিন শব্দ উঠেছে তখনই মনে হয়েছে সেই মানুষটি হাসছে। নম্রতার পাগলামোতে ঝংকার দিয়ে হেসে উঠছে সে। সারারাত ছটফট করে পরের দিন সকালেই গ্রন্থাগারে

ছুঁটে গেল নম্রতা। গ্রন্থগারের গেইটে বিশাল তালা ঝুলতে দেখে মনে পড়ল, আজ শুক্রবার।শনিবারেও বন্ধ থাকবে গ্রন্থাগার। হতাশ, চঞ্চল, অস্থির নম্রতার পরের দু'দিন পড়াশোনা কিছু হলো না। ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষাটা সে কোনোরকম না পড়েই সমাধা করল। দিন-রাত 'সে' 'সে' করেই মন- মস্তিষ্ক জমাট বেঁধে গেল তার।

রবিবার সকালে উঠেই গ্রন্থাগারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। গ্রন্থাগার খুলতেই নীল রঙা খামে নিজের পায়েল পরা পায়ের একটা ফটো রেখে দিল নম্রতা। ধুরুধুরু বুক নিয়ে গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়েই সেকী লজ্জা তার। কে জানে? পায়ের ছবি দেখে কী ভাববে সে? ছবিটা পাঠানো কী ঠিক হলো? এমন সব দ্বিধামাখা প্রশ্ন নিয়েই কেটে

গেল প্রায় একটা সপ্তাহ। অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা নিয়েই একের পর এক পরীক্ষা সমাধা করল নম্রতা। পুরোপুরি এক সপ্তাহ পর আকাঙ্খিত চিঠিটা এলো। টকটকে নীল রঙা দুটো কাগজ ভরে শুধু একটাই লাইন,

‘ তোমার পায়ের তিলটা নেশাতুর। ভাবনাতীত সুন্দর।’সেই এক লাইন দিয়ে ভর্তি চিঠিটা পেয়ে গলা শুকিয়ে

গিয়েছিল নম্রতার। বুকের ভেতর থাকা হৃদপিণ্ডটা কী দ্রুতই না কাঁপছিল। আজও, আজও উপলব্ধি করতে পারে নম্রতা। আজও তার শরীরে ঘাম ছুটে। মুখটা হয় লজ্জায় রক্তিম। তারপর চিঠির উল্টো পাশে লেখা ওই লাইনটা, ‘ আমি মারাত্মক প্রেমে আহত। শ্যামলতাকে না পেলে এই প্রেমিকের মৃত্যু অনিবার্য!’ ইশ! মানুষটা কী অসভ্য কথা লিখেছিল

সেদিন। প্রতিটি শব্দকে লজ্জার সাগরে জিইয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল নম্রতার সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শরীরে। এই লজ্জাবান কী মারাত্মকভাবেই না বিঁধেছিল নম্রতার প্রেমাহত মনে! নম্রতা শিউরে উঠে। ডায়েরি হারানোর ব্যথায় ভেতরটা চিনচিন করে উঠে! এই নিষ্প্রয়োজন জীবনটা নিয়ে কী করবে নম্রতা?সকাল সাতটায় লঞ্চ হালুয়াঘাটে এসে

পৌঁছাল। কেবিনের বিছানায় গুটিশুটি হয়ে শুয়ে থাকা নম্রতার ঘুম ভাঙল সবার পর। বন্ধুরা তখন ব্যাগ কাঁধে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নম্রতা ভারী মাথা নিয়ে উঠে বসল। নীরা নিজের আর নম্রতার ব্যাগটা পাশে রেখে নম্রতার কপালে হাত রাখল। কপাল কুঁচকে বিজ্ঞদের মতো মুখভঙ্গি করে বলল,

‘ জ্বর তো কমই মনে হচ্ছে। হাঁটতে পারবি?’নম্রতা কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! রাতে তার জ্বর এসেছিল? নীরা আবারও একই প্রশ্ন করতেই মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল নম্রতা। মাথাটা ভার ভার লাগছে। চোখে-মুখে পানি ছিঁটাতে পারলে হয়ত কিছুটা শান্তি লাগত। চোখদুটোতেও ব্যথা হচ্ছে খুব। নীরার সহযোগীতায় চোখে-মুখে

পানি দিয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে কেবিন থেকে বেরুতেই একটা পেটমোটা ডায়েরি ধরিয়ে দেওয়া হলো হাতে। নম্রতা প্রশ্নমাখা চোখে বন্ধুদের দিকে তাকাতেই নাদিম দাঁত কেলিয়ে বলল,

‘ এই ডায়েরিতে মোট পয়ত্রিশটা চিঠি আছে দোস্ত। কাল রাত জাইগা এই চিঠিগুলো লিখছি আমরা। যখনই মন খারাপ হবে বসে বসে

পড়বি। আমরা কী কম সুন্দর চিঠি লিখি নাকি? তোর পত্রপ্রেমিক থেকে একটু কম ভালো হলেও ভালোই লিখি।'কথাটা বলে থামল নাদিম। নম্রতার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে গলা খাঁকারি দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল,

' শোন, আমার চিঠিগুলাতে দু-একটা বানান ভুল হইতে পারে।'

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাতেই ঠোঁট উল্টে বলল,

‘ আচ্ছা যা সাত-আটটা ভুল হইতে পারে। ব্যাপারটা ইগনোর করিস। চিঠি লেখাটাই ফ্যাক্ট। কয়টা বানান ভুল হলো সেটা কিন্তু ফ্যাক্ট না।’

নম্রতা ঠোঁট চেপে হাসল। হাতে থাকা রোদ চশমাটা পরে নিয়ে বাঁকা হাসল অন্তুও। কৌতুক করে বলল,

‘ তোর ফিসফিসানি কথা পুরো লঞ্চের মানুষ শুনছে ভাই। মানসম্মান আর রাখলি না। ঢাবির স্টুডেন্ট হয়ে বাংলা বানান ভুল? আস্তাগফিরুল্লাহ!’

নাদিম গুজগুজ করে বলল,‘ ধুর বাল! ইংরেজিতে এসাইনমেন্ট লিখতে লিখতে মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছি। ইউ শ্যুড প্রটেস্ট, বুঝলি?

এই স্যারেরা কোনো কাজের না। আকামের ঢেঁকি সব।’

নাদিমের কথায় ঠোঁটে হাসি নিয়ে মাথা নাড়ল সবাই। ব্যাগ কাঁধে লঞ্চ থেকে নামার উদযোগ করল। নাদিম লঞ্চ থেকে নামতে নামতে অন্তুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ আজ এতো মাঞ্জা মারছ মামা? কাহিনী কিতা? কোন সুন্দ্রীকে গায়েল করতে চায় তোমার মন? হ্যাঁ হ্যাঁ?’

অন্তু চমৎকার এক হাসি দিয়ে বলল, ‘ তোর বোনেরে। হেব্বি দেখতে। আমার হাতে তুলে দে। পরের বছরেই মামা ডাকার সুযোগ-সুবিধা ফ্রী।’

নাদিম অন্তুকে লাথি দিয়ে বলল,‘ তুই আসলেই খারাপ। শালা হারামখোর।’

অন্তু হু হা করে হেসে উঠে বলল,

‘ শালা ডাকছ কেন শালা? দুলাভাই ডাক। শালা তো ডাকুম আমি। শালা, ও শালা। শালা মশাই।’

অন্তর কথায় অন্তকে ধাওয়া করল নাদিম। ভীরে মাঝে ছুটতে ছুটতে বলল,

‘ তোরে তো আজ খাইছি।’

অন্ত-নাদিমের কথায় হেসে উঠলো বাকিরা। ভীরের মাঝে উচ্ছল হাসি নিয়ে ছুটতে থাকা দু’জন তরুনের

দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অনেকেই। ছোঁয়া-নীরা কিছুটা এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে দৌঁড়ে এসে নম্রতার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল রঞ্জন। নম্রতার হাত থেকে লাগেজটা নিজের হাতে নিয়ে অন্যহাতে সানগ্লাস পরল। নম্রতার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকাল,‘ কী রে? খুদা টুদা পেয়েছে তোর?’

নম্রতা ম্লান হেসে মাথা নাড়ল। নাদিমের দেওয়া ডায়েরিটির দিকে দৃষ্টি রেখে বুক ভরে শ্বাস নিল। ঠোঁটের হাসি ধরে রেখে বলল,

‘ আমি ঠিক আছি দোস্ত। চিন্তা করিস না।’

রঞ্জন প্রথমেই কিছু বলল না। সামনের ভীরটা অতিক্রম করার পর মুখ খুলল,

‘ ভাগ্যে বিশ্বাস করিস নমু?’

‘ হু, করি।’‘ তাহলে সবটা ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দে। সবকিছুর পেছনেই তো কোনো না কোনো কারণ থাকে। তোর কিশোরী বয়সের প্রথম প্রেমিক হারিয়ে যাওয়া। স্মৃতিময় ডায়েরিটা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া সবকিছুর পেছনেও নিশ্চয় কারণ আছে। সৃষ্টিকর্তা হয়ত এমন কিছুই চাইছেন। লাইফে মুভ অন কর। অতীত খামঁচে ধরে পড়ে

থাকলে তো চলে না। অন্য কাউকে সুযোগ দে। সুযোগ না দিলে বুঝবি কী করে? মানিয়ে নিতে পারবি নাকী পারবি না?’

নম্রতার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। রঞ্জনের চোখের দিকে তাকাতেই জমে থাকা জলটুকু মুক্ত হলো। সূর্যের আলোয় ফর্সা গালে জলের রেখাগুলো চিকচিক করে উঠল। রঞ্জনের পুরুষ মন

ফিসফিসিয়ে বলে উঠল,‘ যে প্রেমিকের তরে এই রমণীর চোখ ভাসে। সেই নিঃস্ব প্রেমিকের কী কখনও মন হাসে?’

দূর থেকে নাদিমের দৃষ্টি আকর্ষণময় ডাকে ভাবনা কাটল রঞ্জনের। তাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা রেস্তোঁরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নাদিমরা। রঞ্জন তাদের দিকে

তাকিয়ে হাত নাড়তেই দৃঢ় কণ্ঠে বলল নম্রতা,

' জীবনের সব পরিস্থিতিতে যুক্তি খাটে না দোস্ত। অনুভূতির মামলায় যুক্তি বেচারা বড্ড অসহায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। আমি পারছি না সরে আসতে। আর না পারতে চাইছি। আর না এই বিষয়ে কোনরূপ ডিসকাশন শুনতে চাইছি। চারটা বছর ধরে এইসব কথায় শুনে

আসছি আমি। আর কত?’এক দমে কথাগুলো বলে নিয়েই দ্রুত পা চালালো নম্রতা। রঞ্জন দৌঁড়ে গিয়ে ওর সঙ্গ নিল। বলল,

‘ আচ্ছা বেশ। আলোচনা-সমালোচনার দরকার নেই। তুই যেমন আছিস থাক শুধু হ্যাপি থাক। মন খারাপ করে থাকিস না। আচ্ছা, গান শুনবি?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাল। সুদর্শন রঞ্জন মন ভুলানো হাসি দিয়ে গলা ছেড়ে সুর টানলো,

‘ আমার কাছে তুমি মানে সাত রাজার ধন
আমার কাছে তুমি মানে অন্যরকম।
আমার কাছে তুমি মানে আমার পোষা পাখি,
দিনে রাইতে চোখ বুজিয়া তোমায় আমি দেখি।

তোমার কাছে হয়তো বন্ধু আমি কিছু না,
তাইতো তোমার স্বপ্নে বন্ধু আমি আসি না।
আমি মানে তুমি আর তুমি মানে আমি,
আমার কাছে আমার চেয়ে বন্ধু তুমি দামী।’

রঞ্জনের গান শুনে সেখান থেকেই গিটারে সুর তুলল নাদিম। উটপটাং লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগল,

‘ আহা! আহা!’অন্তু মসৃণ ছিটি বাজিয়ে সুন্দর হাসল। নম্রতা হেসে ফেলে রঞ্জনের ধুমধাম কিল বসাল। হাসি ফুটল নীরা আর ছোঁয়ার ঠোঁটেও। রঞ্জনের গান থামল না। রেস্তোরাঁয় কোণার একটা টেবিল ঘিরে বসে একের পর এক গান

চলতে লাগল আড্ডায়। নাদিম গিটার আর অন্তু টেবিল বাজিয়েই আড্ডা জমিয়ে তুলল। রঞ্জনের অদ্ভূত গানে কখনও বা সুর মেলাতে লাগল, কখনও-বা হেসে কুটি কুটি হতে লাগল নীরা-নম্রতা-ছোঁয়া। রেস্তোঁরায় থাকা অধিকাংশ খদ্দের মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সোনালি সকালে ফুটে উঠা একদল উচ্ছল তরুণ-তরুণীদের। সকালের নাস্তা

এলো ডিম,পরোটা আর দই। ধীরে সুস্থে নাস্তা শেষ করে চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখল ওরা। কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে ঘাটে বসে রইল। সমস্বরে গান গাইল। সারাটাক্ষন ফূর্তিতে মেতে রইল প্রতিটি প্রাণ। দশটায় লঞ্চ আসতেই তাড়াহুড়ো করে উঠে গেল তাতে। উদ্দেশ্য কুতুবদিয়া।লঞ্চ ছাড়ার পর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ঠিক তখনই মন

খারাপের মেঘ এসে জমা হলো নম্রতার আকাশে। সেই সাথে এলো কান্না। এতোক্ষণ চেপে রাখা আক্রোশগুলো চামড়া ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল।চিঠির ওপাশের মানুষটির কলার চেপে বলতে ইচ্ছে করল, ' কেন করলে তুমি এমন? সত্যিই হারালে? নাকি ধোঁকা দিলে? আমাকে মরণ যন্ত্রণায় ফেলে এভাবে পিছুতে পারলে তুমি? একটুও কষ্ট

হলো না?’ এই উত্তরগুলোর জন্য হলেও নম্রতা তাকে খুঁজতে চায়। অপেক্ষা করতে চায়। এই উত্তরগুলো না পেলে যে তার ভালো থাকা হচ্ছে না। কিছুতেই না। তাছাড়া, ওই বেয়াদব লোকটিকেও ছাড়বে না নম্রতা। আবার দেখা হলে, শক্ত কয়েকটা চড় লাগাবে। ধাক্কা দিয়ে ডায়েরি ফেলে দিয়ে আবার আবেগ নিয়ে ছেরখানি! এতো বড়

সাহস!কুতুবদিয়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হলো। এখানকার স্থানীয় একটা হোটেলে উঠেছে তারা। আজকের রাতটা কাটিয়ে সকালের লঞ্চে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পৌঁছাবে। অন্ধকার আকাশে মেঘ করেছে। ঝড় হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। চারপাশে উলোট পালোট হাওয়া। সেই হাওয়ায় উড়ে চলেছে নীরার অস্থির চুল, ওড়না। বারান্দার

থামে ঠেস দিয়ে ফোনালাপ সারছে সে। চোখে-মুখে চাপা উৎকণ্ঠা। হরিণীর মতো টানাটানি চোখে অল্পবিস্তর দ্বিধা। খানিক দূরে বসে থেকে এসবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল অন্তু। আড্ডায় মশগুল রঞ্জন, নাদিম একপর্যায়ে থেমে গেল। অন্তুর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে নীরার দিকে তাকাল। দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে একে

অপরের দিকে তাকাল। নাদিম ফট করে বলে ফেলল,‘ এইবার ঢাকায় ফিইরা তোগো দুইডারে কাজি অফিসে ঢুকাইয়া তালা মাইরা দিমু। খুলতাম না। তোগো এসব পারু-দেবদাসের কাহিনী আর ভাল্লাগতাসে না।’

অন্তু কপাল কুঁচকাল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ ক্যারা দেবদাস? ওর জন্য দেবদাস হওয়া লাগব? এতো বাজে দিন আসে নাই আমার।’

‘ হ। ওইডা তো তোর চোখ দেখলেই বুঝা যায়। দোস্তের দিকে এমন কামুক দৃষ্টিতে তাকাইতে তোর বিবেকে বাজে না?’

অন্তু নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল,

‘ প্রথম যখন তাকাইছিলাম তখন তো আর দোস্ত ছিল না। সাধারণ

সুন্দরী মেয়ে ছিল। দেখতেই প্রেমে পড়ে গেলাম। আর সেও আমাকে ফ্রেমেবন্ধী করার পায়তারা করতে লাগল। এই মেয়ের যন্ত্রণাতেই মরে যাব একদিন, দেখিস।'

রঞ্জন ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,' বুঝিয়ে বললেই পারিস।'

' আর কত বুঝাব? তিনটা বছর ধরে তো বুঝাচ্ছিই। আমি কী দেখতে খুব খারাপ? আমার মধ্যে

পছন্দ করার মতো কিচ্ছু নাই? একটা গুণও না?’

কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল অন্তর। চোখদুটো হয়ত একটু টলমলও করে উঠল। রঞ্জন অন্তর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ কি বলিস এগুলো? তুই আর খারাপ দেখতে? মাইয়ারা তাহলে কী দেইখা পটে যায়, বল তো মামা।

ফালতু চিন্তা বাদ দে। নীরা বুঝবে। সময় দে ওরে।’

নাদিম অসহায় চোখে তাকাল। হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ এল্লায় ভাল্লাগে না বাল। নীরুর জায়গায় অন্যকেউ হইলে থাপড়া মাইরা ঠিক কইরা ফেলতাম। কিন্তু নীরুও তো আমাগোই দোস্ত। কারে কী কই বল তো? যন্ত্রণার এক শ্যাষ। শালা তুই প্রেমে পড়ার জন্য

আর কোনো মেয়ে পাইলি না?’অন্তু ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে বলল,

‘ পাইছিলাম তো। তোর বোনেরে। দিলি না। ছ্যাঁকা!’

নাদিম ওর দিকে তেড়ে এসে বলল,

‘ তোর লাইগা হুদ্দাই সেমপ্যাথি আসে। তোরে তো মাইরা ফেলানো উচিত।’

‘ তোর বোনের জন্য জান কুরবান শালা মশাই।’

রঞ্জন এবার হুহা করে হেসে উঠে। নাদিমের মুখ তখন রাগে আগুন। ছাই রঙা বিশাল আকাশে রুটির মতো গোলকার এক চাঁদ। জ্যোৎস্না যেন ঠিকরে পড়ছে। সমুদ্রের হিংস্র ঢেউগুলোর গাঁ চিকচিক করে উঠছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার রূপালী আলোয়। বিশাল ঢেউগুলো শুভ্র ফ্যানা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বালিময় তীরে। নগ্ন পায়ে অগোছালো পদক্ষেপগুলো

জলের তোড়ে মিশিয়ে দিয়ে মহমান্বিত গর্জনে কাঁপিয়ে তুলছে চারপাশ। অন্ধকার মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাউগাছগুলো প্রচন্ড বাতাসে তির তির করে কাঁপছে। কাঁপছে নম্রতার লম্বা চুল, ওড়নার আঁচল। মুগ্ধ চোখদুটো তাকিয়ে আছে বহুদূরে। বিশাল আকাশ আর সমুদ্র, পরম ভালোবাসায় যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়েছে ঠিক

সেখানটাতে। কী আশ্চর্য সুন্দর এই পৃথিবী! কী আশ্চর্য সুন্দর আকাশ আর সমুদ্রের এই স্বর্গীয় মিলন! নম্রতা থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ফোনালাপে ব্যস্ত রঞ্জন। চোখে-মুখে চাপা তৃপ্তির আভাস।‘ কী করছ?’

‘ বিচে আছি। বালির ওপর খালি পায়ে হাঁটছি। যখনই ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই তোমাকে প্রচন্ড মিস করছি।’

ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠী অভিমানী কণ্ঠে বলল,

‘ চাপা! মিস করছ না ছাই।’

‘ আরে! সিরিয়াসলি খুব মিস করছি। এই মুহূর্তে তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি জানো, তোমার রঞ্জন মিথ্যা বলে না।’

ওপাশের কণ্ঠস্বরটা এবার খানিক নরম হলো। আবেগী কণ্ঠে বলল,

‘ আমিও।’

রঞ্জন মন খারাপ ভাব নিয়ে বলল,‘ তোমাকে বললাম সাথে এসো। রাজি হলে না। কী হতো এলে?’

ওপাশ থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মিষ্টি কণ্ঠে বলল,

‘ বন্ধুরা মিলে ট্যুরে গিয়েছ সেখানে গার্লফ্রেন্ডের কী কাজ? সবারই একটা পার্সোনাল স্পেস দরকার। আমি তোমায় ভালোবাসি বলে যে তোমাকে সবসময় আমার মাঝেই

সীমাবদ্ধ রাখব তা ঠিক নয়। আমার বাইরেও তোমার একটা জগৎ আছে। বন্ধুমহল আছে। আমার সাথে কাটানো সময়গুলোতে যেমন তুমি শুধু আমার থাকো। আমাকেই ভাবো। তেমনই ফ্রেন্ডদের সাথে সময় কাটানোর সময় শুধু এই তুমিটা শুধু ওদের হয়েই থাকা উচিত। আমি সাথে থাকলে তুমি কাকে রেখে কাকে সময় দিতে?’

রঞ্জন হাসল। চাঁদের আলোয় ফর্সা মুখটা জ্বলজ্বল করে উঠল। মুগ্ধ কণ্ঠে বলল,‘ তুমি এখন সামনে থাকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেতাম তোমার গালে। এইজন্যই তোমাকে এতো ভালোবাসি পূজা। পরিস্থিতিগুলোকে এতো ভালোভাবে বুঝো কিভাবে বল তো?’

পূজা লাজুক হেসে বলল,

‘ কই বুঝি? তুমি আমায় যতটা বুঝো ততটা তো বুঝে উঠতে পারি না। আচ্ছা? তোমার বন্ধুরা নেই পাশে?’

‘ আরে নাহ। সব কটা নাক ঢেকে ঘুমাচ্ছে। বিচে শুধু আমি আর নমু। ওর নাকি ঘরে দম আটকে আসছিল। মেয়েটা ঠিকঠাক ঘুমায় বলেও মনে হয় না আমার। কতটা পাগল হলে কিছু চিঠিকে পুঁজি করে

বছরের পর বছর অপেক্ষা করা যায় ভাবো!'

পূজা দুঃখী কণ্ঠে বলল,' ওর ডায়েরিটার জন্য খুব খারাপ লাগছে আমার। সেদিন সব শোনার পর কী মনে হয়েছিল জানো?'

' কী?'

' আমার কাছে ম্যাজিক থাকলে। চোখের পলকে ডায়েরিটাকে নদী

থেকে তুলে হাতে ধরিয়ে দিতাম তার। খুব খুশি হতো না?’

রঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠল। আদুরে কণ্ঠে বলল,

‘ পাগলী।’

‘ আচ্ছা? ওই লোকটাকে কী কোনোভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না? আমি কালই পূজো দেব। প্রার্থনা করব নম্রতা যেন খুব শীঘ্রই তার

পত্রপ্রেমিককে পেয়ে যায়। ভগবান আমার কথা না রেখে পারবেই না।'

' এইতো শুরু হলো তোমার অন্ধ বিশ্বাস।'

' আচ্ছা? তুমি কী নাস্তিক?'

' নাস্তিক কেন হব?" তাহলে সবসময় ধর্মের কথায় নাক সিটকাও কেন? জীবনেও তো মন্দিরে যেতে দেখলাম না।'

‘ নাস্তিক না হলেই তোমাদের মন্দিরে গিয়ে মাথা কুটতে হবে? কী আশ্চর্য! শুনো, আমি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, একজন আছেন যিনি আমায়, এই পুরো সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু.... ‘

পূজা অধৈর্য্য হয়ে বলল,

‘ হয়েছে। আপনার এই যুক্তি বহুত শুনেছি। একদম মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু দয়া করে, আমার বাবার সামনে এসব কথা বলো না। আমার বাবা কিন্তু গোঁড়া হিন্দু। তোমার এসব কথায় চেঁতে যেতে দু-মিনিটও লাগবে না।’

রঞ্জন প্রত্তিত্যুরে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। আশেপাশে তাকিয়ে নম্রতাকে দেখতে না পেয়ে আৎকে উঠে বলল,‘ নমুকে আশেপাশে

দেখছি না পূজা। আমি তোমাকে পরে কল করি?’

পূজা বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ সে-কি! আচ্ছা, ঠিক আছে। খুঁজে পেলে ইনফর্ম করো।’

‘ আচ্ছা।’

কথাটা বলেই তাড়াহুড়ো করে ফোন কাটল রঞ্জন। ভয়ার্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। যতদূর চোখ যাচ্ছে জনমানবহীন বালুকাময় তীর।

মুহূর্তেই কোথায় চলে গেল মেয়েটা? সমুদ্র তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কতদূর পৌঁছে গিয়েছে নিজেও জানে না নম্রতা। শুধু জানে সমুদ্র তাকে টানছে। অদ্ভুত সুন্দর এই জলরাশি জ্যোৎস্না স্নান করতে করতে নিবিড়ভাবে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। পরনের লাল ওড়না আর লম্বা চুলগুলো উচ্ছল কিশোরীর মতো লাফালাফি করছে। শরীর থেকে

ছিঁটকে হাওয়ায় হাওয়ায় মাতোয়ারা হতে চায়ছে। নম্রতা সমুদ্রের পানিতে পা ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ উদাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ছুঁই ছুঁই পানিতে গিয়ে দাঁড়াল। সমুদ্রের শীতল বাতাস ঝাপটে পড়ছে নম্রতার গায়ে। নম্রতা চোখ বোজলো। বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে দু'পাশে দু-হাত প্রসারিত করল। নম্রতার

মোমের মতো ফর্সা মুখটা চাঁদের আলোয় ঝলক দিয়ে উঠল। নম্রতার হঠাৎ করেই মনে হলো, সে উড়ছে। বাতাস, চুল, উড়নার আঁচলের সাথে তার হালকা পাতলা শরীরটাও যেন ভাসছে। চারপাশে সমুদ্ররাজ ভয়ানক গর্জন তুলে হাসছে। নম্রতার চোখের পাতায় ভেসে উঠল সে-ই আশ্চর্য সুন্দর দিনটি। নম্রতার 'সে' নম্রতাকে প্রেম নিবেদন করার পর পরই শুরু

হয়েছিল তাদের সুখময় প্রেম। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। নম্রতা একবার খুব আবেগ নিয়ে লিখেছিল,‘ শুনো,

আমরা একটা ঘর বাঁধব। ছোট্ট একটা ঘর। ছনের বনের চাল থাকবে। আধভাঙ্গা দেয়াল থাকবে। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক গেলে এক পশলা জ্যোস্না আসবে। ছোট্ট ঘরের এক কোণায় পুরানো এক লন্ঠন

থাকবে। হাতের তৈরি শিকা থাকবে। সেগুলোতে হরেক রকম রঙ থাকবে। আর শোন? পোষা একটা টিয়া থাকবে। আমাদের এই ছোট্ট ঘরে তারও ছোট্ট ঘর থাকবে। তুমি প্রতিদিন গঞ্জে যাবে.....আমার জন্য মুঠো ভরা লাল ফিতে আর আলতা আনবে। চাঁদের আলোয় গা ভিজিয়ে নদীর পানি ঝলমলাবে। সেই আলোতে মত্ত হয়ে আমার

পায়ে আলতা আঁকবে। বৃষ্টি ভেজা রাতগুলোতে তোমার বুকে সিঁটিয়ে রাখবে। আর শোন? যখন ছোট্ট ঘরের পাঁচিল বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল গড়াবে আমরা তখন ছোট্ট পাত্রে মিষ্টি সেই জল কুঁড়াব। আমাদের আধভাঙ্গা এক চৌকি থাকবে। নড়তে চড়তেই আনন্দে সে খিলখিলাবে। শক্ত একটা তোশক আর শিমুল তুলোর বালিশ থাকবে।

সেই বালিশে মাথা রেখেই তুমি আমার মন ভুলাবে। ছোট্ট ছোট্ট হাঁড়ি-পাতিল আর ছোট্ট কিছু বাসন থাকবে। ছনের বেড়ায় গুঁজে রাখা ছোট্ট একটা আরশি থাকবে। মাঝ দুপুরে, তপ্ত সময় ফুঁড়ে দিয়ে প্রাণখোলে গান গাইবে। দুষ্টুমিতে মত্ত হয়ে ভালোবাসায় মাতাল হবে। আমি লজ্জা পাব, এত্ত এত্ত গাল

ফুলাব। এই শুনছ তুমি? আমরা কিন্তু ছোট্ট একটা ঘর বাঁধব!

ইতি

শ্যামলতা'চিঠিটা লিখে নম্রতার সে-কি লজ্জা। পাঠাবে কী পাঠাবে না সে নিয়ে কতো যে দুর্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত চিঠিটা পাঠিয়েছিল নম্রতা। দু'দিনের মাথায় কাঙ্ক্ষিত উত্তরও পেয়েছিল। নীল কাগজের পরিবর্তে সাদা কাগজের জমিনে লাল আলতা দিয়ে

লেখা হয়েছিল সেই উত্তর। চিঠির ওপর পেঁচানো হয়েছিল লাল ফিতা। লাল আলতায় গুটি গুটি অক্ষরে লিখেছিল,

‘ শ্যামলতা!তুমি কী জানো? তুমি আমায় আজকাল বড্ড জ্বালাচ্ছ। আমি ঠিকঠাক পড়তে পারছি না। হুটহাট মন জুড়ে বর্ষা হয়ে ঝড়ে পড়ছ। সেদিন কী হয়েছিল জানো? গভীর রাতে আমি পড়ছি। ঘড়িতে

একটা কী দুইটা বাজে। হঠাৎ দরজায় কড়া নেড়ে ঘুম ঘুম চোখে ডাকাডাকি করছে নিদ্রা। আমি বিস্ময় নিয়ে দরজা খুলতেই সে বলল, ‘ভাইয়া?তোর কী অসুখ করেছে? কখন থেকে পড়ার মতো সুর করে বলছিস “শ্যামলতা, শ্যামলতা”। কাহিনী কী?’ ওর কথায় আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। তুমি ভাবতে পারছ? আমি নাকি

আধাঘন্টা যাবৎ পড়ার বদলে শ্যামলতা শ্যামলতা বলে জপ করছি অথচ আমি নিজেই জানি না। তারপর আবারও এক কান্ড ঘটালাম। কাল তোমার চিঠিটা পেয়েই ইচ্ছে জাগল তোমার পায়ে আলতা আর চুলে লাল ফিতা জড়াব। কিন্তু আমাদের এই অসম দূরত্বের প্রেমে সে এক প্রকার অসম্ভবই বলা চলে।কিন্তু মন বাবাজি

সম্ভব-অসম্ভবের ব্যাখা শুনতে নারাজ। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আলতার রঙে চিঠি লিখব। সাথে থাকবে লাল ফিতে। এই আলতা জোগাড় করতে কত পেরেশানি করতে হয়েছে জানো? নিদ্রার যন্ত্রণায় ধরা খেয়ে গিয়েছি বাসায়। ছেলে পকেটে আলতা আর লাল ফিতা না ঘুরে বেড়াচ্ছে, মায়ের জন্য এ-যেন এক ভয়ানক কান্ড। বাসায়

হুলস্থুল বাঁধিয়ে মান-সম্মান শেষ। কী লজ্জায় পড়তে হয়েছিল বুঝতে পারছ? দু'দিন ধরে সবাই কেমন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। আমি তাকাতেই মিটমিট করে হাসছে। তুমি আমার কী ভীষণ সর্বনাশ করলে বলো তো? এই সর্বনাশটা কী করে ঢাকব আমি? আচ্ছা শ্যামলতা? এই সর্বনাশা সর্বনাশ ঢাকার পরিবর্তে সমান তালে আরও কিছু

সর্বনাশ করে ফেললে কেমন হয়? শ্যামলতার সর্বনাশের দায় নিয়ে সর্বনাশা, সর্বগ্রাসী হওয়ার মতো প্রাপ্তি কী আর কিছুতে আছে?বিঃদ্রঃ আলতা আর ফিতা কী তোমার পছন্দ হয়েছে? তোমার বাকি চাওয়াগুলো নাহয় দেখা হলেই পূরণ করব।

ইতি

শ্যামলতার ব্যক্তিগত সে’

চিঠির কথাগুলো মনে পড়তেই নম্রতার ফর্সা গালে লাল আভা ফুটল। পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠল নম্রতা। সমুদ্রের গর্জনে চাপা পড়ে গেল সেই উচ্ছল হাসির শব্দ। ঠিক তখনই ডানহাতের বাহু ধরে হেঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে আনা হলো তাকে। বিস্মিত পুরাষালী কণ্ঠ বলে উঠল,

‘ পাগল নাকি আপনি? তীরে লাল চিন্হ উড়ছে দেখছেন না? এখন ভাটার সময় । ঢেউয়ের টানে চোখের নিমিষেই হারিয়ে যেতে পারতেন। এই অসময়ে কেউ পানিতে নামে?’

নম্রতা চোখ তুলে তাকাল। কালো রঙের টি-শার্ট গায়ে সুঠাম দেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। চোখে মোটাফ্রেমের চশমা। চাঁদের

আলোয় চেহারা ভালো বুঝা যাচ্ছে না। তবুও চিনে ফেলল নম্রতা। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই ভ্রু কুঁচকে তাকাল। রাগান্বিত কণ্ঠে বলল,‘ আপনি!’

সামনে দাঁড়ানো মানুষটাও বোধহয় খানিক চমকাল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ ওহ শিট্। আপনি লঞ্চের ওই পাগল মেয়েটা না?’

নম্রতা যেন আরও একটু জ্বলে উঠল এবার। তেড়ে এসে বলল,

‘ আমাকে দেখে পাগল মনে হয়?’

আরফান ভারি অবাক হয়ে বলল,

‘ মনে হয় মানে? আমি তো হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট শিওর যে আপনি পুরোদস্তুর পাগল।’নম্রতার ডায়েরি হারানোর জ্বালাটা আবারও তীব্র রূপ ধারণ করল। আরফানের দিকে তেড়ে যেতেই দু’পা পিছিয়ে গেল

আরফান। এমন সময় দূর থেকে দৌঁড়ে এলো তিনটি ছেলে। নম্রতার কাছাকাছি এসে হাঁটুতে ভর করে জোরে জোরে শ্বাস নিল। নাদিম কোমরে হাত রেখে হাঁপাতে লাগল। গর্জে উঠে বলল,

‘ ওই হারামি! তোরে আজকে সমুদ্রের পানি খাওয়াইতে খাওয়াইতে মাইরা ফেলমু আমি। শালী! তোরে খুঁজতে গিয়ে জীবন শ্যাষ! রঞ্জন তো

ভয় দেখায় দিছিল বাল। উফ! মাইয়া মানেই যন্ত্রণা।’

নাদিম থামতেই আরফানের পেছনে এসে দাঁড়াল একটি লোক। ফর্সাটে গোলগাল মুখ। চোখে-মুখে জ্ঞানী জ্ঞানীভাব। ফর্সা চামড়ায় লাল টকটকে ঠোঁট। লোকটি হালকা ঝুঁকে নম্রতাকে নিরক্ষণ করে বলল,‘ আরফান? কি হয়েছে দোস্ত? এভাবে ছুটে এলি যে?’

বন্ধুর কথায় ফুঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল আরফান। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, ‘ আর বলিস না। দু’দিন যাবৎ এক পাগলকে বাঁচাতে গিয়েই বারবার মানসম্মান খাওয়াতে হচ্ছে আমায়। ‘

‘ মানে? বুঝলাম না।’

‘ এই ভাটার সময়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র বিলাস করছিলেন এই রমণী। আমি ভালো বুঝে বাঁচাতে গেলাম। সে উল্টো আমার

ওপরই অখুশি। সাচ আ ফলিস গার্ল।’

নম্রতা আবারও তেড়ে গিয়ে বলল,

‘ খবরদার বাজে কথা বলবেন না। আমার অতো বড় একটা ক্ষতি করে এখন মহৎ সাজতে এসেছেন?’

আরফান দু-পা পিছিয়ে গিয়ে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে বলল,

‘ দেখ নিষাদ। কেমন অসভ্য মেয়ে। কার্টেসী বলতে কিছু নেই। আমার

ল্যাপটপটা ওভাবে ফেলে দিয়েও বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। ইচ্ছে করছে....'নিষাদ হু হা করে হেসে উঠল। আরফানের কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে শান্ত হতে বলল। নাদিম উশখুশ করে বলল,

' নমু? বাদ দে বইন। ঝগড়া টগড়া কইরা লাভ নাই। এই ভাই খুব একটা মিছা বলে নাই। তোর মাথায় এল্লা ওল্লা ছিট দেখা দিতাছে। এই

রাইতে কেউ একলা একলা এতোদূর আহে? তারওপর পানিতে নামে?’

নম্রতা চোখ-মুখ লাল করে নাদিমের দিকে তাকাল। রঞ্জন এক পা এগিয়ে গিয়ে আরফানকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘ সৌভাগ্যবশত আপনাদের সাথে আবার দেখা হয়ে গেল। আর দূর্ভাগ্যবশত আবারও এমন একটা

সীনক্রিয়েট হলো। সরি ভাইয়া, আসলে নমু একটু ডিপ্রেশড।’আরফান কিছু বলার আগেই পাশ থেকে নিষাদ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ ইট’স ওকে। সুন্দরী মেয়েদের টুকটাক ভুল মাফ করা যায়। আমি নিষাদ আহমেদ নিরব। বর্তমানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির লেকচারার। আর ও হলো ডক্টর আরফান আলম।

বন্ধুদের সাথে ট্যুরে এসেছি। আর আপনারা?’

রঞ্জন ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু হাসল। বলল,

‘ আমি রঞ্জন চক্রবর্তী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি থার্ড সেমিস্টারে পড়াশোনা করছি। ওরা আমার বন্ধু। নাদিম হোসেন, অন্তু তালুকদার আর নম্রতা মাহমুদ। আমরাও ট্যুরে এসেছি।’

নিষাদ বিনয়ী হাসি দিয়ে বলল,‘ তোমরা তো তাহলে আমাদের থেকে বেশ কয়েক বছরের জুনিয়র হবে। অলমোস্ট সাত/ আট বছর। তাই না আরফান?’

আরফান ভদ্রতার হাসি দিয়ে মাথা নাড়ল। দু’পক্ষের পরিচিতি পর্ব শেষ হতেই বিদায় নিয়ে যার যার হোটেলে রওনা হলো। হোটেলের

পথে ফিরতে ফিরতে হঠাৎই প্রশ্ন করল নাদিম,

‘ ওই লেকচারটাকে তুই চিনিস নমু?’

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,

‘ কোন লেকচারার?’

‘ আরে, একটু আগে কথা হইলো না? নিষাদ না বিষাদ নাম কইলো।’

নম্রতা আরেক দফা অবাক হয়ে বলল,

‘ আমি ওই ব্যাটাকে চিনব কেন?’

নাদিম কপাল কুঁচকে বলল,

‘ তাহলে ওই পোলায় তোরে চিনে কেমনে?’নাদিমের কথায় তিনজোড়া চোখ তার উপর এসে নিবদ্ধ হলো। রঞ্জন চোখ ছোট ছোট করে বলল,

‘ ওই ব্যাটায় নমুকে চিনে তোরে কে বলল?’

‘ ফেরার সময় স্পষ্ট শুনলাম। এই লেকচারারে আরফান ভাইকে বলছে,

” রাগিস না দোস্ত। ছেড়ে দে। মেয়েটা আমার পরিচিত।” ‘

নাদিমের কথায় তিনজনই অবাক চোখে একে অপরের দিকে তাকাল। নম্রতার কপালে ভেসে উঠল চিন্তার ভাঁজ। এই লোক কী করে চিনবে তাকে? কই? সে তো চিনে না। দুপুরের খাবার শেষ করে নম্রতাদের ঘরেই আড্ডা বসিয়েছে বন্ধুরা। বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি। পরিষ্কার

কাঁচের জানালায় জমে আছে ফোঁটা ফোঁটা জল। উত্তাল সমুদ্রের গর্জন আর বৃষ্টির শব্দ মিলেমিশে তৈরি হয়েছে নতুন এক সুর। সেই সুরে মাতোয়ারা হয়েই প্রলংয়কারী নৃত্যে মত্ত হয়েছে ঝাউগাছের সারি আর নারিকেল গাছের বহর। কাল শেষ রাতের দিকেও তিন নম্বর বিপদ সংকেত ছিল সৈকতে। সকালের দিকেও আবহাওয়া ছিল চলনসই।

কিন্তু দুপুর দিকে হঠাৎই কোথা থেকে উড়ে এলো এক আকাশ কালো মেঘ। শুরু হলো ভয়ানক বর্ষণ। সমুদ্র সৈকতে জারি করা হলো সাত নম্বর বিপদ সংকেত। দুপুরের পর পরই বাসের টিকেট কাটা হয়েছিল নম্রতাদের।পরশু থিওরি পরীক্ষা।রাতের মাঝে ঢাকায় ফেরা যখন চাই-ই চাই ঠিক তখনই শুরু হলো বৃষ্টিকন্যার ইচ্ছেবিলাস।

বৃষ্টিকন্যার এহেন ন্যাকামোতে টিকেটগুলোর সাথে সাথে ধরা বাঁধা সময়টাও ভেস্তে গেল। নম্রতা, নীরা কফি হাতে বিছানার হেড বোর্ডে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নাদিম বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। একটু পর পর হাতে থাকা গিটারে টুং টাং আওয়াজ তুলছে। ডানপাশের ধবধবে সাদা সোফায় বসে আছে রঞ্জন। এক হাতে কফি

কাপ, অন্যহাতে ফোন। অন্তু কার্পেটের ওপর পা গুটিয়ে বসেছে। কোলের ওপর ল্যাপটপ। কোলের পাশেই ধোঁয়া উঠা কফি কাপ। ছোঁয়া বসে আছে বিছানার এক কোণায়। চশমাটা নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে। গায়ে ভারী কম্বল জড়ানো। ছোঁয়া কফি কাপটি পাশের টেবিলে রেখে ঠোঁট উলটালো। কপাল কুঁচকে বলল,‘ আচ্ছা? ওই

লোকটা নমুর ওই পত্র প্রেমিক হতে পারে না? আই মিন, কো-ইন্সিডেন্সলি। পৃথিবীতে কতশত কাকতালীয় ব্যাপার ঘটছে। এটা কী তাদের মধ্যে একটা হতে পারে না?’ ছোঁয়ার বোকা কণ্ঠে বলা কথায় পাঁচজোড়া চোখ তার উপর এসে নিবদ্ধ হলো। প্রতি জোড়া চোখ পলকহীন তাকিয়ে আছে তার

চেহারায়। ছোঁয়া অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, ‘ সরি! আসলে নমু সেদিন বলছিল, লোকটির নামের প্রথম অক্ষর ‘এন’ হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। আবার তোরা যে লোকটির কথা বলছিস, কী যেন নাম? নিরব-নিষাদ হোয়াটএভার সেই নামটাও ‘এন’ দিয়েই শুরু। তিনি ভার্সিটির লেকচারার। দেট’স মিন ব্রাইট স্টুডেন্ট। নমুর ভাষ্যমতে

নমুর পত্রপ্রেমিকও ব্রাইড স্টুডেন্ট ছিল। বর্ণণাটা মিলে যায়। ওই হিসেবে, ভুল করেই বলে ফেলেছি কথাটা। আই থিংক, আই ওয়াজ রং। সরি!’কেউ কোনো জবাব দিল না। আগের মতোই তাকিয়ে রইল চুপচাপ। তারপর হঠাৎ-ই সটান উঠে বসলো নাদিম। অতিরিক্ত উত্তেজনায় ছোঁয়াকে একটা শক্ত

ধাক্কা দিয়ে সবার চোখে চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ হোয়াট আ থিংকিং! এভাবে তো ভাইবা দেখি নাই।’

ছোঁয়া উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিল। নাদিমের দিকে রক্তচক্ষু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিছানা থেকে সরে সোফায় গিয়ে বসল। রঞ্জন নম্রতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ভ্রু নাচাল। কৌতুক মাখা কণ্ঠে বলল,

‘ কি রে? হতে পারে নাকি এমন কো-ইন্সিডেন্স? কাল তো কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিল। ফিল টিল পাসনি কিছু?’

নম্রতা বিরক্ত কণ্ঠে বলল,‘এটা কি কোনো সিনেমা নাকি যে পাশে দাঁড়ালেই লায়লীর মতো ফিল টিল চলে আসবে? আমি তাকে কখনই দেখিনি। পাশে দাঁড়ায়নি। কাছে যাইনি। তার বাহ্যিক কিছুই জানা

নেই আমার। জানার মধ্যে জানি শুধু মন। তার মন পড়া ব্যতীত অন্যকিছু জানার সুযোগই হয়ে উঠেনি কখনও।’

নাদিম মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ ছাতার মাথা প্রেমে করো তোমরা। এই যুগে এসে এমন রঙিলা প্রেম কাহিনি দ্বিতীয়টি দেখার সুভাগ্য কারো হয়েছে বলে আমার মনে হয়

না।’নম্রতা প্রত্যিত্তুরে কিছু বলল না। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরের দিকটায়। সাদা সাদা বৃষ্টির ফোঁটায় ঝাপসা হয়ে এসেছে প্রকৃতি। সমুদ্রের উচ্ছ্বাসটা হয়ে উঠেছে লাগামহীন পাগলা ঘোড়া। অন্তু ল্যাপটপটা পাশে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। ফুঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,

‘ নিষাদ নামক লোকটিই যদি নম্রতার প্রেমিক হয়ে থাকে তাহলে ব্যাটা চূড়ান্ত ধুরন্ধর। সে নিশ্চয় লুকিয়ে চুরিয়ে নমুকে দেখেছে। হয়তো ফলোও করেছে।’

নীরা কপাল কুঁচকে বলল,‘লোকটা যদি নমুকে দেখেই থাকে তাহলে এই তিন-চারবছরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল না কেন? স্ট্রেঞ্জ!’

নাদিম আবারও বিছানায় হাত-পা মেলে শুয়ে পড়ল। গিটারে একটা বিরহী টুন বাজিয়ে নিয়ে বলল,

‘ সবচেয়ে বড় কথা এই দুইটা আবালের ব্রেকআপ কেমনে হইল? ওই বলদ? তোগো ব্রেকআপ কেমনে হইলো রে?’

‘ ব্রেকআপ হয়নি।’

নাদিম সরু চোখে তাকাল। আরেক দফা ওঠে বসে বিস্মিত কণ্ঠে বলল,

‘ হয়নি?’

নম্রতা সন্তপর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দুই দিকে মাথা নেড়ে জানাল, ‘না, হয়নি।’ নাদিম মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আবারও বিছানায় গা এলালো। চোখ-মুখ বিকৃত করে বলল,‘ একেই বলে পিরিত!’

ছোঁয়া অত্যন্ত ঘৃণাভরা চাহনি দিয়ে বলল,

‘ ভাষার কি ছিঁড়ি! ছিঃ!’

অন্তু অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল,
‘ তাহলে তোদের সম্পর্কের সমাপ্তিটা কোথায়?’
‘ সমাপ্তি!’
শব্দটা উচ্চারণ করেই উদাস ভঙ্গিতে বসে রইল নম্রতা। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল,‘ সমাপ্তি তো হয়নি কখনও। এভাবে কী সমাপ্তি হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলছিল তখন। এদিকে দেখা করার জন্য

মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল ‘সে’। সেইসাথে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলাম আমিও। আমাদের দেখা হবে, কথা হবে, সম্পর্কটা নতুন এক রূপ পাবে এসব আলোচনায় চলছিল সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দু’জনই দু’জনের জন্য বিরাট এক সারপ্রাইজ হিসেবে অপেক্ষা করছিলাম। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হলে দেখা করার দিন-তারিখ ঠিক করব

আমরা। রবীন্দ্র সরোবরেই দেখা হবে আমাদের। আমার পরনে থাকবে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর ওর গায়ে নীল পাঞ্জাবি। হাতে থাকবে বেলীফুলের মালা। সেই মালা নিজ হাতে বানাবে সে। নিজ হাতেই পরিয়ে দেবে আমার খোঁপায়। খুশিতে আত্মহারা আমরা অপেক্ষার প্রহর গুণছিলাম। কবে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে? কবে? এক সময় ভর্তি

পরীক্ষা শেষ হলো। আমি তাকে চিঠি দিলাম কিন্তু চিঠির জবাব এলো না। একদিন, দু'দিন করে সপ্তাহ পেরুলো। মাস পেরুলো। আজ তিনটা বছর পেরিয়ে গেল, চিঠির জবাব এলো না।'

এটুকু বলে থেমে গেল নম্রতা। ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল ছয়টি মানুষের দীর্ঘশ্বাস। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রশ্ন করল রঞ্জন,'

আমি একটা বিষয় বুঝতে পারছি না। তোদের চিঠি দেওয়া-নেওয়াটা এতো সময় চলল কী করে? লাইব্রেরিতে অনেক মানুষ যায়। অন্যকারো হাতে কেন পড়ল না চিঠিটা? তাছাড়া, বই পরিষ্কার করতে গিয়েও কি বইয়ের জায়গা পরিবর্তন হতো না? সেইসব চিঠি কারো চোখে পড়ত না? ব্যাপারটা কেমন সিনেম্যাটিক!’

নম্রতা ম্লান হাসল। সোজা হয়ে বসে, বেশ উৎসাহ নিয়ে বলল,‘ তুই বোধহয় গ্রন্থগারের বর্তমান অবস্থা জানিস না রঞ্জন। গ্রন্থগারের বই এখন হাতেগুনা কয়েকজন ছাড়া কেউ পড়ে না বললেই চলে। সবাই গ্রন্থগারে বসে নিজেদের নোট বুক, গাইড বুক মুখস্থ করে চাকরী বা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতেই ব্যস্ত। পড়াশোনার জন্য গ্রন্থগারের পরিবেশ

অতিরিক্ত ভালো বলেই গ্রন্থগারে এতো ভীর। সাহিত্যচর্চার জন্য নয়। তারওপর দর্শনের ওই পেটমোটা বই? কে পড়বে? আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই হয়তো চিঠিটা তার হাতে পৌঁছেছিল। নয়তো চিঠি বাবাজি সেখানেই ইতিহাস হয়ে রয়ে যেত। তাছাড়া, গ্রন্থগারে প্রত্যেক ক্যাটাগরির আলাদা আলাদা সেল্ফ থাকে। আমাদের চিরপরিচিত বইটা

মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করলেও ঘুরেফিরে ওই একই সেল্ফের মাঝেই ঘোরাফেরা করত। খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হতো না।'

রঞ্জন ঠোঁট উল্টে বলল,' বাপরে!'

ছোঁয়া হঠাৎই আর্তনাদ করে উঠে বলল,

' পরশু যে আমাদের সিটি আছে, মনে আছে তোদের? এই বৃষ্টিতে

ফিরব কিভাবে আমরা? প্রিপারেশনও নেই একদম।’

নাদিম দায়সারা কণ্ঠে বলল,

‘ সিটির কথা আপাতত ভুলে যা। আজ আবহাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর কাল বিকেলের আগে আমরা বাসে উঠছি বলেও মনে হচ্ছে না।’

ছোঁয়া চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ মানে! কিন্তু কেন?’

রঞ্জন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘ ওই ব্যাটা কোন হোটেলে উঠেছে জানি না। আশেপাশের কোনো হোটেলে উঠার সম্ভাবনাই বেশি। কাল সারাদিন হোটেলে হোটেলে ঘুরে ব্যাটাকে খুঁজে বের করব। রহস্যাদ্ধার করব। তারপর বিকেলের গাড়ি ধরে ঢাকা।’

পড়াশোনায় অতিরিক্ত সিরিয়াস ছোঁয়া বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে

রইল। নাদিম গিটারে রোমান্টিক টুন বাজিয়ে বেসুরে কণ্ঠে তাল মেলাল। ছোঁয়ার রাগ তখন সপ্তম আকাশে। নাদিমকে জাস্ট সহ্য হচ্ছে না তার। এমন বেয়ারা ছেলে সে দ্বিতীয়টি দেখেনি। রঞ্জন ফোন হাতে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল,‘ এই ভেজা ভেজা আবহাওয়ায় আমার রেজিস্ট্রি ছাড়া বউটাকে ভীষণ মনে পড়ছে। আমি

প্রেম করতে যাচ্ছি। খবরদার ডিস্টার্ব করবি না।’

রঞ্জনের পিছু পিছু গিটার হাতে উঠে গেল নাদিমও। ছোঁয়া হতাশ কন্ঠে বলল,

‘ ইয়া মাবুদ! সিটির কী হবে তাহলে?’

অন্তু এক গাল হেসে বলল,

‘ এতো বেশি পকপক করিস কেন বল তো? সিটি নিয়ে টেনশন নিস

না। স্যারকে ম্যানেজ করে নেব কোনোভাবে। পানিশমেন্ট হিসেবে একস্ট্রা এসাইনমেন্ট করতে দিতে পারে। তাতেই বা কী? লাইব্রেরি তো আছেই। সবাই মিলে কমপ্লিট করে ফটোকপি করে নেব। কাহিনী খতম।'অন্তু যত তাড়াতাড়ি খতম করে ফেলল তত তাড়াতাড়ি খতম হলো না ব্যাপারটা। ছোঁয়ার গলায় মাছের কাঁটার মতো আটকে রইল।

কিছুক্ষণ পর পর পরীক্ষার চিন্তায় ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে পড়তে লাগল। সবচেয়ে বড় কথা বাবা-মাকে কী অজুহাত দেবে সে? ছোঁয়ার মাথা ঘুরছে। এই লম্পট বন্ধুবান্ধবের চক্করে তার ছোট্ট বোকা বোকা মাথাটা প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে। কখনও কখনও ভয়ে জ্ঞানও হারায়। তবুও বন্ধুদের ছাড়া যায় না। আর না তাদের থেকে গড়পরতার

পাত্তাটুকু পাওয়া যায়। নম্রতা সেই কখন থেকেই নিশ্চুপ বসে আছে। শরীরটা মৃদু কাঁপছেও। গা জুড়ে জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। সত্যিই কি ওই লোকটাই সে? আর যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে তাকে কী করে চিনে? আর যদি চিনেও থাকে তাহলে এত লুকোচুরি কিসের? এমন অপরিচিতের মতো ব্যবহারই বা কেন? আর কেন-ই বা এই

হারিয়ে যাওয়ার খেলা? কষ্ট হয় না তার? নম্রতা আর ভাবতে পারে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সারা শরীর ঝিমঝিম করে আসে। আচ্ছা? সে কি মারা যাচ্ছে? ভয়ানক কালমৃত্যু কি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে তাকে? না, তার তো মরে গেলে চলবে না। ওই মানুষটির মুখ থেকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর না শুনে মরণের কথাটাও যে ভাবা যায় না। কিছুতেই

না।পরের দিন সকালের খাবার শেষ করেই নিষাদকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল সবাই। আকাশে তখন উজ্জ্বল সূর্য। আগের দিনের বৃষ্টির দাপটে চারপাশটা ঝকঝক করছে। আকাশও পরিষ্কার। গাছের পাতাগুলোও হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ, সুন্দর। দশটা নাগাদ বেরিয়ে দু-তিনটা হোটেলে চক্কর কেটে দুপুর দুটোর দিকে নিষাদের সন্ধান পেল

তারা। রিসেপশনিস্টকে জিগ্যেস করতেই বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিল, ‘ নিষাদ আহমেদ নীরব নামের লোকটি আজ সকালেই চেইক আউট করেছেন।’ কথাটা শুনেই মাথায় বাজ পড়ল তাদের। যোগাযোগের জন্য নাম্বার চাইতেই উত্তর এলো, ‘ সরি, কারো নাম্বার দেওয়াটা হোটেলের নিয়ম বহির্ভূত।’ রিসেপশনিস্ট মেয়েকে ইনিয়েবিনিয়ে

উচ্চ মাপের প্রসংশা করেও নাম্বার পাওয়া গেল না। নাদিম রাগ নিয়ে বিরবির করে বলল,

‘ বালের রুলস। থাকুনের হোটেলে এতো কিসের রুলস! ন্যাকামোর একশ্যাষ। এই নর্তকী গো দিন-রাইতে চড়ানো উচিত। বেদ্দপ।’ব্যর্থ প্রতিপন্ন নম্রতারা আশেপাশের হোটেল থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে চারটার দিকে গাড়িতে উঠল। ঢাকায়

ফিরতে ফিরতে হলো গভীর রাত। নীরা-নম্রতা পড়ল বিপাকে। এতোরাতে হলে ঢুকতে দেবে না। রঞ্জন-নাদিমের জন্য সমস্যা না হলেও নীরা-নম্রতা থাকবে কোথায়? এদিকে ছোঁয়ার অবস্থাও বেকাহিল। বাবা-মা প্রচন্ড ক্ষেপে আছে তার। মেয়ে যে বাজে বন্ধুদের সাথে মিশে রসাতলে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পেরে উভয়ই চিন্তিত এবং ক্ষুব্ধ।

সেই ক্ষুব্ধ বাবা-মায়ের সামনে দিয়ে এতো রাতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘরে উঠা আর ছাঁদ থেকে লাফ দেওয়া দুটোই সমান। বাকি রইল অন্ত। এতোরাতে তিনজন মেয়ে বন্ধু নিয়ে বাসায় উঠলে তার মা যে পিঠে কয়টা ঝাঁড়ু ভাঙবে তারও কোনো ইয়াত্তা নেই। এখন যাবে তো যাবে কোথায়?টেনশনে ছয় জনেরই মাথায় হাত। এতোরাতে ছয়জন তরুন-

তরুনী মিলে রাস্তায় বসে থাকাও যায় না, পুলিশের ভয়। অবশেষে, সমস্যার সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হলো পূজা। পরিস্থিতি সামলানোর অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে এই মেয়ে। নম্রতাদের পরিস্থিতিটাও চট করেই সামলে নিল। বাসায় কিছু একটা বুঝিয়ে রঞ্জনের তিন বান্ধবীকে রাত কাটানোর জায়গা করে দিল তার নিজস্ব শোবার ঘরে।

রাত বলতে তখন এক-দুই ঘন্টা বাকি। ফ্রেশ হয়ে ঘুমুতে যেতে যেতে পূর্ব আকাশে লাল রঙ ফুটে উঠেছে। সারাদিনের ক্লান্তি বিছানায় যেতেই ডানা মেলল। চোখে ভর করল রাজ্যের ঘুম। সেই ঘুম যখন ছুটল তখন বেলা হয়েছে প্রচুর। ঘড়িতে নয়টা কি দশটা বাজে। তাদের উঠে বসতে দেখেই অস্থির ভঙ্গিতে বলে উঠল পূজা,‘ তোমরা উঠেছ? ঠাকুর

রক্ষা করল তবে। রঞ্জন ফোন দিতে দিতে অস্থির করে ফেলছে। তোমাদের নাকি সাড়ে দশটায় সিটি আছে?’

ক্লাস টেস্টের কথা শুনতেই স্প্রিং এর মতো উঠে দাঁড়াল নম্রতা আর ছোঁয়া। নীরাকে লাথি-গুঁতো দিয়ে তুলে তাড়াহুড়ো করে ফ্রেশ হলো। পূজা তাদের খাবারটা শোবার ঘরের টেবিলে রাখতে রাখতে বলল,‘ রঞ্জন

আর নাদিম নিচে সিএনজি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তোমরা খাবে কখন? দশটা পনেরো বাজে।’

নম্রতাদের খাওয়া-দাওয়া আর হলো না। খাবার ফেলে রেখেই দৌঁড়ে নিচে নামল তারা। ওদের দেখেই গালির বহর ছুটল নাদিমের মুখে। কোন আলালের ঘরে দুলাল হয়েছে যে দশটা পর্যন্ত ঘুমোনো লাগে? এই সব মেয়েকে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন

দেওয়া উচিত। এদের যন্ত্রণায় এদের জামাইরা বাসর রাতেই হার্ট অ্যাটাক করবে। যুব সমাজ ধ্বংস হবে। এরা সর্বনাশা, ঝঞ্ঝাটময় মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি শুনেই চল্লিশ মিনিটের রাস্তা এক ঘন্টায় অতিক্রম করল তারা। অফিস টাইম। রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম। সিএনজি ছেড়ে নিজেদের ডিপার্টমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতেই এক ঘন্টার পরীক্ষার

পয়তাল্লিশ মিনিট শেষ। অন্তুকে ডিপার্টমেন্টের সামনে মাঠে বসে ঘাস চিবোতে দেখা গেল। ক্লান্ত বন্ধুদের ছুটে আসতে দেখেই চমৎকার হাসি উপহার দিল সে। মুখের সামনে আঙ্গুল মেলে দিয়ে বলল,‘ আট নাম্বার পানিশমেন্টের জন্য তৈরি হও মামা। স্যারের কাছে টাইম চাইবা আর পানিশমেন্ট খাইবা।’

রঞ্জন ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ শালা! তুই পরীক্ষা না দিয়ে এখানে বসে আছিস কেন?’

অন্তু হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক গাল হেসে বলল,

‘ একা পরীক্ষা দিয়ে মজা আছে নাকি মামা? পরীক্ষা, পানিশমেন্ট সব বন্ধুদের নিয়ে করতে হয়। পরীক্ষা তো হলোই না। তার থেকে বরং পানিশমেন্টটাই খাওয়া যাক। এই

চশমারে দিয়া এসাইনমেন্ট করাব সব।’সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠল। পরীক্ষার চিন্তা মুহূর্তেই মাথা থেকে উবে গেল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে ক্লাস রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তারা। অত্যন্ত ইনোসেন্ট মুখে একশো একটা বাহানাও শুনাল। শক্ত স্যার গললেন না। ছয়জনকে আলাদা পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সাথে

সাথে এই তিনবছরের আট নাম্বার পানিশমেন্টটা দিয়েই দিলেন। টপিক ‘ম্যান্টাল সিকনেস’। হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রতিদিন গড়ে কতজন মানসিক অসুস্থতায় শিকার রোগীর সাথে ডিল করেন তার এক সাধারণ জরিপ। নম্রতাদের কাজ হলো দু’জন দু’জন করে গ্রুপ তৈরি করে মোট ছয়জন ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং এই বিষয়ে তাদের মতামত

জেনে এসাইনমেন্ট তৈরি করা। স্যার ভীষণ উৎসাহ নিয়ে তাদের ছয় জনকে তিনটি দলে ভাগ করে দিলেন। কে, কোন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবে তার নাম, ঠিকানাও ধরিয়ে দিলেন হাতে। স্যারের রুম থেকে বেরিয়ে এসেই ক্লান্ত কণ্ঠে বলে উঠল ছোঁয়া,‘ এটা কিন্তু স্যারের কাজ ছিল। স্যার

সবসময় আমাদের ব্ল্যাকমেইল করে নিজের কাজ আদায় করে নেয়।’

নাদিম এই প্রথম ছোঁয়ার কথার সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করল। বিরসমুখে বলল,

‘ এই ফাউলডা অতিশীঘ্রই টাক হবে দেখিস। শালার আবার সুন্দরী একটা বউ আছে। আমি বুঝি না এই খাইচ্চরডারে কি দেইখ্যা বিয়া করল এই সুন্দরী? তার থেকে আমাকে

বিয়া করলেও পারত। আমি না করতাম না। ব্যাটারে বদদোয়া, বউ ভাগবো হালার।'

নাদিমের কথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল অন্ত,
' নমু? দোস্ত? তোর তো ফাটবে রে।'

নম্রতা কপাল কুঁচকে বলল,' মানে?'

‘ তোকে দেওয়া নাম দুটির মধ্যে একটা ডক্টর আরফান আলমের নাম।’

নম্রতা-নীরা বিষয়টা ধরতে না পেরে বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ তো?’

নাদিম হু হা করে হেসে উঠে বলল,‘ চিনতাছো না মামা? এটা কোনো সাধারণ আরফান না বইন। এইটা লঞ্চের ধাক্কা আরফান।’

নাদিমের কথায় বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নম্রতার। নীরার সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই আক্রোশ নিয়ে বলল,

‘ তুই একা যা। আমি যাবো না।’

নীরা অসহায় চোখে বন্ধুদের দিকে তাকাল। বন্ধুদের ঠোঁটে তখন চাপা হাসির রেখা।‘ তোর কি মনে হয়? এতোকিছুর পরও ওই ফাজিলটাকে রিকুয়েষ্ট করবো আমি? ইম্পসিবল!’

নীরা ভ্রু কুঁচকে তাকাল। বিরক্ততে চোখ-মুখ কুঁচকে বলল,

‘ দরকারটা আমাদের নমু। তাই রিকুয়েষ্টটা আমাদেরই করতে হবে। এতো ইগো দেখালে কি চলে বল?’

নীরার কথায় রাগে গা জ্বলে উঠল নম্রতা। চোখের আগুনে নীরাকে ঝলসে দেওয়ার চেষ্টা করে বলল,

‘ ইগো? আমি ইগো দেখাচ্ছি? এটাকে ইগো নয় সেল্ফরেসপেক্ট

বলে। মানুষের মিনিমাম সেল্ফরেসপেক্ট থাকা উচিত। আর আমার তা আছে। সো,আমি যাচ্ছি না। ব্যস!’

নীরা অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল,‘ প্লিজ দোস্ত। দু’মিনিটের জন্য “সেল্ফরেসপেক্ট” ওয়ার্ডটা ভুলে যা। কাজটা হয়ে গেলে আবার মনে করে নিস। আপাতত এসাইনমেন্টটা

কমপ্লিট করতে হবে। নয়তো... শেষ! এক্কেবারে ফেইল। প্লিজ দোস্ত!’

নম্রতা স্পষ্ট গলায় বলল,

‘ ফেইল হলে ফেইল তবুও ওই ব্যাটার কাছে যাবো না আমি। সামান্য একটা ডাক্তার হয়ে আকাশ ছোঁয়া ভাব। উনাকে দেখে কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, এই দুনিয়ায় সেই একমাত্র ডাক্তার আর কোনো

ডাক্তার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নি আর করবেও না। ব্যাটা, বেয়াদব!’

নীরা নম্রতা থেকে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়াল। আড়চোখে নম্রতার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ নতুন ডাক্তার তো তাই। মেডিক্যালের লেকচারারদের ভাব দেখানোটা স্বাভাবিক। তারওপর তুই যা করেছিস।’

নাক ফুলিয়ে নীরার দিকে তাকাল নম্রতা। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, ‘ আমি করেছি? কি করেছি আমি? বল কি করেছি? এখন তো সব দোষ আমাকেই দিবি। তুই আমার ফ্রেন্ড নামে কলঙ্ক। এই মুহূর্তে ওই ব্যাটার চামচার খাতায় নাম লিখা গিয়ে যা।’ নীরা মুখ কালো করে বলল,‘ ধুর! শুধু শুধু বাজে বকছিস নমু। চল না প্লিজ। পরশো এসাইনমেন্ট জমা

দিতে হবে। না দিলে এক ইয়ার লস। আশরাফুল স্যারকে তো চিনিস। ব্যাটা কেমন স্ট্রিক্ট! এসাইনমেন্ট জমা না দিলে শুধু এফ গ্রেড না এর থেকেও বেইজ্জতের কিছু থাকলে তাই দিয়ে দিবে। তারপর মিলাদের গা জ্বলানো কথা। আমাদের ইমেজের প্রশ্ন চলে আসছে দোস্ত। বাসায়ও বাঁশ খেতে হবে। প্লিজ নমু , রাজি হয়ে যা না। প্লিজ,

প্লিজ। বিপদে পড়লে কি এতো ভাবলে চলে?’

নম্রতা জোরে একটা শ্বাস টেনে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। হসপিটালের দিকে চোখ রেখে খানিক ভেবে বলল,

‘ বেশ! চল। কিন্তু ওই ফাজিলটার সাথে একটা কথাও বলবো না আমি। যা বলার তুই বলবি। ওকে?’

নীরা খুশি হয়ে বলল,‘ ওকে,ওকে।’

নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও হসপিটালের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল নম্রতা আর নীরা। ডক্টরের চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়াতেই তার এসিস্ট্যান্টকে ডেকে জিগ্যেস করল নীরা,

‘ এক্সকিউজ মি? ডক্টর.আরফান চেম্বারে আছেন?’

এসিস্ট্যান্ট মাথা নাড়লো। অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল,

‘ জ্বি না। স্যার, ক্লাসে আছেন। দুটোয় ক্লাস শেষ হবে।’এসিস্ট্যান্টের কথা শুনে চোখ কপালে উঠল নম্রতার। কী বলছে এসব? দুটোই ক্লাস শেষ হবে? অথচ, এখন বাজছে মাত্র সাড়ে বারো। নম্রতা কপাল কুঁচকে নীরার দিকে তাকাল। নীরাও অসহায় হরিণীর মতো মুখ করে চেয়ে রইল। আবারও এক দফা রাগ গিয়ে পড়ল ওই মানুষটির উপর।

ব্যাটা সবসময় কোনো না কোনো ঝামেলা পাকায়। সৃষ্টিকর্তা হয়তো এই লোকটিকে ঝামেলার ফুল প্যাকেজ হিসেবেই এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সাথে আস্ত বেয়াদবও বানিয়েছেন। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে করিডোরের চেয়ারে গিয়ে বসল নম্রতা। নীরা মুখ ফুলিয়ে নম্রতার দিকে তাকাল। নম্রতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,‘ এই ব্যাটা ইচ্ছে করে

এমন করছে। কোনো ক্লাস ফাস নাই বুঝলি? আমাদের পেরেশানি বাড়ানোর সূক্ষ্ম চেষ্টা চালাচ্ছে খাটাসটা। দেড়টা থেকে যে আলামিন স্যারের ক্লাস, মনে আছে তোর? মাসে একটা মাত্র ক্লাস নেয় স্যার। ক্লাসটা টু মাচ ইম্পোর্টেন্ট।'

নম্রতার কথায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল নীরা। পাশের চেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়ে বলল,

‘ মনে আছে কিন্তু এটাও তো ইম্পোর্টেন্ট দোস্ত। আজ ইনফরমেশন না পেলে একদিনের মাথায় তো এসাইনমেন্টটা শেষও করতে পারবো না। তারপর আবার ডক্টরের রিকমেন্ডেশন লাগবে। আজ কথা না বলে গেলে এরজন্যও ঘুরতে হবে আমাদের।’

রাগে চোখ-মুখ কুঁচকে খানিক শক্ত হয়ে বসে রইল নম্রতা। বিরবির

করে বলল,‘ আশরাফুল স্যার কেন যে এই ডাক্তারের কাছ থেকেই রিকমেন্ডেশন নিতে বললো আল্লাহ জানে। ঢাকায় কি আর কোনো ডাক্তার ছিলো না?’

নীরা দুঃখী দুঃখী কণ্ঠে বলল,

‘ স্টুডেন্টদেরকে স্যারের ইচ্ছেমতো ছয়জন ডক্টরের আন্ডারে ভাগ করে দিয়েছেন স্যার। এই টপিক সম্পর্কে হয়ত এই ছয়জন ডক্টরই ভালো

ধারনা দিতে পারবে। আর আমাদের ভাগ্যের দোষে এখানে এসে পড়েছি আমরা। তবে,দোষটা কিন্তু ডাক্তারের নয় তোর। লোকটার কতো অমায়িক ব্যবহার দেখেছিস?তুই যদি উনার সাথে ঝামেলা না করতি তো এতোটা পেরেশানি হতো না আমাদের। ‘

নম্রতা রাগী চোখে তাকাল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,‘ সেই! সব দোষ তো

আমারই। আসলে, দোষ নয় ভুল। আমার প্রথম ভুলটা হলো, সাইকোলজির মতো ফাউল একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করার ডিসিশন নেওয়া। আর দ্বিতীয় ভুল হলো, তোর মতো ডাফারকে বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে মেনে নেওয়ার ডিসিশন নেওয়া। ডাফার একটা! '

নীরা আর কথা বাড়ালো না। দীর্ঘ দেড় ঘন্টা পর ডক্টর.আরফান আলম

কেবিনে এসে ঢুকলেন। তারা দু-দুটো প্রাণী যে কেবিনের সামনে বসে আছে সেদিকে ভুলেও তাকালেন না। এমন একটা ভাব নিলেন যেন এই দুনিয়ায় কেবিনের দরজা আর উনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বস্তু নেই। ব্যাপারটা নম্রতার আত্মসম্মানে লাগল। দরজার উপর লেখা,

“ডাঃ আরফান আলম

এমবিবিএস, এমসিপিএস(মেডিসিন)
প্রভাষক
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ”দেখেই নেইম-প্লেটটা করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে বুড়িগঙ্গার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল থেকে প্রবল হয়ে উঠল নম্রতার। নিজের রাগটা যথারীতি নিয়ন্ত্রণ করে নীরার দিকে তাকাল।

নীরা ভাবাবেগ শূন্য গলায় আবারও এসিস্ট্যান্টকে ডাকল,

‘এক্সকিউজ মি? ডক্টর তো এসেছেন। উনাকে গিয়ে বলুন ভার্সিটি থেকে দু’জন স্টুডেন্ট এসেছে উনার সাথে দেখা করার জন্য।’

লোকটি চরম বিরক্তি নিয়ে ভেতরে গেলো। মুহূর্তেই ফিরে এসে বলল,‘স্যার মাত্রই ক্লাস নিয়ে

ফিরলেন। এখন লাঞ্চ করবেন। আগামী আধঘন্টা কারো সাথে দেখা করবেন না।'

নম্রতার রাগটা এবার আকাশ ছুঁলো। ক্ষেপে গিয়ে বলল,

' আশ্চর্য তো! দুটো মেয়ে সেই দুপুর থেকে ওয়েট করছে আর সে খাবার নিয়ে পড়ে আছে? পাঁচ মিনিট পর লাঞ্চ করলে কি মরে যাবে নাকি? লাঞ্চ তো আমরাও করি নি কই

আমরা তো তার মতো খাওয়ার জন্য মরে যাচ্ছি না। আজাইরা!’

নীরা নম্রতার ডানহাতটা শক্ত করে চেপে ধরে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল। চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলে জোরপূর্বক হেসে বলল,‘ ইট’স ওকে। আমরা অপেক্ষা করছি।’

ডক্টর.আরফানের এসিস্ট্যান্টকেও তার মতোই বেয়াদব বলেই মনে হলো নম্রতার। নম্রতাদের থাকা না

থাকা তার কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পেলো বলে মনে হলো না। নম্রতাদের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হেলতে দুলতে চলে গেলো। এসিস্ট্যান্টের এমন ব্যবহারে মেজাজটা আরো দু ডিগ্রি তেতে গেলো নম্রতার। নিজেদেরকে ফেলনা প্রাণীর মতো মনে হতে লাগলো। "ডক্টর" নামক শব্দটির উপরই একধরনের বিতৃষ্ণা জন্মাতে

লাগলো। মনটা কালো রঙের পর্দায় ঢেকে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে। সকাল সাতটাই ক্লাসের উদ্দেশ্যে হল থেকে বেরিয়েছিল দু'জনে। ক্লাস শেষ করে দু'ঘন্টা যাবৎ অপেক্ষা করে চলেছে শুধুমাত্র পাঁচ মিনিট সময় পাওয়ার অপেক্ষায়। অথচ সেই পাঁচ মিনিটের জন্যও দেখা দিতে পারছেন না ডক্টর.আরফান আলম। তার প্রতি বিদ্বেষটা নম্রতার

নতুন নয় তবে আজ যেন তা প্রকাশ পাচ্ছে এক নতুন রূপে। ঘড়ি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে আরো আধাঘন্টা পাড় করল নম্রতারা। ক্ষুধা আর বিরক্তিতে শরীর মিইয়ে পড়ছে প্রায়। এমন সময় তার এসিস্ট্যান্ট এসে বলল,' এখন রোগী দেখার সময়। আপাতত বাড়তি মানুষের সাথে দেখা করা সম্ভব নয়। বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত

রোগী দেখেন না স্যার। হাসপাতালেই থাকে না। পাঁচটা বাজতে মাত্র আড়াই ঘন্টা বাকি। এর মধ্যে রোগী দেখা শেষ করতে হবে। রাউন্ডেও যেতে হবে। আপনারা সাড়ে সাতটার দিকে দেখা করতে পারবেন। আপনারা অপেক্ষা করতে পারেন। নয়তো চলে যেতে পারেন।’

এটুকু শোনার পর মেজাজটা ঠিক রাখা একবারেই দুষ্কর হয়ে উঠল। আরে বাবা, দেখা না করতে চাইলে আগে বললেই হতো এভাবে ভোগান্তিতে ফেলার মানেটা কি? কি মনে করে সে নিজেকে? প্রিন্স চার্মিং? নাকি মহাজান্তা? দেখতে তো আস্তা হনুমান আর গুণে আস্ত একটা বেয়াদব।

‘ দেখেছিস? লোকটা কেমন ঠান্ডা মাথায় বদলা নিচ্ছে। সেদিন এতোকিছুর পরও উচ্চবাচ্য করেননি। আজও না। চুপচাপ থেকে তার থেকেও বেশি নাচিয়ে ছেড়ে দিলেন।’

নম্রতা বিরক্ত কন্ঠে বলল,‘ তুই কি এখানে ওই লোকের প্রসংশা করার জন্য বসে আছিস? ব্যাটা পাঁচটা থেকে সাতটা পার্সোনাল টাইম

স্পেন্ড করে। ওই সময়টুকু থেকে পাঁচ মিনিটও আমাদের দেওয়া যেত না? সেই বারোটা থেকে বসে আছি। ন্যূনতম মানবিকতাটা থাকা উচিত।'

নীরা ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ' তো? কী করবি এখন? সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি?'

' সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হলে ফিরব কখন? আর সাড়ে সাতটায় যে এই ভদ্রলোক আমাদের

সাথে দেখা করতে রাজি হবেন তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? মাঝে থেকে হলের ম্যামের কাছে পানিশমেন্ট খেয়ে বসে থাকব।’

দ্বিধাদ্বন্দ নিয়ে আরও আধ ঘন্টা মতো বসে রইল তারা। তারপর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। আরফান নিয়মমাফিক রোগী দেখে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল পাঁচটায়। সন্ধ্যা পেরিয়ে

ঠিক সাতটায় আবারও হাসপাতালে ঢুকল সে। নীরা ঘড়ি দেখে বিরবির করে বলল,

‘ বেশ পানচুয়াল।’নম্রতা রাগী চোখে তাকাতেই চুপ হয়ে গেল নীরা। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত নীরা-নম্রতার ডাক পড়ল রাত আটটা কুড়ি মিনিটে। হিমশীতল কেবিনে বসে থাকা আরফান তার থেকেও হিমশীতল কণ্ঠে বললেন,

‘ বসুন।’

নীরা, নম্রতা চেয়ার টেনে বসল। দুজনেই ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত। চুল উসকো-খুসকো , এলোমেলো। আরফান সেসব কিছু পাত্তা না দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ আপনারা হয়ত সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন। স্যারের মেইল পেয়েছি আমি। অপেক্ষা করানোর জন্য দুঃখিত। বলুন,

কিভাবে সাহায্য করতে পারি।’নম্রতা অত্যন্ত ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। এই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ-ই তার ঝামেলাপূর্ণ। শুধুমাত্র এই ব্যক্তির জন্য নতুন করে হারানোর কষ্টে কাঁদতে হয় তাকে। তার ওপর আজকের এই ভোগান্তি! নম্রতাকে চুপ থাকতে দেখে। নীরাই আলোচনা এগিয়ে নিল। সবরকম তথ্য নিয়ে আলোচনা শেষ করতে করতে

ঘড়িতে সাড়ে নয়টার ঘন্টা বাজল। আরফানকে ধন্যবাদ দিয়ে অনেকটা দৌড়েই কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো তারা। আরফান তাদেরকে গাঢ় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। নম্রতার ঘৃণাভরা দৃষ্টিটা কি চোখে পড়েছিল তবে? নম্রতারা হলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দশটা বাজল। যথারীতি তাদের ঢুকতে দেওয়া হলো না। গেইটের দারোয়ানকে টাকা খাইয়েও

ভেতরে ঢুকার সুযোগ হলো না। শেষমেশ বাধ্য হয়েই সাড়ে দশটার দিকে ধানমন্ডিতে নিজের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হলো তাদের। সিএনজি খুঁজতে খুঁজতে ভারি রাগ নিয়ে বলল নম্রতা,‘ এতো রাতে একা কোথায় গিয়েছি আমরা? বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে এগারোটার বেশি বাজবে। রাস্তাঘাটে কোনো দূর্ঘটনা হলে? সব দোষ এই

ডাক্তারের। এই লোকটাকে আমার সহ্যই হচ্ছে না। বেয়াদব!’

নীরা জবাব দিল না। নম্রতা তেজ নিয়ে বলল,

‘ কী হলো? বোবা বনে গেলি কেন হঠাৎ?’

নীরা শূন্য দৃষ্টিতে নম্রতার দিকে তাকাল। কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলল,

‘ আমরা তো একটা ভুল করে ফেললাম নমু।’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে বলল,‘ কী ভুল?’

‘ ওই লেকচারার, আই মিন নিষাদ নামক ছেলেটা তো ডক্টর আরফানের বন্ধু। আমরা উনার থেকে নিষাদের ঠিকানা নিতে পারতাম। ওই সময়ে মনেই ছিল না।’

নম্রতার মুখে কালো ছায়া দেখা গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? পরশু তো আমরা আবারও আসছি। তখন টেকনিক্যালি জিগ্যেস করলেই হবে। ব্যাটাকে একবার পেয়ে গেলে বুঝাব মজা।’

নম্রতা ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ করেই আবিষ্কার করল মনটা

ভালো নেই তার। সব মিলিয়ে নিজের উপরই ভীষণ বিরক্ত সে। এই অসহ্যকর জীবনটা আর এক দন্ডও ভালো লাগছে না তার। সেই 'সে' কে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত সে। ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। আর কত সহ্য করে যায় এই বিষাদ?কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছে। সপ্তাহের তীব্র গরম ধুয়েমুছে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে প্রকৃতি।

ধুলোবালিতে ঢেকে থাকা শহরের গা জুড়ে স্নান শেষের স্নিগ্ধতা আর মায়া। গাছের পাতাগুলো হয়ে উঠেছে উচ্ছল সবুজ। লেকের টলটলে পানিতে প্রাণ এসেছে। পানির ওপর ভেসে আছে দু'একটা কৃষ্ণচূড়ার পাঁপড়ি। লেকের দক্ষিণ দিকের ব্রেঞ্চটাতে পায়ের জুতো জুড়া রেখে তারওপর বসে আছে নাদিম। মাথার উপর থাকা বিশাল

কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা চুইয়ে পড়ছে জল। হেলে পড়া সূর্যের কিরণে সেই জলে মোহনীয় এক রং লেগেছে। স্নিগ্ধ কমলা রং।অন্তু, রঞ্জু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সামিয়ানা দেওয়া দোকানগুলো থেকে পলিথিন জোগার করে এনেছে। ভেজা ব্রেঞ্চে পলিথিন রেখে তারওপর সংকুচিতভাবে বসে আছে। নীরা ব্রেঞ্চের গায়ে ঠেস দিয়ে নখ কামড়াচ্ছে। কড়া সবুজ রঙের

জামাতে গায়ের রং-টা ফুটে উঠেছে তার। সেই রঙের মাঝে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে অপর একজনের চোরা দৃষ্টি। ছোঁয়া কৃষ্ণচূড়া গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে তার গাঢ় নীল ফতুয়া আর জিন্স। চশমাটা ফতুয়ার গলায় ঝুলছে। বিরক্ত দৃষ্টি লেকের পাশের কাঁদা আর জমে থাকা ঘোলাটে পানির ওপর ঘুরাফেরা করছে। বন্ধুদের এই

উৎকট পছন্দে রীতিমতো বিরক্ত সে। নম্রতা ব্রেঞ্চের সামনে দ্রুতপায়ে পায়চারী করছে। সবার দৃষ্টি নম্রতার চলার সাথে সাথে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে। এক মুঠো মাখা চানাচুর মুখে পুড়ে নিয়ে ধমকে উঠল নাদিম। চানাচুর চিবোতে চিবোতে বলল,‘ ওই হারামি? এমনে লাগাইছত ক্যান? মাথা চক্কর মারতাছে। এক জায়গায় খাঁড়া বাল।’

ছোঁয়ার বিরক্তি আরও খানিকটা বাড়ল। নাক কুঁচকে বলল,

‘ খাবার মুখে দিয়ে কথা বলিস কেন? ছিঃ। আর কথাবার্তাগুলো একটু ভদ্রভাবে বলা যায় না? খ্যাত!’

নাদিম দাঁত কিরমির করে বলল,

‘ শালার... ‘

অন্তু গালে হাত দিয়ে বসেছিল। গাল থেকে হাত সরিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে বলল,

‘ দয়া করে আবার ঝগড়া টগড়া শুরু করিস না তোরা। সন্ধ্যা নেমে যাবে একটু পরেই। আগে ঝামেলাটা মিটিয়ে নিই তারপর যত ইচ্ছে ঝগড়া করিস। প্যারা নাই।’

নাদিম হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গিমা করে বলল,

‘ কাগজের লেখাটা ফ্লুইড দিয়ে মুছিয়ে ফেললেই হয়।’

নম্রতা জ্বলে উঠে বলল,‘ তোর মাথা হয়। আশরাফ স্যারকে চিনোস না? ব্যাটা ঠিকই বুঝবে।’

নাদিম আবারও দূর্দান্ত এক বুদ্ধি দিল,

‘ উপরের পাতাটা খুইলা ফালাইয়া দিয়া নতুন পৃষ্ঠা লাগাইয়া দে। টাক্কু ব্যাটায় বুঝব না।’

অন্তু ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ তাতেই বা কি? সেখানে আরফান আলমের রেফারেন্স তো লাগবেই। ওটা আনার জন্য হলেও চেম্বারে আবার যেতেই হবে।’

নম্রতা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল,

‘ ওই অসভ্য লোকের কাছে আমি যাবোই না আর। ন্যূনতম মানবতা নেই লোকের। বেয়াদব একটা। অসহ্য! এই লোককে ডাক্তার কে বানাইছে? আল্লাহ যদি একটা খুন

মাফ করত, কসম আমি এই লোকরে খুন করতাম। উফ! উফ!” অলওয়েজ চিরিং বিরিং করে লাফালে এমনই হয়। কি দরকার ছিল এতো চপর চপর করার? যার লাঠি তারই মাটি, বুঝছিস? একটু চুপচাপ থেকে সাইনটা নিয়ে এলেই পারতি। ওই দুই মিনিট তোর মুখ বন্ধ থাকল না?’

রঞ্জনের কথার পিঠে বেশ সাবধানী কণ্ঠে বলল নীরা,

‘ ব্যাটা কিন্তু খুব খারাপ না। আমার এসাইনমেন্টে কিন্তু কোনো গন্ডগোল করেনি। চুপচাপ সাইন দিয়ে দিয়েছে।’

নীরার কথায় তেড়ে এলো নম্রতা। চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ ওই হারামি! তুই আবার ওই ব্যাটার চামচাগিরি করতাছিস? দ্যাখ,

তুই যদি ওই ব্যাটাকে পটাইয়া বিয়েশাদী করার চিন্তায় থাকিস তাহলে তোর বিয়েতে আমরা একটাও যাব না। এতো মাখন ভালো না।’

নম্রতার শেষ দুটো বাক্যে চোখ বড়বড় করে তাকাল অন্ত। বিদ্বেষ নিয়ে বলল,

‘ মানে? ওই ব্যাটার সাথে এই পাগলা ঘন্টীর কিছু চলে নাকি?’

‘ তা নয়তো কি? সেইদিন থেকে তো আর এমনি এমনি গুণ গেয়ে বেড়াচ্ছে না। অতকিছুর পরও কেউ গুণ গায়?’

অন্তর শ্যামলা মুখটা কালো হয়ে গেল। গা জ্বলানো কণ্ঠে বলল,

‘ ওহহো, পরিষ্কার গায়ের রং দেখেই পটে গিয়েছে। দোস্ত তুই তো ভালোই টুপ ফেলছিস। ডাক্তার

ফাক্তারদের বহুত টাকা।'নীরা আগুন দৃষ্টিতে তাকাল। তপ্ত কণ্ঠে বলল,

' খবরদার উলটো পালটা কথা বলবি না অন্তু। তোর কথা শুনেই বুঝা যায় তোর মন কত কালো।'

' সেই! কালো হবে না কেন? আমিও কালো, আমার মনও কালো। তোদের মত ধলাদের সাথে আমার যায় নাকি?'

' কথাটাকে আমি ওভাবে বলিনি।'

‘ আমি বুঝে নিয়েছি। বুঝানোর জন্য ধন্যবাদ।’

ওদের কথাবার্তার ধরনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সবাই। ছোঁয়া দাঁতে নখ কাটতে কাটতে ভীত চোখে চেয়ে রইল। নাদিম মুখ পুড়ে চেনাচুর নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকাল। নম্রতাকে কড়া চাহনি দিয়ে বলল,

‘ গ্যাঞ্জাম লাগাই দিছত হারামি।’নম্রতা কপাল কুঁচকে

তাকিয়ে ছিল। নাদিমের কথায় ফুঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। আবারও সব রাগ গিয়ে পড়ল আরফানের উপর। ওই বেয়াদব লোকটার জন্যই তো এমনটা হলো। এই একটা লোকেই নম্রতার জীবনটাকে ছারখার করে ছেড়ে দিল। সারারাত জেগে এসাইনমেন্ট করে ঘুমু ঘুমু চোখ নিয়ে ক্লাস করেছে নম্রতা, নীরা। টানা দুটো ক্লাস শেষ করে, খাওয়া-

দাওয়া বাদ দিয়ে আরফানের চেম্বারে গিয়েছে একটা সাইনের প্রয়োজনে। আরফান আজ প্রথমেই কোনো গন্ডগোল করেনি। আধঘন্টা-একঘন্টা পরই চেম্বারে ডেকেছিল তাদের। সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু বিপত্তি বাঁধল অন্য জায়গায়। মনে মনে নিরন্তর বলে চলা গালিগালাজের একটা দুটো হুট করেই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এলো

নম্রতার মুখ থেকে। নীরা অবাক দৃষ্টিতে নম্রতার দিকে তাকাল। আরফানের সচেতন কানে তা বোধহয় হাতুড়ি পেটা করে গেল। কপাল কুঁচকে সামনে বসা তরুণী দু'জনের দিকে তাকাল। একদম ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল,'আপনাদের এসাইনমেন্টগুলো দিন। কোথায় সাইন করতে হবে?'

নম্রতা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে ছিল। আরফানের স্বাভাবিক কণ্ঠে খানিকটা স্বস্তিই পেল। তবে কি লোকটি গালিদুটো শুনেনি? ইয়া মাবুদ! তোমার হাজার হাজার শুকরিয়া। আরফান খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাইন করে ফাইলদুটো ফিরিয়ে দিল। নীরা নিজের এসাইনমেন্টটা দেখে নিয়ে স্মিত হেসে ধন্যবাদ জানাল। অপরদিকে নম্রতার মাথায়

হাত। তার এসাইনমেন্টে লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা,
‘ Not as expected. There is some lack. Need to improve. ’ তার নিচে ইংরেজিতে সাক্ষর। নম্রতা লেখাটা দেখে বিস্ফারিত চোখে আরফানের দিকে তাকাল। আরফান অত্যন্ত ভদ্র কণ্ঠে বলল,
‘ আপনারা কিছু মনে না করলে, এবার আসতে পারেন। বাইরে

বেশকিছু প্যাশেন্ট ওয়েট করছে। দুটোয় ক্লাস। তাদেরকে সময় দেওয়া জরুরী।'নীরা আর নম্রতা বোবা চাহনী নিয়ে বেরিয়ে এলো। চেম্বার থেকে বেরিয়েই নম্রতা রণচণ্ডী রূপ ধারণ করল। তবে নীরা ভাবলেশহীন। তার মতে, আরফান ভুল কিছু করেনি। নিজের চেম্বারে বসে, মুখের ওপর কেউ গালি দিলে দুনিয়ার কেউই নেচে নেচে সাহায্য

করতে আসবে না। আরফান যে তাদের চেম্বার থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়নি এটাই তো ভাগ্য। সেই থেকে এখন পর্যন্ত নম্রতার ক্যাচ ক্যাচ খ্যাচ খ্যাচ চলছে। শাহবাগ থেকে রমনা পার্ক পর্যন্ত সে নিরন্তর গালাগাল করে এসেছে। শাহাবাগ মোড় থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাদিম। কিছু না-জেনে, না-শুনেই ভয়ানক সব গালি দিয়ে

বন্ধুদের কান ঝালাপালা করে ফেলেছে। নাদিমের গালির তোড়ে এক পর্যায়ে হার মানতে হয়েছে নম্রতাকে। বাকি বন্ধুদের মতো তাকেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইয়ারফোন কানে দিয়ে ফুল সাউন্ডে গান শুনতে হয়েছে। নাদিমের হৈচৈ- এ বর্তমানে ফিরল নম্রতা। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে নাদিমের দিকে তাকাতেই উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে উঠল সে,‘ ধুরু! এই

মাইয়া গো কথা মাইন্ডে নিতে হয় নাকি দোস্ত? বাদ দে তো। চল, আইজ আবার বাজি লাগুক।’

অন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে বলল,

‘ আমি যার-তার কথা মনে রাখি না দোস্ত। চল। লেটস্ প্লে। যে হারবে আজকের রাতে খাওয়ার বিল হবে তার।’

অন্তুর প্রথম কথাটা তীরের মতো গিয়ে বিঁধল নীরার বুকে। মুহূর্তেই ভার হয়ে গেল মন। নাদিম ভাব নিয়ে বলল,

‘ ব্যাপারই না। আইজ আমি আর তুই। রঞ্জন বাদ।’

রঞ্জন বাঁকা হেসে বলল,

‘ তোরা কখনই আমার সাথে জিততে পারিস না।’

নাদিম রঞ্জনের কথায় পাত্তা না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জুতো জুড়া পরে নিয়ে টি-শার্ট আর চুল ঠিক করল। গিটারটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে অন্তুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল,‘ মাম্মা দুইটা। ‘

অন্তু চমৎকার হাসল। তার হাসি দেখে আফসোসের হাসি হাসল নাদিম। বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল,

‘ তুমি মামা হাসি মাইরাই মেয়ে পটায় ফেলো। হাসবি না খবরদার।’

নাদিমের কথায় হুহা করে হেসে উঠল অন্তু। নাদিম হলুদ রঙের জামা গায়ে একটি মেয়েকে ইশারা করে বলল,

‘ দোস্ত, তুই আগে। ওই মাইয়াটা।’

অন্তু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল। হেসে একবার বন্ধুদের দিকে তাকাল। বুকে ফু দিয়ে নিয়ে বলল,

‘ জুতা পেটা না খাই। আল্লাহ বাঁচাইও।’নাদিম এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজল। তারপর হাতের ইশারায় ডাক দিতেই দৌঁড়ে এলো দশ এগারো বছরের একটি বাচ্চা। গোলাপী, ময়লা একটি জামা গায়ে। খালি পা। ময়লা, পিংলে চুলগুলো ঝুঁটি বাঁধা। হাতের নীল মগে গোলাপ আর বিভিন্ন ফুল। নাদিম খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল,

‘ তোর কাছে আজ কয়টা ফুল আছে রে সুমাইয়া?’
সুমাইয়া উল্টাপাল্টা গুণে নিয়ে আন্দাজি বলল,
‘ পঞ্চাইশটা।’‘ আচ্ছা। পঞ্চাশটা থেকে চারটা ফুল আমায় দে। ওই আপুগুলো যদি পটে যায় তাহলে তোকে প্রতি ফুলের জন্য ডাবল টাকা দেওয়া হবে। আর যদি না পটে জুতো দিয়ে দৌঁড়ানি দেয়

তাহলে টাকা পয়সা পাবি না। ওই টাকা দিয়ে ঔষধ কেনা লাগব। জুতোর বাড়ি খেলে ঔষধ লাগাতে হবে। বুঝছিস?’

সুমাইয়া খুশিতে ঝুমঝুম করে উঠল। এই ভাইয়া-আপুর দলটাকে ভীষণ ভালো লাগে তার। এরা কখনোই তাকে বকে না, ধমকায় না। ঘেন্নাও করে না। পাশে বসতে দেয়। যাওয়ার সময় প্রতিবারই এতোগুলো

ঝালমুড়ি আর টাকা দেয়। সুমাইয়ার থেকে একটা গোলাপ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল অন্তু। বন্ধুরা চাপা উত্তেজনা নিয়ে অন্তুর দিকে তাকিয়ে রইল। সুমাইয়ারও উৎসাহের শেষ নেই। এই ভাইয়ারা প্রায় প্রায়ই এমন খেলা খেলে। খেলা শেষে সবাই যখন দৌঁড়ে পালায় তখন সুমাইয়াকেও দৌঁড়াতে হয়। সুমাইয়ার ভালোই লাগে। ওই সুন্দর

দেখতে আপুগুলো যখন খিলখিল হাসে কি সুন্দর দেখায় তাদের মুখ! এদের গা থেকে ভুরভুর করে সুন্দর গন্ধ বেরোয়। ফুলের থেকেও সুন্দর গন্ধ। কি ভালোই না লাগে সেই গন্ধ!ঘড়ির কাটা বারো বাজতে চলল। টেবিলে বসে ফোনের উপর ঝুঁকে আছে নম্রতা। অলস ভঙ্গিতে ফেসবুক স্ক্রল করছে। একটু আগেই এসাইনমেন্ট শেষ করেছে সে।

সেইসাথে এক ঝাঁক চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে মাথায়। কাল বারোটায় এসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। ওই বেয়াদব লোকটা যদি এগারোটার আগে সাইন না দেয় তবে কি করে চলবে? চিন্তায় মাথা ভনভন করছে নম্রতার। নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল, তার কান্না পাচ্ছে। তার ডায়েরি, তার

ভালোবাসার মানুষটির স্মৃতিগুলো বুকের ভেতর তীব্র যন্ত্রণা তৈরি করছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, ডায়েরি হারানোর পেছনে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী লোকটির কাছেই হার মানতে হচ্ছে নম্রতাকে। আচ্ছা? সত্যিই কি ওই বেয়াদব লোকটার বন্ধুই তার ‘সে’? তাই যদি হয় তাহলে নম্রতার কোনো খোঁজ-খবর নেয় না কেন সে? সে কি নম্রতাকে

মিস করে না? নম্রতার যেমন হঠাৎ করেই নিজেকে পাগল পাগল লাগে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তার হয় না? আচ্ছা? মানুষটার কি বিয়ে হয়ে গিয়েছে? সিনেমা, নাটকের মতো ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে পরিবার? এটাই কি তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রধান কারণ? নাকি সবকিছুই ছিল সাজানো, সুন্দর কোনো নাটক? নম্রতা আর ভাবতে

পারে না। অবচেতন মন ফেসবুকে ‘আরফান আলম’ নাম সার্চ দিয়ে বেড়ায়। বাংলা ফন্টে না পেয়ে ইংরেজিতে খুঁজে। আবার বাংলায় খুঁজে। অবশেষে পেয়ে যায় সেই প্রত্যাশিত আইডি। আইডি পেয়েই চট করে প্রোফাইলে ঢুকে গেল নম্রতা।পুরো প্রোফাইল ঘেঁটেও আহামরি কিছু পাওয়া গেল না। খুবই সাধারণ একটি প্রোফাইল।

বছর আগের পাঁচ-দশটা পোস্ট আর তাতে শ'খানেক রিয়েক্ট। প্রোফাইল পিকচারে নান্দনিক পার্কে সাদা শার্ট গায়ে বসে থাকা রুচিসম্মত একটি ছবি। ছবির পেছনের দৃশ্য দেখে বোঝা যাচ্ছে ছবিটি বাংলাদেশে তোলা নয়। ব্যাটা কি বিদেশী নাকি? নম্রতা আরও কিছু ছবি দেখল। এর আগের প্রোফাইল পিকচারগুলোও বিদেশেই তোলা। নম্রতা ঠোঁট

উল্টাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে প্রোফাইল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর আবারও ঢুকল প্রোফাইলে। প্রচন্ড সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সে। নীরার সাথে আলোচনা করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আপাতত তা সম্ভব নয়। নীরার মনটা আজ ভীষণ খারাপ। তাকে এসব নিয়ে ঘাটানো চলবে না। নম্রতা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে ম্যাসেজ রিকুয়েষ্ট

পাঠাবে বলে ঠিক করল। অসহ্য লোকটি এখন অনলাইনে আছে। ম্যাসেজের রিপ্লাই দিলেও দিতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে। নিজের আত্মসম্মানকে বস্তাবন্দি করে ম্যাসেজ পাঠাল নম্রতা,‘ আসসালামু আলাইকুম ডক্টর আরফান আলম স্যার। আপনার সাথে একটু জরুরি কথা ছিল।’

ম্যাসেজটা দিয়ে উশখুশ করতে লাগল নম্রতা। দশ মিনিটের মাথাতেও যখন ম্যাসেজ সীন হলো না তখন তার উশখুশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেল। রাগে নিজের চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে তার। কি দরকার ছিল নক করার? যেচে পড়ে ফাউ এটিটিউট দেখার কোনো মানে হয়? পরক্ষণেই ভাবল, এছাড়া তো উপায়ও নেই। ব্যাটাকে না মানালে

দেখা যাবে বারোটার আগে ব্যাটার দেখায় পাওয়া যাবে না। আর নগদে এত বড় একটা শূন্য ঝুলে যাবে নম্রতার খাতায়। উত্তেজনা ধরে রাখতে না পেরে ফোন রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল নম্রতা। নীরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে ব্যস্ত। নম্রতা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ দোস্ত?’

নীরা না তাকিয়েই উত্তর দিল,

‘ হু।’

‘ অনেক বেশি মন খারাপ? ‘

নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ মন খারাপ কেন থাকবে? মন খারাপ না। ভাল্লাগছে না কিছু। সবকিছু অসহ্য লাগছে। গোটা জীবনটাকেই কেমন অসহ্য লাগছে।’

নম্রতা বেশ রয়ে সয়ে বলল,

‘ তুই অন্তকে পছন্দ করা সত্ত্বেও কেন মেনে নিচ্ছিস না, বল তো?’

নীরাকে বেশ অপ্রস্তুত দেখাল। থতমত খেয়ে বলল,

‘ আমি অন্তকে পছন্দ করি? কে বলল তোকে? আন্দাজি।’

‘ তুই কাকে, কতোটুকু পছন্দ করিস সেটা আমার অন্যকারো থেকে জানতে হবে? আমি বুঝি না?’

নীরা দৃঢ় কণ্ঠে বলল,‘ আমি অন্তুকে পছন্দ করি না।’

নম্রতা হেসে বলল,

‘ আমি নিজেও প্রেমে পড়েছি বইন। প্রেমে পড়ে প্রেমের স্বাদ একদম গুচিয়ে ফেলেছি। এমন জ্বলেপুড়ে যাওয়া প্রেমিকাকে তুই প্রেমের দৃষ্টি শেখাচ্ছিস? তোর চাহনী দেখেই বোঝা যায় তুই অন্তুর প্রতি দুর্বল। অন্তু বলদটাই শুধু বুঝে না।’

নীরা জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,

‘ তুই ভুল বুঝছিস।’

‘ ঢং না করে কারণটা বল। রাজি কেন হচ্ছিস না? অন্তু আমাদের নিজের বন্ধু। প্রথম থেকে চিনি ওকে। অসাধারণ একটি ছেলে। পড়াশোনাতেও ভালো। কর্মঠ ছেলে। গায়ের রং-টা একটু কালো হলেও দেখতে খারাপ না। তুই নিশ্চয় ওর

গায়ের রং নিয়ে নেগেটিভ জার্জ করছিস না?’

‘ কি সব বলছিস নমু? গায়ের রং আমার কাছে ম্যাটার করে না।’

‘ তাহলে?”‘ বাসায় মানবে না। বাসায় তো এখনই ছেলে দেখা হচ্ছে। বাসায় এখন জুটে গেলেই মিটে গেল টাইপ অবস্থা। তারওপর অন্ত আমার সেইম ব্যাচ। ওর স্যাটেল হতে আরও চার-পাঁচ বছর

চায়। আমার বা আমার পরিবারের অত সময় কোথায়? তাছাড়া, অন্তু আমার থেকে তিন-চারমাসের ছোট। বউয়ের থেকে বর ছোট? কথা উঠবেই।'

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,

' এটা কোনো ডিফারেন্স হলো? আর মাসের হিসাব কে করছে শুনি? স্যাটেল হওয়ার ব্যাপারটা একটু

চিন্তার হলেও আন্টিকে বললে নিশ্চয় সময় দেবে।’

নীরা হেসে ফেলল। ঠোঁটের কোণে বেদনাপূর্ণ হাসি ঝুলিয়ে বলল,‘ আমাদের সমাজের মানুষগুলো এইসব ছোটখাটো বিষয়গুলোকেও হিসাবের খাতা থেকে ঝেড়ে ফেলে না নমু। সমাজটা হিসেব-নিকেশে পাক্কা। কাউকে অপদস্ত করার হিসেব-পত্রে তাদের জুড়ি মেলা

ভার। আর মাও সময় দেবে না। ইরাও তো বড় হচ্ছে। ওকেও বিয়ে দিতে হবে। বাবাহীন গোটা পরিবারটা এখন ভাইয়ার ঘাড়ের ওপর পা রেখেই দাঁড়িয়ে আছে কোনোরকম। আর কত সহ্য করবে তারা? বড় মেয়ে হিসেবে বুঝে নেওয়ার দায়িত্বটা তো আমার। চাকরী-বাকরি কিছু করলে হয়ত বলতে পারতাম চাকরী করছি। কিন্তু

তাও তো নেই। অনার্সই শেষ হলো না এখনও।’

নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষের জীবন যে এতটা ক্রিটিক্যাল হতে পারে ভেবেই দেখেনি নম্রতা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল নম্রতা। খানিকবাদে ধীর কণ্ঠে বলল,‘ তাই বলে নিজের ভালোবাসাটা চেপে যাবি?’

‘ ধুর! ভালোবাসা কই? এটা শুধুই ভালোলাগা। এই ভালোলাগাটাকে সামলে উঠতে খুব বেশি কষ্ট হবে না। কিন্তু একবার যদি এগিয়ে যাই তাহলে দেখবি চারপাশের দুঃখগুলো চম্বুকের মতো আকঁড়ে ধরছে আমাদের। কি দরকার এত দুঃখের? তার থেকে এই ভালোলাগাটুকু আর সুপ্ত ভালোবাসাটুকু নিয়ে দূরে থাকাটাই ভালো। যে সম্পর্কের

কোনো ভবিষ্যতই নেই তাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন বুনে, কষ্ট বাড়িয়ে কি লাভ?’নম্রতা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। নিরুত্তর আকাশের দিকে চেয়ে রইল। পাশ থেকে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরা। কত কত অসহায়ত্ব সেই এক টুকরো দীর্ঘশ্বাসে! আচ্ছা? অন্তুও কি এভাবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে? নীরা তাকে ভালোবাসে না ভেবে কষ্ট

পায়? ইশ! ছেলেটা যদি জানত 'নীরা' নামের মেয়েটা তাকে কতই না ভালোবাসে। কিন্তু অন্তু বড় দুর্ভাগা। ভালোবাসার মানুষটির ভালোবাসার কথা জানার অধিকারও তার নেই। সব ভালোবাসা প্রকাশ করতেও নেই। কিছু কিছু ভালোবাসাকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে, বইয়ের ভাঁজে, মনের খাঁজেই লুকিয়ে থাকতে হয়। তাদের যে বড্ড ভয়।

দুঃখ পাবার ভয়! হারিয়ে গিয়ে, ভেঙে গুড়িয়ে যাবার ভয়!নীরার সাথে কথা বলে রাত একটার দিকে রুমে এলো নম্রতা। রুমে ফিরেই গায়ে চাদর দিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিল নীরা। নম্রতা ঘুমুবে ঘুমুবে করেও ফোনটা হাতে নিল। নোটিফিকেশনে আরফানের রিপ্লাই দেখা যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট আগে রিপ্লাই করেছে সে। নম্রতা এতোক্ষণ নীরা-অন্তুর চিন্তায়

আরফানের কথাটা ভুলে গেলেও এবার তাড়াহুড়ো করে ম্যাসেঞ্জারে উঁকি দিল। আরফান বাংলা ফন্টে খুব সুন্দরভাবে সালামের জবাব দিয়েছে। আর কিছু লিখেনি। নম্রতা বাধ্য হয়েই উত্তর দিল,

‘ কেমন আছেন?’

মিনিটখানেক পর উত্তর এলো,

‘ আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আপনি কে?’প্রশ্নটা শুনেই মেজাজ খারাপ

হয়ে গেল নম্রতার। আইডিতে এতো বড় বড় করে লেখা, ‘নম্রতা মাহমুদ’ তবুও চিনতে পারছে না? আজব! নম্রতা নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত করে লিখল,

‘ আমি নম্রতা মাহমুদ।’

‘ তা জানি। কিন্তু নম্রতা মাহমুদ নামে কাউকে মনে পড়ছে না, দুঃখিত।’

অপমানে সারা শরীর রি-রি করে উঠল নম্রতার। কিন্তু কি আর করার? ইটটি মারলে পাটকেলটি তো খেতেই হবে। নম্রতা এসাইনমেন্টে থাকা আরফানের সাইনসহ পেইজটির ছবি তুলে সেন্ট করল। নিচে লিখল,

‘ এই এসাইনমেন্টটি যার আমি সেই।’

‘ ওহ্। তো, কী চাই?’নম্রতার শরীরে যেন আগুন লেগে গেল। কি চাই, মানে? এটা কেমন ভদ্র ব্যবহার? ব্যাটা ফাজিল। আমি তোর মাথা চাই, দিবি মাথা? রাগে টগবগ করতে থাকা নম্রতা এবার আর রিপ্লাই দিল না। ব্লক অপশনে গিয়েও ফিরে এলো। মনে পড়ে গেল সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘ বিপদের সময় অপমান গায়ে মাখতে নেই।’

নম্রতারও এখন ভয়ানক বিপদ। কাল এগারোটার মধ্যে সাইন না পেলে সর্বনাশ। অতএব, এই রাগ, ক্ষোভকে পাত্তা দিলে চলবে না। আপাতত নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে বস্তাবন্দি রাখতে হবে। সাইনটা নেওয়ার পর নাহয় একে আচ্ছা এক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নম্রতা জোরে জোরে শ্বাস নিল। নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত

করার চেষ্টা করল। তারপর লিখল,‘ আসলে, আপনাকে সরি বলার ছিল। সকালের ব্যাপারটার জন্য আই এক্সট্রিমলি সরি স্যার।’

‘ স্যার? শালা থেকে ডিরেক্ট স্যার? গুড ইম্প্রুভ। তো, সরি কেন? কি হয়েছিল সকালে?’

নম্রতার রাগ এবার আকাশ ছুঁলো। ফোনটা টেবিলের উপর ফেলে রেখে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগল।

এতো ভাব! কিসের এতো ঢং এই লোকের? নিজেকে ভাবেটা কি এই লোক? রাজা-মহারাজা? কথা বলার কি বাঁজ! উফ, অসহ্য!নম্রতা পাঁচ-দশ মিনিট সময় নিয়ে নিজেকে শান্ত করল। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল,

‘ আসলে, সকালে খুব ডিস্টার্ব ছিলাম। কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম খুব। তাই অন্যমনস্কভাবে

হঠাৎই দুটো উইয়ার্ড শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। ট্রাস্ট মি! আমি ইচ্ছে করে বলিনি। আর না আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছি। কসম!'

বেশ কিছুক্ষণ পর আরফান উত্তর দিল,

' তাই নাকি? তো, কি বলেছিলেন? আই মিন, হঠাৎ বেরিয়ে আসা উইয়ার্ড শব্দদুটো কী ছিল? আমার

ঠিক মনে পড়ছে না।’রাগে নম্রতার ফর্সা নাক লাল রঙ ধারন করল। বাঘিনীর মতো ফুঁসতে ফুঁসতে ঢকঢক করে বোতলের পুরো পানি সাবাড় করল। ডানহাতের পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে চেয়ার পা গুটিয়ে বসল। প্রচন্ড রাগে গায়ে ঘাম দিচ্ছে তার। পিঠজুড়ে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলোকে হাত খোঁপা করে আবারও ফোনের দিকে তাকাল

নম্রতা। মাথার উপর ক্যাট ক্যাটে শব্দ তুলে ঘুরে চলেছে পাখা । নম্রতার মনে হচ্ছে, এই পাখায় বাতাসের থেকে শব্দই পাওয়া যাচ্ছে বেশি। ‘খালি কলসি বাজে বেশি’ টাইপ অবস্থা। কিছুতেই ঘাম বন্ধ হচ্ছে না। নম্রতা চোখ বোজে জোরে জোরে দম নিল। ওই অসভ্য লোকটা শুধু অসভ্য নয়, ভয়ানক থেকে ভয়ানক ফাজিলও। ইচ্ছে করে

ছ্যাচলামো করছে। বেয়াদব।এইসব বেয়াদব দিয়ে হাসপাতাল ভরে থাকলে রুগীরা সুষ্ঠু চিকিৎসা পাবে কোথায়? দেখা যাবে, অপারেশন থিয়াটারে দাঁড়িয়েও এদের ছ্যাচলামো, ফাজলামো শুরু হয়ে গিয়েছে। নম্রতাকে যেমন সব জেনেশুনেও জিগ্যেস করছে, 'ওই হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া উইয়ার্ড শব্দ দুটো কী?' ঠিক তেমনই অপারেশন

বাদ দিয়ে রুগীকে জিগ্যেস করবে, ‘ আপনার এই উইয়ার্ড রুগের পেছনে কারণ কী? বিশ্লেষণ করুন তো শুনি।’ নম্রতা বিপন্ন দৃষ্টিতে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন কী উত্তর দিবে সে? উফ্ ভাল্লাগে না। নম্রতা বার কয়েক ঘন ঘন দম নিয়ে লিখল,‘ নেতিবাচক বিষয়গুলো মনে না থাকায় ভালো। সেগুলো মনে না করিয়ে দেওয়া আরও ভালো।

আপনার মনে নেই শুনে স্বস্তি পেলাম। আপনি প্লিজ সরিটা একসেপ্ট করে নিন। ক্ষমা করা মহৎ গুণ।’

‘ তাই নাকি? কে বলেছে?’

‘ সবাই বলে। তাছাড়া আল্লাহ ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। আজকাল, মানুষ নিজের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিচ্ছে আর আপনি ওই ছোট্ট দুটো শব্দের জন্য

আস্ত একটা সরি একসেপ্ট করতে পারবেন না?’

বেশ কিছুক্ষণ পর উত্তর এলো,‘ আপনি খুবই হিপোক্রিট মহিলা। নিজের কথার প্রতি নিজেরই ভরসা নেই ঠিকঠিক।’

‘হিপোক্রিট’ শব্দটা শুনেই নম্রতার মিইয়ে থাকা আগুনটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এতো বড় সাহস! এই লোক নম্রতাকে হিপোক্রিট বলে।

নম্রতাকে? রাগে হাত-পা কাঁপছে নম্রতার। মাথা ধরে যাচ্ছে। এই লোকটা আস্ত শয়তান, অসভ্য। যে কুক্ষণে এই লোকটাকে নক করতে গিয়েছিল, সেই কুক্ষণটাকে কেঁটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করছে নম্রতার। ইনবক্স ভর্তি গালি দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, ব্যাটা তুই হিপোক্রিট, ম্যানারলেস। নাও গো টু হেল। কিন্তু বলা যাচ্ছে না। এহেন

অপমান সহ্যও করা যাচ্ছে না। রাগে-দুঃখে-বাধ্যবাধকতায় কান্না পেয়ে যাচ্ছে নম্রতার। কিছুক্ষণ চোখ বোজে বসে থেকে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিল নম্রতা। তারপর আরফানের কথাটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিল,‘ এসাইনমেন্টে আপনার সাইন লাগবে। ইট’স ইমারজেন্সি। প্লিজ।’

‘ আমাদের মতো ফালতু ডাক্তার থেকেও সাইন লাগে নাকি আজকাল?’

‘ লাগছে তো।’

‘ কখন চাই?’

‘ দশটায়।’

‘ দশটায় আমার ক্লাস আছে।’

‘ প্লিজ স্যার। প্লিজ। কৃতজ্ঞ থাকব।’

নম্রতা দাঁতে দাঁত চেপে আবারও লিখল,

‘ কালকেই জমা দিতে হবে। নয়তো ঝামেলা হয়ে যাবে। প্লিজ, স্যার। ‘

‘ সাড়ে দশটায় চলবে?’

‘ চলবে চলবে।’

‘ বেশ! আসবেন সাড়ে দশটায়।’নম্রতা হাফ ছেড়ে বাঁচল। ফোনটা রেখে বিছানায় যেতে যেতে মাথায় একটা চিন্তায় খেলে গেল। এই বেয়াদব লোকটিকে শুকনো কথায় ছেড়ে দিলে তো চলবে না।

ভয়ানক কিছু ভাবতে হবে। এই লোককে হাই লেভেলের অপমান না করতে পারলে ঠিকঠাক ঘুমও হবে না নম্রতার। বিশাল যন্ত্রণা।

ভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বই ঘাটছিল নীরা। তার পাশের সেল্ফ থেকেই সাইকোলোজির উপর কোনো একটা বই খুঁজছিল অন্তু। অন্তুর চোখ-মুখ আজ গম্ভীর, থমথমে। কাল থেকে নীরার সাথে

হা-হু ছাড়া কথা বলছে না সে। নীরা খেয়াল করেছে। নম্রতা, ছোঁয়াদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে নীরার সাথে এমন নিষ্ঠুরতা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। অন্ত বই হাতে কোণার একটা টেবিলে চেয়ার টেনে বসল। নীরা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্তর পাশের চেয়ারটাতে বসল। অন্তর গায়ে কালো রঙের পাতলা টি-শার্ট। ছিমছিমে কালো গায়ে কালো রঙটা

বেশ মানিয়েছে। পরিপাটি চুল আর শক্ত চিবুকে আকর্ষনীয় দেখাচ্ছে। নীরা গলা খাঁকারি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। অন্তু ফিরেও তাকাল না। গভীর মনোযোগে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচু কণ্ঠে জিগ্যেস করল,‘ তুই ঠিক আছিস?’

অন্তু চোখ তুলে তাকাল। অবাক হয়ে বলল,

‘ আমাকে বলছিস?’

‘ এখানে আর কেউ আছে?’

অন্তু তাচ্ছিল্যের সাথে বলল,

‘ ঠিক থাকব না কেন? আমার কী বেঠিক থাকার কথা ছিল নাকি?’

নীরা আহত কণ্ঠে বলল,

‘ এভাবে কথা বলছিস কেন?’

অন্তু বই থেকে মুখ উঠিয়ে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। ভারি অবাক হয়ে বলল,

‘ কিভাবে কথা বলছি?’

‘ কেমন ঠেস মারা কণ্ঠে কথা বলছিস। শুনতে খারাপ লাগছে।’

অন্তুর সহজ উত্তর,‘ খারাপ লাগলে যেচে পড়ে কথা বলতে আসছিস কেন?’

‘ তুই দু’দিন যাবৎ খুব রুড বিহেভ করছিস আমার সাথে। কি করেছি আমি?’

অন্তর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। টেবিলের নিচে থাকা নীরার বাম হাতের কনুইয়ের নিচে শক্ত করে চেপে ধরল। হেঁচকা টানে নীরাকে নিজের দিকে এনে রক্তলাল চোখে তাকাল। তপ্ত কিন্তু ধীর কন্ঠে বলল,

‘ তোর সাথে সবসময় আদর আদর কন্ঠে কথা বলতে হবে এমন কোনো চুক্তি ছিল নাকি আমার?’

নীরা চাপা স্বরে বলল,

‘ অন্তু হাত ছাঁড়। লাগছে।’

অন্তুর হাতের থাবা আরও খানিকটা শক্ত হলো। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ লাগুক। আমারও লাগছে। তিন বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি লাগছে। কই? আমি তো অভিযোগ করি না। তাহলে তোর এতো হাসফাস কেন?’‘ ছাঁড় অন্তু।’

‘ আমাকে ভালোবাসিস না কেন?’

‘ অন্তু এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।’

‘ হোক বাড়াবাড়ি। বল, কেন ভালোবাসিস না আমায়? কেন? কি করলে ভালোবাসবি?’

বিরক্তি আর রাগে চোখ-মুখ কুঁচকে এলো নীরার। জারি দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলল,

‘ জোরজবরদস্তি নাকি? ভালোলাগে না তাই ভালোবাসি না। এখন কি জোর করে ভালোবাসাবি আমায়? এতোটা নীচে নেমেছিস তুই।’

অন্তু এবার রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই হাতের বাঁধনটা শক্ত করল সে। রাগান্বিত মস্তিষ্ক নীরাকে কষ্ট দিতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কোমল মনের সাথে পেরে উঠল না। হাতটা ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে হিসহিসিয়ে বলল,‘ ভালোবাসিস না অথচ সস্তা মেয়েদের মতো আগেপিছে ঘুরিস

কেন? খবরদার আশেপাশে আসবি না আমার।'

নীরা হতভম্ব চোখে অন্তুর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ থেকে টসটসে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। অন্তু সত্যিই কথাটা বলল? তাকে সস্তা, নোংরা মেয়েদের সাথে তুলনা করতে পারল? কন্ঠে আটকাল না? নীরা কী সত্যিই এতো সস্তা? নীরার বুকের ভেতর উথলে উঠল কান্না।

বইটা টেবিলের ওপর রেখে সেল্ফের এক কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। এতো কষ্ট হচ্ছে কেন তার? অন্তুর কথাগুলো ঘুরেফিরে কানে এসে বাজছে। নীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয়। ওড়নার আঁচল কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ নিঃশব্দ অশ্রু বিসর্জন করে। মনে মনে খুব করে কামনা করে, এই সস্তা আমিটার যেন খুব

জলদিই মরণ হয়। খুব খুব জলদি মরণ হয়। এই সাংসারিক টানাপোড়েন। পরিবার আর মান-সম্মানের চিন্তায় অস্থির থাকার চেয়ে মরণটা কি সহজ নয়?সুন্দর ঝকঝকে সকাল। আকাশে ছড়ানো ছিটানো শুভ্র মেঘমালা। উজ্জ্বল সোনালি রোদে ঝলমল করছে পুরো শহর। নম্রতা ব্যাগ কাঁধে চেম্বারের সামনে পায়চারী করছে। হাতে

এসাইনমেন্ট। সাদা-নীল সালোয়ার-কামিজ আর ঘন খোলা চুলে ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। নম্রতা পায়চারী থামিয়ে ঘড়ি দেখল, দশটা ঊনত্রিশ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দরজার দিকে উঁকি দিল নম্রতা। ঠিক তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আরফানের এসিস্ট্যান্ট। হ্যাংলা পাতলা ছেলেটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল,‘ নম্রতা মাহমুদ কে?’

নম্রতা কপাল কুঁচকে বলল,
‘ আমি।’
‘ স্যার আপনাকে ভেতরে যেতে বললেন। ভেতরে যান।’
নম্রতা মাথা হেলিয়ে আবারও ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে ঠিকঠাক দশটা ত্রিশ। দুই হাতে এসাইনমেন্টের ফাইলটা চেপে ধরে ঠোঁট উল্টাল নম্রতা। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বিরবির করল, ‘

ব্যাটা দেখি বহুত পাঙ্চুয়াল।’ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই জোরেসোরে শ্বাস ছাড়ল নম্রতা। মন থেকে সব রকম ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে মন ও মস্তিষ্ককে শান্ত করল। তারপর ধীর হাতে দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল।‘ আসতে পারি?’

আরফান গভীর মনোযোগে সামনে রাখা ফাইল ঘাটছিল। দুই ভ্রুর মাঝখানে হালকা কুঁচকানো। গায়ে

গাঢ় নীল শার্ট। কব্জির ওপর সাদা চকচকে ব্র্যান্ডেড ঘড়ি। নম্রতার প্রশ্নে চোখ তুলে তাকাল আরফান। কুঁচকে থাকা ভ্রু'জোড়া সোজা করে গমগমে কণ্ঠে বলল,

' আসুন।'

নম্রতা দরজাটা সাবধানে লাগিয়ে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। আরফানের টেবিলের কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই বিচলিত হয়ে পড়ল

নম্রতা। আরফান প্রথম থেকেই ঠান্ডা দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষন করছে তাকে। আরফানের ঠান্ডা, গম্ভীর দৃষ্টি নম্রতাকে ক্রমেই বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। ছেলেটা কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকায়। ঠান্ডা, মায়াভরা চোখদুটো বুকের কোথাও তীরের মতো আটকে যায়। চোখ ফেরাতে দেয় না, ভাবতে দেয় না। চিন্তাগুলোকে করে দেয় এলোমেলো।

ভারী টেবিলটির ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পর নম্রতা উপলব্ধি করল ,উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের এই অসভ্য পুরুষটিকে আজ ভালো দেখাচ্ছে। নাকের ডগায় ঝুলে থাকা গাম্ভীর্যটাই যেন তাকে পরিপূর্ণ পুরুষ করে তুলেছে। নম্রতা টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই গমগমে কণ্ঠে বলল আরফান,‘ বসুন।’

নম্রতা জানে না কেন আরফানের এই ছোট্ট কথাতে চমকে উঠল । গলা শুকিয়ে এলো। সন্তপর্ণে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার টেনে বসল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে রইল। আকাশ-পাতাল চিন্তাভাবনা করে হঠাৎই নিজেকে শক্ত, স্বাভাবিক করে তুলল সে। মাথা তুলে সরাসরি আরফানের চোখের দিকে তাকাল। আরফান

চেয়ারে ঠেস দিয়ে নম্রতার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঘাড়টা হালকা কাত। দৃষ্টি গভীর ও শান্ত। নম্রতা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,

‘ হ্যালো স্যার।’

আরফানের ঠোঁটের কোণায় হাসি দেখা গেল না। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল,

‘ আপনার এসাইনমেন্ট?’অপমানে নম্রতার ফর্সা মুখটা কালো হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে হাঁতের

এসাইনমেন্টটা এগিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল। আরফান আজ ঝামেলাহীনভাবেই সাক্ষর করল। সাক্ষর শেষে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ কমপ্লিট। আর কিছু?’

নম্রতা মাথা নেড়ে ‘না’ জানাল। এসাইনমেন্টটা উল্টেপাল্টে দেখে নিতেই গম্ভীর কন্ঠে বলল আরফান,

‘ তাহলে আসুন। আমার এখন ব্রেকফাস্টের সময়। একটু পর রাউন্ডে যেতে হবে।’

নম্রতা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে নিয়েও হঠাৎই থমকে গেল। কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিমা করে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে সামনের দেয়ালটির দিকে তাকিয়ে রইল। কপালের ওপর পড়ল চিন্তার ভাঁজ। আরফান ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ কোনো সমস্যা?’

নম্রতা জিহ্বা দিয়ে উপরের ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে আরফানের দিকে তাকাল। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে বলল,‘ একটা প্রশ্ন করতে পারি?’

আরফান একই ভঙ্গিমায় উত্তর দিল, ‘ বলুন।’

নম্রতার অস্বস্তি আরও বাড়ল। অস্থির দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে

নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল। আরফান পুরোটা সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল নম্রতাকে। মেয়েটা একটু কেমন যেন। অদ্ভুত, ক্ষ্যাপা আবার পাগলাটে। আরফান কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বলল,

‘ কি হলো? বললেন না?’

নম্রতা আমতা আমতা করে বলল,‘ আপনার বন্ধু নিষাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করার ছিল।’

আরফানের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। খানিকটা বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে বলল,

‘ নিষাদ সম্পর্কে কি প্রশ্ন আপনার? আপনি নিষাদকে চিনেন?’

নম্রতার হৃদপিন্ড কাঁপছে। পরের প্রশ্নটা করতে গিয়ে জিহ্বা ভারী ভারী লাগছে। আচ্ছা? সত্যিই কি নিষাদই নম্রতার সে? আরফান কি তাকে পৌঁছে দিতে পারবে তার

গন্তব্যে? নম্রতা অনেক কষ্টে প্রশ্ন করল,

‘ হয়ত চিনি। আচ্ছা? উনি কি খুব পড়াকু? ঘন ঘন লাইব্রেরিতে যাওয়ার অভ্যাস আছে উনার?’

আরফান অবাক হয়ে বলল,‘ হ্যাঁ। কিন্তু কেন?’

নম্রতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,

‘ উনি খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, তাই না?’

আরফান সরু চোখে তাকাল। পরমুহূর্তেই ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠল বাঁকা হাসি। ঠেস মারা কন্ঠে বলল,

‘ ওয়েট! ওয়েট! প্রেমে টেমে পড়েছেন নাকি নিষাদের? ওহহো, গ্রেট! আপনার জন্য অসম্ভব কিছুই না।’

আরফানের কথায় অনুভূতি নামক প্রজাপতিরা যেন প্রমোদ গুনল।

মুহূর্তেই রঙিন প্রজাপতিগুলো মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল চারপাশ। ধেবে থাকা রাগটা ফুঁস করে উঠল। চেয়ার থেকে তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়িয়ে তপ্ত কণ্ঠে বলল নম্রতা,‘ যে যেমন তার কাছে পৃথিবীর সবার চরিত্রও তেমন। কথায় আছে না? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। আসছি ডক্টর আরফান আলম স্যারররর। আল্লাহ হাফেজ।’

কথাগুলো বলে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না নম্রতা। এই লোক নিজেকে ভাবেটা কি? প্রিন্স চার্মিং? নাকি এই বিশ্ব-ভ্রহ্মান্ডের মালিক? সামান্য ডাক্তারের ডিগ্রি অর্জন করেই এতো অহংকার! কিন্তু এ-কি! নম্রতার রাগে ফুঁসতে থাকা মস্তিষ্ক হঠাৎই কেমন শান্ত হয়ে গেল। পেশীগুলো বেয়ে নেমে গেল অদ্ভূত এক শীতলতা। সচেতন মস্তিষ্কে বাজতে লাগল

একটাই প্রশ্ন। একটাই চিন্তা। নিষাদ ঘন ঘন লাইব্রেরি যেত! পড়াকু ছিল। গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতাও তার স্পষ্ট। তবে কি এই সেই পুরুষ? নম্রতার কল্পনার কল্প পুরুষ? কিন্তু তার সন্ধান কি করে পাবে নম্রতা? কোথায় থাকে সে? নম্রতার কথা কি আদৌ মনে পড়ে তার?বারোটায় এসাইনমেন্ট জমা দিয়ে ক্যান্টিনে গিয়ে বসল নম্রতা। সাথে নীরা আর

ছোঁয়া। নীরার চোখ-মুখ থমথমে। ফর্সা নাকের ডগা লাল। চোখদুটোও খানিক ফোলা। ছোঁয়া-নম্রতার আড্ডার আসরে তার মনোযোগটাও আজ নিতান্তই আলগা। নম্রতাও খানিকটা চিন্তিত, অবিশ্রান্ত। ক্যান্টিনের সুস্বাদু চা আজ তেঁতো, বিশ্রী। আড্ডাও জমছে না। চারদিকে কেমন বিষণ্ন, উদাস ভাব। অন্তু ক্যাম্পাসেই ছিল। কিন্তু নানা

টালবাহানায় ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এই ঘন্টা দুই হলো। রঞ্জন পূজাকে নিয়ে ব্যস্ত আর নাদিম ব্যস্ত টিউশনিতে। নম্রতা বিষণ্ন মুখ নিয়ে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে রইল। মনটা খুব পোড়াচ্ছে তার। পুড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে।হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে ফিরে পাওয়ার আকুতিতে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে এই স্বপ্নময় সুন্দর পৃথিবী। তার যে ওই লোকটাকে

চাই-ই চাই। বছরের পর বছর জমিয়ে রাখা প্রশ্নের উত্তরগুলোর জন্য হলেও তাকে চাই। এমন বিষণ্ন, মৃদুল পরিবেশে দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এলো নাদিম। গিটার আর ব্যাগটা ধুম করে টেবিলের উপর রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে হাঁপাতে লাগল। গরমে দরদর করে ঘামছে তার শরীর। হলুদ শার্টটা ঘামে ভিজে ল্যাপ্টে

আছে গায়ে। একদম সাদা ফর্সা মুখটা সূর্যের তাপে রক্তের মতো লাল রঙ ধারণ করেছে। নাদিমের হঠাৎ আগমনে চমকে উঠল নম্রতারা। ছোঁয়া কোল্ড ড্রিংকের ক্যান হাতে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল। নাদিম বিদ্যুৎবেগে উঠে গিয়ে ছিনিয়ে নিল কোল্ড ড্রিংকের ক্যান। এক চুমুক সবটা শেষ করে ভারি আয়েশী কণ্ঠে বলল,‘ বালের লোকাল

বাস। জীবনডারে মেইনহল বানাইয়া ছাইড়া দিছে একদম। শালার যেদিকে তাকাই শুধু দূর্গন্ধ। এই গরমের দিন এতো ঘষাঘষি কইরা বাসে উঠতে মন চায়? শালার বুইড়া আংকেলগুলোও আরেক সার্কাস। এমনভাবে শরীরের ওপর পড়ে মনে হয় নয়া নয়া পিরিতি জাগছে, রিডিকিউলাস। মনডায় চায় বা..’

নাদিমকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ফুঁসে উঠল ছোঁয়া। রণচণ্ডী রূপ নিয়ে বলল,

‘ তুই আমার কোল্ড ড্রিংক খেলি কেন? আমি মাত্রই কিনে আনলাম বোতলটা। ফাজিল একটা। অসভ্য। আর এইসব কি ভাষায় কথা বলিস তুই? ন্যূনতম ব্যক্তিত্ববোধ নেই তোর? ছিঃ। আমার জাস্ট ঘেন্না লাগে।’

নাদিম ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ঠোঁট বাকিয়ে বলল,

‘ আরেকটায় ব্যক্তিত্ব মারাইতে আসছে। তোর ওই প্রফেসর বাপরে গিয়া ব্যক্তিত্ব জ্ঞান দে গা বাল। আমার সামনে আজাইরা ঢং মারাইতে আসবি না।’এমন সময় ক্যান্টিনে এসে ঢুকল রঞ্জন। নাদিমের পাশের চেয়ারটা টেনে

দু'দিকে পা দিয়ে উল্টো করে বসল। শার্টের উপরের দুই বোতাম খুলে দিয়ে কলার ঝাঁকিয়ে বলল,

' প্রচন্ড গরম আজ। আমি বোধহয় লেইট। পূজাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এলাম। মেয়েটা অসুস্থ।'

তারপর আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে কপাল কুঁচকাল। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করল,

' এই অন্তু কই রে?'

নাদিম ততক্ষণে গিটার তুলে নিয়েছে হাতে। দক্ষহাতে টুংটাং সুর তুলে চলেছে একের পর এক। রঞ্জন খাওয়ার জন্য কিছু অর্ডার করে বন্ধুদের দিকে তাকাল। নম্রতা হেসে বলল,

‘ দোস্ত? তোরে তো গরমের দিনেও হেব্বি হ্যান্ডসাম লাগে রে। তুই আমার বন্ধু না হলে আমি তোর প্রেমে পড়ে যেতাম।’রঞ্জন সামনে

রাখা ম্যাগাজিন দিয়ে বাতাস করতে করতে হাসল। চোখ টিপে বলল,

‘ আর তুই আমার বান্ধবী না হলে আমি তোরে বিয়ে করে ফেলতাম। আহা! সুন্দরী বউ।’

রঞ্জনের কথায় সামনে থাকা খাতাটা ছুঁড়ে মারল নম্রতা। নাদিম গিটার বাজানো থামিয়ে দাঁত বের করে হাসল। ডান পা দিয়ে রঞ্জনের কোমর বরাবর লাথি মেরে বলল,

‘ আর তোমার পূজা তোমারে এই এঙ্গেলে পূজা করত মামা।’

নাদিমের কথায় হেসে ফেলল সবাই। হঠাৎই হাসি থামিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল রঞ্জন,

‘ তুই ঠিক আছিস নীরু? চোখ-মুখ এমন লাগছে কেন?’

নীরা হাসার চেষ্টা করল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ আমার কি হবে? ঠিক আছি।’

সবার চোখ এবার নীরার দিকে আটকে গেল। নাদিম টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেশ খেয়াল করে দেখল। চোখ-মুখ বিকৃত করে বলল,‘ জামাই মইরা গেছি নাকি রে? কান্দিছস মনে হইতাছে। চোখ-নাক লাল ক্যান? জামাই মরলে কান্দোন লাগব? আমরা আছি না? দরকার পড়লে আরেকটা জামাই ধইরা আইনা দিমু। প্যারা নাই।’

নাদিমের কথায় হেসে ফেলল নীরা। চোখ নামিয়ে বলল,

‘ শরীরটা একটু খারাপ লাগছে।’

নম্রতা তাড়াহুড়ো করে নীরার কপালে হাত রাখল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ জ্বর টর তো নেই। কি হয়েছে বল তো? কেঁদেছিস কেন?’

নম্রতার কথার মাঝেই বন্ধুদের আড্ডায় এসে পৌঁছাল অন্তু। মুখ

ভার করে পাশের টেবিল থেকে চেয়ার টেনে রঞ্জনের পাশে বসল। নীরা অন্যদিকে তাকিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ কাঁদিনি তো।’কথাটা শুনে চোখ তুলে তাকাল অন্তু। টিস্যু দিয়ে চোখ-মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বলল,

‘ কেঁদে কেটে মরে যাওয়ার মতো কি হয়েছে? আশেপাশের মানুষ

কেঁদে কেটে অমাবস্যা নামায় ফেলছে দেখি।'

নাদিম গিটারে দ্রুততর টুন বাজিয়ে বলল,

' উক্ত মহিলার জামাই ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। তাহাকে অতিশীঘ্রই একটা জামাই গিফটাইতে হইবে। এই মহান কাজের জন্য তোমরা তৈরি সেনা?'

সবাই টেবিলে হাত বাজিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,

‘ ইয়েসসসস!’

নীরা সামনে থাকা বইটা নাদিমের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেসে ফেলল। মুখে বলল,

‘ চুপ থাক হারামি।’

নাদিম বইটা ক্যাচ ধরে বিগলিত হাসল। ধীরে ধীরে কাঁটতে লাগল উত্তপ্ত দুপুরের বিষণ্নতা। জমে উঠল

আড্ডা। মেতে উঠল প্রতিটি প্রাণ। কর্ম ব্যস্তময় দীর্ঘ দিনটা পাড় করার পর রাতে যখন ফোনটা হাতে নিল নম্রতা ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল আরফান নামক অসভ্য লোকটির কথা। আরফানকে অনলাইনে দেখেই সকালের অপমানগুলো রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজতে লাগল। আরফানের প্রোফাইলের দিকে কিছুক্ষণ

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ইনবক্সে ঢুকল। নির্ভুল বাংলায় লিখল,

‘ আপনার মতো অসভ্য, অভদ্র আর ইতর মানুষ আমি আমার জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। একটা মেয়েকে কতটা বাজেভাবে হেনস্তা করেছেন আপনি। কাল আমাকে হিপোক্রেট বললেন। হিপোক্রেট মানে বুঝেন আপনি?দেখে তো মনে হয় নকল টকল করে, প্রফেসরকে টাকা

খাইয়ে নয়তো নকল সার্টিফিকেট দিয়ে ডাক্তার হয়ে গিয়েছেন।'

এভাবে শুরু করে মাথায় যা এলো তাই তাই লিখে ইনবক্স ভরিয়ে ফেলল নম্রতা। আরফান অনলাইনেই ছিল। নম্রতার লেখা প্রত্যেকটা ম্যাসেজ আরফান সীন করছে দেখে নম্রতার বুকে এক আকাশ স্বস্তি মিলল। মনের সব ঝাঁঝ ইনবক্সে মিটিয়ে দিয়ে অসভ্য লোকটাকে ব্লক

লিস্টে পাঠিয়ে দিল নম্রতা। আহ্ শান্তি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই....মনের সব ঝাঁঝ ইনবক্সে মিটিয়ে দিয়ে অসভ্য লোকটাকে ব্লক লিস্টে পাঠিয়ে দিল নম্রতা। আহ্ শান্তি। কিন্তু সেই শান্তি বেশিক্ষণ টিকল না। কিছুক্ষণ পরই নম্রতার মনে হলো, এবার বড্ড হ্যাংলোপনা করে ফেলেছে সে। এই বয়সে এসে এমন ইমম্যাচিয়ুরদের মতো কাজ কী

তাকে শোভা পায়? এমন বাচ্চামো প্রতিশোধের কি কোনো মানে হয়? ওই আত্ম অহংকারী লোকটা কী ভাববে? নম্রতাকে নিশ্চয় প্রচন্ড গেঁয়ো আর ন্যাকা ভাববে? নম্রতার হঠাৎ-ই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ তাকে ফালতু আর বিরক্তিকর ভাবছে ভাবতেই মনটা তেঁতিয়ে গেল।কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে আরফানকে আনব্লক

করল নম্রতা। কিছুক্ষণ ফোন নিয়ে অযথাই ঘাটাঘাটি করল। মনের কোথাও একটা আপেক্ষা তাড়া দিচ্ছে তার। যদি লোকটি ম্যাসেজের উত্তর দেয়! যদি কিছু বলে! এই ভাবনাতেই কেটে গেল সুপ্ত অপেক্ষার প্রহর। কিন্তু ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও ওপাশ থেকে কোনোরূপ উত্তর এলো না। ওই অসভ্য লোকটি প্রতিটা ম্যাসেজ সীন করার পরও

কোনোরূপ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল না। নম্রতার আত্মসম্মানবোধটা যেন এবার খন্ড বিখন্ড হয়ে গেল। লোকটা কী তবে নম্রতাকে ম্যাসেজের উত্তর দেওয়ার মতো অতোটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করল না? নম্রতার শরীর-মন অপমানে টনটন করে উঠল। এই লোকটা ভারী হিসেবী ধরনের।কোথায় কোন কাজ করলে অপর পাশের মানুষকে

শতাধিক অপমান করা যাবে, অপদস্ত করা যাবে তা যেন এই লোকের অস্থিমজ্জায় জানা। এই যে, এই মুহূর্তে লোকটি যদি কোনো উত্তর দিত। নম্রতার সাথে কথা কাটাকাটির চেষ্টা করত, পাল্টা অপদস্তের চেষ্টা করত তাহলেই তো অপরাধবোধ, অপমানবোধটা কমে যেত নম্রতার। কিন্তু ওই অসভ্য লোকটি সে সুযোগ দিল না। একদম

নীরব থেকে নম্রতার জাগ্রত আত্মসম্মানবোধে তীব্রভাবে আঘাত করে গেল, নম্রতা টেরও পেল না। আচ্ছা? নীরবতার মতো ভয়ানক ছুঁড়ি কী আদৌ কিছু হয়? নম্রতার সতর্ক মস্তিষ্ক উত্তর দিল, না হয় না। এই পৃথিবীতে নীরবতার মতো ভয়ানক ছুঁড়ি আর কিছু হয় না। হতে পারে না।নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই

বেয়াদব মনটা আফসোসের শিষ তুলে বলল, কি দরকার ছিল যেচে পড়ে নক দিয়ে লোকটিকে এত কথা শোনানোর? শখ করে নিজেকে উপহাসের পাত্র বানানোর? তুমি সবসময়ই এমন উৎপটাং কান্ড কেন কর নম্রতা? তোমার কি আত্মসম্মানবোধ নেই? তুমি কি ব্যক্তিত্বহীন সস্তা মানবী? নম্রতার বুকে মোচড় দিয়ে উঠল। চারপাশের

সবকিছু বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। আত্মগ্লানি আর অপমানবোধে তেঁতো হয়ে উঠল মুখ। তার এই মন খারাপ ভাবটা রাতের গভীরতার সাথে সাথে কষ্ট হয়ে নেমে এলো চোখে। জীবনের সব না-পাওয়াগুলো, হারিয়ে ফেলার স্মৃতিগুলো বেয়াদব মনটাকে কাঁদিয়েই ছাঁড়ল। সেই স্বার্থপর হারিয়ে যাওয়া 'সে' কে ভেবে রাত-ভোর করে কাঁদল নম্রতা। পূর্ব

আকাশে যখন আলো ফুটলো। লালাভ লজ্জায় রাঙা হলো বিশাল আকাশ। ঠিক তখনই দু'দন্ডের ঘুম নেমে এলো নম্রতার চোখে। জ্বালাপোড়াময়, ফোলা চোখদুটো নিয়ে ঘন্টাখানিকের জন্য চোখ বোজল নম্রতা। ঘুমের মাঝেও নম্রতা দেখতে পেল পুরাতন সেই বই। হাজার হাজার নীল চিরকুট আর তার মাঝে নীল পাঞ্জাবি গায়ে

সুদর্শন এক পুরুষ। নম্রতা ধরফরিয়ে উঠে বসল। গলা, বুক ঘেমে চিপচিপে হয়ে আছে । নম্রতা ডানহাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট আর নাকের ঘাম মুছল।‘ কখন থেকে ডাকছি তোকে। ক্লাস টাইম হয়ে গিয়েছে। রেডি হবি না? সাড়ে নয়টায় ক্লাস, জলদি ওঠ।’

নম্রতা ফাঁকা মস্তিষ্কে নীরার দিকে তাকাল। নীরা চুলে চিরুনি চালাচ্ছে।

গায়ে তার কাঁচা হলুদ রঙের জামা। ফর্সা গায়ে সুন্দর দেখাচ্ছে কাঁচা হলুদ রং। নম্রতা বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। ওই পুরুষটা! ওই নীল পাঞ্জাবি পরনে পুরুষটার চেহারা মনে পড়ছে না তার। অথচ স্বপ্নে কত পরিচিত লাগছিল তাকে। মনে হচ্ছিল কত আপন, কত ভালোবাসাময় সেই মুখ, সেই ঠোঁট

আর সেই নীল রঙা পাঞ্জাবি। নীরা আবারও তাড়া দিতেই অলস ভঙ্গিতে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল নম্রতা। কালো প্লাজুর সাথে পরা ঢলঢলে টি-শার্টটা টেনেটুনে ঠিক করতে করতেই সিদ্ধান্ত নিল, আজ আবারও গ্রন্থাগারে যাবে সে। সেই বইটাকে বুকে জড়িয়ে বসে থাকবে অনেকক্ষণ। মলাটের নিচের গন্ধ শুঁকবে। এতোগুলো বছরের আদান-

প্রদানেও সেখানে কী ‘সে’ এর নিজস্ব মিষ্টি গন্ধটা জমা হয়নি? একটুও না?নম্রতা ওয়াশরুমে যাওয়ার পর পরই ভার্সিটির বই গুছাতে মন দিল নীরা। ক্লাস অনুযায়ী বইগুলো নাড়াচাড়া করতেই একটা বই থেকে টুপ করে নিচে পড়ে গেল একটি চিরকুট। নীরা ভ্রু কুঁচকে চিরকুটটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ভারি বিস্ময় নিয়ে

তুলে নিল ছোট্ট সেই কাগজের টুকরো।
কাগজটা মেলে ধরতেই টানা টানা চির পরিচিত অক্ষরগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। মাত্র দুটো লাইনের সেই লেখাতেই নীরার বিক্ষিপ্ত, অশান্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল। নীরা টলমলে অনুভূতি নিয়ে সেই লাইন দুটো আবারও পড়ল,‘ জীবনে আর কখনও ভালোবাসতে

বলব না তোকে। তবু কাঁদিস না প্লিজ। আমাকে ভালো না বাসলেও সহ্য করতে পারব। চোখের সামনে অন্য কাউকে ভালোবাসবি সেটাও সহ্য করে নিব। কিন্তু তোর কান্নাটা সহ্য হবে না। এই নীরুপাখি? কাঁদিস না,প্লিজ।'

চিরকুটটা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়ল নীরা। বুকের ভেতর উথাল-পাতাল

ঢেউয়ের সাথে উথলে উঠল কান্না। এই ছেলেটা কেন এতো ভালোবাসে তাকে? তার মতো স্বপ্নহীন মেয়েটিকেই কোনো ভালোবাসতে হলো তার? আর কেন-ই বা এমন অদ্ভুত মিষ্টি তার প্রকাশ ভঙ্গি? নীরার মতো পোড়াকপালি মেয়ের জন্য অতো ভালোবাসাও জমা থাকে বুঝি? সেই পাগল প্রেমিক কী জানে না পোড়াকপালিদের ঠিক

ভালোবাসতে নেই। ভালোবাসার অধিকার নেই। নীরার বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। চোখ থেকে নেমে আসে নোনা স্রোতের ধারা। তেজস্বী সূর্য অনেকটাই মিইয়ে এসেছে। ত্যক্ত গরমটা সয়ে এসেছে শরীরে। নম্রতার নীল রঙা কামিজটা ঘামে ল্যাপ্টে আছে গায়ে। চোখের নিচে অসাবধান আদরের মতোই ল্যাপ্টে আছে কাজল কালী। হাত-পা

মৃদু কাঁপছে। নিঃশ্বাস ভারী। নম্রতা ছোট ছোট পা ফেলে গ্রন্থাগারের দু-তলায় উঠল। আজ একাই এসেছে সে। আজ তার একা থাকারই পালা। না, একা তো নয়। সে এবং তার সুপ্ত, গভীর অনুভূতিগুলোর খুব একান্তে সময় কাটানোর পালা। নম্রতা ঢোক গিলে দর্শনের সেল্ফের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু একি! দর্শনের বইটা এখানে নেই।নম্রতার

পরিচিত পৃথিবীটা এবার দুলতে লাগল। মাথা ঘুরছে। চিন্তা গুলিয়ে যাচ্ছে। কোথায় গেল সেই বই? সারা সেল্ফ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না সেই বই। শেষ পর্যন্ত এই শেষ চিন্হটাও কী তবে হাতছাড়া হলো তার? নম্রতা কোণার এক চেয়ারে বসে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁপাতে লাগল। বুকে চাপ লাগছে। শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না।

আচ্ছা? নম্রতা কী মারা যাচ্ছে? ওই নিষ্ঠুর লোকটিকে না দেখেই কী মরে যেতে হবে তাকে? নম্রতা টেবিলে মাথা এলিয়ে ঘন্টাময় বসে রইল। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর গ্রন্থগারের কর্মচারীদের জিজ্ঞেসাবাদ করে জানল গ্রন্থগারেরই কোনো এক পাঠক একদিন আগে বইটি বাড়ি় নিয়ে গিয়েছে। এখনও ফিরিয়ে দিয়ে যায়নি। নম্রতার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে

এলো। এতো বছর পর হঠাৎ কার প্রয়োজন পড়ল এই বই? নম্রতা উত্তেজিত হয়ে বলল,‘ যে লোকটি বই নিয়েছেন তার নাম কি? চেইক করে বলুন প্লিজ। আমার খুব প্রয়োজন।’

লোকটি খুব একটা ঝামেলা করল না। নম্রতার দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে রেজিস্ট্রার খাতা ঘাটতে লাগল। বেশ

কয়েক মিনিট ঘাটাঘাটির পর গম্ভীর মুখে বলল,

‘ নিষাদ আহমেদ নীরব। গত পরশো বিকালের দিকে নিয়ে গিয়েছেন বইটা।’

নামটা শুনেই বিদ্যুৎ শক লাগার মতো চমকে উঠল নম্রতা। নিষাদ? নিষাদ নিয়ে গিয়েছে সেই বই? কিন্তু কেন? তবে কি নম্রতারা যা ভাবছে তাই? নিষাদই সেই নিষ্ঠুর পুরুষ?

নাকি ব্যাপারটা পুরোপুরি কাকতালীয়? এমন কাকতালীয় ঘটনাও কি ঘটতে পারে? এতো বছর পর কাকতালীয়ভাবে সেই বইটিই কেন নিতে হবে নিষাদকে? নম্রতার ভাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। নম্রতা শুকনো গলায় কোনরকম ফ্যাচফ্যাচ করে বলল,‘ উনার নাম্বারটা একটু দেওয়া যাবে? উনাকে ভীষণ দরকার আমার।’

লোকটি নম্রতার অনুরোধকে সম্পূর্ণ নাকচ করে বলল,

‘ সম্ভব নয়। নাম্বার দেওয়ার নিয়মে নেই।’

নম্রতা হাজার অনুরোধ করেও লোকটি থেকে নাম্বার উদ্ধার করতে পারল না। ধীর, দুর্বল পায়ে গ্রন্থগার থেকে বেরিয়ে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল সিঁড়ির গোড়ায়। না, আর হাঁটতে পারছে না সে। এই শরীরের

ভার বহনের শক্তি আর হচ্ছে না। নিষাদের দেখা সে কিভাবে পাবে এখন? ডাক্তার আরফানকে জিগ্যেস করে দেখবে? এতোকিছুর পরও কি ওই ডাক্তার তার কথা শুনবে? সাহায্য করবে? নম্রতা সিঁড়ির রেলিং-এ ঠেস দিয়ে ব্যাগ থেকে ফোন বের করল। ডায়ালে প্রথমেই নাদিমের নাম্বার থাকায় তাকেই ফোন করল প্রথম। দু-বারের চেষ্টায়

ফোনে পাওয়া গেল তাকে। ফোন ধরেই ওপাশ থেকে বিরক্ত কণ্ঠে বলল,‘ টিউশনি করাইতাছি বাল। বেহুদা ফোন দিয়া ডিস্টার্ব করতাছস কেন?’

নম্রতা দুর্বল শরীরে জোরে জোরে শ্বাস নিল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,

‘ সরি দোস্ত। তুই একটু রঞ্জন, অন্তু, নীরা কাউকে ফোন দিয়ে শাহবাগ গ্রন্থগারে আসতে বলবি? জলদি।’

এটুকু বলতেই কান্নায় গলা ভিজে গেল নম্রতার। নাদিম চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

‘ রঞ্জন তো পুরাতন ঢাকায় গেছে। অন্তু কই আছে জানি না। কিন্তু হইছেটা কি? কই তুই? ঠিক আছিস?’

‘ আমি শাহবাগে। গ্রন্থগারের সিঁড়িতে বসে আছি। আমাকে নিয়ে যেতে বল। হাঁটতে পারছি না।’

নাদিম আর কোনো প্রশ্ন করল না। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,‘ তুই থাক আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতেছি।’

‘ তোর টিউশনি?’

‘ রাখ তোর টিউশন। আমি আইতাছি। চিন্তা করিস না।

অন্তুকেও কল করি। শালায় আছেটা কই?’

নিজের মনে কথা বলতে বলতেই ফোন কেটে দিল নাদিম। নম্রতা সেখানে বসেই চোখ বন্ধ করল। এই চোখ খোলে রাখাটাও শরীরের আর কুলচ্ছে না।আকাশ থমথমে। বোধহয় বৃষ্টি হবে। ভ্যাপ্সা গরমে জ্বলে যাচ্ছে গা। গাছের পাতায় হেলদোল নেই। পশ্চিম আকাশে ঘন

মেঘের ছায়া। নম্রতা হাসপাতালের করিডোরে উদাস বসে আছে। চোখদুটো অনুভূতিশূন্য। দূর আকাশে দু-তিনটি কালো পাখি উড়াউড়ি করছে। অলস পাখা মেলে একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসছে তারা। আচ্ছা? এই পাখিগুলোর কী ভয় নেই? এই যে বৈশাখী রাজকন্যা তার সখীসহ থমথমে মন খারাপ নিয়ে বসে আছে। চোখে তার একরাশ

অভিমান। সেই অভিমান দেখে পাখিদের ভয় হয় না? অভিমানী জলে ভেজার, বজ্রপাতে ভস্ম হয়ে যাওয়ার ভয় কী তাদের হতে নেই? নাকি তারাও নম্রতার মতোই অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে আজ? ভীষণ প্রিয় কারো খুঁজে তারাও কী ঘরদোর ছেড়ে নিরুদ্দেশ আকাশ পথে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে? নম্রতা যেমন বেড়াচ্ছে ওই চেম্বারটার

আশেপাশে? দূরের আকাশে চোখ রেখেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল নম্রতা। শরীরটা দুর্বল লাগছে। এক ঘন্টা যাবৎ ঠাঁই বসে থাকায় পা'দুটো ঝিঝি করছে। নম্রতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাল। নাদিম আর অন্তু হাত ভাঁজ করে বসে আছে। নাদিমের চোখ দুটো ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। ঘামে ভিজে আছে শার্টের সামনের দিকটা। নম্রতা বিরক্ত কণ্ঠে বলল,'

তোদের না বললাম চলে যেতে? বসে আছিস কেন শুধু শুধু?’

নাদিম ঘুম মাখা চোখে ঘড়ি দেখল, চারটা বায়ান্ন। তারপর মাথাটা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসল। এখন একটু ঘুমিয়ে নেবে সে। হাসপাতালের শান্ত পরিবেশে একটু পজিশন করে বসলেই দারুণ ঘুম ঘুমানো যায়। অযথা ক্যাচ ক্যাচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ নেই।

বাড়তি বালিশ-কাঁথার ঝামেলাও নেই। রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা টাড্ডা দিয়ে দুটোর দিকে বই নিয়ে বসেছিল নাদিম। পড়তে পড়তে কখন যে সকাল হয়ে গিয়েছে খেয়াল করেনি। সাড়ে নয়টা থেকে টানা দুটো ক্লাস করে টিউশনি করাতে গিয়েছে শহীদ সারণী এলাকায়। সেখান থেকে শাহবাগ গ্রন্থগার। নম্রতার পাগলামো আর জেদের জন্য

শাহবাগ থেকে আরফান আলমের চেম্বারে।আরফান আজ ভীষণ ব্যস্ত। এই ব্যস্ত সময়ে অযথা দেখা টেখা করার সময় নেই তার। ক্লাস, রোগী, হাসপাতালের ডিউটি সব মিলিয়ে নাকি শ্বাস ফেলারও সময় পাচ্ছে না সে। আপাতত নাদিমদের তাই জানানো হয়েছে। কিন্তু নম্রতা নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই হলে ফিরবে না। আরফান বিকেল পাঁচটা

থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত হসপাতালে থাকে না। আরফান পাঁচটায় যখন হাসপাতাল থেকে বের হবে ঠিক তখনই কথা বলবে নম্রতা। দরকার হলে জোর করে কথা বলবে। কিন্তু আরফানের সাথে কথা টথা না বলে সে যাবে না, মানে যাবে না। নাদিমের পেটে মোচড় দিয়ে উঠল। তল পেটে যন্ত্রণা করতেই মনে পড়ল, সকাল থেকে

কিছু খাওয়া হয়নি তার।সময় হয়নি। টাকাও ছিল না। আগের মাসে সেমিস্টার ফাইনালের চাপে টিউশনি করানো হয়নি। বেতনও জুটেনি। যা টাকা ছিল সেগুলো এবারের ঢাকা টু কক্সবাজার ট্যুরেই উবে গিয়েছে। সকালে পকেটে পঞ্চাশ টাকা ছিল। তিনদিন কোনরকম সকালের খাবার হয়ে যেত এই টাকায়। শাহবাগ গ্রন্থগারে আসার সময় তাড়াহুড়োয়

বিশ টাকা রিক্সা ভাড়া দিতে হয়েছে তাকে। আজকাল রিকশা চালকদের যা দেমাক! নাদিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল। এই মুহূর্তে নম্রতার সাথে ফাউ কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছে না তার। তবে অন্তু চুপ থাকল না। ধমক দিয়ে বলল,

‘ বেশি পাকনামো করিস? তোকে এই অবস্থায় একা রেখে চলে যাব আমরা? বসে থাকতে ইচ্ছে করছে

বসে থাক। আমরাও বসে থাকব। বেহুদা খ্যাচ খ্যাচ করে মাথা খাবি না।’নম্রতা কিছু বলার আগেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো আরফান। ক্লান্ত আরফানের গায়ে নীল-সাদা চেইক শার্ট। পরনে ডেনিম জিন্স। ডানহাতের কব্জির ওপর সাদা ঝকঝকে ঘড়ি। মাথার পরিপাটি চুল থেকে পায়ের পোলিশ করা জুতোজুড়ে স্মার্টনেসের ছড়াছড়ি।

আরফানকে দেখেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল নম্রতা। আরফান নম্রতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পাশ কাটাতেই দৌঁড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল নম্রতা। আরফান আবারও পাশ কাটানোর চেষ্টা করতেই আবারও সামনে গিয়ে দাঁড়াল নম্রতা। বেশ কিছুক্ষণ পাশ কাটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ক্লান্ত চোখদুটো মেলে নম্রতার মুখের দিকে তাকাল আরফান। সেই নিষ্পাপ

চাহনিতেই কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল নম্রতা। এই লোকের চোখে অদ্ভুত কিছু আছে। এই চোখের চাহনিতে কেমন এক সম্মোহনী শক্তি আছে। গুছিয়ে রাখা কথা, গুছিয়ে রাখা সময়গুলোকে এলোমেলো করে দেওয়ার শক্তি। নম্রতাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে গমগমে কণ্ঠে বলল আরফান,‘ পথ ছেড়ে দাঁড়ান। আমি যাব।’

নম্রতা আরফানের চোখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কন্ঠে বলল,

‘ আপনার সাথে আমার কথা আছে। জরুরি কথা।’

আরফানের ভ্রু জোড়া কুঁচকে এলো। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল,

‘ আমার সাথে আপনার জরুরি কথা? আবারও সরি বলতে এসেছেন নাকি? জেনে রাখুন, আপনার সরির

কোনো প্রয়োজন আমার নেই। পথ ছাড়ুন।’

কথাটা বলে পাশ কাটাতে নিতেই আবারও সরে এসে সামনে দাঁড়াল নম্রতা। আরফান চোয়াল শক্ত করে বলল,‘ সমস্যা কি আপনার?’

‘ বললাম তো, কথা আছে।’

‘ কিন্তু আমার সময় নেই। আমি ব্যস্ত আছি। এই দুই ঘন্টা আমার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার

গুরুত্বহীন ফালতু কথার পেছনে আমি আমার প্রয়োজনীয় সময়টুকু নষ্ট করতে চাইছি না। দয়া করে পথ ছাড়ুন।'

নম্রতা নরম কণ্ঠে বলল,

' দেখুন। আমার সত্যিই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনি আপনার বন্ধু নিষাদের ফোন নাম্বারটা দিন। আই প্রমিজ আমি আপনাকে বিরক্ত করব না।'

আরফান বিরক্ত চোখে তাকাল। তার চোখে খেলে গেল নিদারুণ বিতৃষ্ণা। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ নিষাদের সাথে আপনার কি কাজ? তাছাড়া, নিষাদ তো বলল সে আপনাকে চেনে। আপনার নাম্বারও হয়ত আছে। সে ইচ্ছে করলেই যোগাযোগ করতে পারে। নিষাদ যেহেতু যোগাযোগ করছে না তারমানে আপনার সাথে

কোনোরকম যোগাযোগ সে করতে চাইছে না। আর বন্ধু হিসেবে নিষাদের ইচ্ছের বাইরে গিয়ে তার ফোন নাম্বার আমি আপনাকে দিতে পারি না। দুঃখিত।'এটুকু বলেই নম্রতাকে পাশ কাটিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল আরফান। নম্রতা কয়েক সেকেন্ড থম ধরে দাঁড়িয়ে থেকে আরফানের পেছন পেছন দৌঁড় লাগাল। অন্তু-নাদিম একে

অপরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। নাদিম কপাল কুঁচকে বলল,
‘ মাইয়া মানুষ মানেই হারামি। চিন্তা কইরা দেখ অন্তু। একটু আগে যে মাইয়া ফিট মারতাছিল সে এখন ডাক্তারের পিছনে পিছনে দৌড়াইতাছে। শালী! এখন শক্তি কই থেকে আসে শরীরে?’
অন্তু চিন্তিত কন্ঠে বলল,

‘ আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে দোস্ত। এই নিষাদের ব্যাপারটা কী? সব জায়গায় গন্ডগোল লাগাচ্ছে কেন এই লোক? কি হচ্ছে, কিছুই তো বুঝতাছি না।’নাদিম ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে আবারও চেয়ারে বসে পড়ল। নম্রতার পেছন পেছন ছুটার আর কোনো মানে হয় না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এই মেয়ের টাকি মাছের প্রাণ। অতো সহজে মরবে

না। ফিটও খাবে না। সুতরাং, চিংড়ি মাছের মতো লাফালাফি না করে স্বস্তিতে ঘুমোনো যাক।

হাসপাতালের বাইরে কিছুদূর হেঁটেই রিকশা নিয়েছিল আরফান। কিন্তু রিকশা চলতে শুরু করার আগমুহূর্তেই কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল নম্রতা। তাড়াহুড়ো করে রিকশায় উঠে বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ আশ্চর্য! এমন রোবটের মতো বসে আছেন কেন? সরে বসুন। আমার জায়গা হচ্ছে না।’

আকস্মিক ঘটনায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ল আরফান। খানিকটা সরে বসে ধাঁধা লাগা দৃষ্টিতে তাকাল। নম্রতা ব্যাগটা কোলের উপর রেখে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ মামা চলুন।’গোটা ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটে যাওয়ার পর কিছুটা

ধাতস্থ হলো আরফান। পুরো ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো তার। যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আশ্চর্য! আপনি আমার রিকশায় কেন উঠেছেন?’

‘ এটা আপনার রিকশা? আপনি কিনেছেন?’

আরফান দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ আমি না কিনলেও আমি ভাড়া করেছি।’

‘ তো? আমি কি বলেছি যে রিকশাটা আপনি ভাড়া করেননি? ভাড়া যেহেতু করেছেন ভাড়াও দিবেন। মানা করেছে কে? দেখুন, আমি জাস্ট আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।’

আরফান রাগে থমথমে কণ্ঠে বলল,‘ আপনি অত্যন্ত গায়ে পড়া একটা

মেয়ে। আমি এই ধরনের মেয়েদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করি না।'

অপমানে,দুঃখে চোখদুটো ছলছল করে উঠল নম্রতার। এতোটা অপমান, এতোটা ঘৃণা এর আগে কেউ কখনও করেনি তাকে। নম্রতা খুব দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। ওই নিষ্ঠুর মানুষটির জন্যই তো এতো অপমান গায়ে মাখতে হচ্ছে তাকে। ওই নিষ্ঠুর মানুষটিকে হাতের কাছে

পেলে সবটা সুদে আসলে শোধ করবে নম্রতা। নম্রতা যতটা কষ্ট পেয়েছে তার থেকেও দ্বিগুণ কষ্ট দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে সেই মানুষটাকে। কিন্তু সেজন্য তো তাকে খুঁজে পেতে হবে। যেভাবেই হোক পেতেই হবে। নম্রতা অতি সন্তপর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আরফানের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি আমাকে যা ইচ্ছে ভাবতে পারেন কিন্তু আমার কাছে এছাড়া কোনো উপায়ও নেই। আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো ছাড়া বেঁচে থাকা যাচ্ছে না। একমাত্র আপনার কাছেই আছে সেই উত্তর। উত্তরগুলো দিয়ে দিন। আমি আর বিরক্ত করব না।’নম্রতার তেজি অথচ ছলছলে দৃষ্টিতে আরফানের মনটা হয়ত কিছুটা নরম

হলো। সেই সাথে বিস্মিতও হলো। বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে মানে কী? আমি তো আপনাকে ঠিকঠাক চিনি না পর্যন্ত। কী জানতে চান আপনি?’

‘ নিষাদ আমাকে কিভাবে চেনে? আর উনার কাছে আমার নাম্বারটাই বা কিভাবে আছে?’

আরফান ভারি অবাক হয়ে বলল,

‘ সেটা কী আদৌ আমার জানার কথা? আর আপনি নিষাদকেই বা খুঁজছেন কেন? আপনাদের মধ্যে কী কখনও কোনো সেনসেটিভ সম্পর্ক ছিল? থাকতেও পারে। কিন্তু সম্পর্ক থাকলে তার আপনাকে চেনা বা না-চেনার প্রশ্ন কেন আসছে? আমি কনফিউজড।’

নম্রতা দিশেহারা হয়ে বলল,‘ আমি নিজেও কনফিউজড।’

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ বসে রইল। খানিকবাদে বেশ রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল আরফান,

' আপনি নিষাদের উপর ক্রাশড? নাকি ভালোবাসেন?'

নম্রতা অসহায় দৃষ্টিজোড়া তুলে আরফানের দিকে তাকাল। ওই চোখ জোড়ায় কী ছিল জানা নেই আরফানের। তবে হঠাৎ করেই মেয়েটার প্রতি বড্ড মায়া হলো

তার। আহা! মেয়েটা বোধহয় ভীষণ ভালোবাসে নিষাদকে? ভালোবাসা নামক অনুভূতিটা তো আরফানও খুব বুঝে। আরফানেরও তো এমনই ভালোবাসাময় এক রাজকন্যা আছে। আরফান এবার নরম কণ্ঠে বলল,

‘ ভালোবাসেন?”‘ জানি না। আমার ভালোবাসার মানুষটি উনিই কিনা জানি না। আমি আসলে কিছু বুঝে উঠতে পারছি না।’

নম্রতার এমন উত্তরে বেশ অবাক হলো আরফান। ভালোবাসার মানুষকে জানে না মানে? আরফান নম্রতার কথার প্রেক্ষিতে কোনো কথা খুঁজে পেল না। তবে মেয়েটাকে আগের মতো বিরক্তিকর ও অসহ্যও লাগছে না বরং খানিকটা তরল, স্নিগ্ধ অনুভূতি হচ্ছে। আরফান কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজের অনুভূতির পরিবর্তন দেখল। মানুষ

কি আশ্চর্য জীব। তাদের মন নামক বস্তুটা কতই না ভিন্নতর, কতই অদ্ভুত! আরফান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আপনাদের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি-না জানি না। আপানাদের কেমিস্ট্রিটাও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, নিষাদের পেছনে দৌঁড়ে খুব একটা লাভ হবে বলে মন হয় না। রিসেন্টলি

নিষাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। নিষাদ সর্বদা বাবা-মার বাধ্য ছেলে। ওর বাবা-মা যেহেতু চাইছে বিয়েটা হোক। বিয়েটা হয়ত ও করবেই। আর এজন্যই হয়ত...'আরফানের কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল নম্রতা। নিষাদের বিয়ে ঠিক? তারমানে নম্রতা যা ভাবছিল তাই? এসব কারণেই কি তবে নম্রতার সাথে যোগাযোগ করেনি নিষাদ? 'সে'- ও

তো তার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত। সব সময় বাবাকে নিয়ে বিস্তর লিখত। বাবার ইচ্ছে বলেই শিক্ষকতায় যেতে চাইত। নম্রতার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নিষাদ কি তবে মিথ্যা অভিনয় করেছিল তার সাথে? নীল চিরকুটের সবটাই কী নিতান্তই সময় কাটানোর পসরা ছিল তার? নাকি অন্যকিছু? সবটা কাকতালীয়? নম্রতার বুকে আবারও

চাপ পড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নম্রতা হা করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল। অস্থিরতায় সারা গায়ে ঘাম দিচ্ছে।নম্রতার হঠাৎ এমন পরিবর্তনে অবাক হলো আরফান। এই মেয়েকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না আরফান।মেয়েটা যেন কেমন ধারার। সব সময় হুটহাট এসে ঝামেলা বাঁধিয়ে দিয়ে আবার কোথায় হারিয়ে যায়। সেদিন

ল্যাপটপটা ফেলে দিয়ে কি ভয়ানক ঝামেলাতেই না ফেলে দিল আরফানকে। তারপর আবার এক লঞ্চ মানুষের সামনে নাটক ফাটকও করে ফেলল। চেম্বারে এসে গালি দিয়ে আবার যেচে পড়ে সরিও বলল। আবার কী সব অভদ্র ব্যবহার করল কাল রাতে। এখনও কী নতুন কোনো ঝামেলা করতে চাইছে নাকি এই মেয়ে? আরফান কপাল কুঁচকে

নম্রতার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে। মেয়েটা এখন বিশ্রীভাবে কাঁপছে। যেকোনো সময় রিকশা থেকে পড়ে গিয়ে মাথা টাতা ফাটিয়ে কেলেংকারী করে ফেলতে পারে। আরফান তীব্র অস্বস্তি নিয়ে নম্রতার ডানহাতটা ধরল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি ঠিক আছেন?’নম্রতা টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জবাব দিল না। আরফান রিকশা দাঁড় করিয়ে

পাশের এক রেস্টুরেন্ট থেকে পানির বোতল কিনে আনল। নম্রতাকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ আপনার শরীরটা বোধহয় ভালো নেই। রেস্টুরেন্টে বসবেন একটু?’

নম্রতা কোনরকম মাথা নাড়ল। যার অর্থ, সে রেস্টুরেন্টে বসবে। আরফান একরকম বাধ্য হয়েই দুর্বল নম্রতার এক হাত ধরে রাখল। নম্রতাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সময়

নিয়ে হাতের নাড়ি পরিক্ষা করল। তারপর সেই অদ্ভুত চাহনিটা নম্রতার চোখে মেলে ধরে বলল,‘ আপনার শরীর আসলেই ঠিক নেই। লাস্ট চেকআপ কবে করিয়েছেন? মনে তো হচ্ছে, প্রেশার লো। আপনার এখনই কিছু খাওয়া উচিত। নয়ত সেন্সলেস হয়ে যেতে পারেন।’

কথা বলতে বলতেই ওয়েটারকে ডেকে কিছু খাবার অর্ডার করল

আরফান। অর্ডার দিয়ে ওয়েটারকে বিদায় করার পর ঘাড় ফেরাতেই অসচেতন দৃষ্টি রেস্টুরেন্টের দেয়ালে থাকা ঘড়ির ওপর আটকে গেল, পাঁচটা বিশ। আরফান সময়টা নিজের মনে বিরবির করে সটান উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ডানহাতের কব্জির ওপর থাকা ঘড়িটিতে চোখ বুলাল। মুখ থেকে অস্পষ্ট বেরিয়ে এলো, 'ওহ শিট!'

নম্রতার দিকে তাকিয়ে অস্থিরতার সাথে বলল,‘ দেখুন মিস.নম্রতা মাহমুদ। আমি বুঝতে পারছি মানবতার খাতিরে হলেও এই মুহূর্তে আমার আপনার সাথে থাকা উচিত। কিন্তু আমার একটু তাড়া থাকায় আমি পারছি না। কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝে এই

সময়টুকু শুধু তার। আমি অলরেডি লেইট।’

এটুকু বলে থামল আরফান। টেনশন আর অস্থিরতায় অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথা বলছে সে। আরফান বড় শ্বাস টেনে নিয়ে নিজেকে শান্ত করল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি খাবারটা খেয়ে নিলেই বেটার ফিল করবেন। আমি

রিকশাটা বাইরে রেখে যাচ্ছি। আপনি যেখানে যেতে চাইবেন সে পৌঁছে দিবে। রিকশাচালক আমার পরিচিত। ওকে? আমি আসছি।’কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত দেরী করল না আরফান। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে। নম্রতা অবাক চোখে পুরো ব্যাপারটা দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কে অপেক্ষা করছে এই অদ্ভুত চাহনির

লোকটির জন্য? প্রিয় কেউ? নিশ্চয় প্রিয় কেউ, নয়তো অতো হন্তদন্ত আর অস্থির কেউ হয়? নম্রতার মনটা আবারও বিষাদময় হয়ে উঠল। এই অসভ্য লোকটিও তার প্রিয় মানুষটিকে কত কত ভালোবাসে। তার জন্য কেমন অস্থির হয়ে পড়ে! অথচ নম্রতার সে? তবে কি ভালোবাসা সব সময় ভালোবাসা হয় না? মাঝে মাঝে ভালোবাসাটা

ভুলবাসা, মিথ্যাবাসাও হয়? নম্রতার সে-ও কি তবে মিথ্যে বেসেছিল তাকে? সত্যবাসেনি। একটুও ভালোবাসেনি। একটুও না। নয়তো ওভাবে বিয়ের জন্য রাজি হয় কেউ? কই! নম্রতা তো হয় না।বারান্দার গ্রিলে ল্যাপ্টে থাকা লতানো গাছটির নাম জানা নেই নম্রতার। লাল টুকটুকে ফুল ফোটে থাকা গাছটির নাম কী হতে পারে, ভাবতে ইচ্ছে

করছে না। কুঞ্জলতা, তরুলতা,মাধবীলতা টাইপ কিছু হবে নিশ্চয়? হলে হোক। ফুল গাছের নাম নিয়ে নম্রতার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। নাম দিয়ে ফুল বিবেচনা করাটা বোকামো। ফুল হলো সৌন্দর্যের প্রতীক। ভালোবাসার প্রতীক। ফুল দেখে আকৃষ্ট হওয়ার নিয়ম আছে, নাম জানতেই হবে এমন কোনো নিয়ম

নেই। পৃথিবীর প্রায় সব ফুলই সুন্দর হয়। কিন্তু সব ফুলের নাম সুন্দর হয় না।এইযে, “রেড স্পাইডার লিলি” নামের ফুলটির আরেকটা অদ্ভুত নাম হলো, “মৃতদেহ ফুল”। কি আশ্চর্য! ফুলের মতো সজীব, প্রাণোবন্ত একটি উদ্ভিদের নাম এমন বিদঘুটে কেন হবে? ফুলের নাম শুনেই যদি চোখের সামনে ফ্যাকাশে,ভয়ঙ্কর মৃতদেহের ছবি

ভেসে উঠে তাহলে তো চলবে না। ফুলের নাম হতে হবে স্নিগ্ধ, আবেগী। নম্রতার ইচ্ছে হলো ওই লাশ, ফাঁসের জনককে ধরে এনে বলে, ‘ ইউ রিয়েলি নিড টু ইম্প্রুভ ইউর কমনসেন্স, ডাফার।’ কিন্তু বলা হলো না। আমাদের জীবনে সব ইচ্ছে পূরণ করার জন্য হয় না। কিছু ইচ্ছে শুধু ইচ্ছে করার জন্যই হয়। নম্রতার এই ইচ্ছেটাও তাই। সুতরাং,

ইচ্ছে পূরণের অ◌াবশ্যকতা নেই। নম্রতা ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। টকটকে লাল ফুলগুলোতে আলতো আঙ্গুল ছোঁয়াল। সাথে সাথেই মসৃন, শীতল এক অনুভূতি খেলে গেল ডানহাতের তালুই।ফুলগুলো কী অদ্ভুত লাল! নম্রতার মাথাতে চট করেই কড়া নেড়ে গেল এক অদ্ভুত নাম। মুহূর্তেই এই অপরিচিত ফুলটির নাম ঠিক ফেলল নম্রতা।

আজ থেকে এই ফুলের নাম হবে, রক্ত ফুল। blood flower। এই ফুলের নাম শুনতেই চোখে ভাসবে থোকা থোকা তাজা রক্ত। নম্রতার উলোটপালোট চিন্তার মাঝেই আর্তনাদ করে উঠলো একজোড়া কুকুর। নম্রতা গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাল। কুকুরগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। নিকষ কালো অন্ধকারে, তিনতলার ওপর থেকে কুকুরের

অবস্থান টের পাওয়ার কথা নয়। কুকুরগুলো আবারও ডাকছে। আচ্ছা? এই মাঝরাতে কোনো এক গোপন কষ্টে নম্রতার মতো তারাও কি কাঁদছে? দূর থেকে ভেসে আসা ওই ডাকে কী বিষণ্নতার ছাপ আছে? নিশ্চয় আছে। নয়তো তাদের আর্তনাদে অন্ধকারটা আরও একটু বিষণ্ন আর গাঢ় লাগছে কেন নম্রতার?নম্রতার বুক চিড়ে বেরিয়ে

এলো আরও একটি দীর্ঘশ্বাস। হলের পাশে ঝোপের মাথায় দুই একটা ঝিঁঝি পোকা নির্বিকার আলো ছড়াচ্ছে। নম্রতার বিষণ্ন চোখে তাদেরকে হঠাৎ-ই আকাশ থেকে খসে পড়া জীবন্ত তারা বলে বোধ হচ্ছে। সেগুলো যেন আকাশব্যাপী ছড়ানো ছিটানো তারক ফুলের মালা! নম্রতা এক সমুদ্র বিষণ্নতা নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। তার চোখে

রাজ্যের কান্না। বেশ কিছুক্ষণ চাঁদহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর নম্রতার মনে হলো, তার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। এক বুক অসহায়ত্ব নিয়ে জীবনের চাকাটা ঘুরতে চাইছে না। এবার তার বিশ্রাম চাই। আদরমাখা বিশ্রাম। কাছাকাছি কোথাও আবারও ডেকে উঠল সেই জোড়া কুকুরের দল। নম্রতা চোখ নামিয়ে আবারও নিচের দিকে

তাকাল। কুকুরের তীক্ষ্ণ আর্তনাদের সাথে মিলেমিশে ঘড়িতে বারোর ঘন্টা বাজল। সেই সাথে বাজল মৃদু ম্যাসেজ টুন। নম্রতা ক্লান্ত চোখে ফোনের দিকে তাকাতেই চোখে-মুখে বিস্ময় খেলে গেল। নোটিফিকেশনে 'আরফান আলম' নামটা চোখে পড়তেই নিজ দায়িত্বে কুঁচকে গেল ভ্রু জোড়া।' আপনি এখন কেমন আছেন? '

কাল রাতে দেওয়া অতোগুলো উলোটপালোট ম্যাসেজের পর আরফান যেচে পড়ে নক দিয়েছে ভাবতেই বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল নম্রতার চোখে-মুখে। নম্রতা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেশ রয়ে সয়ে উত্তর দিল,

‘ ঠিক আছি। আপনি?’

‘ আলহামদুলিল্লাহ।’

আরফানের এমন উত্তরের পর বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না নম্রতা। কী বলবে, কী বলা যায় এসব ভাবতে ভাবতেই আরফান লিখল,

‘ আপনাকে ওই অবস্থায় ফেলে আসার জন্য দুঃখিত। আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। দিনের ওই সময়টাতেই ব্যক্তিগত মানুষগুলোকে একটু সময় দেওয়ার চেষ্টা করি। সরি, এগেইন।’

নম্রতা নিজের মনে হাসল। হুট করেই প্রশ্ন করে ফেলল,

‘ প্রিয় মানুষটিকে ভীষণ ভালোবাসেন। তাই না?’

ম্যাসেজ সীন হলো কিন্তু উত্তর এলো না। নম্রতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে খানিকটা অপ্রস্তুত হলো। তাড়াহুড়ো করে লিখল,‘ সরি! এভাবে আপনার পার্সোনাল বিষয়ে প্রশ্ন করাটা উচিত হয়নি আমার।’

‘ ইট’স ওকে। প্রশ্নটা ততটাও ব্যক্তিগত ছিল না। তাকে আমি ভীষণ নয় হয়ত তার থেকেও বেশি ভালোবাসি। এজন্য তার বরাদ্দ সময়টুকুর এক বিন্দুও অন্যকাউকে দিতে সাহস পাই না। পাছে, রেগে যায় বা কষ্ট পায়। বয়োজ্যেষ্ঠরা বলে, মেয়েদের রাগ নাকি সাংঘাতিক। আমি সাংঘাতিক রাগে ভস্ম হতে চাই না।’

কালো মেঘে ডুবে থাকা নম্রতার মনটা একটু নড়েচড়ে উঠল। ভালোবাসা নামক অনুভূতিটা এত অদ্ভুত কেন? ভালোবাসার ছোট্ট একটা গল্প শুনলেও এত সুখ সুখ অনুভূতি হয় কেন? বুকের কোথাও একটা তীক্ষ্ণ ঈর্ষা জাগে আবার সেই মন-ই মিষ্টি আনন্দ নিয়ে প্রার্থনা করে, বেঁচে থাকুক ভালোবাসা। সুখে থাকুক ভালোবাসা-বাসীর

মানুষগুলো। কি আশ্চর্য এই নিয়ম! কি আশ্চর্য এই মন! নম্রতা ছোট্ট শ্বাস টেনে নিয়ে উত্তর দিল,' কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয়। মেয়েদের রাগ সত্যিই সাংঘাতিক। তবে তারা বিনা কারণে রাগ করে না। রাগের পেছনে শক্ত কোনো কারণ থাকে।'

ওপাশ থেকে উত্তর এলো,

' তাই নাকি? পৃথিবীতে তাহলে আপনিই একমাত্র নারী যার রাগের

পেছনে কোনো কারণের প্রয়োজন হয় না। অযথা রণচণ্ডী রূপ নিয়ে ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলেন।’

আরফানের ম্যাসেজে কপাল কুঁচকে গেল নম্রতার। বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ ঝামেলা বাঁধিয়ে ফেলি মানে কী? আপনি কী মাঝরাতে ঝগড়া করার জন্য নক দিয়েছেন আমায়?’

আরফান যেন বেশ বিস্মিত হলো। বলল,

‘ ঝগড়া আর আমি? আমি ঝগড়া করি না। সত্যটা বললাম। ঝগড়া করাটা আপনার স্বভাব আমার নয়।’

নম্রতা ফুঁসে উঠে বলল,‘ আপনি অসহ্য একটা মানুষ। আমি কখনই অযথা ঝগড়া করি না। আপনিই সেই কালপ্রিট যে প্রথম থেকে আমায় বিরক্ত করছেন।’

‘ ওসব ছাড়ুন। অনাধিকার চর্চা না হলে একটা কথা বলি? নিষাদকে

ভালোবেসে খুব একটা সুখী আপনি হবেন না। আপনি বরং তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন।'

আরফানের ম্যাসেজ দেখে বেশ অবাক হলো নম্রতা। লিখল,

' আপনি অনুমতি চাইলেন ঠিক। কিন্তু অনুমতি দেওয়ার মতো সময়ই দিলেন না। আর নিষাদে কী সমস্যা আপনার? কোনভাবে আপনি ভিলেন হওয়ার চেষ্টা করছেন না তো?

এমনও হতে পারে নিষাদের বিয়ে টিয়ের কথা আদৌ হচ্ছেই না অথচ আপনি বাংলা সিনেমার ভিলেনদের মতো কথা বাড়াচ্ছেন।" সবসময়ই উল্টো বুঝাটা নিশ্চয় আপনার জন্মগত রোগ? আজব কথা-বার্তা। আপনাদের মধ্যে কথা বাড়িয়ে আমার কী লাভ? আমি আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম। বলার পর

বুঝতে পারছি, বলাটা উচিত হয়নি। আল্লাহ হাফেজ।’

ম্যাসেজটা সেন্ট করেই ফোনটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল আরফান। পুরো ব্যাপারটিই ঘটল নিঃশব্দে। কোথাও কোনরূপ শব্দ হলো না। ফোনের কোন প্রকার ক্ষতি হয়েছে বলেও মনে হলো না। ঘরের পরিবেশ রইল আগের মতোই নিস্তব্ধ, শীতল। হুট করে রেগে

যাওয়ার স্বভাব আরফানের নেই। চোখের সামনে ভয়ানক কিছু ঘটে গেলেও রাগ হয় না আরফান। কিন্তু এখন রাগ লাগছে। নিজের উপর প্রচন্ড রাগে মাথা ফেঁটে যাচ্ছে। বিকেলে মেয়েটির এহেন দুর্দশা দেখে সত্যিই খুব মায়া হচ্ছিল আরফানের। তাই ভেবেছিল, মেয়েটাকে একটু সাবধান করা যেতে পারে। কতই আর বয়স হবে

মেয়েটার? বাইশ অথবা তেইশ। কিন্তু মেয়েটা তো ধানী লঙ্কা। সব সময় উলোট পালোট এক্সকিউজ লাগানোর চেষ্টা করে আরফানের গায়ে। আরফানের ভাবনার মাঝেই ম্যাসেজ টুন বাজল। নম্রতার ম্যাসেজ,‘ আল্লাহ হাফেজ পরে বলুন। আগে আপনার বন্ধুর নাম্বারটা দিন। তাহলেই বুঝব আপনি স্টোরি ক্রিয়েট করছেন না-কি না।’

নম্রতার ম্যাসেজে আবারও মেজাজ চটে গেল আরফানের। স্টোরি ক্রিয়েট করছে মানে কী? এই মেয়ে তাকে ভাবেটা কী? আরফানের রাগের পারদ তরতর করে বাড়ছে। নম্রতার আইডিকে ইগনোরে রেখে দিয়ে গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছাঁড়ল আরফান। মেয়েটাকে ব্লক করা যাবে না। আরফান যে রেগে আছে তা ওই উদ্ভট মেয়েকে বুঝতে দেওয়া যাবে

না। বোকারা হুটহাট রেগে যায়, আরফান কখনই বোকাদের দলে পড়ে না। ভবিষ্যতেও পড়বে না। আরফান ফোন রেখে ল্যাপটপটা কোলে তুলে নিল। কাজে মন বসছে না। মেজাজ খারাপ ভাবটা কিছুতেই কাটানো যাচ্ছে না। রাগ আর জেদগুলো দলা পাকিয়ে মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ ব্যথা তৈরী করছে। আরফান দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, এই উদ্ভট, ঝামেলাপূর্ণ

মেয়েটির সাথে কথা বলা তো দূর। তাকে নিয়ে একরত্তিও ভাববে না। বেশিরভাগ মানুষই ভাবনা আর কাজ দুটো গুলিয়ে ফেলে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু আরফান পারে। তার ভাবনা এবং কাজ একই গতিতে চলে। সুতরাং, নম্রতা নামক অতি অদ্ভুত মেয়েটির সাথে যে আরফানের ভবিষ্যৎ কালে

কোনোরূপ কথা হবে না তাতে আরফান মোটামুটি নিশ্চিত, চিন্তহীন। শহরে দিগন্ত নেই। ইট- পাথরে আঁটা বিল্ডিং-এর সারি গুলোকে দিগন্ত বলা যায় কি-না বুঝতে পারছে না নাদিম। নাদিমের হাতে গিটার। কপালে চিন্তার ভাঁজ। অন্যমনস্ক মনে গিটারের তারে উলোট পালোট সুর তুলে দিগন্ত বিষয়ক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে

সে। দুইদিন থেকে নতুন একটা টিউশনি জুটেছে তার। জেলা জাজের মেয়ে। বেতনের অঙ্ক বিরাট। মাসে দশ হাজার তো অবশ্যই। তারসাথে ভিন্ন ভিন্ন নাস্তার ব্যবস্থা। প্রথম সুযোগে টিউশনিটা লুফে নিলেও দুই দিনের মাথাতেই বিরক্ত ধরে গিয়েছে তার। কি-সব অদ্ভুত প্রশ্নে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে মেয়েটা। কাল হঠাৎ বলছে,

‘ফসলের মাঠ দিগন্ত বিস্তৃত হয়। দিগন্ত বিস্তৃত শহরের মাঠ হয় না? এই ধরুন পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠছে। ঢাকা শহরের বিরাট বিল্ডিং-এর পেছন থেকে সূর্য উঠলেও কী সেটা দিগন্ত বিস্তৃত?নাকি অন্যকিছু?’ প্রশ্নটা শুনে নাদিম কিছুটা থতমত খেয়ে গিয়েছে। সাংঘাতিক প্রশ্ন। বিষয়টা এভাবে ভেবে দেখেনি নাদিম। সাইকোলজির স্টুডেন্টদের

দিগন্ত নিয়ে অত ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হয় না। দিগন্ত বিস্তৃত খেলার মাঠ না পাটের ক্ষেত তা নিয়ে ভাবার কাজ বাংলা বিভাগের ছাত্রদের হলেও হতে পারে কিন্তু নাদিমের না। সে গিয়েছে ইংরেজি পড়াতে। ইংরেজি পড়িয়ে চলে আসবে। সেখানে দিগন্ত ফিগন্ত কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। নাদিমের শতভাগ ধারণা

মেয়েটা ইচ্ছে করে নাদিমকে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে। নাদিমকে বিব্রত হতে দেখে পুচকো মেয়েটা ভীষণ মজা পাচ্ছে। বড়লোকের মেয়েদের এই এক সমস্যা।এরা অন্যকে বিব্রত করে আলাদা একটা মজা পায় যা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা করে না। নাদিম ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। সাদা শার্ট পরে চা স্টলের সামনে এসে দাঁড়াল রঞ্জন। গরমে ফর্সা রং-

টা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। পাতলা ঠোঁটজোড়া কিশোরী মেয়েদের মতো হাতে আঁকা, সুন্দর। নাদিম অন্যমনস্ক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। রঞ্জনের মতো এমন সুপুরুষ আজকাল চোখে পড়ে না বললেই চলে। রূপকথার রাজকুমারগুলো হয়ত রঞ্জনের মতোই হয়ে থাকবে। নাদিম হঠাৎ-ই হেসে উঠে বলল,‘ শালা! তোরে

মাঝে মাঝে মাইয়া মনে হয় আমার। তুই সত্যিই পোলা তো? প্রুভ দে তো। আই হ্যাভ বিরাট সন্দেহ। দেখা দেখা।'

রঞ্জনের সুন্দর ভ্রু জোড়া কুঁচকে এলো। ভার্সিটিতে পা রাখতেই বন্ধুর এমন কথায় খানিকটা অপ্রস্তুত হলো। পরক্ষণেই রাগে লাল হয়ে বলল,

‘ একদম মুখ খারাপ করাবি না বলে দিলাম। সকাল সকাল মুখ খারাপ করতে চাই না।’

কথাটা বলে ডানপাশের ব্রেঞ্চটাতে আরাম করে বসল রঞ্জন। ঘন চুলগুলোতে হাত চালিয়ে বলল,

‘ মামা এক কাপ কড়া চা দাও তো। সঙ্গে দুইটা বিস্কুট। তুই নাস্তা করছিস?’

নাদিম গিটারে নিরন্তর বাজনা বাজিয়ে সুর তুলে বলল,‘ পকেটে টাহা নাই মামা। ও মামা রে! পকেটে টাহা নাই আমার। ওওও মামা.... ‘

রঞ্জন হেসে ফেলল। আরেক কাপ চা দিতে বলে এদিক-ওদিক তাকাল। কপালে কুঁচকে বলল,

‘ অন্তু, নম্রতা ওরা সব কই? হারামিরা পড়তে পড়তে মরে যাচ্ছে নাকি?’

নাদিম পাত্তা না দিয়ে বলল,
‘ বাল পড়ছে। ও..’
নাদিমের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথা থেকে ছুটে এলো ছোঁয়া। গায়ে থাকা নীল ফতুয়া কাঁদায় মাখামাখি। এক পায়ে জুতো। অন্য পা খালি। ডানহাতে ব্যাগ আর বাম হাতে এক পাটি ছেঁড়া জুতো। মোটা ফ্রেমের চশমাটা নেমে এসেছে নাকের ডগায়। ছোঁয়ার এমন

অবস্থায় খনিকের জন্য কথা বলতে ভুলে গেল নাদিম, রঞ্জন। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইল। ছোঁয়া হাঁটুতে ভর করে হাঁপাচ্ছে। রঞ্জন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল,‘ এ-কি হাল তোর! এই অবস্থা কেন?’

ছোঁয়া জোরে জোরে শ্বাস ফেলে কিছু বলার প্রস্তুতি নিতেই চোখে-মুখ কুঁচকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বলে উঠল নাদিম,

‘ এই তুই ক্যাডায়? যা ভাগ। ইশ কি বিশ্রী! আমার তো ঘেন্না পাচ্ছে।’ শেষ কথাটা অনেকটা ছোঁয়াকে নকল করে বলল নাদিম। ছোঁয়া টলমলে চোখে একরাশ ক্রোধ নিয়ে তাকাল নাদিমের মুখে। নাদিমের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। এর মধ্যেই রাস্তা-ঘাট উড়িয়ে বাইক নিয়ে এসে পৌঁছাল অন্তু।

বাইরা পার্ক করেই হতবিহ্বল কণ্ঠে বলল,‘ এই বিশ্রী মহিলাটা কে?’ কথাটা বলেই মুখ টিপে হাসল অন্তু। তার সাথে হাসি ফুটলো বাকি দু’জোড়া ঠোঁটেও। ছোঁয়ার রাগ যেন এবার আকাশ ছুঁলো। মুখ ফুলিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে বসতেই লাফিয়ে উঠল নাদিম,

‘ ওই! তুই আমার লগে বসবি না। তুই একটা এলার্জি। আমি

কোনোরূপ এলার্জির পাশে বইতে চাই না। উঠ তুই। উঠ শালী।'ছোঁয়ার চোখ-মুখ দেখে মনে হলো সে যেকোনো সময় ভ্যা করে কেঁদে দিবে। তার এমনিতেই মন খারাপ তারওপর বন্ধুদের ব্যবহারে সে মোটামুটি বিক্ষিপ্ত। তার এখন কেঁদেকেটে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দুই তিন মিনিটের মাথায় নীরা আর নম্রতায় যুক্ত হলো

আড্ডায়। ছোঁয়াকে নিয়ে একটু আধটু চোখ টিপাটিপি করার পর ভীষণ গম্ভীর আর সিরিয়াস হয়ে কাহিনী জানতে চাইল। ছোঁয়া কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে যতটুকু বলল তার অর্থ এই, শাহাবাগের বিশাল জ্যামে আটকে পড়েছিল তার বিশাল বাপের বিশাল পাজেরো গাড়ি। সেই গাড়িতে টানা এক ঘন্টা বসে থাকার পর ছোঁয়ার মনে হলো সে হেঁটে হেঁটে

ভার্সিটি অব্দি আসতে পারবে। এটা আহামরি কঠিন কোনো কাজ নয়। তাছাড়া, একঘেয়েমী জীবনে খানিকটা এডভেঞ্চার হলেও মন্দ হয় না। ভাবনা মতে গাড়ি থেকে নামল ঠিক কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরই বাঁধল এক বিপত্তি। রাস্তার পাশে বাচ্চা কোলে নিয়ে হেঁটে আসছিল এল পাগলী।তার বক্ষদেশ উন্মুক্ত। বাচ্চাটি তার ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত।

জনবহুল একটা জায়গায় এমন বিদঘুটে দৃশ্য দেখে চোখ-মুখ কুঁচকে এসেছিল ছোঁয়ার। খানিকটা ঘৃণাভরে তাকিয়েছিল মাত্র। তাতেই ক্ষেপে গেল পাগলী। বাচ্চা কোলে রেখেই রাস্তার পাশ থেকে একটা ইট তুলে ধেয়ে এলো ছোঁয়ার পিছু। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ‘ তুই তাকাইলি ক্যান। খাঁড়া ছেমড়ি, খাঁড়া।’ সেইসাথে মা-বাপ তুলে অকথ্য

গালি। যার বেশিরভাগের অর্থই ছোঁয়ার অজানা।পাগলীকে ধেঁয়ে আসতে দেখে প্রথমে হাঁটার গতি বাড়িয়ে তারপর দিগবিদিক শূন্য হয়ে দৌঁড়ে পালিয়েছে ছোঁয়া। সেই দৌড়াদৌড়িতেই এই কাঁদা মাখামাখি আর জুতো ছেঁড়া। ছোঁয়ার গোটা কাহিনী শুনে সবাই কিছুক্ষণ চোখ-মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ-ই হুহা করে হেসে উঠল

সবাই। নাদিমের হাসির বহর দেখে মনে হচ্ছে, সে পারলে মাটিতে গড়াগড়ি করে হাসে। নীরা হাসতে হাসতে কেঁদেই ফেলল। ছোঁয়া শুধু বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তার আবারও কান্না পাচ্ছে। যেনতেন কান্না নয়। কান্না করতে করতে পৃথিবী ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। হাসাহাসি শেষ করে ছোঁয়াকে রিক্সায় তুলে বাসায় পাঠিয়ে দিল রঞ্জন।

রিকশাওয়ালাকে সাবধানে চালাতে বলে নম্রতার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ তোর প্রেম কাহিনীর কি খবর জানেমান?’

নম্রতা হেসে ফেলে বলল,

‘ কুত্তা! আবার জানেমান বললে মাইর খাবি।’

পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল,

‘ আমার প্রেমকাহিনী ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। সব কাহিনি

নিষাদ সাহেবের কাছে গিয়ে জট পাকাচ্ছে। নিষাদ সাহেবের সাথে আমার কথা হওয়াটা খুবই জরুরি দোস্ত। কিন্তু ওই ডাক্তার তার নাম্বারটা দিচ্ছেই না। বেয়াদব ডাক্তার।’

রঞ্জন গম্ভীর মুখে বেঞ্চিটিতে বসল। কপালের ভাঁজ গাঢ় হলো। অন্ত প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ কেন! কি বলে ব্যাটায়? নাম্বার দিতে টাকা চায়?’

‘ ধূর! টাকা চাইবে কেন? টাকা চাইলে তো হতোই। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। ব্যাটার সাথে আমার যখনই কথা হয় তখনই কোনো না কোনো একটা ঝামেলা লেগে যায়। এখন তো ম্যাসেজের রিপ্লাই-ই দিচ্ছে না। কিছু একটা কর দোস্ত।’

নাদিম এতোক্ষণ গিটারটা বুকের উপর রেখে বেঞ্চে লম্বালম্বিভাবে

শুয়ে ছিল। নম্রতার কথায় উঠে বসল। দুর্বোধ্য হেসে বলল,

‘ রিপ্লাই কি রে? শুধু রিপ্লাই নয় ব্যাটা আরও অনেক কিছু দিবে। জাস্ট অপেক্ষা বন্ধু। অপেক্ষা।’

নাদিমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চার জোড়া প্রশ্নবিদ্ধ চোখ। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে আর চল্লিশ মিনিট বাকি। আরফান ক্লান্ত চোখে ঘড়িতে চোখ বুলাল। দেয়াল ঘড়ি

থেকে চোখ সরিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। সময়ের হেরফের নেই, পুরোপুরি চারটা বিশ। আরফান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে প্রেসক্রিপশনে মনোযোগ দিল। প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে সামনে বসে থাকা বয়স্ক লোকটির দিকে তাকিয়ে নম্র হাসল। বৃদ্ধ লোকটির মাথায় ধবধবে সাদা চুল। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ চিন্তার ছাপ। এয়ার

কন্ডিশনার যুক্ত রুমে বসেও কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম। আরফান প্রেসক্রিপশনটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল,‘ রিপোর্ট খুব একটা ভালো আসেনি চাচা। এই বয়সে একটু নিয়ম মাফিক না চললে চলে? তবে, এখনই খুব একটা ভয়ের কিছু নেই। সাত দিনের ঔষধ দিয়েছি। ঠিকঠাক ঔষধ খান। ব্যথা কমলে ভালো। নয়তো একজন কার্ডিওলজি

স্পেশালিষ্ট দেখাতে হবে। অযথা চিন্তা করবেন না। তেমন কিছু হয়নি। এই বয়সে এসব স্বাভাবিক। কিছুদিন একটু নিয়ম মাফিক চলুন। দেখা যাক কী হয়।’

আরফানের কথায় বৃদ্ধের চিন্তা কিছু কমলো বলে মনে হলো না। বয়স্ক লোকটির পাশে থাকা জোয়ান মতো লোকটি আরও অস্থির হয়ে উঠল। ছেলেটার বয়স পঁচিশের বেশি হবে

না। চোখে-মুখে একটা আদর আদর ভাব আছে। ছোট থেকে কোলে কোলে বড় হওয়া ছেলেদের মুখে এই ভাবটা বেশি থাকে। একটু আহ্লাদী ভাব। অল্পতেই অস্থির হয়ে উঠাই এদের স্বভাব। আরফান কাটা কাটা চোখে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষন করল। ছেলেটির চোখের দৃষ্টি অস্থির। সে সেই অস্থিরতা নিয়েই প্রশ্ন করল,‘ এনিথিং সিরিয়াস ডক্টর?

উনার এট্যাক ফেট্যাক হওয়ার সম্ভবনা নেই তো? আমি আর দাদু একা বাড়িতে থাকি। হঠাৎ এট্যাক ফেট্যাক হয়ে গেলে ঝামেলা। বাবা জাস্ট খুন করে ফেলবে আমায়।’

আরফান ছেলেটির দিকেই তাকিয়ে ছিল। ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে পুরু ভ্রু’জোড়া খানিকটা কুঁচকে এলো। ছেলেটা বেশি কথা বলে। এই বয়সের ছেলেদের অযথা

বকবক করা শোভা পায় না। কিন্তু এই ছেলেটাকে পাচ্ছে। ছেলেটির কথায় একটু শিশুসুলভ ভাব আছে। আরফান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল। আরফান মেডিসিন ডাক্তার। কার, কখন এট্যাক ফেট্যাক হয়ে যাবে তা তার জানার কথা নয়। তাছাড়া, হার্ট অ্যাটাকটা অধিকাংশ সময়ই আকস্মিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে

সূক্ষ্ম লক্ষ্মণ দেখা যায় না, তা নয়। লক্ষ্মণ দেখা যায়। রুগী সেই লক্ষ্মণগুলো ঠিকঠাক বলতে পারলে এট্যাকের আগেই কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারে চিকিৎসক। তাই বলে এভাবে আগাম জানা সম্ভব নয়। আরফান ডাক্তার বলেই তো আর বলতে পারে না, অমুক সাহেব? আপনি শনিবার সকাল দশটায় হার্ট এট্যাক করবেন। আপনার উচিত

সকাল ছয়টায় হাসপাতালে এসে বসে থাকা। নয়ত কেল্লা ফতে। বিষয়টা ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগছে আরফানের। আরফান মৃদু শ্বাস টেনে বলল,

‘ তা বলতে পারছি না। তবে, ঔষধগুলো ঠিকঠাক নিন। আর অযথা চিন্তা-ভাবনাগুলোকে একদম লাল কার্ড দেখিয়ে দিন। ইন-শা-আল্লাহ এমন কিছু হবে না।’বৃদ্ধ ও

তার নাতির সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে তাদের বিদায় করল আরফান। তাড়াহুড়ো করে আবারও ঘড়ির দিকে তাকাল, চারটা ত্রিশ। এর মধ্যেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল পরবর্তী রুগী। আরফান হাতের কাছের ফাইলগুলো গুছাতে গুছাতে সামনে না তাকিয়েই বলল,

‘ বসুন প্লিজ।’

আগুন্তকঃ নিঃশব্দে বসল। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকাতেই অবচেতন মনটা খানিক চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা পরিচিত প্রশ্নে উথাল-পাথাল হয়ে উঠল, এই মেয়ের এখানে কী? আবারও নতুন কোনো এলিগেশন লাগাতে এসেছে নিশ্চয়? আরফান নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করল,‘ আপনি এখানে?’

নম্রতা ‘ডোন্ট কেয়ার’ ভাব নিয়ে বলল,

‘ ডাক্তার দেখাতে এসেছি।’

আরফান বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ ডাক্তার দেখানোর মতো কি হয়েছে আপনার? দেখুন, ফাজলামো করার মতো সময় আমার হাতে নেই। ইউ মে লিভ।’

‘ আরে! বাইরে ভিজিট দিয়ে, এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে, গোটা দু’ঘন্টা

অপেক্ষা করে তারপর ঢুকেছি। আর আপনি বলছেন চলে যেতে? আশ্চর্য! নিন বসুন, চিকিৎসা করুন।’আরফানের পুরু ভ্রু জোড়া আরও খানিকটা কুঁচকে এলো। নম্রতার প্রতি সে মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত। কাল রাতেই আরফান প্রতিজ্ঞা করেছে নম্রতার সাথে এ-জীবনে দ্বিতীয়বার কথা বলবে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজই

এমন অঘটন ঘটে গেল। নম্রতা নামের মেয়েটা একদম সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। জীবনে প্রথম বারের মতো আরফানের পরিকল্পিত চিন্তা-ভাবনা একদম মাঠে মারা গেল। আরফানের রাগটা আবারও তরতর করে বাড়ছে। আরফান গাল ফুলিয়ে শ্বাস নিল। তারপর নিঃশব্দে টেলিফোনটা তুলে নিল কানে ।

মৃদু,শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল,‘ আর ক’জন পেশেন্ট বাকি আছে আসাদ?’

ও পাশ থেকে ফ্যাসফ্যাসে গলায় উত্তর এলো,

‘ ছিলো কয়েকজন। তাদেরকে আটটার পর আসতে বলেছি স্যার।’

আরফান হালকা কেঁশে গলা পরিষ্কার করল। ইতস্তত কন্ঠে বলল,

‘ মাত্রই যিনি ঢুকলেন তার কাছে এপোয়েন্টমেন্ট আছে?’

‘ জি স্যার। বারো নাম্বার সিরিয়াল। কেন স্যার? কোনো সমস্যা?’

আরফান ক্লান্ত কণ্ঠটা খানিক উঁচু করল। নম্রতা শুনতে পায় এমন করেই বলল,

‘ না। কোনো সমস্যা নেই। আমি আজ আর রুগী দেখব না। বেরুচ্ছি। উনাকে উনার ফিসটা ব্যাক করে দাও।’

আসাদ অবাক হলো। বিনয়ী কণ্ঠে বলল,

‘ আচ্ছা স্যার।’আরফান টেলিফোন নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের হাতলে থাকা এপ্রনটা হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। নম্রতার দিকে ফিরেও তাকাল না। নম্রতা কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল,

‘ আশ্চর্য! পেশেন্ট না দেখেই চলে যাচ্ছেন। এটা কেমন বিহেভিয়ার? আপনারা রুগীদের সাথে এমন ব্যবহার করেন? রুগী যদি এখন মরে টরে যায় তার দায় ভার কে নেবে শুনি?’

আরফান ভ্রু কুঁচকে তাকাল। ঘাড়টা হালকা কাত করে বলল,

‘ আপনি মরে যাচ্ছেন নাকি? কই? দেখে তো মনে হচ্ছে না।’

নম্রতা লাফিয়ে উঠে বলল,‘ বলছেন কি? আপনি এভাবে ফ্লুয়েন্টিলি আমার মৃত্যু কামনা করতে পারছেন? মানবতা বলে কিছু নেই? সাংঘাতিক!’

আরফান এবার চরম বিরক্ত। এই মেয়ের একচুয়াল সমস্যাটা কোথায়? ঝড়ের মতো হুটহাট কোথা হতে আছড়ে পড়ে। আরফানের মন-মেজাজকে লন্ডবন্ড করে দিয়ে

আবার মুহূর্তেই হাওয়া হয়ে যায়। খানিকটা উদ্ভট, খানিকটা আশ্চর্য! আরফান গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছাঁড়ল। যথেষ্ট শান্ত কণ্ঠে বলল,

' দেখুন মিস. নম্রতা মাহমুদ। এটা আমার চেম্বার কোনো পাগলাগারদ বা নাট্যশালা নয়। আপনি প্লিজ আপনারা ড্রামা বন্ধ করুন এবং বাড়ি় যান। আপনার মিথ্যে অসুস্থতার গল্পের থেকে সত্যিকার

অসুস্থ দুটো পেশেন্ট আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্যান ইউ লিভ নাও?’

নম্রতা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল,‘ আশ্চর্য! আপনি আমার সাথে এমন ব্যবহার কেন করছেন ডক্টর? আমার অসুস্থতাটা আপনার কাছে নাটক বলে মনে হচ্ছে? বি জেন্ট্যাল ডক্টর আরফান। আপনি তো নিজেই দেখলেন কতটা

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। দেখেননি? তারপরও অসুস্থ, অসহায় মেয়ের সাথে এমন ব্যবহার? আর আপনার কী ধারনা? টাকা-পায়সা গাছে ধরে? আমি টাকা-পয়সা খুইয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে নাটক করতে চলে আসব? তাও বেছে বেছে আপনার চেম্বারে? আপনি কী আমার প্রেমিক? নাকি আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? কোনটাই তো নয়।

আপনাকে দেখার জন্য মারা যাচ্ছি এমন সাংঘাতিক ঘটনাও কখনও ঘটবে না। তাহলে?’

আরফান এবার খানিকটা নরম হলো। এপ্রনটা চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। চেয়ার টেনে বসে সন্দিহান চোখে তাকাল। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ আচ্ছা। আপনার সমস্যা বলুন।’

নম্রতা রহস্যময় হাসল। আরফান গম্ভীর চোখদুটো মেলে বলল,

‘ কী হলো, বলুন।’

কথাটা বলে আরও একবার ঘড়িতে চোখ বুলাল আরফান। নম্রতা ফট করে বলল,

‘ নিষাদ সাহেবের নাম্বারের চিন্তায় জ্বর উঠে গিয়েছি। মনের থার্মোমিটারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধরা

পড়েছে। আপনি তার নাম্বারটা দিয়ে আমায় জ্বর মুক্ত করুন, ডক্টর।’

আরফান ঘড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে নম্রতার মুখের দিকে তাকাল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ জি?’নম্রতার কথার মূলভাব উদ্ধার করতে আরফানের অন্যমনস্ক মস্তিষ্কে দুই তিন সেকেন্ড সময় নিল। অর্থোদ্বার করার পর চট করেই উঠে

দাঁড়াল আরফান। চোয়াল শক্ত করে বলল,

‘ কী! আপনি কী মজা করতে এসেছেন এখানে?’

নম্রতা বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল,

‘ একদমই নয়। রোগ সারাতে এসেছি। যেহেতু রোগের ঔষধ আপনার কাছে সেহেতু রোগ তাড়ানোর দায়িত্বটাও আপনার। নাম্বারের চিন্তায় রাতে ঘুমোতে

পারছি না। খেতে পারছি না। প্রেশার ফল করছে। তাই ভিজিট দিয়ে নাম্বার নিতে এসেছি। এবারও দিবেন না?’আরফান অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই মেয়ে নির্ঘাত পাগল। আর এই মেয়ের পাল্লায় পড়ে সে রীতিমতো ছাগল। একটা নাম্বারের জন্য এতো কাহিনী করার কোনো মানে হয়? কী এমন সম্পর্ক নিষাদ আর তার? নিষাদের

ইতোপূর্বে কোনো গার্লফ্রেন্ড ছিল কি-না মনে করার চেষ্টা করল আরফান। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। ছাত্র জীবনে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তখন তো এই মেয়ের নিতান্তই বাচ্চা থাকার কথা। নম্রতা আবারও একই কথা বলায় বিরক্ত কণ্ঠে বলল আরফান,

‘ আপনার ভিজিটের জন্য আমি মারা যাচ্ছি না। বার বার ভিজিট ভিজিট

করবেন না। আপনার টাকা নিয়ে আপনি বিদেয় হোন। নাম্বার আমি দেব না, ব্যস।’

নম্রতা নাক-মুখ ফুলিয়ে বলল,‘ আপনি তো সাংঘাতিক নির্দয় মানুষ। একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এভাবে ঘুরাচ্ছেন।’

আরফান বাঁকা হাসল। টেবিলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল,

‘ ডোন্ট বি সো সিলি মিস.নিম পাতা। আপনি নিষ্পাপ হলে এই পৃথিবীতে কনভিকটেড কোনো মানুষ থাকবে বলে মনে হয় না। সবাই নিজেকে ইনোসেন্ট বলেই দাবি করবে।’

নম্রতা রাগী দৃষ্টিতে তাকাল। নিম পাতা? নম্রতাকে এই ডাক্তার ফট করে নিম পাতা বানিয়ে ফেলল?

নম্রতা নিজেও খানিকটা ঝুঁকে এলো টেবিলে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ আপনি নাম্বার দেবেন কি-না বলুন।’

আরফান ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে বলল,

‘ দিব না।’নম্রতা বুঝলো, এই লোকের সাথে শক্ত হয়ে লাভ নেই। এই লোক নিদারুণ খেলোয়াড়। নম্রতাকে খুব একটা পাত্তা সে দিবে

না। নম্রতার মস্তিষ্ক বিজ্ঞের মত উপদেশ দিল,

‘ চোখ বন্ধ করে অপমান সয়ে নে, নমু। বিপদের সময় অপমান গায়ে মাখতে নেই। তেল দে। এই আরশোলাকে হালকা পাতলা তেল দেওয়া যেতেই পারে। বেঁচে থাকলে শোধ নেওয়ার অসংখ্য সুযোগ পাবি। ডু ইট ফ্যাস্ট।’

নম্রতা মস্তিষ্কের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আরফানের দিকে মায়া মায়া চোখে তাকাল। মনের ভেতর এক আগ্নেয়গিরি সমান রাগ নিয়ে সে মৃদু হাসল। ইনিয়ে বিনিয়ে বলল,‘ আমাদের পার্সোনাল প্রবলেমগুলো এখানে টানার কী কোনো মানে হয়?একজন দায়িত্ববান পুরুষ হিসেবে এতোটুকু সাহায্য তো

আপনি করতেই পারেন। তাছাড়া, একটা ফোন নাম্বারই তো...’

এমন অসংখ্য নরম কথাতেও আরফানের মন গললো বলে মনে হলো না। সে অস্থির ভঙ্গিতে বারবার ঘড়ি দেখতে লাগল। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজতেই তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াল আরফান। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ টাইমস্ আপ। আমায় যেতে হবে।’

নম্রতা গো ধরে বলল,‘ আমার প্রেসক্রিপশন না দিলে আমি যাব না। ভিজিট দিয়ে এসেছি। বিনে পয়সায় নয়।’

আরফান নম্রতার দিকে তাকাল। আবারও ভিজিট ভিজিট করছে মেয়েটা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আরফানকে সে কোটি টাকা ডোনেশন দিয়ে ফেলেছে। অসহ্য। আরফান একটা কাগজ টেনে নিয়ে

কিছু একটা লিখল। তারপর নম্রতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ আই ডোন্ট ওয়ান্না মিট ইউ এগেইন মিস. নম্রতা।’

নম্রতা কাগজটা হাতে নিল। খুশি হয়ে বলল,

‘ মি টু।’শব্দ দুটো উচ্চারণ করেই কাগজের দিকে তাকাল নম্রতা। আরফান ততক্ষণে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সাদা কাগজে

ইংরেজিতে লেখা শব্দগুলো দেখে চোখ বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো নম্রতার। কাগজের ঠিক মাঝখানে লেখা,

‘ You are mad. I don’t wanna meet you again.’নম্রতা প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ তারপর আশাহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কাগজটির দিকে। রাগে দুঃখে কাগজটি দুমলে মোচড়ে ফেলে দেওয়ার ঠিক আগ

মুহূর্তে কাগজের অপর পৃষ্ঠায় থাকা এগারো ডিজিটের নাম্বারটি চোখে পড়ল তার। নম্রতা খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল। শেষমেশ নিষাদের নাম্বারটা পেল সে। সত্যিই পেল? এবার নিশ্চয় জবাব মিলবে? এতো বছরের জমিয়ে রাখা প্রশ্নের জট খুলবে?বর্ষার শেষ। তবুও সারাদিন ব্যাপী মুশলধারার বৃষ্টি। নাদিম পাজেরো সেডান গাড়িতে বসে

আছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘোলা হয়ে আসছে উইন্ড শিল্ড। ড্রাইভার উইপারগুলো সক্রিয় করে দিয়ে হালকা কাঁশলো। মুখভঙ্গি গম্ভীর করে বলল,

‘ শাহবাগের রাস্তায় দুই দিন আগে গর্ত খুঁড়া হয়েছে। বৃষ্টির পানি জমে নাজেহাল কান্ড। গাড়ি যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনার এখানেই নামতে হবে।’নাদিম বিরক্ত চোখে

তাকাল। বাইরে টানা বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে বেরুনো মাত্রই কাক ভেজা নিশ্চিত। এই চকচকে লাল পাজেরো গাড়িটা তার নয়। তার বড়লোক ছাত্রী মৌশির। টিউশনি করে ফেরার সময় একরকম জোর করেই গাড়িতে উঠানো হয়েছে তাকে। প্রথম দফায় মুখ-চোখ গম্ভীর করে 'না' হেঁকেছিল নাদিম। এসব চকমকে গাড়িতে চলার অভ্যাস তার

নেই। সে মাটির মানুষ, দুই-এক ঘন্টার বৃষ্টিতে কিছু হয় না। কিন্তু বড়লোক বাবার মেয়েদের মধ্যে একটা ন্যাকা ন্যাকা ভাব থাকে। এরা 'রিজেকশন' জিনিসটা সহ্য করতে পারে না। অল্পতেই চোখ-মুখ অন্ধকার করে টলমলে চোখে তাকায়। সুন্দরী মেয়েদের টলমলে দৃষ্টি উপেক্ষা করা কঠিন। নাদিমও পারেনি। এক সমুদ্র বিরক্তি নিয়ে

চকচকে গাড়িতে উঠতে হয়েছে। সেইসাথে ড্রাইভার নামক উল্লুক বস্তুটির বক্র চাহনীর শিকার হতে হয়েছে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েরা যতটা ঢঙ্গী হয়, তাদের ড্রাইভারগুলো হয় ততটাই হারামি। এদের ভাবসাব গাড়ির মালিক থেকেও উঁচু। মালিকের সুন্দরী মেয়েরা নাদিমের মতো ছাল-চামড়াহীন উদ্ভট ছেলেদের দিকে মায়া মায়া চোখে

তাকালেই এদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দৌঁড়াতে শুরু করে। ওসব ছাল-চামড়াহীন ছেলেগুলো হয়ে দাঁড়ায় রাজ্যের বিতৃষ্ণার বস্তু। যেন সুযোগ পেলেই রাজত্বসহ রাজকন্যা নিয়ে ভেগে যেতে পারে এসব ভন্ড ছেলের দল। নাদিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ বাইরে তো বৃষ্টি। এখানে নামলে ভিজে যাব না?’

‘ এমনিতেও তো ভিজেই আসতেন। সামনে রাস্তা খারাপ থাকলে আমি কী করব? পানি ঢুকে ইঞ্জিন গেলে, স্যার তো ছেঁড়ে কথা বলবে না।’

নাদিমের মেজাজ চটে গেল। সে-কি ইচ্ছে করে গাড়িতে উঠেছে নাকি? যেচে পড়ে গাড়িতে তুলে এসব রং-ঢং অপমানের মানে কী? নাদিম তার নিজের ক্যারেক্টারে ফিরে এলো। পেছনের সীটে গা এলিয়ে দিয়ে ড্যাম

কেয়ার ভাব নিয়ে বলল,‘ অন্য কোনো রাস্তা ধরুন। শাহবাগ যাওয়ার আগে আমি নামব না।’

ড্রাইভার সন্দিহান চোখে তাকাল। বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ অন্য কোনো রাস্তা চিনি না। সব রাস্তায় জল আটকে আছে। আপনাকে এখানেই নামতে হবে।’

‘ আপনার ম্যাডামকে ব্যাপারটা জানান। উনি কী বলেন শুনেই নেমে যাব।’

ড্রাইভার ঢোক গিলল। ফন্ট গ্লাসে নাদিমের দিকে কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপচাপ বসে রইল। নাদিমকে চিন্তাহীন বসে থাকতে দেখে বাধ্য হয়েই ম্যাডামকে ফোন লাগাল। দুই এক মিনিট হু-হা করে চরম বিরক্তি নিয়ে গাড়ি চালাতে মন দিল। কয়েক

মিনিট চলার পর নাদিম তার নিজস্ব কায়দায় বলল,
‘ ওই মিয়া? গাড়ি থামাও।’
ড্রাইভার কপাল কুঁচকে বলল,
‘ কেন? ছোট ম্যাডাম আপনাকে হলের সামনে নামিয়ে দিতে বলেছে।’‘ একটা থাপড়া দিয়া গাল লাল কইরা ফেলমু। যা কইছি করো। গাড়ি থামাইতে কইছি থামাবা, ব্যস।’

মুহূর্তেই নাদিমের কথার টুন পরিবর্তন হওয়ায় খানিকটা থমকে গেল ড্রাইভার। গাড়ি থামিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। নাদিম ভরা বৃষ্টিতে গাড়ি থেকে নামল। জানালার কাঁচে টোকা দিয়ে কাঁচ নামাতে বলল। ড্রাইভার যন্ত্রের মতো গাড়ির কাঁচ নামাল। নাদিম জানালায় দু-হাত রেখে শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তোর ম্যাডামকে গিয়া বলবি এইসব বাল-ছালের গাড়িতে আমি উঠি না। আর হ্যাঁ, পরের বার আমার সামনে এমন পার্ট দেহাইলে জিগারের ডাল দিয়া পিটাইয়া তোর পার্ট ছুটাই দিমু। বুঝছিস কি কইছি?’

নাদিমের কথায় হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইল ড্রাইভার। চোখে-মুখে অবিশ্বাস। ড্রাইভারের হতভম্ব দৃষ্টিকে

উপেক্ষা করে নাদিম শাহাবাগের দিকে হাঁটা দিল। চাল-চলনে অদ্ভুত এক সুখ সুখভাব। ভিজে চুপচুপে ফ্যাকাশে শরীরটাতে যেন অনাবিল শান্তি। ড্রাইভারের হতভম্ব দৃষ্টি হঠাৎ-ই সরে গেল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল, হাতিরপুল থেকে শাহাবাগ হেঁটে হেঁটে যাবে নাকি লোকটা? নাদিম উদ্দেশ্যহীন হাঁটছে। চাল-

চলনে কোনো তাড়া নেই। হাঁটু সমান জলে অযথা দৌঁড়া-দৌঁড়ির কোনো মানে হয় না। আস্তেধীরে হাঁটলেও সন্ধ্যার আগে ভার্সিটির নির্দিষ্ট হলে পৌঁছে যাওয়া যাবে । অতো অস্থির হয়ে লাভ নেই। জীবনটা ছোট। এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করায় বুদ্ধিমানের কাজ। নাদিম নিজেকে বুদ্ধিমান বলেই দাবি করে। এইযে হাঁটু সমান পানিতে পা

উঁচিয়ে উঁচিয়ে হাঁটছে, এই হাঁটাটাও বেশ উপভোগ করছে নাদিম। নতুন ভঙ্গিতে হাঁটতে তার ভালো লাগছে। তাছাড়া, সঙ্গীহীন পথচলায় মুক্ত মস্তিষ্কটা মৌশির কথা ভাবারও সময় পাচ্ছে। এটা প্রয়োজন। মৌশিকে নিয়ে হালকা-পাতলা ভাবার প্রয়োজন তার আছে। নাদিমের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, মৌশিকে খুব বেশিদিন পড়ানো তার হবে না। মোটা অঙ্কের

বেতনের জন্য এতোদিন টিকে থাকলেও সেই টিকে থাকাটা বেশিদিন টিকে থাকবে না। মেয়েটার চাহনী অন্যরকম। কিশোরী মেয়েদের চাহনীতেই সমস্যা। তার থেকেও বড় সমস্যা এরা নাদিমের মতো উলোটপালোট, উশৃংখল ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। নম্র-ভদ্র, সুশৃঙ্খল ছেলেদের প্রতি তাদের তেমন ফ্যান্টাসি কাজ করে না।

মেয়েটা ইদানীং নাদিমের কথায় মুগ্ধ হতে শুরু করেছে। নাদিমের অপছন্দীয় কথাগুলো আজকাল তার ভালো লাগছে। বিষয়টা চিন্তার। ভীষণ চিন্তার।বারান্দার কোণায় টিমটিমে আলো জ্বলছে। হলদে আলো। বারান্দার রেলিং, মেঝে সব ভিজে একাকার। ফ্লোরের কোণায় পানি জমে আছে। নম্রতা পানিটুকুকে পাশ কাটিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল।

চোখের সামনে কালো, অন্ধকার আকাশ। ঠান্ডা, শীতল পরিবেশে শীত শীত করছে নম্রতার। আবার মুহূর্তেই ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। হাতে ধরে রাখা মোবাইলটির দিকে তাকাতেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে নীরাকে ভীষণ প্রয়োজন ছিল তার। কিন্তু নীরা নেই। কাল দুপুরেই প্রয়োজনীয় ফোন পেয়ে বাড়ি ছুঁটেছে সে। নম্রতা কাঁপা কাঁপা

হাতে নিষাদকে কল করল। প্রতিবারের মতো এবারও কল ঢোকার আগেই কেটে দিল। ঝপঝপে ভেজা ফ্লোরটাতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সে। আবারও গরম লাগছে। প্রচন্ড গরম। সেই সাথে পানি পিপাসা।নিষাদকে কল করার সাহস বা শক্তি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। নিষাদকে কল করার পর অবশিষ্ট আশাটুকুও যদি নিরাশা হয়ে

যায়? তখন কী নিয়ে বাঁচবে নম্রতা? মোবাইলটা কোলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ উদাসীন বসে রইল নম্রতা। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। প্রচন্ড ঝড়ের পূর্বাবাস হিসেবে নেচে উঠল গাছপালা। শাখা-প্রশাখার আন্দোলনে চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠল। কিন্তু নম্রতার সাড়া নেই। কালো মায়াময় চোখদুটো মেলে তাকিয়ে আছে বহু দূরে। দৃষ্টি শূন্য। বেশ কিছুক্ষণ

কেটে যাওয়ার পর নম্রতা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিল। নিজেকে শক্ত করে নিষাদের নাম্বার ডায়াল করল। প্রথমবার বাজল, রিসিভ হলো না। অধৈর্য নম্রতা আবারও ডায়াল করল। কল কেটে যাওয়ার আগ আগ মুহূর্তে কল রিসিভ হলো। ওপাশ থেকে গম্ভীর ভরাট কণ্ঠে সালাম দিয়ে উঠল কেউ। নম্রতা হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পেল না।

গলা থেকে কথা বেরুচ্ছে না। বহু কষ্টে সালামের জবাব নিতেই ওপাশ থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ জি, কে বলছেন?’

‘ আপনি নিষাদ সাহেব?’

ওপাশ থেকে খুশ-মেজাজী উত্তর,

‘ সাহেব কি-না বলতে পারছি না তবে নিষাদ নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি কে? মাফ করবেন, চিনতে পারছি না।’

নম্রতা ভেতরের উথাল-পাতাল চিন্তাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমি নম্রতা। নম্রতা মাহমুদ।’

‘ নম্রতা! আপনাকে কী আমার চেনার কথা? আসলে, এই নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। কিছু মনে না করলে আরেকটু ডিটেইলস পরিচয় দেওয়া যাবে? আমার চেনার মতো।’

নম্রতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,
‘ আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল মাস খানিক আগে। কক্সবাজারে। আপনার বন্ধুর সাথে একটা ঝামেলা বেঁধে গিয়েছিল আমার। মনে পড়েছে?’ওপাশে কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর উৎসাহী কণ্ঠে উত্তর,

‘ আরে! চিনতে পেরেছি। সরি প্রথমটায় গুলিয়ে ফেলেছিলাম। কেমন আছ?’

নিষাদের কথায় খানিকটা থমকাল নম্রতা। নিষাদের কথার টুন পাল্টে গিয়েছে। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, নিষাদ তার পূর্ব পরিচিত। বহু বছর পর হঠাৎ তাদের কুশলাদি বিনিময় হচ্ছে। নম্রতা একটু চুপ থেকে বলল,

‘ আপনি আমায় চিনেন?’

নিষাদের স্বাভাবিক উত্তর,

‘ চিনব না কেন?’

‘ কিভাবে চিনেন?’

‘ তুমি যেভাবে চেনো সেভাবেই।’

নম্রতা বুঝতে না পেরে বলল,

‘ মানে?’

নিষাদ উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ তুমি হঠাৎ আমায় ফোন করলে? কোনো প্রয়োজন ছিল?’

নম্রতার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই লোকটি ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছে না, নাকি নম্রতা ঠিকঠাক প্রশ্নই করতে পারছে না? নম্রতা কি সোজাসাপ্টা জিগ্যেস করবে? নম্রতাকে চুপ থাকতে দেখে ওপাশ থেকে বলল,

‘ হ্যালো! হ্যালো? নম্র? শুনছ?’

নম্রতা ফট করেই প্রশ্ন করল,

‘ আপনিই কী সে?’

‘ তুমি আমাকে খুঁজছিলে। তো, আমি যে সে হবো এটাই স্বাভাবিক।’

নম্রতা কী বলবে বুঝতে পারছে না। নিষাদ কথার প্রেক্ষিতে কথাটা বলল নাকি সবটা বুঝে বলল সেটাও বুঝা যাচ্ছে না। নম্রতা বুঝল এভাবে সম্ভব নয়। সরাসরি কথা বলে মিটমাট করতে হবে। তাছাড়া, কথাগুলোও গুছিয়ে নিতে হবে। নম্রতার সময় দরকার। নম্রতা বেশ

ভেবেচিন্তে বলল,‘ আমি খুব প্রয়োজনে ফোন দিয়েছি আপনাকে। কিন্তু প্রয়োজনটা ফোনে বুঝাতে পারছি না। আপনার সাথে একটু দেখা করা যাবে? প্লিজ?’

নিষাদ খানিক চুপ থেকে বলল,

‘ আমার সাথে দেখা করতে হবে কেন?’

‘ দেখা হলে বলি?’

নিষাদ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ বেশ! তবে আজ-কালের মধ্যে সম্ভব হবে না। বাবা আর মাকে নিয়ে রাজশাহী এসেছি। এখানে পার্সোনাল কিছু সমস্যার জন্য দু-চারদিন থাকতে হচ্ছে। আমি ঢাকায় ফিরে তোমায় কল দিই?’

অনিশ্চিত সময়ের অপেক্ষায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল নম্রতা। ছোট্ট করে বলল,‘ আচ্ছা।’

ওপাশ থেকে হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বলে উঠল নিষাদ,

‘ পড়াশোনা কেমন চলছে? নাকি এখনও ফাঁকিবাজি চলে?’

নিষাদের একটা প্রশ্নেই দুনিয়া ঘুরে গেল নম্রতার। কে এই নিষাদ? নম্রতা সম্পর্কে কিভাবে জানে এতো? তাহলে কী সত্যিই নিষাদই সেই? নম্রতার উত্তর না পেয়ে আবারও কথা বলল নিষাদ,

‘ তুমি সত্যিই এতো কম কথা বলো? নাকি পাল্টে গিয়েছ?’

‘ আপনি কে? কিভাবে চিনেন আমায়?’

‘ তুমি জানো না কিভাবে চিনি? তুমি আমাকে চিনে ফেলছ অথচ আমি তোমায় চিনব না? অদ্ভুত!’

নম্রতা শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমি আপনাকে চিনি না।’

নিষাদ অবাক হয়ে বলল,

‘ তাহলে খুঁজছ কেন?’
নম্রতা কিছু বলবে তার আগেই ব্যস্ত কন্ঠে বলে উঠল নিষাদ,‘ বাবা ডাকছে নম্র। এখন আর কথা বলতে পারছি না। তোমায় বরং ঢাকায় ফিরে কল করি? রাজশাহীর এই জায়গাটাতে নেটওয়ার্ক একটু স্লো।’
‘ রাজশাহী কি করছেন?’
নিষাদ ইতস্তত করে বলল,

‘ এসেছি দুটো কাজে। এখানে জমিজমা সংক্রান্ত কিছু ঝামেলা হচ্ছে। খারিজ টারিজ করতে স্থানীয় ভূমি অফিসে ভীষণ দৌঁড়ঝাপ চলছে। আর দ্বিতীয় কাজটা হলো বাবা-মা একটা মেয়ে দেখছেন।’

নম্রতার হঠাৎ রাগ লাগল। এই লোক যদি ‘সে’ হয়ে থাকে তাহলে তার ‘সে’ বিয়ে করে ফেলছে? আর

নেচে নেচে সেই খবরও দেওয়া হচ্ছে! নম্রতা তপ্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তো বিয়ে করা হচ্ছে!’

নিষাদ খানিক ইতস্তত করল। খানিক চুপ থাকল। তারপর কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব সহজ করে বলল,

‘ এখনই হচ্ছে না। তবে কথা চলছে। বয়স হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে তো

করতেই হবে। আর বাবা-মাও চাপ দিচ্ছে।’

নম্রতা চাপা তেজ নিয়ে বলল,‘ ভালো। করে ফেলুন বিয়ে। তার আগে..’

নম্রতার কথার মাঝেই বলে উঠল নিষাদ,

‘ আচ্ছা নম্র। বিয়ে নিয়ে আলাপটা পরে করি? আপাতত রাখতে হচ্ছে। বাবা ডাকছে।’

নম্রতা কিছু না বলে ফোন কাটল। মাথা ভর্তি কনফিউশান আর প্রশ্ন নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। জীবনটা এতো কমপ্লিকেটেড কেন? চারপাশে প্রশ্নের পর প্রশ্ন! উত্তরের খাতাটা সব সময়ের মতোই শূন্য। সাদা।আকাশে মেঘ নেই। উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে চারপাশ। ডিপার্টমেন্টের সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা আর তার

বন্ধুরা। নাদিম কিছুক্ষণ পর পর হাঁচি দিচ্ছে। চোখ-মুখ লাল। জিহ্বা বিস্বাদ। মন-মেজাজও চটে আছে খুব। ছোট-খাটো কথাতেই রেগেমেগে গলা চড়াচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। নম্রতার গায়ে সাদা সালোয়ার-কামিজ। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। একটু খেয়াল করলেই চোখের কার্ণিশে দেখা যাবে নির্ঘুম রাতের কালো ছোপ দাগ। অন্তর

গায়ে ঢোলাঢালা টি-শার্ট। হাতে পানির বোতল। কোনো এক অদ্ভুত কারণে কিছুক্ষণ পরপর ঢকঢক করে পানি গিলছে সে। কিছুক্ষণ আগেই ক্লাস শেষ হয়েছে। আড্ডাটাও বেশ জমে এসেছে। আড্ডার মূল বিষয়বস্তু লেখক রিচার্ড ডকিন্সকে নিয়ে যখন সবাই যুক্তি দাঁড় করাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই ধীর পায়ে পাশে এসে দাঁড়াল নীরা। গায়ে

তার সবুজ রঙের শাড়ি। মুখে হালকা সাজের রেখা। নীরা পাশে এসে দাঁড়াতেই থমকে গেল সবাই। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার মুখে। পাঁচ জোড়া চোখের নীরব দৃষ্টিতে নীরা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সবার দিকে চোখ বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করল। ছোঁয়া চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল,‘ শাড়িতে তোকে

হেব্বি লাগছে। কিন্তু, আজ তো ভার্সিটিতে কোনো অকেশন নেই। শাড়ি পরেছিস কেন দোস্ত?’

নাদিম অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল,

‘ তুই কইতে টপকাইলি? তুই না বাড়িত গেছিলি? আর এসব মাঞ্জার কারণ কী? মতলব তো সুবিধার না মামা। বিয়া কইরালাইছস নাকি? দাওয়াত দেস নাই, তোর বিয়া মানি না। ফুট।’

নাদিমের সাধারণ কথাটাতেই উপস্থিত একজনের বুক ধ্বক করে উঠল। গলায় আটকে গেল নিঃশ্বাস। হতভম্ব, অসহায় চোখে চেয়ে রইল নীরার ফর্সাটে মুখে। নীরা হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ তোদের না বলে বিয়ে করব নাকি? বাসা থেকে ছেলে ঠিক করেছে। তার সাথেই দেখা করার কথা আজ। ভার্সিটির পাশের রেস্টুরেন্টটাতেই।

তাই...’কথাটা শেষ করতে পারল না নীরা। তার আগেই একজোড়া চোখে আটকে গেল তার চোখ। সেই পাগলাটে দৃষ্টিতে ভেতরটা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল নীরার। সেই চোখে চোখ রেখেই শক্ত কণ্ঠে কথাটা শেষ করল নীরা,

‘ তাই তোদের সাথে দেখা করতে এলাম। খুব নার্ভাস ফিল করছি। দোয়া কর বিয়েটা যেন হয়ে যায়।’

অন্তুর হাতের বোতলটা ধুমলে মুচড়ে গিয়েছিল সেই অনেক আগে। নীরার কথাটা শেষ হতেই বোতলটা ছুঁড়ে ফেলল দূরে। নিঃশব্দে সরে গিয়ে নিজের বাইকের ওপর বসল। বাইকে স্টার্ট দিতেই চেঁচিয়ে উঠল নাদিম,' ওই হালায়? যাস কই? ক্লাস করবি না?'

নাদিমের কথার কোনোরূপ উত্তর না দিয়েই বাইক ছুটাল অন্তু। সেদিকে

তাকিয়ে থেকে একইসাথে পাঁচটা হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। কিই-বা করার আছে তাদের? নীরার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে হলে জান বের করে ছেড়ে দিত তারা। কিন্তু বন্ধুই যখন বন্ধুর প্রতিপক্ষ তখন যে পরিস্থিতিটা বড্ড অসহায়। বন্ধুর জন্য বান্ধবীকে কী আদৌ কিছু বলা যায়? দুজনেই যে আপন। একদম নিজের।ঘড়িতে

নয়টা বাজে। আকাশটা ঘন মেঘে ঢাকা। রাতের শেষ প্রহরে হুট করেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আকাশ-পাতাল অন্ধকার করা বৃষ্টি। শাহবাগের রাস্তায় হাঁটু সমান পানি। সেই বৃষ্টি আর পানিকে উপেক্ষা করে ভার্সিটিতে ছুটে এসেছে ডিপার্টমেন্টের ছেলেপুলে। চারদিন বাদে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। লাইব্রেরিতে বই আর নোটের বহর।

মৃদু গুঞ্জন তুলে পড়াশোনায় ব্যস্ত সবাই। করিডোর অথবা সিঁড়িতে বসেও চলছে গম্ভীর ডিসকাশন। ফাঁকা ক্লাস রুমেও চার-পাঁচজনের গ্রুপ করে নিরন্তর ছুটে চলেছে গ্রুপ স্টাডি। শুধুমাত্র নম্রতাদের মধ্যে কোনো তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। ক্যান্টিনের চির পরিচিত টেবিলটা ঘিরে অলস বসে আছে তারা। একের পর এক চায়ের কাপ খালি

হচ্ছে কিন্তু বিষণ্নতা যাচ্ছে না। টেবিলে পড়ে থাকা খোলা বইটির দিকে মনের ভুলেও তাকাতে ইচ্ছে করছে না।ছোঁয়া বার কয়েক বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে পড়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। বন্ধুদের থমথমে আড্ডায় বসে থেকে পড়ায় মনোযোগী হওয়া যায় না। চিরপরিচিত ছয় বন্ধুর আড্ডায় অন্তু অনুপস্থিত। দুই-তিনদিন যাবৎ

বন্ধুদের সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ সে করছে না। ফোন তুলছে না। ভার্সিটিতেও দেখা যাচ্ছে না। চারদিন বাদে পরীক্ষা অথচ অন্ত সেমিস্টার ফি পরিশোধ করেনি। নোট জোগার করেনি। বন্ধুরা ব্যাগ, পকেট ঝেড়ে হাত খরচের বাড়তি টাকা জড়ো করে অন্তর সেমিস্টার ফি সামলে নিলেও পরীক্ষায় বসার জন্য আপাতত তাকে চায়। পরীক্ষার

ইতিহাসে সেমিস্টার ফি দিয়েই পাশ মার্ক পেয়ে যাওয়ার ঘটনা বিরল সুতরাং সেমিস্টার লস করতে না চাইলে অন্তত পরীক্ষা দেওয়াটা চাই-ই চাই। কিন্তু অন্তর কোনো হদিস নেই। নোট কালেক্ট বা পরীক্ষার কোনো চিন্তাই তার নেই। নাদিম ফুঁস করে নিঃশ্বাস ছেঁড়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। এক চুমুকে কাপের বাকি চা'টুকু শেষ করে

অন্তর নাম্বারে ডায়াল করল। ‘ফোন রিসিভ হবে না’ এই মানসিকতা নিয়েই ফোনটা লাউডে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথমবারেই ফোন রিসিভ করল অন্ত।‘ বল।’

অন্তর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে থমকে গেল নাদিম। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে ধমকে উঠে বলল,

‘ বল মানে? কই তুই? চারদিন পর পরীক্ষা জানিস না? সেমিস্টার ফি কী তোর শশুর দিবে?’

অন্তু আগের মতোই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ আমি পরীক্ষা দেব না।’

অন্তুর কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না নাদিম। চোখদুটো ছোট ছোট করে ফোনের দিকে তাকাল। সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ মানে?’

‘ আমি পরীক্ষাটা দিচ্ছি না।’

রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে এলো নাদিমের। অন্তর এই দায়সারা কথা বিন্দুমাত্র সহ্য হচ্ছে না তার। দাঁতে দাঁত চেপে ধমকে উঠল,

‘ পরীক্ষা দিচ্ছি না মানে কি? মামার বাড়ির আবদার পাইছিস তুই? সং শুরু করছিস? থাপড়াইয়া গাল লাল করে ফেলব।’

অন্তু শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে বলল,‘ আমার পরীক্ষা আমি দেব কি দেব না তা নিতান্তই আমার ব্যাপার। তাতে তোর কি?’

নাদিম এবার জ্বলে উঠল। রাগে লাল টুকটুকে হয়ে গেল তার ফর্সা মুখ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ফোনটা নিজের হাতে তুলে নিল রঞ্জন। নাদিমকে হাতের

ইশারায় চুপ থাকতে বলে ঠান্ডা গলায় বলল,

‘ কই আছিস দোস্ত?’

‘ আছি ভার্সিটিতেই।’

‘ কোনদিকে?’

‘ স্ট্যাচু পার্ক।’

রঞ্জন অবাক হয়ে বলল,

‘ এই বৃষ্টিতে?’

‘ বৃষ্টি তো এখন নেই।’

রঞ্জন বাড়তি কোনো প্রশ্ন না করে কল কাটল। চোখ তুলে বন্ধুদের দিকে তাকাতেই সবার বুক চিড়ে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। অর্ধেক খাওয়া চা রেখেই স্ট্যাচু পার্কের দিকে হাঁটা দিল তারা। নীরা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল,‘ তোরা যা। আমি বরং এখানেই থাকি?’

নাদিম তেড়ে এসে বলল,

‘ ঢং দেখাও? তোগো এইসব বাংলা ঢং দেখার টাইম আমাগো নাই। বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি জাস্ট। ব্যাংকারকে বিয়ে করবি কর। বন্ধুদের সাথে আগলা ঢং দেখানোর মানে কি?’

নাদিমের কথায় মুখটা ছোট হয়ে গেল নীরার। অসহায় চোখে তাকিয়ে থেকে মাথা নুয়ালো। রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তোরা কি এখন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা ক্রিয়েট করতে চাইছিস? অযথা তর্কা-তর্কী করার মানে কি? নীরু? তুইও চল। অন্তত তো আমাদের একার নয় তোরও ভালো বন্ধু, তাই না? ওর খারাপ সময়ে আমাদের সাথে তোরও উচিত ওর পাশে দাঁড়ানো। ওকে একটু বুঝা। হয়তো ও তোর কথা শুনবে।’নীরা আবারও অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল।

নম্রতা চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করে বলল,

‘ রঞ্জন হয়তো ঠিকই বলছে নীরু। অন্তর উচিত সত্যটা একসেপ্ট করে নেওয়া।’

নীরা মুখ ভার করে বসে রইল। অন্ত তার বন্ধু। ভীষণ পরিচিত। এই ভীষণ পরিচিত মানুষটিকেও হঠাৎ হঠাৎ চিনতে পারে না নীরা। কেমন যেন ভয় হয়। চোখের দিকে

তাকালে আত্মা কাঁপে। তার এই অনুভূতি কি করে বুঝাবে সে? স্ট্যাচু পার্কে শান বাঁধানো একটি বেঞ্চে বসে আছে অন্তু। গায়ে জবজবে ভেজা শার্ট। সবসময় খাঁড়া করে গুছিয়ে রাখা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে। চুল দিয়ে টপাটপ পানি ঝড়ছে। রঞ্জন ধীর পায়ে অন্তুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বন্ধুদের

উপস্থিতি ঠিক ধরতে পারল না অন্তু। আগের মতোই চুপচাপ, ভাবলেশহীন বসে রইল সে। নম্রতা কাঁধে হালকা স্পর্শ করতেই চমকে উঠল অন্তু। মুখ তুলে পাশে তাকাল। চোখের উপর এসে পড়া চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে চমৎকার হাসল অন্তু। টকটকে লাল চোখের সাথে হাসিটা বড্ড বেমানান লাগল নম্রতার। নাদিম ফুঁসে উঠে বলল,‘ নিজেকে

কি মনে করিস তুই? তোর পরীক্ষা তুই দিবি কি দিবি না এটা নিতান্তই তার ব্যাপার? তোর ওপর আমাদের কোনো অধিকার নাই? ভালো বলেছিস। থেংকিউ।’

রঞ্জন আর ছোঁয়া নাদিমকে থামানোর চেষ্টা করল। ছোঁয়া নাদিমের বাহুতে হাত রাখতেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে জায়গাটা থেকে সরে গেল নাদিম। কয়েক সেকেন্ড নাদিমের

যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে গাল ফুলিয়ে শ্বাস নিল রঞ্জন। চোখ ফিরিয়ে অন্তুর দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ হঠাৎ পরীক্ষা দিবি না কেন? শুধু শুধু এক সেমিস্টার লস দেওয়ার কোনো মানে হয়? তোর ক্যারিয়ারের কথাটা তো আপাতত চিন্তা কর। কোনো সমস্যা থাকলে বল আমাদের। হয়েছেটা কি?’

অন্তু নিরুত্তর বসে রইল। নম্রতা অধৈর্য্য কণ্ঠে বলল,‘ আংকেলের কথাটা একবার ভাব। তুই পরীক্ষা দিচ্ছিস না এই খবরটা উনার উপর কেমন ইফেক্ট ফেলবে। উনি কষ্ট পাবেন।’

অন্তু এবারও কিছু বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল অন্তু,

‘ আমি ঠিক আছি। কোনো সমস্যা নেই। পরীক্ষা দিতে ইচ্ছে করছে না তাই দিব না। কে কষ্ট পাবে আর কে পাবে না তার দায়ভার আমার নয়।’

নম্রতা-রঞ্জন একে অপরের দিকে তাকাল। সুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। নীরা আর ছোঁয়া খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। নম্রতা নীরার হাত টেনে কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে

ফিসফিস করে বলল,‘ তুই একটু চেষ্টা কর না রে নীরু।’

নীরা বিপন্ন কণ্ঠে বলল,

‘ আমার কথা কেন শুনবে ও?’

‘ শুনবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা তো আমরা দিচ্ছি না। তবে শুনতে পারে। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।’

রঞ্জন আর ছোঁয়াও সাঁই জানাল। নীরা কিছুক্ষণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রাজি হলো।

নম্রতাদের রেখে দুরুদুরু বুকে অন্তর দিকে এগুলো। আধভেজা বাঁধানো বেঞ্চিটাতে বসে সরাসরি অন্তর দিকে তাকাল। অন্তর দৃষ্টি কঠিন। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে জমা থাকা কাদা পানির দিকে।

‘ অন্ত?’

অন্ত উত্তর দিল না। নীরা বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই বসেছিল। সেই দূরত্ব বহাল রেখেই মাথা নিচু

করে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর নীরবতা কাটিয়ে নিজে থেকেই কথা বলল অন্তু,‘ কি চাই?’

নীরা চোখ তুলে তাকাল।

‘ কি চাই মানে? তোর সাথে কি আমার চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক?’

অন্তু দূর্ব্যোধ্য হাসলো। নীরা অভিমানী কন্ঠে বলল,

‘ নম্রতা বা ছোঁয়ার সাথে তো এমন রূঢ় ব্যবহার করিস না তুই। তাহলে আমার সাথেই কেন?’

‘ রূঢ় ব্যবহার করলাম নাকি?’

‘ করিসনি? গত চার-পাঁচ দিনে সবার ফোন তুললেও আমার ফোন একটা বারের জন্যও তুলিসনি। কেন?’

নীরার কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অন্তু,

‘ প্রেম কেমন চলছে তোর?’

নীরা বিস্ময় নিয়ে তাকাল। বড় বড় চোখদুটোতে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে বলল,‘ মানে?’

‘ ওই ব্যাংকারের কথা বলছিলাম। সেদিন শাহবাগ পার্কে পাশাপাশি হাঁটছিস দেখলাম। দারুণ মানিয়েছে তোদের।’

কথাটা বলে হাসল অন্ত। সেই হাসিতে ভেতরটা কেঁপে উঠল

নীরার। কি মায়াময় হাসি! এই হাসিটার জন্য নীরার মরণও সই। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। নীরা আর দশটা মেয়ের মতো পাগলামো করতে পারে না। কাউকে ভালোবেসে প্রচন্ড সুখে মরে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতে পারে না। তার যে অনেক দায়িত্ব। পরিবারের প্রতি, মায়ের প্রতি, সমাজের প্রতি। দায়িত্বের বহরেই যে সাজানো তার

জীবন। অন্তুর দিকে আটকে থাকা দৃষ্টিটা সরিয়ে সামনে তাকাল নীরা। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ পরীক্ষা কেন দিচ্ছিস না অন্তু?’

‘ আমার ইচ্ছে।’

‘ সবার কাছে আমায় দোষী বানিয়ে দিস না প্লিজ।’

অন্তু হেসে ফেলে বলল,

‘ তুই দোষী কেন হবি?’

নীরা মুখ ফিরিয়ে অন্তুর দিকে তাকাল। ভারি মায়াময় কণ্ঠে বলল,

‘ ভালোবাসার থেকেও বড় বন্ধন, বড় প্রাপ্তি হলো বন্ধুত্ব। আমাকে এভাবে অবহেলা করিস না। বন্ধু হিসেবে থাকতে দে।’

অন্তু উত্তর দিল না। নীরা হঠাৎ-ই অন্তুর হাতের ওপর হাত রেখে বলল,

‘ পরীক্ষাটা দে প্লিজ। নয়তো আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।’

অন্তুর সাবলীল জবাব,‘ আমার পরীক্ষা না দেওয়ার সাথে তোর নিজেকে ক্ষমা করতে পারা বা না পারার সম্পর্ক কী? আর যদি আদৌ কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে। তাহলে আমি চাইব তুই সারাজীবন অপরাধীই থাক। এক জীবনে এতো

শান্তি, এতো ক্ষমা তোর ভাগ্যে জুটবে কেন?’

নীরা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অন্ত উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

‘ আমার তাড়া আছে। মিরপুর যেতে হবে। আসছি।’

নীরা ব্যস্ত হয়ে বলল,

‘ হঠাৎ মিরপুর কেন? এই ভেজা জামা-কাপড়ে অতোদূর যাবি? জ্বরে পড়বি তো।’অন্ত এবার নীরার

চোখের দিকে তাকাল। সেই সম্মোহনী দৃষ্টিতে শরীরটা কেমন বিবশ হয়ে গেল নীরার। হাত-পায়ে ছড়িয়ে পড়ল মৃদু শিহরণ। কয়েক সেকেন্ড গভীর চোখে তাকিয়ে থেকে শক্ত কন্ঠে উত্তর দিল অন্তু,

‘ আমাকে নিয়ে ফালতু কনসার্ন দেখানোর দুঃসাহস দ্বিতীয়বার করবি না নীরা। তুই কাকে বিয়ে করছিস। কতদিনের জন্য হানিমুনে যাচ্ছিস।

কয় বাচ্চার মা হচ্ছিস তা যেমন আমার ভাবনার বিষয় নয়। ঠিক তেমনই আমি সম্পর্কিত কোনো কিছুই তোর ভাবনার বিষয় হতে পারে না।’কথাগুলো বলে এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অন্ত। অন্তর যাওয়ার পথে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চোখ ভরে জল নীরার। চোখের পলক ফেলতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে ছেঁয়ে গেল নরম গাল।

পড়ার টেবিলের পাশে ছোট্ট টেবিলটাতে তিন-চার পদের খাবার সাজানো। ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে খাবার পানি। চায়ের কেতলি আর কাপটাও পরিষ্কার, ধবধবে। মধ্যবিত্ত পরিবারে যে কাপ-পিরিজগুলো যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখা হয় সেগুলো থেকেও চমৎকার তার ডিজাইন। নাদিম খাবারগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ

আগেই অল্প বয়সী এক তরুনী সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে গিয়েছে এই বিলাসবহুল খাবারের ট্রে। তরুনী যাওয়ার আগে নাদিম তাকে মৌশির কথা জিগ্যেস করেছিল। সে বলেছে, ছোট আফা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছে। এরপর আধাঘন্টা কেটে গিয়েছে। মৌশির পাঁচ মিনিট আদৌ শেষ হয়েছে নাকি আরও ঘন্টাখানেক চলবে বুঝতে পারছে না

নাদিম।মাথার ভেতর থিতিয়ে রাখা রাগটা কেমন ঝিমঝিম করছে। সামনে রাখা খাবারের ট্রে-টা ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মৌশির গালে দুটো শক্ত চড় বসিয়ে দিয়ে হলে ফিরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নাদিম তেমন কিছুই করল না। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে রইল। অন্তর কথায় মন খারাপ হয়েছে তার। সেই মন খারাপের রেশ ধরে রাগটা বেশ

আয়োজন করেই ধরা দিচ্ছে মাথায়। দরজার কাছে খুট করে শব্দ হওয়ায় চোখ তুলে তাকাল নাদিম। মৌশি এসেছে। গায়ে জলপাই রঙা শাড়ি। চোখ ভর্তি কাজল।। ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক আর হাত ভর্তি জলপাই রঙা চুড়ি। চুলগুলো একটু অন্যরকম করে খোঁপা বাঁধা। সদ্য কিশোরী মেয়েটির দেহজুড়ে প্রথম যৌবনের ঢেউ। মৌশির এমন সাজে

ভ্রু কুঁচকে তাকাল নাদিম। মৌশি ঠোঁট ভর্তি হাসি নিয়ে নাদিমের সামনে গিয়ে বসল। নাদিম কিছু বলার আগেই কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো কানের পেছনে গুঁজে দিয়ে অনেকটা স্বীকারোক্তির মতো করে বলে উঠল মৌশি,' আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিনে আমি শাড়ি পরি। আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে, স্যার?'

নাদিম ছোট্ট করে উত্তর দিল,

‘ হ্যাঁ। সুন্দর দেখাচ্ছে।’
মৌশি উৎসাহ নিয়ে বলল,
‘ আমি আজকে রান্নার দারুণ কিছু প্রিপারেশন তৈরি করেছি স্যার। ইতালির বিখ্যাত নেপোলিতান পিৎজাও বানিয়েছি। আপনি কি একটু টেস্ট করবেন?’
কথাটা বলে বড় বড় মায়াবী চোখ মেলে নাদিমের দিকে তাকাল মৌশি। নাদিম মৌশির দিকেই

তাকিয়ে ছিল। তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। মৌশিকে আগাগোড়া নিরক্ষণ করে নাদিমের হঠাৎ-ই মনে হলো, মেয়েটা অতীশয় রূপবতী। এই রূপবতী মেয়ের ইচ্ছে পূরণ করতে নেপোলিতান পিৎজা নামক খাবারটা চট করে টেস্ট করে নেওয়া উচিত। টেস্ট করা শেষে মুগ্ধ গলায় বলা উচিত, 'অসাধারণ! পিৎজার মতো খাবারও যে এতোটা সুস্বাদু হতে

পারে তা আমি ভাবতেই পারিনি। একদম মুখে লেগে থাকার মতো স্বাদ।' কিন্তু নাদিম এমন কিছুই বলল না। তার কাছে উচিত কাজগুলো কখনোই উচিত বলে বোধ হয় না। তার কাছে উচিত কাজ মানেই দুনিয়ার বিরক্তিকর কাজ। নাদিম বেশ গম্ভীর এবং স্পষ্ট কণ্ঠে বলল,' নেপোলিতান নামক কোনো পিৎজা খাওয়ার জন্য

আমাকে আসতে বলা হয়নি মৌশি। আমি পড়াতে এসেছি। পড়ানো শেষ হলে চলে যাব। তুমি অলরেডি আধাঘন্টা লেইট। চটজলদি বই বের করো, ফ্যাস্ট।’

মৌশি তার টলমলে চোখদুটো লুকাতে তাড়াহুড়ো করে মাথা নিচু করল। ডানহাতে থাকা চুড়িগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে বলল,

‘ আজ পড়ব না। জন্মদিনের দিন পড়তে হয় না। জন্মদিনে আনন্দ করতে হয়, এটাই নিয়ম। জন্মদিনের নিয়ম।’

নাদিম বিরক্তি নিয়ে তাকাল। যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তাহলে আমায় ফোন করে মানা করলে না কেন?’

‘ আপনাকে নেপোলিতান পিৎজা আর চিকেন মুয়াস্বা খাওয়াব বলে।

বাবা বাড়ি নেই। আসতে আসতে রাত। আপনি কি আমার সাথে আমার জন্মদিনটা সেলিব্রেট করবেন স্যার?’

নাদিম উঠে দাঁড়াল। সামনে বসে থাকা অসম্ভব রূপবতী মেয়েটির টলমলে চোখদুটো উপেক্ষা করে বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,‘ শুভ জন্মদিন মৌশি। জন্মদিনের দিন আনন্দ করতে হয়। তুমি আনন্দ

করো। আমি কাল এসে তোমাকে পড়িয়ে যাব। শার্প এট টুয়েলভ।’

শাহবাগ গ্রন্থাগারে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ পর গ্রন্থাগারে পা রাখতে চলেছে সে। ভার্সিটিতে অন্তুকে নিয়ে ঝামেলাটা হয়ে যাওয়ার পর সবার মনই বেশ বিক্ষিপ্ত। বিশেষ করে নীরার। নীরার চোখ-মুখে থমথমে ভাব। অনেকটা আষাঢ়ের ভারী

আকাশের মতো। গা ভর্তি জল অথচ ঝড়ে পড়ার উপায় নেই। নম্রতা আজ ইচ্ছে করেই একা ছেড়ে দিয়েছে নীরাকে। থাকুক কিছুক্ষণ একা। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষরই একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সময় প্রয়োজন। যেখানে সে থাকবে আর থাকবে তার নিজস্ব সত্তা। সেখানে তৃতীয় কারো থাকার অধিকার নেই। নম্রতা ছোট্ট শ্বাস ফেলে সিঁড়ি

ডিঙিয়ে দুই তলায় উঠল।অলস পায়ে চিরপরিচিত সেল্ফটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল। পুরাতন সেই বইটি সেল্ফের এক কোণায় পড়ে থাকতে দেখে একরকম লুফে নিল নম্রতা। বই হাতে কিছুক্ষণ থম ধরে বসে থেকে ধীরে ধীরে বইয়ের মলাটের নিচের দিকটাই তাকাল। কম্পনরত হৃদপিণ্ডটি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য

থমকে গেল। তারপর আবারও পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগল হৃদস্পন্দন। পুরো চার বছর পর চেনা সেই চিরকুট দেখে নম্রতার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগার। হৃদপিন্ডটা বুঝি বেরিয়ে আসবে এখনই? নম্রতা দু'হাতে মুখ চেপে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। নিজেকে যথাসাধ্য শান্ত করে চিরকুটটি খুললো। সেই পরিচিত

গুটি গুটি অক্ষরে লেখা,‘ শ্যামলতা? আমি কি হারিয়ে গিয়েছি? নাকি হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে? আমার ঘরে এখন আর বেলীফুলের সুগন্ধটা আসে না। বেলীফুলের সুগন্ধহীন এই অক্সিজেনটা আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি আর পারছি না। ফিরে এসো নয়ত ফিরিয়ে নাও আমায়।’চিরকুটটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল নম্রতা। সারা শরীরে ঘাম

দিচ্ছে তার। হাত-পা কাঁপছে। উঠে দাঁড়ানোর মতো শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। নম্রতা ঘন্টাখানেক বসে থেকে নিজেকে শান্ত করল। লাইব্রেরির কর্মচারীদেরকে বইটা ইস্যু করার ডেইট জিগ্যেস করে জানল, বইটা কাল ফেরত দেওয়া হয়েছে। নম্রতার চিন্তাগুলো ধোঁয়াশা হয়ে আসছে। নিষাদ কি তবে ফিরে এসেছে ঢাকা? আর নিষাদ যদি নম্রতাকে চিনেই

থাকে তাহলে এই চিরকুটের মানে কি? নিষাদ আর সে একই ব্যক্তি হওয়াটা কি আদৌ সম্ভব? নম্রতা বইটা নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এলো। নতুন কোনো চিরকুট সে লিখল না। গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়েই নিষাদকে ফোন লাগাল সে। দু'বারের মাথায় ফোন উঠিয়ে হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে সালাম দিল নিষাদ। নম্রতা সালামের জবাব

দিয়েই প্রশ্ন ছুঁড়ল ,‘ আপনি কোথায়? ঢাকায় ফিরেছেন?’

‘ হ্যাঁ। মাত্রই স্টেশন থেকে বেরুলাম। কেন বল তো?’

‘ আপনার সাথে দেখা করতে চাই। এখনই।’

নিষাদ অবাক হয়ে বলল,

‘ এখনই কিভাবে?’

‘ প্লিজ!’শাহবাগের ছোট্ট একটি কফিশপে বসে আছে নম্রতা।

টিপটিপ বৃষ্টি আর ঠান্ডা হাওয়ার মাঝেও দরদর করে ঘামছে সে। গায়ে থাকা গাঢ় নীল ওড়না দিয়ে কপাল আর গলার ঘাম মুছল নম্রতা। শুকিয়ে আসা খড়খড়ে ঠোঁটটা জিহ্বা দিয়ে বার কয়েক ভিজিয়ে নিয়ে কফিশপের দরজার দিকে তাকাল। দৃষ্টি ফিরিয়ে অস্থির চোখে হাতে থাকা ঘড়িটির দিকে তাকাল নম্রতা। বামহাতে থাকা ছোট্ট

ডায়ালের ঘড়িটি জানান দিচ্ছে এখন শেষ বিকেল। কিছুক্ষণ পরই আসরের আজান পড়বে। নম্রতার অস্থিরতা বাড়তে লাগল। নিষাদের নাম্বারটা তৃতীয় বারের মতো ডায়াল করল সে। কল রিসিভ হলো না। দুই মিনিটের মাথায় কফিশপের স্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে লম্বা, ফর্সা দেখতে এক যুবককে দেখা গেল। গায়ে কালো চেইক শার্ট। চোখে মোটা

ফ্রেমের চশমা। বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছে শার্টের অনেকটা। লোকটি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই নম্রতার দিকে এগিয়ে এলো। কাছাকাছি এসে এক গাল হেসে বলল,‘ কেমন আছো নম্র?’

নম্রতা চমকে তাকাল। সামনে দাঁড়ানো যুবকটিকে ঠিক চিনে উঠতে পারছে না সে। নম্রতা কপাল কুঁচকাল,

‘ আপনি?’

‘ নিষাদ। আশ্চর্য! চিনতে পারছ না?’

নম্রতা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। দুই একটা শুকনো ঢোক গিলে বলল,

‘ সরি! আমি ঠিক চিনতে পারিনি।’

নিষাদ হাসল। সামনের চেয়ারটা ডানহাতে টেনে নম্রতার মুখোমুখি বসল। নম্রতার দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বলল,

‘ দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।’

নিষাদের কথায় সম্বিৎ ফিরল নম্রতার। চট করে বসে পড়ে অস্থির দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ডানহাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের উপরের ঘামটুকু মুছে নিয়ে জোড়াল শ্বাস ছাড়ল। নিষাদ বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বিস্মিত কণ্ঠে বলল,' তুমি কি কোনো কারণে আমায় ভয়

পাচ্ছ নম্র? তোমাকে রেস্টলেস দেখাচ্ছে।’

নম্রতা এবার চোখ তুলে তাকাল। নিষাদের ক্লান্ত মুখে চিন্তার ছাপ। চোখদুটোতে চকচক করছে কৌতূহল। নম্রতাকে নীরব তাকিয়ে থাকতে দেখে সামনে থাকা পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিল নিষাদ। শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আই থিংক, পানিটুকু তোমার প্রয়োজন।’

নম্রতা বিনাবাক্যে গ্লাসটা তুলে নিল হাতে। এক নিঃশ্বাসে পুরো গ্লাস ফাঁকা করে দিয়ে আবারও নিষাদের দিকে তাকাল। নিষাদ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে-মুখে কৌতূহল। কপালে চিন্তার ভাঁজ। নম্রতা জোড়াল নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল। নিষাদের

চোখের দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল,‘ কেমন আছেন?’

নিষাদ হাসল। টেবিলের ওপর দু’হাত রেখে সোজা হয়ে বসল। মৃদু কন্ঠে বলল,

‘ ভালো। তুমি কেমন আছ নম্র?’

‘ ভালো। আমিও ভালো আছি।’

‘ তোমাকে দেখে কিন্তু তেমনটা মনে হচ্ছে না। কেমন যেন বিধ্বস্ত লাগছে। যায়হোক, এতো জরুরি

তলবের কারণ কি? এনিথিং সিরিয়াস নম্র?’

নম্রতা অনেকটা ফিসফিসিয়েই বলল, ‘ আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি নিষাদ সাহেব। সেই উত্তরগুলো আপনার থেকেই এক্সপেক্ট করছি। আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?’

নম্রতার কথায় বেশ অবাক হলো নিষাদ। ভ্রু কুঁচকে বলল,‘ প্রশ্ন? কেমন প্রশ্ন নম্র? তোমার কথাগুলো

ঠিক ধরতে পারছি না। একটু খুলে বলবে, প্লিজ?’

নম্রতা এবার সরাসরি প্রশ্ন করল,

‘ শাহাবাগ গ্রন্থগার থেকে বেশ কিছুদিন আগে একটা বই ধার এনেছিলেন আপনি। দর্শনের বই। সেই বইটা সম্পর্কে জানতে চাইছি।’

নিষাদের পুরু ভ্রূ আরও খানিকটা কুঁচকে গেল। অবাক হয়ে বলল,

‘ মানে? কোন বইয়ের কথা বলছ তুমি? আমি ক্যামেস্ট্রি টিচার। দর্শনের বই কেন আনতে যাব হঠাৎ? তাছাড়া ফিলোসোফির প্রতি খুব একটা আকর্ষণও আমার নেই।’

‘ আপনি বলতে চাইছেন বইটা আপনি আনেননি?’

‘ না। আনিনি। কিন্তু একটা বই নিয়ে এতো জিগ্যেসাবাদের কারণ কী? তোমাকে অস্থিরও দেখাচ্ছে।

বইটার কি কোনো বিশেষত্ব আছে? যদি থেকেও থাকে সেই বিশেষত্বটাই বা কী?’

নম্রতা উত্তর না দিয়ে বলল,‘ লাইব্রেরির রেজিস্ট্রার খাতা তো অন্য কথা বলছে নিষাদ সাহেব। ওখানে স্পষ্ট লেখা আছে কিছুদিন আগে আপনার কার্ড দিয়েই বইটা ধার নেওয়া হয়েছিল। বইটা কালই আবার লাইব্রেরিতে ইস্যু করা

হয়েছে। আপনি যদি ঢাকার বাইরে থেকে থাকেন তাহলে আপনার হয়ে বই দেওয়া-নেওয়া করছেটা কে? হু ইজ দিস পার্সোন?’

নিষাদ থমকাল। কপালে গভীর ভাঁজ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরব বসে রইল। ভ্রু কুঁচকে নম্রতাকে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বলল,

‘ সেই বইয়ের সাথে তোমার কি কানেকশন নম্র? সামান্য একটা

বইয়ের জন্য এতো উতলা হচ্ছ কেন?’

নম্রতা উত্তর না দিয়ে বলল,

‘ বইগুলো দেওয়া-নেওয়া কে করছিল নিষাদ সাহেব?’

নিষাদ ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ আমি লাইব্রেরিতে লাস্ট গিয়েছিলাম এক-দুই সপ্তাহ আগে। যেদিন রাজশাহী যাওয়ার কথা ছিল সেদিন বিকেলে। সেখানে গিয়ে

হঠাৎই আমার বন্ধুর সাথে দেখা। ওর কিছু বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এদিকে আমার তাড়া, বাবা-মাকে নিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। তাই কার্ডটা বন্ধুকে দিয়ে। লাইব্রেরিয়ানের সাথে কথা বলে আগেই রেজিস্ট্রিতে সাইন করে বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার বন্ধু কোন দুটো বই নিয়েছে জানি না। সেই বইয়ে তোমার বলা বইটা আছে কি-না সেটাও জানি না।’

শ্বাস আটকে রেখে প্রশ্ন ছুঁড়ল নম্রতা, ‘ আপনার বন্ধু? আপনার বন্ধু কেন নিয়েছিল বইটা?’

নিষাদ হতাশ কণ্ঠে বলল,‘ সেটা তো জানি না।’

নম্রতা বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না। মাথাটা কেমন ধপধপ করছে তার। ঘাড়ের কাছটা ঝিমঝিম করছে। নম্রতা একহাতে কপাল চেপে ধরে চুপ করে রইল। নম্রতার

ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিষাদ,

‘ তুমি ঠিক আছো?’

নম্রতা ছোট্ট করে শ্বাস টেনে নিয়ে মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থেকে মাথা তুলে নিষাদের দিকে তাকাল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ আপনি বলতে চাইছেন, বইটার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই?’

‘ আমি প্রথম থেকে এমনটাই বলছি নম্র।’

‘ তাহলে আপনি আমাকে জানেন কিভাবে? আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনি আমার পূর্ব-পরিচিত। কিন্তু কিভাবে?’নম্রতার এমন কথায় যেন বেশ ধাক্কা খেল নিষাদ। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি আমাকে এখনও চিনতে পারোনি? এজন্যই এতোক্ষণ ‘নিষাদ

সাহেব' 'নিষাদ সাহেব' বলে সম্বোধন করছিলে। তোমার মুখে এমন সম্বোধন শুনে খুব অস্বস্তিবোধ করছিলাম। অবাকও হচ্ছিলাম।'

এবার নম্রতার অবাক হওয়ার পালা। বড় বড় চোখদুটোতে খেলে গেল বিস্ময়ের তারা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল,

' আমার কি আপনাকে অন্যকিছু বলে সম্বোধন করার কথা?'

নিষাদ বেশ হতাশ হলো। নম্রতার দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল,

‘ তোমার নাজু খালাকে ভুলে গিয়েছ নম্রতা?’

নম্রতা এলোমেলো মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে চোখ বড় বড় করে নিষাদের দিকে তাকাল।‘ নাজু খালাকে আপনি কি করে চিনেন নিষাদ সাহেব?’

নিষাদ দূর্বোধ্য হাসল। নম্রতা সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ নিশুদা? আপনি নিশুদা? নাজু খালার ছেলে নিশুদা?’

নিষাদ তৃপ্তির হাসি হেসে বলল,

‘ এতোক্ষণে চিনলে তবে? আমি তো প্রথম দিনই চিনে ফেলেছিলাম।’

নম্রতার বিস্ময় এখনও কাটেনি। সে হতভম্ব দৃষ্টি নিয়ে বলল,

‘ প্রায় চৌদ্দ/পনেরো বছর পর দেখা। কিভাবে চিনলেন?’

নিষাদ হাসল। মুখ টিপে হেসে বলল,‘ দুই-তিন বছর পর আগে আম্মুর পরিচিত এক ঘটক তোমার ছবি দেখায়। আমরা তখনও জানতাম না যে তুমিই সেই ছোট্ট নমু। যথারীতি তোমার বাড়িতেও আলাপ হচ্ছিল এবং এই আলাপচারিতার মধ্যেই হঠাৎ জানতে

পারলাম তোমরা আমাদের পূর্ব-আত্মীয়। তোমার পরিচয় জানার পর আম্মু তোমাকে বউ বানাতেই উঠে পড়ে লাগলেন। হাজার হলেও পুরাতন বান্ধবীর মেয়ে, ব্যাপারটাই আলাদা। তোমার পরিবারও বেশ এগিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন খবর এলো তুমি মানা করে দিয়েছ। বিয়ে-শাদি নাকি করবে না। বেশি চাপাচাপি করলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে

চলে যাবে। আম্মু প্রায় এক বছর অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তোমাকে এখনও রাজি করানো যায়নি শুনে সব আশা ত্যাগ করে নতুন উদযোগে পাত্রী খুঁজতে লেগে পড়েছেন। তোমাকে প্রথম ছবিতেই দেখেছিলাম। তারপর হঠাৎ কক্সবাজারে। প্রথমে চিনতে পারিনি। কিন্তু নাম বলার পর চিনে গিয়েছি।’

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল নিষাদ। নম্রতা অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,‘ মাই গড! এতোকিছু ঘটে গিয়েছে?’

নিষাদ হেসে বলল,

‘ হ্যাঁ। ঘটে গিয়েছে। কেন, তুমি জানতে না? আমি তো ভেবেছিলাম সবই তোমার জানা। তাই তোমার ফোনটা পেয়ে একটু অবাকই হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই

বিষয়েই কিছু বলবে। কিন্তু এখানে এসে তো দেখি কাহিনি ভিন্ন। তোমার কাহিনিটা কী বল তো? আমি কনফিউজড।'

নম্রতা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে বলল, ' সে অনেক লম্বা কাহিনি। অন্য কোনোদিন বলব। আচ্ছা? আপনার যে বন্ধুটা লাইব্রেরি কার্ডটা ইউজ করেছিল তার নামের প্রথম অক্ষর কী 'ন'? '

নিষাদ কপাল কুঁচকে বলল,‘ না তো।’

নম্রতার আশাভঙ্গ হলো। দুর্বল কণ্ঠে বলল,

‘ উনি কি করেন? ভার্সিটি টিচার টাইপ কিছু?’

নিষাদ নম্রতার অসহায় মুখটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল,

‘ হ্যাঁ। টিচার বলা যেতেই পারে। আর আমার যতটুকু ধারণা তুমিও তাকে চিনো।’

নম্রতা আঁৎকে উঠে বলল,

‘ আমি চিনি?’

‘ হ্যাঁ। আরফানকে মনে আছে? কক্সবাজারে যার সাথে ঝামেলা হলো তোমার।’

নম্রতার পুরো পৃথিবী দুলে উঠল। গলার কাছে আটকে আসতে লাগল

নিঃশ্বাস। আরফান? আরফান নিয়েছিল বইটা? কিন্তু কেন? নম্রতার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এলো। চোখের সামনে নেমে এলো রাজ্যের অন্ধকার। কানের কাছে ভেসে এলো আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর,‘ নম্র? এই নম্র? আর ইউ ওকে? নম্র?’

নম্রতা চোখ খোলার বৃথা চেষ্টা করে অনেকটা ফিসফিসিয়েই বলল,

‘ ডক্টর আরফানের বোনের নাম কী নিদ্রা?’

ভার্সিটি থেকে ফিরে এসেই লম্বা ঘুম দিয়েছিল নীরা। প্রচন্ড মন খারাপের দিনগুলো ঘুমিয়েই পাড় করে দেয় সে। খালি পেটে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকলে কেমন মাতাল মাতাল ভাব চলে আসে শরীরে। শিরায় শিরায় তৈরি হয় অদ্ভুত ঝিমঝিমানি। নীরার ধারণা, ধমনীর এই ঝিমঝিমভাব

তার মন খারাপগুলোকে ভুলিয়ে রাখে। তখন শারিরীক কষ্টগুলো মানসিক কষ্টগুলোকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। দিতে চায় না। এইচএসসি পরীক্ষার পর যখন হুট করেই বাবা মারা গেলেন। সেদিনই এই মাতাল মাতাল থিওরিটা ধরতে পেরেছিল নীরা। শরীরকে কষ্ট দিলে যে মনকে ভুলিয়ে রাখা যায় সেই শিক্ষাটা সেসব দুঃখী দিনগুলো

থেকেই পাওয়া। নীরা টালমাটাল পায়ে ওয়াশরুমে গেল। ঘন্টাময় শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল তার সংগ্রামী জীবনের কন্টকাপূর্ণ পথটার কথা। এই নীরার নীরা হয়ে উঠার গল্পটা কী আদৌ খুব সহজ ছিল?ঘন্টাময় শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগল তার সংগ্রামী জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথটার কথা। এই নীরার নীরা হয়ে

উঠার গল্পটা কী আদৌ খুব সহজ ছিল? এইচএসসি পরীক্ষার পর বাবা যখন হুট করেই মারা গেলেন নীরা তখন বুঝে গিয়েছিল জীবনের সংগ্রামময় অধ্যায়ের কথা। টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা। সরকারি অফিসের খুব সাধারণ একটা কর্মচারী ছিলেন বাবা। মাসিক বেতন কতই বা হতো তাঁর? তবুও নীরা জানত, বাবা আছেন। বাবার দীর্ঘ

পরিশ্রমের গল্প জানে না নীরা। শুধু জানে, বাবা তাদের ইচ্ছেগুলো নরম পদ্মের মতো আগলে রাখতেন। পূরণ করতেন। চারপাশের জীবনটাকে রূপকথার মতোই সাজিয়ে তুলেছিলেন বাবা। রূপকথার সেই দেয়ালে সত্যিকারের দুঃখগুলো, সংগ্রামগুলো চোখ মেলে দেখার সুযোগই হয়নি নীরার।নতুন উড়তে শেখা পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে

বেরিয়েছে রঙিন দুনিয়ায়। বাবার মৃত্যুতে হঠাৎই খসে পড়ল সেই দেয়াল। তিন সন্তান নিয়ে স্বামী সম্বলহীন মা পড়লেন অথৈ জলে। নীরার ভাই তখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ছোট বোনটা এসএসসি পরীক্ষার্থী। সংসারে টাকা রোজগার করার মতো মানুষ তখন এক ভাইয়া-ই ছিল। সেই ভাইও কাজ-কর্মহীন বেকার। পড়াশোনা

শেষ হয়নি। অনার্সের সার্টিফিকেট পর্যন্ত হাতে জুটেনি। এই কঠিন দুনিয়ায় ডিগ্রীবিহীন ছেলের চাকরী পাওয়াটা কী খুবই সহজ? নীরা বুঝেছিল, সহজ নয়। এই অন্ধকার দুনিয়ায় ফ্রীতে এক গ্লাস পানি পেয়ে যাওয়াটাও সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম খুব একটা সমস্যা না হলেও মাস দুয়েকের মাঝেই পৃথিবীর উৎকট, রংহীন জীবনটা কড়া নাড়ল

দরজায়।বাবার প্যানশনের টাকা ছিল মাসিক মাত্র আট হাজার টাকা। কাগজ-পত্রের কিছু ঝামেলায় সেই টাকা হাতে পেতেও আরও সাত-আট মাসের ব্যাপার। বাবার রেখে যাওয়া কিছু ঋণ। অফিসে প্যানশনের জন্য দৌড়াদৌড়িতে হাতে থাকা জমানো টাকাগুলোও চোখের পলকে বেরিয়ে গেলো। ভাড়া বাসায় বাড়ি ভাড়ার জন্য তাগদা পড়তে লাগল।

সহায়সম্বলহীন মানুষের ঢাকা শহরে ভদ্র এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকাটা নিতান্তই বিলাসিতা মনে হয়েছিল তখন। চাচা-মামাদের থেকে ধার-টার নিয়ে বাসা ভাড়াটা কোনোরকম পরিশোধ করেই ঢাকার বাসাটা ছেড়ে দিলেন মা। তিন সন্তানকে নিয়ে ছুটলেন গ্রামের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও বাঁধল ঝামেলা।মুখোশধারী সহোদররা

এবার মুখোশ খুলল। বাবার অবর্তমানে ভাইয়ের ছেলে-মেয়েদের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ব দেখালেন না তারা। উপরন্তু অধিকার হরণের চেষ্টা করে গেলেন একের পর এক। বাবা যে দুনিয়াটা দেখিয়ে গিয়েছিলেন সেই দুনিয়ার বাইরে এসে গোটা পরিবার যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। কি অসহায়, কি যন্ত্রণাময় কেটেছিল সেই রাতগুলো!

এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়াল যে ভাইয়ের সেমিস্টার ফি দেওয়ার সামর্থ্যটা পর্যন্ত রইলো না। ছোট বোনের ফরম ফিলাপের টাকা দিতেই যেখানে নাভিশ্বাস উঠে যাওয়ার উপক্রম সেখানে নীরার ভর্তি পরীক্ষাটা ছিল আলাদা আতঙ্ক। কোনো ভর্তি কোচিং তো দূর একটা এডমিশন গাইড কেনার সুযোগও হলো না নীরার। শেষমেশ ভাইয়ের

সেমিস্টার ফাইনাল দেওয়া হলো না। ভাইয়া এখান-সেখান থেকে ধার-দেনা নিয়ে ছোট বোন ইরার ফরমফিলাপের টাকা জোগাড় করলেও নিজের সেমিস্টার ফি জোগাড় করতে পারলেন না। গ্রামে ভিটেমাটিসহ বিঘা খানেক জমিজমা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু অতো দ্রুত, দুনিয়া সম্পর্কে অপরিপক্ক পরিবারের পক্ষে জায়গা জমি বিক্রির

সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও হয়ে উঠছিল না। দিন দুনিয়া সম্পর্কে অচেতন নীরা সেদিন উপলব্ধি করল তার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার পথে। তার হাজারও স্বপ্ন অন্ধকার পৃথিবীর নিষ্ঠুর থাবায় ক্রমেই বিলীন হওয়ার পথে। মা তখন দিগবিদিক পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নীরাকে বিয়ে দিলে পরিবারের একটা সদস্য তো অন্তত কমবে! একজনের খাওয়া-পরার

খরচ কমবে! নীরা এমন দিনও কাটিয়েছে যেদিন সস্তা মুদি দোকানদার থেকেও বিয়ের ঘর এসেছে। এসেছে গ্রামের অশিক্ষিত, নেশাখোরদের থেকে প্রস্তাব। মা রাতভর জায়নামাজে বসে কেঁদেছেন। বাবার ভাইদের অশ্রাব্য গালিতে দোর বন্ধ করে বসে থাকতে হয়েছে। ভাইয়া তখন ঢাকায় থেকে টিউশনি করায়। পরীক্ষা দিতে না

পারায় সে নিজেই তখন ডিপ্রেশড। নীরা তখন থেকে শক্ত হতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত নেয় সে পড়বে। যেভাবেই হোক পড়াশোনাটা আপাতত শেষ করবে। ভাইকে ফোন করে জানায়, সে ঢাকা যেতে চায়। গ্রামে টিউশনি পাওয়া মুশকিল। শহরে থাকলে কি একটা টিউশনিও জুটবে না তার? কিন্তু দুইজন মানুষের ঢাকা থাকার মতো সামান্য

খরচাও তাদের ছিল না। ভাইয়া বুঝাল, গ্রামের সরকারি কলেজে ভর্তি হয়ে যা। কষ্ট হলেও টাকা জোগারের চেষ্টা আমি করব। আর কিছুদিন পর তো বাবার প্যানশনের টাকা পাচ্ছিই। ভার্সিটিতে ফরম তুলতে যে কাড়ি কাড়ি টাকা লাগবে সেই টাকা কোথায় পাব আমরা বোন? নীরা কি ভীষণ কেঁদেছিল সেদিন। চোখের পলকে ভাগ্য

পরিবর্তনের খেলা দেখে বিস্মিত হয়েছিল। ঠিক তখনই দেবদূতের মতো এলো নম্রতা। নিজের বাবাকে ম্যানেজ করে এক মাসের জন্য নীরাকে নিয়ে গেল নিজের বাসায়। নীরা যেন এবার একটু আশা ফিরে পেলো। গভীর সমুদ্রে জুটে গেল একটুখানি ঠাঁই।সেইসাথে জুটল নিজের জন্য যুদ্ধে নামার শেষ সুযোগ। সেদিন নম্রতাই ছিল তার

একমাত্র সাপোর্ট। কোচিং-এ ভর্তি হতে না পারলেও নম্রতার নোট,শীট,গাইড দিয়েই পড়াশোনা চালিয়ে গেল নীরা। নম্রতার পরিচিত আন্টির নার্সারি পড়ুয়া বাচ্চার টিউশনিও জুটিয়ে দেওয়া হলো তাকে। মাসিক এক হাজার টাকা বেতন। নীরা তাতেই ছিল মহাখুশি। এডমিশনের একটা মাস রাত-দিন অন্ধকার করে পড়াশোনা করেছে

নীরা। টিউশনির সময়টুকু ছাড়া এক মুহূর্ত বই ছাড়েনি সে। কখনও কখনও সারাদিনে শুধু একবার খাবার মুখে নিয়েছে। কখনও কখনও খায়ই নি। বান্ধবীর বাড়ি হলেও অন্যের দয়ায় থাকা-খাওয়াটা যে কত কষ্টের, কতটা সম্মানহানীর তা প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝতে পেরেছে নীরা। বুঝতে পেরেছে জীবন নামের সংগ্রাম। দিনের পর দিন সয়েছে,

কষ্ট করেছে।কেঁদেছে পরমুহূর্তেই আবার শক্ত হয়েছে। টিউশনির ওই এক হাজার টাকা দিয়েই ঢাকা ভার্সিটির ‘খ’ ইউনিটে একটিমাত্র ফরম তোলার সুযোগ পেয়েছে। নম্রতার সহযোগীতা, সাপোর্ট আর নিজের পরিশ্রমে ওই একটা সুযোগেই নিজের জীবন পাল্টেছে। রেজাল্টের দিন নম্রতাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদেছে।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সেই বিভীষিকাময় সময়গুলোকে ভেবেই শিউরে উঠল নীরা। এই ছোট্ট জীবনে যতটা চড়াই-উতরাই পার করেছে নীরা সেই চড়াই-উতরাই সম্পর্কে অন্তুর কী আদৌ কোনো ধারণা আছে? অন্তুর কাছে দুনিয়া রঙিন। ভালোবাসাটা অমৃত। কিন্তু নীরার কাছে দুনিয়ার রং ভিন্ন। ভালোবাসাটা অমৃত নয়, পরিস্থিতির

চাপে বিষাক্ত। ভাইয়া তাদের দুই বোনের জন্য এখনও বেগার খাঁটছে। ভাইয়ের ঘাড়ে বসে আর কত খাবে সে?ইরার কথাটাও ভাবতে হবে। ভাইয়া, মা ওদের কথায় বা কীভাবে ভুলবে নীরা ? একটু শান্তি কী ভাইয়ারও প্রাপ্য নয়? তার কী কোনো ভালোবাসা নেই? সবারই একটা গল্প থাকে। গাধার মতো খেঁটে যাওয়া নীরার ভাইটার কী

কোনো গল্প নেই? সুখ বা দীর্ঘশ্বাসের গল্প? নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বোজল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ-ই চোখ খুলল নীরা। শক্ত হতে হবে তাকে। অনেক শক্ত। আচ্ছা? ব্যাংকারের সাথে তার বিয়েটা কতটুকু এগলো? মাকে জিগ্যেস করতে হবে। নীরা তাড়াহুড়ো করে গোসল শেষ করে। মন-প্রাণে ভুলে

যেতে চায় অন্তু নামে কেউ একজন তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। হাসপাতালের লম্বা করিডোরে পায়চারী করছে নম্রতা। বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্টগুলো জ্বলে উঠেছে প্রায় ঘন্টাখানেক আগে। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন, ডাক্তার-রোগীর আহাজারি সবকিছু ছাপিয়েই ধুবধাপ ছুটে চলেছে নম্রতার হৃৎস্পন্দন। হাতে

থাকা মুঠো ফোনটা বার বারই কেঁপে কেঁপে উঠছে। দু-একবার বিরক্তি নিয়ে কেটে দিলেও এবার রিসিভ করল নম্রতা। ফোনটা কানে নিয়ে বলল,

‘ হুম বল।’

ওপাশ থেকে উদ্বেগী কন্ঠ ভেসে এলো,

‘ বল মানে? কই তুই? সময় দেখেছিস? সাড়ে সাতটা বাজতে

চলল। একটু পরই হলের গেইট বন্ধ হয়ে যাবে অথচ তোর খবর নেই।'

নম্রতা উত্তেজনা চেপে বিরবির করে বলল,' আমার হাত-পা কাঁপছে নীরু। কখনও ভীষণ রাগ লাগছে তো কখনও সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি রে নীরু।'

নীরা আঁতকে উঠে বলল,

‘ কী বলছিস? কোথায় আছিস এখন? আমি আসব?’

নীরার কথায় সম্বিত ফিরে পেলো নম্রতা। ব্যস্ত হয়ে বলল,

‘ আমি ঠিক আছি। ফিরে এসে বলছি সব। তুই টেনশন নিস না। রাখছি।’

নীরাকে প্রত্যুত্তরে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ফোন কাটল নম্রতা। অস্থির ভঙ্গিতে মুখের ঘাম মুছল।

আরফানের এসিসট্যান্টকে তৃতীয়বারের মতো জিগ্যেস করল,

‘ স্যার কেবিন থেকে বেরুবেন কখন? উনি না বেরুলে আমায় ঢুকতে দিন। ভীষণ প্রয়োজন।’

এসিস্ট্যান্ট মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ স্যার একটু আগেই চেম্বারে ঢুকছে এখন আর বেরুবে না। আর আপনাকে ঢুকতে দেওয়া মানা

আছে। আপনি অন্য ডাক্তার দেখান ম্যাডাম।’নম্রতা জোড়ালো শ্বাস ফেলল। এই অস্থিরতা নিয়ে টানা অপেক্ষা করার পর এমন কথায় মেজাজ চটে যাচ্ছে তার। নম্রতা তর্ক না করে পাশের চেয়ারটাতে বসল। দু’হাতে কপাল চেপে চোখ বোজল। ক্লান্তিতে শরীরটা ছেঁয়ে আছে তার। পেটের বাম পাশটায় মোচড় দিয়ে উঠতেই খেয়াল হলো, দুপুর থেকে

কিচ্ছুটি খাওয়া হয়নি তার। নম্রতার ভাবনার মাঝেই চেম্বারের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আরফান। হাতে স্টেথোস্কোপ। উদ্বিগ্ন, গম্ভীর চোখজোড়া ঘড়ির দিকে নিবদ্ধ। কুঁচকে থাকা ভ্রু জোড়াতে রাজ্যের বিরক্তি। নম্রতা উঠে দাঁড়াল। নীল শার্ট পরিহিতা ফর্মাল যুবকটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। নতুন করে দেখছে। বোঝার চেষ্টা

করছে। আরফান বিরক্ত চোখজোড়া তুলে এসিস্ট্যান্টের দিকে তাকাল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ টেবিলের ওপর লাল রঙের একটা ফাইল আছে। আমি রাউন্ডে যাচ্ছি। মুহিব স্যার খোঁজ নিলে ফাইলটা উনাকে দিও সাইদ।’

এসিস্ট্যান্ট বাধ্য ছেলের মতো মাথা দুলিয়ে বলল,

‘ জি আচ্ছা।’

সাইদ সেখান থেকে সরে যেতেই তীরের বেগে তার বুকের উপর এসে পড়ল কেউ। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠল আরফান। টাল সামলাতে না পেরে দু'পা পিছিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ঘটনা বুঝতে ভ্রু কুঁচকে নিজের বুকের দিকে তাকাল। বুকের এতো কাছে কোনো নারীদেহের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্বিতীয় বারের

মতো চমকে গেল আরফান। হঠাৎ-ই কোনো কথা খুঁজে পেল না। বুকে ল্যাপ্টে থাকা রমনীকে টেনে সরাতে নিতেই একা একাই সরে গেল সেই আগুন্তকঃ। তাকে দেখে প্রথম দফায় বিস্মিত হলেও পরমুহূর্তেই রাগে লাল হয়ে গেল আরফান। চোয়াল শক্ত করে বলল,‘ এটা কোন ধরনের অভদ্রতা মিস. নম্রতা। ছি! আপনার

বিহেভিয়ার এমন থার্ডক্লাস হয়ে যাচ্ছে কেন দিন দিন?’

নম্রতার মধ্যে কোনো ভাবাবেগ হলো না। অনুভূতিশূন্য চোখে আরফানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আরফান বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ আপনার কী কোনো সেল্ফ রেসপেক্ট নেই? এতো কিছুর পরও কেন জ্বালাচ্ছেন আমায়? এটা

হসপিটাল। আমার একটা রেপুটেশন আছে।’

নম্রতা এবারও কিছু বলল না। মিনিট খানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দু’পা এগিয়ে গেলো। আরফানের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রাখল। খুবই শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আর জ্বালাব না। হৃৎস্পন্দনটা শোনার জন্যই এতোটা কাছে গিয়েছিলাম। প্রতারকদের হৃৎস্পন্দন

কেমন হয় তা জানতে ইচ্ছে করছিল খুব। ব্যস এটুকুই!’এটুকু বলে আবার কয়েক পা পিছিয়ে গেল নম্রতা। নম্রতার কথার আগাগোড়া বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আরফান। কপালের ভাঁজ আরও গাঢ় হলো। নম্রতা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ডানপায়ের সালোয়ারটা হালকা উঁচু করল। আরফান নম্রতার দিকেই তাকিয়ে ছিল। নম্রতার

সালোয়ারের নিচে ধবধবে সাদা পা জোড়া চোখে পড়তেই চমকে উঠল আরফান। ভয়ানক সুন্দর তিলটার সাথে চিরপরিচিত সেই পায়েল দেখে কুঞ্চিত ভ্রু সোজা হয়ে গেল আরফানের। চোখদুটোতে ফুটে উঠল রাজ্যের বিস্ময়।হতভম্ব আরফান হঠাৎ-ই কোনো কথা খুঁজে পেলো না। আপন শক্তিতে আলাদা হয়ে গেল তার ওষ্ঠদ্বয়।। চোখের সামনে

ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। নম্রতার হঠাৎ আগমন,কিছু ঝাঁঝালো কথা আর সেই চির পরিচিত পায়েলের অর্থোদ্ধার করে উঠার আগেই জায়গা ত্যাগ করল নম্রতা। টালমাটাল চালে এগিয়ে যাওয়া রমণীর পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আরফান। চোখের পলক পড়ছে না। নম্রতা করিডোরের বাঁকে হারিয়ে যেতেই

ঘোর কাটলো আরফানের। ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো সে। শার্টের উপরের বোতাম দুটো খুলে বার দুয়েক ঢোক গিলল। কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে। অস্থির লাগছে। প্রচন্ড অস্থিরতায় দরফর করছে শরীর।কালো বিশাল আকাশটিতে তারার মেলা বসেছে আজ। সারাদিনব্যাপী বর্ষনের পর ঝকঝক করছে আকাশ। চারদিকের

মৃদুমন্দ বাতাসে শীত শীত লাগছে নীরার। ওড়নাটা গায়ের উপর আরো একটু টেনে দিয়ে চারপাশে তাকাল নীরা। থমথমে , নীরব রাস্তায় কোথাও নম্রতার টিকিটুকুর সন্ধান নেই। নম্রতার দেরী হচ্ছে দেখে নিজেকে আর ঘরে ধরে রাখতে পারেনি নীরা। এই অসময়ে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। নম্রতাকে ফোনে না পেয়ে রঞ্জন আর নাদিমকেও ইনফর্ম

করেছে। দশ-পনেরো মিনিটের মাথায় ল্যাম্পপোস্টের ফিঁকে আলোর নিচে রঞ্জনকে চোখে পড়ল নীরার। টুংটাং শব্দ তুলে ছুটে চলা রিকশার উপর বসে আছে রঞ্জন। পাশে ভুবনমোহিনী পূঁজা। সাদা আর নীলের মিশেলে শাড়ি পড়েছে পূজা। বড় বড় চোখদুটো গাঢ়ে কাজলে রাঙা। নীরার ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রিকশা। রিকশাটা

ছেঁড়ে দিয়ে নীরার দিকে তাকাল রঞ্জন। ভ্রু কুঁচকে বলল,‘ বের হতে মানা করেছিলাম না? শুধু শুধু বেরিয়েছিস কেন? সাড়ে আটটা বাজে প্রায়। হলে ঢুকতে দেবে এখন?’

কথাটুকু বলে নীরার উত্তরের জন্য মিনিট খানেক অপেক্ষা করল রঞ্জন। এরইমধ্যে উত্তর দিকের রাস্তা ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে দেখা গেল

লম্বাটে এক তরুণ। পরনে থ্রী কোয়াটার প্যান্ট, কাঁধে গিটার। ফ্যাকাশে বাদামি চুলগুলো বাতাসে মুক্ত। নীরাদের দেখতে পেয়ে আরও দ্রুত পায়ে পথটুকু অতিক্রম করল ছেলেটি। ওদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েই ধমকে উঠে বলল,‘ তোগো কী আর কোনো কাম-কাজ নাই? শালার রাইতেও শান্তি দিবি না। ওই হারামি মরছেড়া কই? রাত-বিরেতে মাইয়া

মানুষের এতো টগরবগর থাকব ক্যান? থাপড়াইয়া ঠিক করা উচিত বেয়াদব।’

নীরা, রঞ্জন নীরব দৃষ্টিতে নাদিমের দিকে তাকিয়ে রইল। নাদিম বিশাল বিরক্তি নিয়ে পাশে থাকা ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। অসচেতনতায় পূজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। এক গাল হেসে বলল,

‘ আসসালামু আলাইকুম থুক্কু আদাব। আদাব বৌদি। এই গর্দভ এই রাতের বেলাও আপনাকে বগল দাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি? বন্ধুকে তো একদম মজনু বানিয়ে দিয়েছেন বৌদি। রাতে ঘুমালেও বৌদি বৌদি থুক্কু পূজা পূজা করে।’ নাদিমের কথায় হেসে ফেলল পূজা। রঞ্জন ঘাড়ের কাছে একটা কিল বসিয়ে বলল,‘ ডাহা মিথ্যা কথা!

তোর আজাইরা প্যাঁচাল বন্ধ করে নম্রতাকে খোঁজ। নম্রতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

নাদিম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল,

‘ মইরা গেছে হয়তো। পাশেই মেডিক্যাল। আয় মর্গে চেইক মাইরা আসি গা।’

নীরা রাগী দৃষ্টিতে তাকাল। শাসিয়ে বলল,

‘ একদম ফাজলামো করবি না। ব্যাপারটা সিরিয়াস। ফোনে কিসব উলোটপালোট কথা বলছিল। মাথা ঘুরছে, শরীর খারাপ করছে হেনতেন।’নীরার কথায় কানের পাশে চুলকাতে চুলকাতে মুখভঙ্গি গম্ভীর করল নাদিম। ঠিক তখনই পকেটে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। নাদিম মাত্রাতিরিক্ত বিরক্তি নিয়ে ফোন বের করল। স্ক্রিনে ছোঁয়ার

নামটা দেখেই চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলল সে। ভ্রু-কপাল কুঁচকে বলল,

‘ এই বালডা ফোন দেয় ক্যান আবার?এক্সট্রা মাথাব্যথা একটা।’

কথাগুলো বলতে বলতেই ফোন রিসিভ করল নাদিম। প্রথম বাক্যেই ধমকে উঠে বলল,

‘ ওই হারামি! তোর ফোনে আর কারো নাম্বার নাই? আমারে ফোন

দেস ক্যান? শুদ্ধ ভাষা শিখাইতে ফোন দেস? তোর বা..’

ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল ছোঁয়া,‘ খবরদার শব্দটা উচ্চারণ করবি না নাদিম। ছিঃ! তোর এসব থার্ডক্লাস কথাবার্তায় বমি পায় আমার। একটা স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা সত্ত্বেও নর্দমার মতো বিহেভিয়ার তোর। মাম্মা তো স্বাদে বলে না যে, নাদিম নামের ছেলে

থেকে দূরে থাক। দেয়ার ইজ আ স্ট্রং রিজন।’

নাদিম জ্বলে উঠে বলল,

‘ ওই ইংরেজের ঘরের ইংরেজ। তোরে কইছি আমার লগে মিশতে? শালের জীবনডারে ফ্যানা ফ্যানা বানাই হাল দিলি।’

ছোঁয়া বুঝতে না পেরে বলল,

‘ হোয়াট ইজ ‘ফ্যানা ফ্যানা’? আর ‘হাল’ দেয় কিভাবে?’

নাদিম চূড়ান্ত বিস্মিত। রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বরে বলল,‘ এই শালী তো বাংলা বুঝে না রে মামা। এই তুই বাংলাদেশতে বাইর হ। এই মুহূর্তে বাইর হ। ব্রিটিশের বংশদূত। বাংলা বুঝস না আবার ভাষা শিখাস!’

ছোঁয়া যেন বেকুব বনে গেল। অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ ওগুলো বাংলা ছিল? তাহলে আমি কখনও শুনিনি কেন?’

‘ তুই ইংরেজের জাত এইজন্য। ফারদার তুই যদি আমারে ফোন দিয়া মাথা খাস। কসম ছোঁয়াইয়া, তোরে আমি মার্ডার কইরালামু।’এদের দুজনের ঝগড়ায় চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে ফোনটা ছিনিয়ে নিল রঞ্জন। ছোঁয়াকে ফোন দেওয়ার কারণ জিগ্যেস করতেই জানা গেল,

সে নম্রতার বর্তমান পরিস্থিতি জানার জন্য কল করেছে। কিন্তু নাদিম তাকে বাজেভাবে ডিস্ট্রেক্ট করে দিয়েছে। নাদিমের মতো বেয়াদব ছেলে এই দুনিয়াতে হয় না। ওর মতো একটা বন্ধু পেয়ে ছোঁয়ার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। বাংলা ভাষার এমন বাজে পরিণতির জন্য নাদিমকে পুলিশ দেওয়া উচিত। রঞ্জন বেশ মনোযোগ দিয়ে ছোঁয়ার

কথা শুনলো। টুকটাক প্রয়োজনীয় কথা বলে ফোন ছাঁড়ল। নাদিমের দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই পাঁচমিশালি চরিত্রের বন্ধু পেয়ে বেচারার জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত। আড়চোখে পূজার দিকে তাকাতেই দেখল পূজা হাসছে। ঠোঁট টিপে বিচিত্র ভঙ্গিমার সেই হাসিতেই মাথা পাগল হয়ে যায় তার। ইশ! মেয়েটা এতো স্নিগ্ধ কেন?

নাদিমদের কথাবার্তার মাঝপথেই একটা রিক্সা এসে থামল তাদের পাশে। রিক্সা থেকে নেমে বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল সেই তরুণী,‘ তোরা সব এখানে কী করছিস?’

নম্রতাকে সুস্থ-সবল দেখে গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইল ওরা। নীরবতা ভেঙে নাদিমই কথা বলল প্রথম,

‘ তুই একলাই আইসা পড়ছস? আমরা আরও মর্গে থাইকা আনতে যাইতাছিলাম তোরে। লাশ আনতে যে গাড়িবাড়ি লাগব সেই ভাড়ার জন্য চান্দা তুলতাছিলাম। তোর তো মামা ধৈর্য্য এক্কেবারে কম!’

নম্রতা হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল। কিছু বুঝতে না পেরে বলল,

‘ মানে?’

‘ ওর কথা বাদ দে তো। কোথায় ছিলি এতোক্ষণ? ফোন দিচ্ছি ফোনটা পর্যন্ত তুলছিস না। ঠিক আছিস?’

নীরার কথার মাঝেই মাথায় শক্ত চাটি মারল নাদিম। নীরা শক্ত চোখে তাকাতেই চোখ পাকিয়ে তাকাল নাদিম। রঞ্জন দুষ্টুমি করে বলল,‘ তোমার চিন্তায় তো ঠিকঠাক প্রেমটাও করতে পারলাম না কলিজা। বারবার আমার প্রেমে

এমন বজ্রপাত ঘটালে কিন্তু তোমাকে ইন্সট্যান্ট ডিভোর্স দিয়ে দেব কলিজা।’

নম্রতা হেসে ফেলল। রঞ্জনের বাহুতে চড় বসিয়ে বলল,

‘ হারামি!’

নাদিম বাঁকা হেসে বলল,

‘ কলিজা! ভাই তোর কয়ডা লাগে? এইডা কলিজা হইলে ওই পাশেরটা কি? ফুসফুস? ‘

‘ উহু। এইটা জান।’

রঞ্জনের কথার ধরনে আবারও হেসে ফেলল সবাই। নীরা কৃত্রিম মন খারাপ নিয়ে বলল,

‘ আহা! আজকে কারো জান, কলিজা হতে পারলাম না বলে!’

নাদিম তৎক্ষনাৎ মাথায় চাটি মেরে বলল,‘ তোর কয়ডা লাগে রে বেয়াদব মহিলা? ওই ব্যাংকারের হাত, পাও, কিডনি, ফ্যাঁপড়া, ফুসফুস

হয়েও তোর শান্তি নাই? আবার জান, কলিজা হইতে মন চায়?’

নাদিমের কথায় মুখ ভেঙাল নীরা। পূজা খিলখিল করে হেসে উঠল। প্রত্যেকের জীবনের চাপা কষ্টগুলো মুহূর্তেই যেন শূন্যে উড়াল দিল। ঘড়িতে মধ্যরাতের ঘন্টা বাজছে। নীরা-নম্রতা কারো চোখেই ঘুম নেই। নীরা দুটো চায়ের কাপ এনে বিছানায় পা তুলে বসল। নম্রতার

দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বেশ ফুরফুরে কণ্ঠে বলল,

‘ এখন বল তো কই ছিলি? কারো প্রেমে মজেছিলি নাকি, হুম?’

নীরা ভ্রু নাচিয়ে দুষ্টু হাসল। নম্রতা অনুভূতিশূন্য চোখে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে খুবই সাধারণভাবে বলল,‘ খুঁজে পেয়েছি।’

নীরা বুঝতে না পেরে বলল,

‘ কী খুঁজে পেয়েছিস?’

নম্রতার ভাবলেশহীন উত্তর,

‘ যাকে খুঁজে পেলে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, তাকে খুঁজে পেয়েছি।’

নম্রতার কথাটা বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল নীরা। বুঝে উঠার সাথে সাথেই চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ তুই কি কোনোভাবে তোর পত্রপ্রেমিকের কথা বলছিস নমু?’

নম্রতা শুকনো হাসল। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল নীরা। চায়ের কাপটা রেখে দুই হাতে মুখ চেপে ধরে বলল,

‘ কিভাবে সম্ভব? হাও ম্যান হাও? আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। দেখেছিস তাকে? দেখা হয়েছে? কিভাবে কি হলো? কি কথা বললি? সব বল আমায়। ও মাই গড! আমি আর চিন্তা করতে পারছি না।’

নীরাকে এতো উত্তেজিত হতে দেখে হাসল নম্রতা। মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ তুইও চিনিস। দেখেছিসও।’

নীরার চোখ এবার কুটোর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম। বিছানায় আবারও ধপ করে বসে পড়ল সে। কৌতূহল নিয়ে বলল,

‘ আমি চিনি? বলছিস কী? পরিচিত কেউ?’

নম্রতা ফোনটা উল্টে নীরার মুখের সামনে ধরল। নীরা চোখ ছোট ছোট করে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। আরফান আলম নামের একটি আইডি থেকে কন্টিনিউয়াসলি ম্যাসেজ আসছে ফোনে। নীরা মুখটা আরেকটু এগিয়ে নিল। দেখতে দেখতেই আরও তিন চারটে ম্যাসেজে এসে জমা হল ইনবক্সে।

নীরা জোরে জোরে পড়ার চেষ্টা করল,

‘ মিস. নম্রতা, আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ। প্লিজ! একটু বোঝার চেষ্টা করুন। এটা আমার জীবন-মরণ প্রশ্ন। ম্যাসেজের রিপ্লাই তো দিন এটলিস্ট। প্লিজ, নম্রতা। আই বেগ ইউ, প্লিজ।’ম্যাসেজটা পড়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নীরার। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে বলল,

‘ দোস্ত! তুই প্লিজ এটা বলিস না যে ডক্টর আরফানই..’

নম্রতার নির্বিকার চাহনি দেখে যেন দুনিয়া ঘুরে গেল নীরার। ভাবনাতীত বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ কেমনে সম্ভব? আমার একদমই বিশ্বাস হচ্ছে না। কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না তো?’

নম্রতা জবাব দেওয়ার আগেই আবারও প্রশ্ন করল নীরা,

‘ এক্সাইটমেন্টে হাত-পা কাঁপছে আমার। কিভাবে সম্ভব! আচ্ছা? ডক্টর জানে ব্যাপারটা?’

নম্রতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আমি কিছু বলিনি। তবে সন্দেহ অবশ্যই করেছে। আর সন্দেহ জেগেছে বলেই একের পর এক ম্যাসেজে পাগল করে দিচ্ছে।’‘ ও মাই গড! দোস্ত? তোর কেমন ফিলিংস হচ্ছে রে? লজ্জা লাগছে?

আমার তো ভাবতেই কেমন কেমন লাগছে। জাস্ট চিন্তা কর? এই ডাক্তারের জন্য তোকে বাসর ঘরে একহাত গোমটা দিয়ে বসে থাকতে হবে। যে ডাক্তারকে তুই দুই চোখে দেখতে পারিস না তাকে প্রেমিক হিসেবে মানতে হবে। এই ব্যাটারে তুই প্রেমময় গদ্য লিখেছিস, ভাবা যায়? এই তোরা বাসর ঘরের আলাপচারিতাও সেড়ে নিয়েছিলি

নাকি চিঠিতে? আস্তাগফিরুল্লাহ! অস্বস্তি লাগছে না?’

নম্রতা কপাল কুঁচকে তাকাল,

‘ তোর চিন্তা এতো দ্রুত দৌঁড়ায় ক্যান? ডিরেক্ট বাসর ঘরে ঢুকে গেলি? এতো সোজা? এই ডাক্তারকে এতো সহজে ছাড়ব নাকি আমি? আমাকে চারটা বছর যে জ্বালানো জ্বালিয়েছে তার ডাবল জ্বালাব আমি।’

নীরা উৎসাহ নিয়ে বলল,
‘ কী করবি? চেম্বারে গিয়ে সুযোগ নিবি? ফ্রীতে চিকিৎসা নেওয়া যাবে, আহা!’
নম্রতা কটমট করে তাকাল। চোখ পাকিয়ে বলল,‘ তোর মাথা।’
নীরা মুখ গোমড়া করে বলল,
‘ তাহলে? কি করবি তুই?’
‘ কিছুই করব না। এই কিছুই না করাটাই তার জন্য হবে অনেক

কিছু। আচ্ছা? একটা বিয়ে করে ফেললে কেমন হয় নীরা? সেই বিয়ের ভিডিও তাকে গিফ্ট হিসেবে পাঠাব। দেখাব, তার প্রতারণায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমি ভালো আছি। এবং হেসে খেলে সংসার করছি।’

কথাগুলো বলতে বলতেই নীরব হয়ে গেলো নম্রতা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ-ই ফুঁপিয়ে উঠল। দু’হাতে মুখ

চেপে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল,

‘ আই হেইট হিম নীরু। আই জাস্ট হেইট হিম।’

নীরা অসহায় চোখে চেয়ে রইল এই অসম্ভব দুঃখী মেয়েটির দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ উপলব্ধি করল, এই কান্নায় দুঃখ নেই। এই কান্না ভরা প্রাপ্তির সুবাস। নম্রতার কাঁধে একটা হাত রেখে খানিকটা

এগিয়ে এসে বসল নীরা। নরম কণ্ঠে বলল,' ধুর পাগলী! কাঁদছিস কেন বল তো? তোর মতো ধৈর্য্যশীল মেয়ে এমন ভ্যা ভ্যা করে কাঁদে নাকি?'

নম্রতা জলমাখা চোখ তুলে তাকাল। বোকা বোকা কণ্ঠে বলল,

' আমার নিজেরও ভীষণ অস্বস্তি লাগছে রে। আমি ডক্টর আরফানকে... '

নম্রতার কথার মাঝেই ফোন বাজল নীরার। ফোনটা তুলতেই ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল নাদিম,
‘ অন্তুকে একটা ফোন লাগা তো নীরু।’
কোনো ভূমিকাহীন এই কথায় অবাক হলো নীরা। বিস্ময় নিয়ে বলল,
‘ কেন? এতোরাতে ওকে ফোন দিব কেন হঠাৎ ?’
নাদিম বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ আমার ফোনে টাকা নাই তো তাই তুই ফোন দিয়ে জিগ্যেস করবি টয়লেট হচ্ছে নাকি ঠিকঠাক?’

‘ মানে?’নাদিমের বিরক্তি এবার আকাশ ছুঁলো। ধমকা ধমকির এক পর্যায়ে বলল,

‘ তুই হইলি দুনিয়ার বেকুব। ফোন লাগা ওরে। ওর মায়ে কাইন্দা কাইটা ফিট মারতাছে। বাসায় যায় নাই সারাদিন। রাত একটা বাজে

এখনও কোনো খোঁজ খবর নাই। কারো ফোন ধরতাছে না। এখন নিশ্চয় বুঝাই দেওয়া লাগব না যে কেন ফোন দিতে কইতাছি?’

নীরা প্রথম দফায় আঁতকে উঠলেও খুব দ্রুত সামলে নিল। শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমি ফোন দিতে পারব না।’

নাদিমের মেজাজ চটে যাচ্ছে। রাগ গমগমে কণ্ঠে বলল,

‘ কেন পারবি না?’‘ যেখানে তোদের কারো ফোন তুলছে না সেখানে আমার ফোন কেন তুলবে ও। তাছাড়া আমি চাইছি না… ‘

নাদিমের কণ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটল এবার। চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ কি চাইছিস না তুই? শুনি কি চাইছিস না? তুই চাস পোলাডা মইরা যাক? তিনদিন পর পরীক্ষা আর আমরা এখানে পড়াশোনা বাদ

দিয়া তোগোর রঙলীলা দেখতে বইসা আছি। শালার.... '

নাদিম কথাটা শেষ না করেই ফোন কাটল। নীরা ফোনটা কানে নিয়েই স্থির বসে রইল। বুকের ভেতর উথলে উঠা কান্নাটা বুকের কাছেই থেমে গেল। বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে নম্রতার দিকে তাকাল। কান্না আর কষ্টটুকু চেপে প্রশ্ন করল,

‘ অন্তু আমাকে ভালোবাসে। এটা আমার দোষ? আমি বলেছিলাম ভালোবাসতে?’নীরার কঠিন কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল নম্রতা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চমকে উঠে ভাবল, নীরা কী সত্যিই অন্তুকে ভালোবাসে না? একটুও না? নাকি সবই নাটক বা বাহানা?

রাতের শেষ প্রহর। আকাশের কোণে ফ্যাঁকাশে আলোর স্ফূরণ।

সদ্য ফর্সা হয়ে আসা আকাশটাতে দুই একটা পাখির পদচারণ। চারপাশে শিরশিরে ঠান্ডা বাতাস। এই নিস্তব্ধ রাতের শেষ প্রহরে ভূতগ্রস্তের মতো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে পাতলা টি-শার্ট পরিহিতা সুঠাম দেহী যুবক। মাথার চুলগুলো বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে। চোখের কোণে নির্ঘুম রাতের ছাপ। ডান হাতের মুঠোয় ফোন।হাতে থাকা

ফোনটার দিকে শেষ বারের মতো তাকিয়েই রাগে-বিরক্তিতে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল আরফান। সবসময় পরিপাটি থাকা ঘরটি আজ অগোছালো। এখানে সেখানে পড়ে আছে বই, ফুলের ঝাঁড়। বুকের অস্থিরতাটা যেন ছড়িয়ে আছে ঘরজুড়ে। আরও কিছুক্ষণ বারান্দার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভেতরের দিকে সরে এলো

আরফান। শেভিং রেজারের ওপর নগ্ন পাটা পড়তেই চোখ-মুখ কুঁচকে গেল তার। অবিন্যস্ত ঘরটির দিকে চোখ রেখেই রেজারটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। কেঁটে যাওয়া পা নিয়েই ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল বিছানায়। পায়ে নয় বুকে জ্বালাপোড়া করছে খুব। ডান হাতটা কপালের ওপর রেখে চোখ বোজল। সাথে সাথেই ডান চোখের

কোল ঘেঁষে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। বহু বছর পর। হ্যাঁ, বহু বছর পর আবারও গড়াল এই জল! বিশাল ড্রয়িংরুমের ধবধবে সাদা সোফায় বসে আছে নাদিম। কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিংটির দিকে তাকিয়ে আছে। পেইন্টিং-এ একটি নগ্ন মেয়ের ছবি। নগ্নদেহী মেয়েটির গলায় জড়োয়া গহনা, হাত ভর্তি চুড়ি। টলমলে

চোখজুড়ে গাঢ় কাজলের রেখা। নাদিম তীক্ষ্ণ চোখে পেইন্টিংটির অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করল। চেষ্টা সফল হচ্ছে না। চিত্রশিল্পী নগ্ন মেয়ের গায়ে গহনা, চুড়ি ঝুলিয়ে কী প্রমাণ করতে চাইছে নাদিম বুঝতে পারছে না। নাদিমের ঠিক সামনের সোফাটাতেই বসে আছেন ইমায়েত সাহেব। মৌশির বাবা। গম্ভীর গড়নার এই মানুষটিকে সামনে রেখে

একটি নগ্ন পেইন্টিং-এর দিকে ‘হা’ করে তাকিয়ে থাকাটা অনুচিত। নাদিমের উচিত পেইন্টিং থেকে চট করে নজর সরিয়ে ফেলা। নাদিম চোখ সরাল না। নরম, স্নিগ্ধ নারীদেহের দিকে তাকিয়ে থেকেই প্রশ্ন করল,‘ এটা কার পেইন্টিং? অবশ্যই কোনো রুচিশীল পুরুষ হবেন এই চিত্রকার?’

ইমায়েত সাহেব অবাক হলেন। নাদিমের স্বতঃস্ফূর্ত কথায় কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ল। পরমুহূর্তেই নিজের বিস্ময় চাপা দিয়ে বললেন,

‘ পুরুষই কেন হবে? চিত্রকার কী নারী হতে পারে না?’

নাদিম হাসল। আড়চোখে আরও একবার পেইন্টিংটি দেখে নিয়ে বলল,

‘ হতে পারে। কিন্তু এই পেইন্টিং এর চিত্রকার কোনো নারী বলে মনে হচ্ছে না।’

ইমায়েত সাহেব ভ্রু কুঁচকে বললেন, ‘ মনে হচ্ছে না কেন?’

‘ নারীদেহ পুরুষের চোখে যতটা সৌন্দর্যমন্ডিতভাবে প্রকাশ পায়, নারী চোখে ততটা পায় না। পেইন্টিং-টা দেখেই বুঝা যাচ্ছে, চিত্রকার ছবিটা খুব অনুভূতি নিয়ে এঁকেছেন।

কোনো নারীর নিজের দেহের প্রতি অত অনুভূতি আসার কথা নয়।’ইমায়েত সাহেব কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণ অথচ শান্ত দৃষ্টিতে নাদিমের দিকে চেয়ে রইলেন। টিউশনি করানো ছেলেগুলো ছাত্রীর অভিভাবকদের কাছে সবসময়ই অতিব পবিত্র হওয়ার ভান ধরতে পছন্দ করে। চোখে-মুখে তরল নিষ্পাপ ভাব আনার চেষ্টা করে।

কথাবার্তার ধরন থাকে বিনীত। মৌশির আগের দুটো গৃহশিক্ষকও অনেকটা সেরকমই ছিল। কিন্তু নাদিমের মধ্যে এমন কোনো ধরন দেখা যাচ্ছে না। ছেলেটির কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। ভয় নেই। নিজেকে নিষ্পাপ, নির্দোষ প্রমাণ করার কোনো তাড়া নেই। ইমায়েত সাহেব হঠাৎই উপলব্ধি করলেন তিনি বিরক্ত হচ্ছেন।

বিচারক মানুষের এই এক সমস্যা। তাদের সুপ্ত মন সবসময়ই চায়, সামনে বসে থাকা মানুষটি তার ভয়ে অস্থির থাকুক। কথাবার্তা গুলিয়ে ফেলুক। কিন্তু নাদিম কথা গুলিয়ে ফেলছে না। নিঃসংকোচে নগ্ন পেইন্টিং নিয়ে আলাপজুড়ে বসে আছে। ইমায়েত সাহেব মৃদু কাশলেন। রণিতা নামের এক তরুণী চমৎকার, ঝকঝকে দুটো

কাপ ভর্তি চা দিয়ে গেল। ইমায়েত সাহেব নিজের কাপটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,‘ তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করো না।’

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হালকা হাসল নাদিম। এই বাড়ির চা খেতে বিস্বাদ। কখনও শরবতের মতো মিষ্টি তো কখনও বিষের মতো তেতো। এই মূহুর্তে চা খেতে লাগছে নিমের পাতার মতো বিস্বাদ।

নাদিমের অশ্লীল কিছু গালি দিতে ইচ্ছে করছে। নিষিদ্ধ ইচ্ছেটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে চায়ের কাপে মনোযোগ দিল নাদিম। চা বানানোটা একটা শিল্প। ঠিকঠাক চা বানানোর শিল্পটা এদের নেই। নাদিম হালকা গলায় বলল,

‘ কিছু মনে করছি না।’

ইমায়েত সাহেব আবারও ভড়কালেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললেন,

‘ তোমার গ্রামের বাড়ি কোথায়? বাবা কী করেন?’

নাদিম চোখ তুলে তাকাল। ইমায়েত সাহেব যে তার কথাবার্তায় চরম বিরক্ত তা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পারছে। ইমায়েত সাহেবকে বিরক্ত করে মনের কোথাও একটা প্রচন্ড

আনন্দও হচ্ছে। নাদিম বিরস মুখে বলল,‘ গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল। বাবা নেই। তাই কিছু করার প্রশ্নও উঠছে না।’

‘ মা?’

‘ মা-ও নেই।’

‘ ভাই-বোনও নেই?’

নাদিমের সাবলীল উত্তর,

‘ একটা বোন আছে। এবার বোধহয় এসএসসি পরীক্ষার্থী। একজেক্ট বলতে পারছি না।’

‘ বোধহয় কেন? তোমার বোন কোন ক্লাসে পড়ে তা তুমি জানো না? আশ্চর্য!’

‘ জিগ্যেস করা হয়নি।’

ইমায়েত সাহেবের বিস্ময় যেন আকাশ ছুঁলো। কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু একটা বলবেন

তার আগেই উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ল নাদিম,‘ আপনি আমাকে কেন ডেকেছিলেন স্যার?’

নাদিমের প্রশ্নে কণ্ঠনালিতে আটকে থাকা প্রশ্নগুলো গিলে ফেললেন ইমায়েত সাহেব। নাদিমের কথার ধরনই বলে দিচ্ছে, সে নিজের সম্পর্কে আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। ইমায়েত সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই ছেলেকে

তার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু মেয়ের জন্য ছাড়িয়েও দিতে পারছেন না। ইমায়েত সাহেব ক্লান্ত হাতে খবরের কাগজটা তুলে নিলেন। কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে বললেন,

‘ মৌশি বলছিল, তুমি দুদিন ধরে পড়াতে আসছ না।’

‘ জি। আসছি না।’

‘ কিন্তু কেন?’নাদিমের বলতে ইচ্ছে করল, আপনি বালের জাজ। নিজের

মেয়েকে যে জাজ করতে পারে না সে আবার কিসের জাজ? মেয়ে যে গাছে বসে কাঁঠাল খাচ্ছে সেদিকে না তাকিয়ে নাদিমকে জিগ্যেস করা হচ্ছে, আসে না কেন? নাদিম শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমার ফাইনাল সেমিস্টারের প্রস্তুতি চলছে। সময় হয়ে উঠছে না। আপনি চাইলে নতুন টিচার নিয়োগ দিতে পারেন। আমি খোঁজ দেব?’

ইমায়েত সাহেব খবরের কাগজটা সরালেন। নাদিমের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন,

‘ প্রয়োজন নেই। তোমার পরীক্ষা শেষ হবে কবে নাগাদ?’

নাদিম খানিকটা বাড়িয়ে চারিয়ে বলল,

‘ দেড় মাসের মতো তো লাগবেই।”

বেশ! দেড় মাস পরই রেগুলার পড়ানো শুরু করো। মাঝে মাঝে

পড়াশোনাতেও একটু আধটু গ্যাপ প্রয়োজন। ম্যান্টাল রিফ্রেশমেন্ট, ইউ নো? মৌশি একটু রেস্ট নিক বরং। এই দেড়মাস সপ্তাহে দু'দিন করে পড়িও। তাতেই হবে। হবে না?'

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হতাশ চোখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মৌশির মাঝে আজকাল বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ-ই মুগ্ধ চোখে

তাকিয়ে থাকছে। পড়তে আসার আগে বেশ সাজুগুজু করছে। নাদিমের লো-ক্লাস কথাবার্তা। হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলা দুই একটা নিষিদ্ধ শব্দ মেয়েটাকে আজকাল ভীষণ আকর্ষণ করছে। পড়ার মাঝে হুটহাটই খিলখিল করে হেসে উঠছে। নাদিম সাইকোলজির স্টুডেন্ট। এর বাইরেও পূর্ণাঙ্গ পুরুষ মানুষ। কিশোরী মনের তাড়না সে

বুঝে। মৌশির মনে বাসা বাঁধা ভয়ানক রোগটা হয়তো সে ধরে ফেলেছে।হল থেকে বেরিয়ে ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটছে নীরা-নম্রতা। হাতে থাকা নোট নিয়ে কিছু একটা আলোচনা চালাচ্ছে। দুই দিন বাদে পরীক্ষা। প্রচুর নোট বাকি। তারওপর শীটের এতো এতো মুখস্থ। নম্রতা-নীরার টেনশন মাখা কথাবার্তার মাঝেই ফোন বাজল

নম্রতার। স্ক্রিনে অচেনা নাম্বার দেখে কপাল কুঁচকাল নম্রতা। ফোনটা কানে নিয়ে সালাম দিল কিন্তু অপর পাশে নীরব। নম্রতা আবারও সাড়া দিল,

‘ হ্যালো? হ্যালো, কে বলছেন? হ্যালো?’

নীরা চোখের ইশারায় জিগ্যেস করল, ‘কে?’ নম্রতা ভ্রু কুঁচকে ফোনের স্ক্রিনটা চোখের সামনে

আনল। ঠোঁট উল্টে বলল,‘ কি জানি? কথা বলছে না তো।’

কথাটা বলে আবারও সাড়া দিল নম্রতা,

‘ হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো? শুনছেন?’

ওপাশ থেকে একবার জোড়াল দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এলো তারপরই কেটে গেল কল। নম্রতা খানিক অবাক হলো। রং-নাম্বার ভেবে বিষয়টাকে খুব একটা আমলে

আনল না। কিন্তু নীরার সাথে গল্পে মশগুল হতেই আবারও বেজে উঠল ফোন। এবারও সেই অপরিচিত নাম্বার। নম্রতা ফোনটা তুলে নরম কণ্ঠে বলল,

‘ হ্যালো! কে বলছেন?’

ওপাশে নীরব। কেউ একজন তুমুল অস্বস্তি নিয়ে কথা খুঁজছে। বিশাল অস্বস্তির সাগরে কোনোরূপ কথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নম্রতা

আবারও একই কথা জিগ্যেস করতেই, ফোনের ওপাশে গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠ হালকা কেশে গলা পরিষ্কার করল। আবারও কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল,‘ আমি আরফান আলম।’

এই তিন তিনটা শব্দ উচ্চারণ করতেই অস্বস্তিতে গলা বসে আসতে চাইল আরফানের। নম্রতার সাথে এভাবে কথা বলতে হবে

কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি সে। আরফান অস্বস্তি ঢেকে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। ‘ আরফান আলম’ নামটা শুনেই চমকে উঠল নম্রতা। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আরফানকে কপি করে বলল,

‘ কি চাই?’আরফান অস্বস্তি ভুলে এবার একটু হাসল। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ দেখা করতে চাই।’

‘ কেন?’

‘ দেখা হলে বলি?’

‘ সরি! আমি ব্যস্ত। দেখা করতে পারছি না। বলুন, কি বলবেন?’

আরফান থতমত খেয়ে বলল,

‘ এভাবে কিভাবে বলব? আপনি ফ্রী হবেন কখন?’

নম্রতা ভাবলেশহীন কন্ঠে বলল,

‘ আপাতত আমি ফ্রী হচ্ছি না। টানা এক-দুই মাস চলবে এই ব্যস্ততা। ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি বরং ফোনেই বলুন।’

‘ এর মধ্যে কী একটুও ফ্রী হবেন না? জাস্ট দশ মিনিটের জন্য। আমি বরং আপনার ভার্সিটি আসি। ক্যান্টিনে বসে কথা বলা যাবে। ইট’স আর্জেন্ট।’

নম্রতা শক্ত কণ্ঠে বলল,‘ হবে না। ভার্সিটির পর আমি শপিং-এ যাব। বিয়ের শপিং-এ অনেক সময় লাগে। ফ্যামিলি থাকবে সাথে। আই এম সো সরি, ডক্টর আরফান।’

আরফান সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ কার বিয়ের শপিং?’

‘ আমার।’

আরফান চমকে উঠে বলল,

‘ আপনার বিয়ে হচ্ছে?’

‘ হচ্ছে না হবে। আমি কি ফোনটা রাখতে পারি ডক্টর?’

আরফান জবাব দিল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করুন। একটু দেখব শুধু।’

নম্রতা ভ্রু কুঁচকে বলল,‘ কি দেখবেন?’

আরফান উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ আপনি কি দেখা করছেন?’
নম্রতা শক্ত কন্ঠে জবাব দিল,
‘ না।’
ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এলো জোড়াল দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। নম্রতা ফোনটা কেটে নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নীরার দিকে তাকাতেই চিন্তিত নীরা হঠাৎই প্রশ্ন করল,
‘ অন্তুর খোঁজ কি পাওয়া গিয়েছে? ফোন ধরেছিল?’নম্রতা-নীরা শীট-

নোট কালেক্ট করে লাইব্রেরি থেকে যখন বেরুলো তখন দুপুর দুটো বাজে। দু'জনের শরীরই তখন ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত। নীরা অস্বস্তি নিয়ে বিরবির করল,

' অন্তুর কোনো খবর পাওয়া গেল না, না?'

নম্রতা উদাস কণ্ঠে বলল,

' পাওয়া গেল না তো। এখন তো ফোনও বন্ধ দেখাচ্ছে। চিন্তা করিস

না, নাদিম-রঞ্জন খুঁজছে। পেয়ে যাবে।’

নীরা উত্তর দিল না। অতি সন্তপর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলল,

‘ তোর পত্রপ্রেমিকের কথা কি ভাবলি?’

‘পত্রপ্রেমিক’ শব্দটা শুনতেই ভেতর-বাহির নেচে উঠল নম্রতার।

চোখদুটো চকচক করে উঠল। নীরা আবারও বলল,

‘ বিলিভ মি, দোস্ত। ডক্টর আরফান তোর পত্রপ্রেমিক তা আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। এই লোকের পক্ষে চিঠিপত্র লেখা আদৌ সম্ভব?’নম্রতা জবাব দিল না। আরফানের কথাটা মনে হতেই মন খারাপ লাগছে তার। আরফান আর সে দুজনকে তার দুই মেরুর মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ‘সে’

তো চিঠিতে অতোটাও গম্ভীর ছিল না। তবে আরফান এতো গম্ভীর কেন? বাকিটা পথ দুজনের কেউই তেমন কথা বলল না। ক্যান্টিনে পৌঁছে হালকা কিছু অর্ডার করতেই কোথা থেকে উড়ে এলো নাদিম। চির পরিচিত গিটারটা এখনও ঝুলছে কাঁধে। গায়ে থাকা বাদামী শার্টটা ঘামে ল্যাপ্টে আছে বুকে। নম্রতার মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে ধুম

করে বসে পড়লো নাদিম। তারপাশে বসল ক্লান্ত রঞ্জন। ছোঁয়া এলো আরও দশ/পনেরো মিনিট পর। হাতভর্তি বই নিয়ে টালমাটাল পায়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। বিস্তর সরল হাসি দিয়ে বলল,

‘ নীলক্ষেত থেকে কিনে আনলাম এগুলো। কখন যে পড়ে শেষ করব সব।’ছোঁয়ার কথার জবাবে কেউ কিছু বলল না। ছোঁয়ার এই

অভ্যাসটা পুরোনো। পরীক্ষার আগে আগে স্যারের হাতে, টেবিলে, মুখে যত বইয়ের নাম শুনেছে বা দেখেছে সব কিনে এনে টেবিল বোঝাই করাই তার স্বভাব। তারপর রাতদিন এক করে একটা বইও শেষ করতে না পেরে ডিপ্রেশনে চলে যাওয়াটাও তার অন্যতম স্বভাব। নাদিম মুখে এসে যাওয়া কথাগুলো গিলে নিয়ে খাবার অর্ডার করতে গেল।

সারাদিনের ব্যস্ততায় এক মুঠো ভাত খাওয়ারও সময় হয়নি তাদের। ট্রে ভর্তি ভাত, আলু ভর্তা আর ডাল এনেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে খেতে শুরু করল সে। রঞ্জন ধীরস্থিরে নিজের প্লেটটা এগিয়ে নিল। টানা দশ মিনিট বিনাবাক্য ব্যয়ে খেয়ে চলল নাদিম। তারপর হুট করেই বলল,‘ তোর ওই ধাক্কা আরফানকে দেখলাম

রে নমু। তোগো মধ্যে প্রেম-পিরিতি হইয়া গেল না তো আবার?’

নাদিমের কথায় চমকে উঠল নম্রতা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কপাল কুঁচকাল,

‘ দেখলি? কোথায় দেখলি ওকে?’

নম্রতার উৎসাহে অবাক হলো নাদিম। সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাল,

‘ কোথায় আবার? ভার্সিটিতেই তো দেখলাম। আমাদের ডিপার্টমেন্ট

থেকেই বের হলো। ওই টাকলা স্যারও ছিল সাথে।’নম্রতার মনে দুমুখো অনুভূতির জোয়ার ছুটলো। ‘আরফান তার খুঁজেই হয়ত এসেছিল’, এমন ভাবনায় খুশি হয়ে উঠল মন। পরমুহূর্তেই অদ্ভুত এক অস্বস্তি দানা বাঁধলো বুকে । নম্রতার ভাবের এই পরিবর্তন চোখ এড়াল না নাদিমের। খাওয়া থামিয়ে কপাল

কুঁচকে তাকাল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘তোর ভাবভঙ্গি তো সুবিধার মনে হচ্ছে না রে মামা। কাহিনী কী? এমনে তো ডাক্তারের নাম শুনেই চিরিক মাইরা উঠো। আজ আবহাওয়া এতো ঠান্ডা কেমনে?’

নাদিমের কথায় অত্যন্ত ভাবুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল ছোঁয়া,‘হেই গাইস? হোয়াট ইজ চিরিক?’

ছোঁয়ার কথায় মেজাজ চটে গেল নাদিমের। ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘তুই আবারও আমার মান্ধাতার আমলের মেজাজটা খিঁচড়ে দিলি বাল। দ্যাখ, আমি আজকে বিরাট সিরিয়াস। এই সিরিয়াস মেজাজটা খিঁচড়ে দিলে তোর খবর খারাপ।’

‘স্ট্রেঞ্জ! আমি আবার কী করলাম? আই ওয়াজ জাস্ট আসকিং......’

‘তোর আসকিং-এর ......’

নাদিমকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিরক্তির শিষ তুলল নম্রতা। বিরক্ত হয়ে বলল,

‘আহ্, থামবি তোরা?ডক্টর আরফান এখানে কেন এসেছিল সেটা বল।’

নাদিম চোখ ছোট ছোট করে বলল,‘তুই আগে তোর কাহিনী বল। ওই ধাক্কা আরফানের জন্য তোর এতো নৃত্য করার কারণ কী? হুম হুম?’

কথাটা বলে ভ্রু নাঁচাল নাদিম। নম্রতা আমতা-আমতা করে কিছু বলার প্রস্তুতি নিতেই পাশ থেকে বিরস কন্ঠে বলে উঠল নীরা,

‘ ওর জন্য নৃত্য করবে না তো কার জন্য করবে? ওই ধাক্কাধাক্কিই তাহার পত্রপ্রেমিক মামা।’

নাদিম নীরার কথাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল,

‘ কি? পত্রপ্রেমিক বলতে?’

নীরা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল,

‘ যে প্রেমিক পত্রের মাধ্যমে প্রেম করে তাকে পত্র প্রেমিক বলে।’

নীরার কথা বলার ভঙ্গি ভাবলেশহীন হলেও বাকিদের চোখ চড়কগাছ। কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। নাদিম খাবার মুখে তুলতে ভুলে গেল। তারপর নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সাথে বলল,

‘ আজাইরা। আমি জিন্দেগীতে বিশ্বাস করি না। এটাও সম্ভব?’

নীরা বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ আমারও বিশ্বাস করতে বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু সত্যিটা তাই।’

রঞ্জন বলল‘ এই ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাগুলো কি তবে নিতান্তই কাকতালীয়? এতো কাকতালীয় ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটে? আশ্চর্য!’

‘ ঘটবে না কেন? আমার কি মনে হয় জানিস? ‘The whole world is a fair of coincidences’ আমাদের বেঁচে থাকাটাও বোধহয় একটা কাকতালীয় ব্যাপার।’

ছোঁয়ার কথায় সরু চোখে তাকাল নাদিম। তবে কোনোরূপ ধমকা-ধমকি না করে অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল,

‘ তোরা মাইয়ারা দেখি হেব্বি চালু। চিঠি চিঠি খেলেও রাঘব বোয়াল ক্যাচ করে ফেলছিস। মাই গড! আমি চিঠি লিখলে নির্ঘাত এই ছোঁইয়ার মতো মাথা পাগল, ছিট খাওরা, অশিক্ষিত, গাঞ্জাখোর মাইয়া জুটতো।’

ছোঁয়া চেতে উঠে বলল,‘ এই তুই কী আমাকে গালি দিচ্ছিস? হুয়াই আর ইউ ইনসাল্টিং মি?’

নাদিম আর ছোঁয়ার কথা কাটাকাটির মাঝপথেই ফোন এলো রঞ্জনের। ফোনে কথা বলা শেষে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রঞ্জনের ফ্যাকাশে মুখ দেখে ভেতর ভেতর খানিকা চিন্তিত হলেও বরাবরের মতো ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল নাদিম,

‘ কি হইছে? ফোনে কথা বইলাই এমন মটকা মারলি ক্যান?’

রঞ্জন নাদিমের দিকে তাকাল। বার কয়েক ঢোক গিলে নিয়ে অত্যন্ত শুকনো কণ্ঠে বলল,

‘ অন্তু হাসপাতালে।’

এই দুটো শব্দেই হাত-পা অসাড় হয়ে এলো নীরার। বাকিরাও স্তব্ধ অবিশ্বাস নিয়ে চেয়ে রইল রঞ্জনের মুখপানে। সবসময় কুল থাকা নাদিমের কপালেও দেখা দিল মৃদু

ঘাম। স্পষ্ট কণ্ঠটা একটু কেঁপে উঠল তার,‘ কোন হাসপাতাল?’

‘ মেডিক্যাল।’

কাউকে কিছু বলতে হলো না। বুঝিয়ে দিতে হলো না। পাঁচ জোড়া পা কোনো আলাপচারিতা ছাড়াই দৌঁড়ে বেরিয়ে গেল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। টেবিলে পড়ে রইল আধ খাওয়া খাবার। পরীক্ষার নোট। ছোঁয়ার এক গাদা বই। গরমের জন্য

খোলে রাখা নাদিমের জুতো জুড়োও। ক্যান্টিনের বাকি মানুষগুলো বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করল, পাঁচজন যুবক-যুবতি দিগবিদিক ছুঁটে চলেছে। চোখে মুখে তাদের একই দ্যুতি। একই ভয়।

প্রচন্ড মেজাজ খারাপ নিয়ে রোগীর সামনে বসে আছে আরফান। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আজ আর রোগী দেখবে না। এটাই শেষ।

তারপর সোজা বাড়ি। শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চাপ সব মিলিয়ে কেমন দমবন্ধ লাগছে তার। এভাবে আসলে বাঁচা যায় না। রোগীর সব কথা ঠিকঠাক না শুনেই কাগজ টেনে প্রেসক্রিপশন লিখল আরফান। প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ এই মেডিসিনগুলো এক সপ্তাহ ঠিকঠাক খান। এক সপ্তাহ পর আবার আসবেন।’

আরফানের কাট কাট কথায় নতুন করে কিছু বলার সাহস পেলো না আগুন্তকঃ। প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। আরফান ডানহাতে কপাল চেপে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসল। বিরক্তি আর রাগে মাথাটা ধপধপ করছে তার। পুরো পৃথিবীটাকে ভেঙে গুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। বিয়ে

করছে! বিয়ে করছে মানে কী? মন চাইল আর বিয়ে করে ফেলল? বিয়ে কী মামার বাড়ির মোয়া? বিয়ের আনন্দে আরফানের সাথে পাঁচ মিনিটের জন্য কথা বলতে পারছে না? আরফানকে এই মারপ্যাঁচ, এই মানসিক অশান্তিতে রেখে কিভাবে বিয়ে করে ফেলতে পারে সে? সবকিছু এতো সোজা? দরকার পড়লে কিডন্যাপ করে হাত-পা বেঁধে

সামনে বসিয়ে রাখবে। এই ধাঁধা থেকে মুক্তি না দিয়ে যাবে কোথায় এই মেয়ে? আরফান যা ভাবছে তাই যদি হয় তাহলে তো সারা জীবনেও ছাড়বে না তাকে। থাকতে না চাইলে, জোর করে রাখবে। আরফান চোয়াল শক্ত রেখেই ঘড়ির দিকে তাকাল, চারটা বিশ। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতেই দরজায় কড়া নড়ল।

আরফান ফিরে তাকাতেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ওয়ার্ড বয়। আরফানের কপাল কুঁচকে এলো। ভ্রু বাঁকিয়ে তেঁতো মুখে বলল,‘ কিছু বলবে?’

ওয়ার্ড বয় মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,
‘ স্যার ইমার্জেন্সির একটা প্যাশেন্টকে ঘন্টাদুই আগে কেবিনে দেওয়া হয়েছে।’

‘ তো?’

আরফানের থমথমে মুখ দেখে বাকিটা বলার ভরসা পেলো না ওয়ার্ড বয়। বার কয়েক ঢোক গিলে বলল,

‘ জি স্যার। আসলে...’

আরফান ধীরে অথচ শক্ত কন্ঠে বলল,

‘ যা বলার স্পষ্ট বলো। কি বলতে চাও?’

‘ রোগীর বাড়ির লোকরা ভীষণ হল্লা করছে। কেবিনে দেওয়ার পর আর কোনো ডাক্তার দেখেনি তাকে। আপনি যদি একটু দেখতেন। মুনতাসীর স্যার আপনার কথায় বলে গিয়েছে। ‘

আরফান মাত্রাতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে বলল,‘ বলে গিয়েছে মানে কী? এখন কি আমার ডিউটি? উনি নিজের ডিউটিটাও ঠিকমতো করতে

পারেন না? আর আমিই কেন? হাসপাতালের সব ডাক্তার কি মারা গিয়েছে?’

ওয়ার্ড বয়ের মুখ ইতোমধ্যেই ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছি। সবসময় শান্ত, রাগহীন মানুষটির কণ্ঠে স্পষ্ট রাগ ঝরতে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠছে সে। আরফান খুব দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। দুপুরের পর থেকে কিছুতেই রাগ কনট্রোলে রাখা

যাচ্ছে না। হুটহাট রেগে যাচ্ছে। আর রেগে গেলেই সামনের মানুষগুলোকে কঠিন কিছু কথা শোনাতে ইচ্ছে করছে। আরফান গাল ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি যাও। আমি আসছি।’ওয়ার্ড বয় যেন দেহে প্রাণ পেল। অনুমতি পেয়েই একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল রুম থেকে। আরফান তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টেথোস্কোপ হাতে বেরিয়ে

গেল। নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো, চিকিৎসকের মতো বিশ্রী পেশা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আর এই মুহূর্তে নিজের পেশার প্রতিই প্রচন্ড রকম বিরক্ত সে। নির্দিষ্ট কেবিনের সামনে এসেই হঠাৎ থমকে গেল আরফানের পা। করিডোরের চেয়ারে বসে থাকা চিন্তারত মেয়েটিকে দেখে কপালে থাকা বিরক্তির ভাঁজগুলো মিলিয়ে

গেল মুহূর্তেই। বুকেজুড়ে ঠান্ডা পরশ বয়ে গেল। টগবগ করতে থাকা রাগগুলো কেমন থিতিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে স্থির হয়ে গেল মেয়েটির পায়ে। কিন্তু হায়! মেয়েটির পা'জোড়া ঢেকে আছে কালো কাপড়ের নান্দনিক শো-জুতোই। আরফান হতাশ চোখে চেয়ে রইল জুতোই ঢাকা পা-জোড়ার দিকে।

নম্রতা দুই হাতে কপাল চেপে বসে ছিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দেওয়া সতর্ক বার্তায় চোখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠল। আরফানকে নিবিষ্ট চোখে জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল সে। কিছুক্ষণ কাঁচুমাচু করে এখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই চোখ তুলে তাকাল আরফান। তার গম্ভীর,শান্ত কণ্ঠে

এবার খানিক চঞ্চলতা খেলে গেল।‘ আপনি না বিয়ের শপিং-এ যান? তাহলে এখানে কি?’

‘ প্রয়োজন তাই।’

‘ ভেতরে কে? আপনার প্যাশেন্ট?’

নম্রতা মুখ কালো করে বলল,

‘ হুম। আমার ফ্রেন্ড।’

আরফান ভিন্ন ভঙ্গিতে ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ ওহ!’

এটুকু বলে থামল আরফান। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফিরিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলল। ঘাড়টা হালকা কাত করে বলল,

‘ কতক্ষণ থাকছেন?’

নম্রতা মুখ গুম করে উত্তর দিল,

‘ জানি না।’

আরফান অদ্ভুত কর্তৃত্বের স্বরে বলল,

‘ আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন। কথা আছে। আমি আপনার ফ্রেন্ডকে দেখে আসছি। ফিরে এসে না পেলে খবর আছে।’আরফানের মৃদু ধমকীতে চোয়াল ঝুলে পড়ার জোগার হলো নম্রতার। পাশে বসে থাকা ছোঁয়া চশমার উপর দিয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল। আরফান যখন কেবিনের দরজা ঠেলে ভেতরে

ঢুকলো। আরফানের লোমশ পুরুষালী হাত। ওই স্নিগ্ধ, গম্ভীর মুখখানা দেখে নম্রতার প্রথমবারের মতো মনে হলো, ‘ লোকটা দেখতে ততটাও খারাপ নয় বরং অদ্ভুত সুন্দর। ভীষণ ভীষণ সুন্দর।’পশ্চিমাকাশে ঝুলে আছে স্নিগ্ধ, নিরুত্তাপ সূর্য। চারদিকে কমলা রঙা আলো ছড়িয়ে জানিয়ে দিচ্ছে ক্লান্ত দিনের বিদায় সম্ভাষণ।

কেবিনের ছোট্ট কাঁচের জানালায় গড়াগড়ি খাচ্ছে নরম, মিষ্টি আলো। জানালার কার্নিশে বসে থাকা কুচকুচে কালো কাকটা কিছুক্ষণ পরপরই সবিস্ময়ে ঠুকরে দিচ্ছে স্বচ্ছ কাঁচে ভেসে উঠা তার নিজস্ব প্রতিবিম্ব। অন্তু সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে। মস্তিষ্কটা কেমন ঘোলাটে, অনুভূতিশূন্য। প্লাস্টারে ঢাকা

বামহাতটা কিছুক্ষণ পর পরই তীক্ষ্ণ ব্যথায় অস্থির করে তুলছে। অন্তু চোখ বোজল।অসহনীয় ব্যথায় কপাল কুঞ্চিত। অন্তু চোখ বোজেই বুঝতে পারল কেবিনের দরজাটা খুলে গিয়েছে। মৃদু মেয়েলী সুবাস ভেসে আসছে কাছে, খুব কাছে। অন্তুর চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রমনীকে দেখতে ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ

শুয়ে থেকে তার উপস্থিতি অনুভব করতে ইচ্ছে করছে। নীরা কাঠের টোলটা টেনে অন্তর মাথার কাছে বসল। এই এতোক্ষণে কেবিনে ঢোকার সাহস ও সুযোগ হলো তার। নীরার প্রতি অন্তর দুর্বলতাটা হয়ত কোনোভাবে জেনে গিয়েছেন অন্তর মা জাহানারা বেগম। শান্তশিষ্ট, গোলাগাল মহিলাটি পুরোটা সময় হিংস্র দৃষ্টিতে খেয়াল করে গিয়েছেন

নীরাকে। তার দৃষ্টি বলছিল, অন্তর এই অবস্থার জন্য শুধু এবং শুধুই নীরা দায়ী। নীরা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ জেগে আছিস?’

অন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ মেলে তাকাল। নীরার সুন্দর,টুলটুলে মুখটিতে গভীর বিষাদ দেখতে পেলে হয়তো খুব বেশিই খুশি হতো অন্ত। তার সুপ্ত মনও বুঝি এমনটাই চেয়েছিল। কিন্তু নীরার মাঝে

আহামরি দুঃখী দুঃখীভাব দেখা গেল না। স্নিগ্ধ চোখজোড়ায় ক্লান্তি ব্যতিত কিচ্ছুটি নেই। অন্তুর জন্য বিন্দুমাত্র অনুভূতি নেই। কষ্ট আর হতাশায় বুকের ভেতরটায় চিনচিনে ব্যথা করে উঠল অন্তুর। অন্তুকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরা। কঠিন কণ্ঠে বলল,‘ এক্সিডেন্টটা কিভাবে হলো? কোথায় ছিলি এই দুইদিন? সবকিছুকে

ফ্যান্টাসি ভাবলে হয় না অন্তু। জীবনটা ফ্যান্টাসি নয়। এই যে তুই এমন উদ্ভট কার্যকলাপগুলো করছিস, তাতে আমার ভেতরের বিরক্তটা হুহু করে বাড়ছে। এর বাইরে অন্যকোনো অনুভূতি হচ্ছে না। দুনিয়াকে কী দেখাতে চাইছিস? আমি অপরাধী আর তুই মহান? ভালোবেসে দেবদাস হয়ে যাচ্ছিস? লিসেন অন্তু, জোর করে বা

ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে কিছু হয় না। কেন বুঝিস না যে, আমিও তোকে ভালোবাসি। যতটা নাদিম, রঞ্জন, নমু, ছোঁয়াকে ভালোবাসি ঠিক ততটা ভালোবাসা তোর জন্যও বরাদ্দ। তোকে এভাবে দেখলে কষ্ট হয়। খারাপ লাগে। কিন্তু এই খারাপ লাগা থেকে সেমপ্যাথি আসে। ভালোবাসাটা আসে না। তাই এসব দেবদাসের ভং ধরা বন্ধ কর। বন্ধু

আছিস, বন্ধু থাক। প্লিজ!’নীরার কঠিন কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো অন্ত। কয়েক সেকেন্ড অপলক তাকিয়ে থেকে শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তুই নিজেকে এতো ইম্পোর্টেন্ট কেন ভাবছিস নীরু? এক্সিডেন্ট বিষয়টাই আকস্মিক। রাত জেগে বাইক চালাচ্ছিলাম তাই হয়তো একটু এদিক-ওদিক হয়ে গিয়েছে।

এছাড়া কিছুই না। অন্যের জীবনে নিজেকে অতোটা ইম্পোর্টেন্ট ভাবিস না। পায়েসে বাদাম যেমন উটকো। থাকলে বিলাসিতা না থাকলে গুরুত্বহীন। তুইও আমার জীবনে সেরকম, গুরুত্বহীন। আমাকে নিয়ে না ভেবে নিজের হবু স্বামী আর সংসার নিয়ে চিন্তা কর দোস্ত। ফ্রেন্ড সার্কেলে তোরই প্রথম বিয়ে। আমরা কিন্তু খুব আশাবাদী।’

অন্তর জ্বালা ধরা কথা আর অপমানে ভেতরটা বিষিয়ে উঠল নীরার। অন্তর দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে ম্লান হাসল।‘ বেশ তো। শুনে ভালো লাগল। এই কথাগুলো বাকি দুনিয়াকেও জানিয়ে দিস। দুনিয়ার কাছে তো আবার নীরা মহাপাপী।’ অন্তও ঠোঁটে হাসি ধরে রেখে বলল, ‘ অবশ্যই। তুই কি এখন একটু যাবি দোস্ত? আমি ঘুমাব।’

নীরা চুপচাপ বসে রইল। ভেতরটা পুড়ছে, জ্বলছে। চোখ ভাসিয়ে দিতে চাইছে উত্তপ্ত বর্ষণ। ততক্ষণে চোখ বোজে নিয়েছে অন্ত। নীরা উদাস দৃষ্টিতে অন্তর বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ধীর পায়ে উঠে এলো জায়গাটা থেকে। কেবিন থেকে বেরিয়েই মায়ের ফোন পেল নীরা। ফোনটা কানে নিয়ে কিছুটা ফাঁকা

জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই উদ্বেগী কণ্ঠে বলে উঠলেন মা,‘ কেমন আছিস নীরা?’

নারী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

‘ ভালো আছি মা। তুমি ভালো আছ?’

‘ তা আছি। কাল যে একটু বাড়ি আসতে হচ্ছে তোকে। খুব জরুরি।’

‘ কেন? কি হয়েছে, মা? পরশো থেকে আমার ফাইনাল পরীক্ষা। এখন কিভাবে যাব?’

‘ একটু ম্যানেজ করে চলে আয় মা। ছেলের বড় খালা আর দুলাভাই তোকে দেখতে চাইছে। ছেলেপক্ষকে তো আর মানা করতে পারি না।’

নীরা বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ আমি কী কোনো শো-পিস মা? জনে জনে দেখতে হবে কেন?

কুরবানির পশুকেও বোধহয় এত যাচাই বাছাই করে না। আমার অস্বস্তি লাগে।’

ওপাশ থেকে ব্যস্ত উত্তর,‘ ওমন বলতে নেই নীরা। বিয়ের সময় ওসব একটু আধটু হয়। আমাদের সময়ও হয়েছে। ছেলে টাকা-পয়সা কিছু নেবে না। শুধু সুন্দরী মেয়ে চায়। এমন শর্তহীনভাবে বিয়ে করছে, মেয়ে তো একটু যাচাই-

বাছাই করবেই। আমাদের কী এখন টাকা-পয়সা দিয়ে বিয়ে দেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে?'

নীরার বলতে ইচ্ছে করল, ' সুন্দর মেয়ে চাওয়া কী শর্তের মধ্যে পড়ে না মা? লোকটি তোমার মেয়ের মন নয় দেহে দেখে বিয়ে করছে। এই দেওয়াটা টাকা-পয়সা দেওয়ার থেকে অনেক বেশি কিছু কি হয়ে যাচ্ছে না?' নীরা তেমন কিছুই বলল না।

সুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,‘ আচ্ছা মা। আমি সকালের বাসেই আসছি। চিন্তা কোরো না।’

‘ হ্যাঁ। তাই কর। আর আসার আগে পার্লারে কি-সব করে না মেয়েরা? ফ্যাশিয়াল না কি? ওসব করে আসিস। নিজের যত্ন তো নিস না একদম। দিন দিন পোঁড়া কাঠ হচ্ছিস। ছেলের বড়খালা নাকি বাঘা মহিলা। বিয়ে টিয়ে ভেঙে গেলে

সর্বনাশ। এদিকে ইরা স্মার্টফোনের জন্য লাফালাফি করছে। দুই বোনের ভার্সিটির খরচই সামলে উঠতে পারছে না ইরাম। তারমধ্যে আবার ফোন? বিন্দুমাত্র আক্কেল নেই মেয়েটার।'

নীরা দুর্বল কণ্ঠে বলল,' এখন একটা স্মার্টফোন ওর আসলেই দরকার মা। ভার্সিটিতে পড়ছে। সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে না? তাছাড়া

এসাইনমেন্ট, নোট এসবের জন্যও লাগে ফোন।'

নীরার মা ক্ষ্যাপা কণ্ঠে বললেন,

' কই? তোকে তো কিনে দিইনি। তুই তাল মিলিয়ে চলতে পারিসনি? উল্টে পড়ে গিয়েছিস? পেঁয়াজের দাম হয়ে গিয়েছে ত্রিশ টাকা কেজি। একটা সংসার চালাতে কত খরচ হয় কোনো ধারণা আছে? ছেলেটা খেঁটে খেঁটে মরে যাচ্ছে। মেসে থেকে

চাকরী করছে। এই খাচ্ছে, এই খাচ্ছে না। এসব কী ও বুঝে না? সারাদিন স্যাশন ফি। হেন ফি। তেন ফি। কই? তুই তো নিস না।"

"আমার সাথে ওর তুলনা করছ কেন মা? আমার আর ওর জেনারেশনে যথেষ্ট গ্যাপ আছে। তুমি ওকে অযথা বকো না তো মা। ওকে ওর মতো বাঁচতে দাও। আমি টিউশনি খুঁজছি। দুই-এক মাসের টিউশনির টাকা

জমিয়ে ওকে একটা ফোন কিনে দেব। আমার কাছে টিউশনির কিছু টাকা জমানো আছে ওর স্যাশন ফি আমিই পাঠিয়ে দেব মা। ভাইয়াকে পাঠাতে হবে না।’

নীরার কথায় মা শান্ত হলেন না। সংসারের একের পর এক জোট-ঝামেলার কথা আওড়াতে লাগলেন। নীরা চুপচাপ শুনছে। সেইসাথে বুক ফেঁটে কান্না পাচ্ছে। মনে মনে শুধু

একটাই প্রার্থনা করছে, পৃথিবীর আর কোনো মেয়েকেই যেন তার মতো বাটগাছহীন, দুর্ভাগা হতে না হয়। ইরাকে যেন তার মতো এতোটা সহ্য করতে না হয়। তার ছোট বোনটা একটু বাঁচুক। প্রাণখোলে বাঁচুক। বুক ফাঁটা কষ্টগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কে চাড়া দিয়ে উঠল একটিই চিন্তা, আরেকটা টিউশনি পেতে হবে। খুব

শীগগির পেতে হবে!রেস্টুরেন্টের চওড়া টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে আরফান-নম্রতা। শেষ বিকেলের কমলা আলো তাদের গায়ে পড়ছে না। অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্টটা কৃত্রিম আলোতে ঝলমল করছে। নম্রতা ঘাড় ঘুরিয়ে আশেপাশের ডেকোরেশন দেখছে। মূলত, আরফান নামক মানুষটিকে পুরোদমে এবোয়েড করার চেষ্টা করছে।

আরফান নিশ্চুপ চোখে নম্রতার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। নম্রতা তাকে লক্ষ্য করছে কি করছে না সেদিকে তার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। নম্রতা ব্যাপারটা প্রথম থেকেই খেয়াল করেছে এবং চুপ থেকেছে। কিন্তু এবার একটু নড়ে চড়ে উঠল। হালকা কেশে গলা পরিষ্কার করল।‘ আপনি আমার পায়ের দিকে কি দেখছেন?’

নম্রতার কথায় আরফানের ঘোর কাটল। আনমনা হয়ে বলল,

‘ হু? কিছু বললেন?’

‘ আপনি আমার পায়ের দিকে অতো কী দেখছেন? জুতোগুলো পছন্দ হয়েছে? খুলে দেব?’

আরফান উত্তর না দিয়ে অল্প কাঁশল। দু-একদিনের অযত্নে গজানো দাঁড়িগুলোতে হাত বুলিয়ে নিয়ে ঘাড়ে হাত বুলাল। নম্রতাকে তার দিকে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে একজন ওয়েটারকে ডাকল আরফান। ঠোঁটে হাসি টেনে বলল,‘ কি খাবেন?’

নম্রতা শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কিছু খাব না। আপনি কি বলবেন, বলুন। শুনে চলে যাব।’

‘ আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম তবুও করলেন না কেন অপেক্ষা?’

নম্রতা এবার চোখে চোখ রাখল। আরফানের গম্ভীর, শান্ত চোখে কোথাও একটা শিশুসুলভ চঞ্চলতা। এক আকাশ কৌতূহল আর মায়া। নম্রতা সেই শিশুসুলভ চোখে চেয়ে বলল,

‘ অপেক্ষা খুবই ক্লান্তিকর ডক্টর। তাই এখন আর অপেক্ষা করার সাহস হয় না।’

আরফান কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থেকে নজর ফেরাল। অন্যদিকে চোখ রেখে বলল,

‘ আপনার পায়ে একটা পায়েল দেখেছিলাম সেদিন।’

‘ তো?’‘ পায়েলটা আমার পরিচিত। আসলে, আপনার পা জোড়াও আমার পরিচিত। ওগুলো সত্যিই আপনার পা?’

কথাটা বলে হাসল আরফান। নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে বলল,

‘ না তো। পাশের বাসা থেকে ধার করে এনেছি পা।’

নম্রতার কথায় মাথা নিচু করে হাসল আরফান। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ জুতো জোড়া একটু খুলবেন প্লিজ?’

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,

‘ কেন?’

‘ এক পলক দেখে যে ভাবনাটা এসেছিল সেই ভাবনাটা সঠিক কি-না যাচাই করব।’

নম্রতা সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘ কি ভাবনা এসেছিল?’

আরফান সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল,

‘ পা জোড়া আপনি চুরি করেছেন।’

‘ কিহ!’

নম্রতার আওয়াজটা খানিক জোড়ে হওয়ায় আশেপাশের দু-একজন ঘাড়

ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। আরফানের ঠোঁটে মৃদু হাসি। নম্রতা থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ বাদে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এসে নিচু স্বরে বলল,

‘ কি?’

আরফানের হাস্যোজ্জ্বল জবাব,

‘ আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আই হ্যাভ আ প্রুফ।’নম্রতা এবার সোজা হয়ে বসে সরু চোখে তাকাল। ‘হি

হ্যাজ আ প্রুফ?’ কিসের প্রুফ? নম্রতার কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো, লোকটি বদ্ধ পাগল। শ্যামবর্ণের অসহ্য সুন্দর পাগল। আরফান পকেট থেকে নিজের ফোন বের করে নম্রতার চোখের সামনে ধরল। নম্রতা অবাক হয়ে খেয়াল করল, আরফানের ফোন ওয়ালে নম্রতার পায়ের ছবি। প্রেমের প্রথম দিকে চিঠির সাথে পাঠানো কিশোরী

নম্রতার ফর্সা পায়ের ছবি। নম্রতার চোখে-মুখে বিস্ময় ফুঁটে উঠতেই হাসল আরফান। ফোনটা পকেটে রেখে বলল,‘ এবার বলুন, পা গুলো আমার নিজস্ব সম্পদ না আপনার?’

নম্রতা জবাব দিল না। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছুঁটছে। অদ্ভুত অনুভূতিতে উথাল-পাতাল হচ্ছে বুক। চোখ ভাসিয়ে কান্না পাচ্ছে। তারমানে

আরফান তাকে ভুলে যায়নি। সেও আরফানের কাছে ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যতটুকু নম্রতার কাছে ছিল আরফান। নম্রতা চট করে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে হাঁটা দিল। আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে নিশ্চয় কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে যাবে নম্রতা। এই পাব্লিক প্লেসে এমন ন্যাকামোর কোনো মানে হয়?

নম্রতার হঠাৎ প্রস্থানে হতভম্ব হয়ে গেল আরফান। নম্রতার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ-ই ডেকে উঠল সে,‘ শ্যামলতা! আপনিই শ্যামলতা, তাই না? ‘

নম্রতা থমকে গেল। দরজার কাছাকাছি গিয়েও ফিরে তাকাল। আরফান তার শিশুসুলভ চোখদুটোতে অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে চেয়ে আছে। নম্রতা টলমলে চোখদুটো

ফিরিয়ে নিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। চোখদুটো থেকে নেমে গেল এক বর্ষা শীতল বর্ষণ। আরফান বলা ‘শ্যামলতা’ ডাকটা ঘুরেফিরে বাজতে লাগল কানে। আকাশ, বাতাস, এই কোলহলময় শহর সবকিছুকে ছাপিয়ে ডেকে উঠল একটি পুরুষালি কণ্ঠ, ‘ শ্যামলতা! আপনিই শ্যামলতা, তাই না?’ নম্রতার চোখ ঝাপসা হয়ে

আসছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আসছে। চিৎকার করে পুরো পৃথিবীকে জানাতে ইচ্ছে করছে, শুনছ? আমি পেরেছি। চার চারটা বছর অপেক্ষার জ্বালা সইতে আমি পেরেছি। সে এখন আমায় ডাকে। কি আশ্চর্য! আজ আমি তাকে শুনতে পাই!'রাত দুটো কি তিনটা বাজে। এতোরাতেও হলের দু-একটা রুম থেকে গুনগুনিয়ে পড়ার আওয়াজ আসছে।

সিনিয়রদের তাসের আড্ডার হৈ-হুল্লোড়ও কানে আসছে মৃদু। নাদিম-রঞ্জন মাত্রই হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। ঘামে গোসল হয়ে থাকা শরীর থেকে বিদঘুটে গন্ধ আসছে। ঘামে ভেজা শার্টটা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল নাদিম। শরীরটা প্রচন্ড ক্লান্ত। রঞ্জন নিজের শার্ট খুলে ব্যালকণিতে লাগানো দড়ির ওপর ছড়িয়ে দিল।

ধীরে স্থিরে এসে বসল বিছানায়। রঞ্জনের সব কিছু যেন মাপা মাপা। সবকিছুই পরিষ্কার, পরিপাটি আর গোছালো। পূজার প্রতি ভালোবাসাটাও তার গোছানো। কোনো অতিরঞ্জতা নেই। কোনো ঝামেলা নেই। দু'জনেই শান্ত আর বোঝদার। নাদিম টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে গিটারটা টেনে নিল কোলে। গিটারের মাথায় আলতো

চুমু খেয়ে উলোটপালোট টুন বাজাতে লাগল। সেই উলোটপালোট সুরই বেশ সুন্দর শোনাল রঞ্জনের কানে। নাদিম গিটারটা বেশ আবেগ নিয়ে বাজায়। গিটারের প্রতিটি তারে তার স্পর্শ দেখে মনে হয় গিটার নয়, পরম আদরে প্রেমিকার নরম চিবুক ছুঁয়ে দিচ্ছে সে। নাদিম বার দুয়েক সুর তোলার চেষ্টা করে বলল,‘ দোস্ত? তুই যদি মাইয়া হইতি

তাহলে তোর সংসার হইতি হেব্বি পার্ফেক্ট। এক্কেরে ঝকমকা।’

রঞ্জন কপাল কুঁচকে তাকাল। বিছানা হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজে নিয়ে বলল,

‘ তুই মুখ খুললেই ফালতু কথা। এজ আ ম্যান, আমি ঠিক আছি। কথায় কথায় মাইয়া মাইয়া করলে তোর খবর আছে।’নাদিম হাসল। টেবিলে পড়ে থাকা নতুন উপন্যাসের

বইটির দিকে চোখ পড়তেই ভ্রু জোড়া কুঁচকে এলো। বইটি মৌশি দিয়েছে। মৌশি নাকি জন্মদিনে তার প্রিয় মানুষ এবং মোটামুটি প্রিয় মানুষদের গিফ্ট দিতে পছন্দ করে। দুর্ভাগ্যবশত নাদিম তার মোটামুটি প্রিয় মানুষগুলোর দলে আটকা পড়ে গিয়েছে এবং এই বই গিফ্ট হিসেবে নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। নাদিম বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে

দেখল। বইটা খুলে দুই-এক পাতা উল্টাতেই ভেতর থেকে টুপ করে পড়ে গেল একটা চিরকুট। নীল কাগজে লেখা নীল চিরকুট। নাদিম চিরকুটটা তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তাতে লেখা,‘ স্যার, আমি আমার জন্মদিনে বেশ কিছু মজার মজার খেলা খেলি। তারমধ্যে একটি হলো ধাঁধা খেলা। আমি যদি খেলাটা

আপনার সাথে খেলতে চাই তাহলে কি আপনি খুব রাগ করবেন? আপনার সাথে খেলাটা খেলতে চাওয়ার বিশেষ একটা কারণ আছে। এই বিশেষ কারণটা আমি এখনই বলব না। আপনাকে আমি চারটা প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নগুলোর ঠিকঠিক উত্তর দিতে পারলেই সেই বিশেষ কারণটা বলব নয়তো নয়। প্রশ্নগুলো হল,১. যখন ওকে দেখে

হাসি, সে ও হাসে আমাকে দেখে। আমি চোখ মারলে, সে-ও মারে। আবার আমি তাকে চুমু খেলে সে-ও আমায় সমান আগ্রহে চুমু খায়। কে সে বলতে পারেন?

২. এই জিনিসটা আসলে আমার। কিন্তু আমার কাছে ছাড়া তা শুধু তোমার কাছেই থাকতে পারে! কোন জিনিসের কথা বলছি জানেন?

৩. কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের কখনও ঝগড়া হয় না কেন জানেন?

৪. এই জিনিসটির উপর বড়লোকেরা অধিকার স্থাপন করতে চান। জ্ঞানীরা বুঝতে চান। আর গরিব মানুষদের কাছে এটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। কোন জিনিসটির কথা বলছি জানেন?

স্যার, আপনি কি প্রশ্নের উত্তরগুলো ধরে ফেলেছেন? প্রশ্নগুলো লেখার

সময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি যেন আপনি উত্তরগুলো পেয়ে যান। আমি সেই বিশেষ কারণটা আপনাকে বলতে চাই। আপনি উত্তরগুলো খুঁজে না পেলে সেই বিশেষ কারণটা আমার বলা হবে না।

ইতি

মৌশি ‘নাদিম গোটা চিঠিটা বেশ কয়েকবার মনোযোগ সহকারে

পড়ল। প্রশ্নগুলো খুবই সহজ। প্রশ্নের উত্তরগুলো আরও সহজ। মৌশির সেই রহস্যময় বিশেষ কারণটাও স্পষ্ট। নাদিম দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো সে মৌশিকে বলবে না। মৌশির বিরক্তিকর বিশেষ কারণটাও সে শুনবে না। কিছুতেই না। নাদিম চিরকুটটা ধুমলে মোচড়ে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। রাতের

অন্ধকারে হারিয়ে গেল কিশোরী মেয়ের এক দলা অনুভূতি আর স্বপ্ন! প্রকৃতিতে শরতের ছোঁয়া লেগেছে মাত্র। নিকষকালো আকাশে এখন শুভ্র মেঘের খেলা। চারপাশে ফুরফুরে বাতাস থাকলেও ভ্যাপসা গরম অস্থির করে তুলছে জীবন। আরফান বারান্দায় রাখা বেতের সোফায় বসে আছে। গায়ে পাতলা টি-শার্ট আর টাউজার। চোখে মোটা

ফ্রেমের চশমা। পা-দুটো টি-টেবিলে রেখে কোলের উপর ল্যাপটপ। কপালে হালকা ভাজ। হাতের দশ আঙ্গুল কী-বোর্ডে নিরন্তর ছুটে চললেও মস্তিষ্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে জটিল এক প্রশ্ন। মেয়েটি কি সত্যিই শ্যামলতা? এক ঝলক দেখেই এমন কিছু ভেবে নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে আরফানের? শ্যামলতার পা দুটো যে আরফানের ভীষণ পরিচিত তাতে

কোনো সন্দেহ নেই।এতোগুলো বছরে পায়ের আঙ্গুলগুলোর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলেছে আরফান। তবুও কোথাও যেন একটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এক পলকের দৃষ্টিকে ততটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। মেয়েটাও তো স্পষ্ট কিছু বলছে না। বারবার ফোন বা ম্যাসেজ দেওয়াটাও অস্বস্তির। সেদিন যদিও নিজের অস্বস্তি, আত্মসম্মান পাশে

রেখে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসেছিল দু'জন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। গোটা দুই ঘন্টা বসে থেকে দুই থেকে তিনটি কথা বলতে পেরেছিল আরফান। তারওপর মেয়েটি কেমন উদ্ভট কাজ করে বসল। হুট করেই উঠে চলে গেল। কি আশ্চর্য! মেয়েটাকে মাঝে মাঝে পাগল মনে হয় আরফানের।কিন্তু পরমুহূর্তেই তার নিবিড় চোখদুটোর

কথা মনে পড়ে। মেয়েটির চোখে কি সত্যিই অন্যরকম কিছু ছিল না? একদম অন্যরকম কিছু অনুভূতি? দরজা খোলার শব্দে বারান্দা থেকে রুমের ভেতর উঁকি দিল আরফান। আগুন্তককে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ল্যাপটপের স্যাটার নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় সাথে সাথেই ছোটখাটো, সুন্দরী এক তরুণী এসে বসল সোফায়। সারা শরীরে তার

শিশুসুলভ চঞ্চলতা। চোখে-মুখে স্বভাবসুলভ হাসি। হাতে দুই কাপ কফি। আরফান চশমাটা খুলে মনোযোগী চোখে তাকাল। মেয়েটি একটা কাপ এগিয়ে দিতেই মৃদু হাসল আরফান। কফি কাপ হাতে নিতে নিতে বলল,‘ তোমার কফির হাত আগের থেকে ভালো হয়েছে। গুড। আই এম ইম্প্রেস।’

মেয়েটি হাসল না। চোখদুটোতে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ তুমি বিয়ে কবে করছ? তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। সাথে আমিও বুড়ি হয়ে যাচ্ছি।’

আরফান হেসে বলল,

‘ তোমার বয়স কত? তেইশ অথবা চব্বিশ? তেইশ-চব্বিশ বছরে কেউ বুড়ি হয় না।’

‘ মেয়েরা পঁচিশ বছরেই বুড়ি হয়ে যায়। তুমি বুঝবে না। যারা সারাদিন পড়াশোনা করে তাদের এসব বুঝার কথা নয়। এখন বলো বিয়ে কবে করছ?’

আরফান হাসল তবে প্রত্যুত্তর করার চেষ্টা করল না। ল্যাপটপটা টি-টেবিলের উপর রেখে পা নামিয়ে বসল। মেয়েটি কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ কাজ করছিলে? সারাদিন

এতো কী কাজ করো? খুব ইম্পোর্টেন্ট নাকি অল্প ইম্পোর্টেন্ট?’

‘ খুব ইম্পোর্টেন্ট। রিসার্চের রিপোর্ট লিখছিলাম। আগেরবার ল্যাপটপটাই তো গেল।’

‘ গেল! কই গেল?’

আরফানের সাবলীল জবাব,

‘ একজন নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছে। এখন নদীর তলদেশে থাকলে

থাকতে পারে। একজেক্ট বলতে পারছি না।'

মেয়েটি আঁতকে উঠে বলল,

' কি সাংঘাতিক! তোমার রাগ হচ্ছে না? আমি হলে ল্যাপটপের সাথে সাথে তাকেও ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিতাম।'

আরফান শব্দ করে হাসল। কাপে চুমুক দিয়ে বলল,

' তখন রাগ হয়েছিল।'

‘ মারাত্মক রাগ হয়েছিল?”‘ হ্যাঁ। মারাত্মক রাগ হয়েছিল কিন্তু এখন সেই রাগ মোটামুটিতে নেমে এসেছে। কিছুদিন পর মোটামুটি থেকে শূন্যতে নেমে আসতে পারে। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।’

মেয়েটি সোফায় আয়েশ করে বসল। চোখ ছোট ছোট করে কৌতূহল নিয়ে বলল,

‘ কিন্তু সব রেখে ল্যাপটপটাই নদীতে ফেলল কেন? আর ঢাকা শহরে নদী কোথায়?’

‘ কক্সবাজারে গেলাম যখন, তখন ফেলেছে। কেন ফেলেছে, জানি না। ল্যাপটপ ফেলে দেওয়ার মতো আহামরি কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। আমার তখন মনে হয়েছিল মেয়েটি বদ্ধ পাগল। এখনও অবশ্য তাই মনে হয়। তবে সেই ভাবনাটা

পরিবর্তন হলেও হতে পারে। হুট করেই মনে হচ্ছে, মেয়েটা আসলে বদ্ধ পাগল নয়। মাথায় একটু সমস্যা আছে মাত্র।'কথাটা বলে হেসে ফেলল আরফান। মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল,

' কি বলছ! ওটা একটা মেয়ে ছিল?'

আরফান মাথা নাড়ল। মেয়েটি চোখ দুটো ছোট ছোট করে সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ সুন্দরী ছিল?’

আরফান কফি কাপটা টেবিলের উপর রেখে হাসল। মেয়েটির দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,

‘ সুন্দরীই বলা যায় বোধহয়। তেমন খেয়াল করে দেখিনি কখনও। পরের বার দেখা হলে খেয়াল করে দেখব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুরো এক ঘন্টা মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝার চেষ্টা করব মেয়েটি আসলেই

সুন্দরী কি-না। তারপর তোমায় এসে অপিনিয়ন জানাব। আপাতত আমার শার্টটা চট করে ইস্ত্রি করে দাও তো নিদু। ফ্যাস্ট, আমি বেরুব।'রুমের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ক্রমাগত পায়চারী করছে নম্রতা। হাতে বই। পড়ায় মনোযোগ আসছে না। বিছানায় বেশ আয়েশ করে বসে আছে নীরা। সেকেন্ডর জন্য বিরতি না নিয়ে নিরন্তর পড়া মুখস্থ করছে

সে। নম্রতা পায়চারী থামিয়ে বিরক্ত চোখে তাকাল। প্রচন্ড অভিমান নিয়ে নীরার পাশে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। পুরো বিছানা হঠাৎ কেঁপে উঠাই চমকে উঠল নীরা। অবাক চোখে নম্রতার দিকে তাকিয়ে থেকে বুকে ফু দিল। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

‘ কি হলো? এমন ডাইনোসরের মতো লাফাচ্ছিস কেন?” ডাইনোসর?

আমাকে তোর ডাইনোসর মনে হচ্ছে? আমি যে টেনশনে টেনশনে মরে যাচ্ছি সেদিকে তোর কোনো দৃষ্টি নেই? তুই আমার এমন বান্ধবী?’

‘ পরীক্ষার সময় টেনশনে থাকবি এটাই স্বাভাবিক। টেনশনে না থাকলে না-হয় ভিন্ন কিছু হতো।’

নম্রতা বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ আরে বাপ! এই টেনশন সেই টেনশন নয়। এটা হলো হৃদয় ঘটিত টেনশন।’

নীরা সরু চোখে তাকাল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ কেন? হৃদয়ে আবার কি হলো? প্রেমিক পুরুষ তো পেয়েই গেলি। এখন তো তোর খুশিতে মরে যাওয়া উচিত। খুশি না হয়ে এতো টেনশন কেন?’নম্রতা বিছানায় এক পা তুলে

নীরার দিকে ঘুরে বসল। ঠোঁট উল্টে বলল,

‘ এখানেই আসল সমস্যা। ওই প্রেমিক পুরুষই সব সমস্যা। ওই ডক্টর আসলেই ‘সে’ কি-না সেই কনফিউশানটা নাহয় আমার পায়ের ছবিতে অনেকাংশ ক্লিয়ার হয়েছে। কিন্তু ডক্টর আর ‘সে’ কে মেলাতে গেলেই কেমন হেঁচকি উঠে যাচ্ছে আমার। দ্বিতীয়ত, লাস্ট উইকে

পরীক্ষার জন্য ফোন ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল। ডক্টর অসংখ্যবার ফোন দিয়েছে, আমি ধরিনি। এখন এক সপ্তাহ হয়ে গেল সে ফোন টোন কিছু দিচ্ছে না। আমি নিজে থেকে ফোন দিব কি-না সেটাও বুঝতে পারছি না। প্রচন্ড অস্বস্তি হচ্ছে।’এটুকু বলে থামল নম্রতা। তারপর প্রচন্ড অভিমান নিয়ে বলল,

‘ আমি নিজে থেকে কখনই যোগাযোগ করব না। এতোদিন আমি চেষ্টা করেছি, কষ্ট করেছি, বেহায়া হয়েছি। এবার কি ওর চেষ্টা করা উচিত নয়? এবার সে যোগাযোগ না করলে আমি সত্যি সত্যিই বিয়ে করে ফেলব নীরু। আমার আর ভালো লাগছে না।’

নীরা হেসে ফেলল। বইটা উল্টে রেখে বলল,‘ বিয়ে করলে সাফার

সবচেয়ে বেশি তুই-ই করবি। পত্রপ্রেমিক নিয়ে তুই যে পরিমাণ পসিসিসিভ। তাতে দেখা গেল, বিয়ে করলি ঠিক আছে কিন্তু বাসর ঘরে বসে ফোন দিয়ে ন্যাকামো শুরু করে দিবি। “দোস্ত! আমি এই ব্যাটার সাথে বাসর টাসর কিছু করব না। আমার দমবন্ধ লাগছে। আমি এই ব্যাটাকে স্বামী হিসেবে মানি না, মানব না। আমার ডাক্তার আমাকে

এনে দে ব্যস!” তখন যত প্যারা আমাদের। তোর কান্নাকাটি দেখে নাদিম, অন্তুরা সত্যি সত্যিই তোকে বাসর ঘর থেকে ভাগিয়ে আনতে পারে। এদেরও বিশ্বাস নেই। পরের দিন খবরের কাগজে আমাদের ছবি। আহ! হিট! হিট।’

নীরার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল নম্রতা। নীরা হেসে বলল,‘ হাসিস না। সিরিয়াসলি বলছি। তুই যদি

অতো কান্ড করিস তাহলে নাদিম নির্ঘাত মধ্যরাতে তোর জামাইকে গিয়ে বলবে, আরে! এতো চাপ নিতাছ কেন মাইরি? বাংলাদেশে কি বউয়ের অভাব পড়ছে নাকি? এক বউ গেলে আরেকটা আসবে। আরেকটা গেলে আরোও একটা আসবে। আসতেই থাকবে।টেনশন করে চান্দি গরম কইরো না। তোমাকে আমরা আরেকটা বউ এনে

দেব। দরকার পড়লে বউয়ের বাজার বানাই দেব। কিন্তু আমার বন্ধবীরে দেব না মামা। বান্ধবীর জামাই পছন্দ হয় নাই। সো, জামাই চেঞ্জ।'

নীরা এটুকু বলতেই হুহা করে হেসে উঠল নম্রতা। নীরাও খুব হাসল। নম্রতা হাসতে হাসতে বলল,' হতেই পারে। নাদিমের পক্ষে সব সম্ভব।'

তারপর হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে বলল,

‘ তাহলে তুই কিভাবে পারবি? তোর দমবন্ধ লাগবে না নীরু?’

নীরার মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না,

‘ আমার কেন দমবন্ধ লাগবে?’

‘ তুই অন্তুকে ভালোবাসিস। অন্তুকে ভালোবেসে অন্যজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস। তবু বলছিস দমবন্ধ কেন লাগবে?’

নীরা হেসে বলল,‘ ছোটবেলা এঞ্জেল হওয়ার স্বপ্ন দেখতি না নমু? সুন্দর দুটো ডানা মেলে পরীদের মতো উড়ে বেড়ানোর স্বপ্নটা কোন মেয়ের ছিল না বলত? অথবা বিশাল রাজ্যের রাজকুমারী হয়ে যাওয়া। গা ভর্তি গহনা। ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্র। এতো এতো দাসীর স্বপ্ন তো সবাই দেখতো। সেই স্বপ্ন পূরণ না-হওয়াতে কি দমবন্ধ হয়ে মারা

যাচ্ছিস? ভালো আছিস। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখছিস। চোখে অসংখ্য স্বপ্ন থাকলে দু-একটা অসম্ভব স্বপ্ন ভুলে থাকা যায় নমু। অসম্ভব স্বপ্নগুলো অবসরে অনুভব করে আনন্দ পাওয়ার জন্যই হয়। বাস্তবে পাওয়ার জন্য নয়।’

নম্রতা হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পেল না। কয়েক সেকেন্ড অপলক চেয়ে থেকে বলল,‘ অন্তুকে এটলিস্ট

জানাতে তো পারিস। অথবা নাদিম বা রঞ্জন?’

‘ অন্তুকে বলার প্রশ্নই আসে না। আর নাদিম – রঞ্জনকেই বা কি বলব? এটা কি বলার মতো কিছু হলো? আমার আবেগ, আমার অনুভূতি আমার মধ্যে আবদ্ধ থাকাটাই কি ভালো নয়? তুই শুধু শুধু এতো ভাবছিস। বাদ দে তো।’

নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই মেয়েটাকে সে বুঝে না। কিচ্ছু বুঝে না।

নাদিম ভ্রু কুঁচকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ঘড়িতে তিনটা বাজতে আর তিন মিনিট বাকি। মৌশিকে পড়ানোর কথা দুইটা ত্রিশে। অথচ তার খবর নেই। মৌশির সময় জ্ঞানহীনতাই নাদিম বিরক্ত। চরম বিরক্ত। ঘড়ির কাঁটা

যখন তিনটা দুইয়ের ঘরে গেল ঠিক তখনই মৌশির আগমন ঘটলো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে বই-খাতা বের করতে করতে বলল,‘ সরি, স্যার।’

নাদিম জবাব দিল না। মৌশিকে আজ স্বাভাবিক লাগছে। মুখে বা শরীরে আলাদা কোনো সাজগোজ নেই। সাদা রঙের একটা টপের ওপর লাল রঙের স্কার্ফ ঝুলছে। চোখদুটো লাল হয়ে ফুলে আছে।

মৌশি কাঁদছিল? কাঁদলে কাঁদতে পারে। এই বয়সী মেয়েদের কান্নাকাটি করা আহামরি বড় কোনো বিষয় নয়। এরা কথায় কথায় ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। নাদিম গম্ভীর মুখে পড়ানো শুরু করল। মৌশি হঠাৎ-ই প্রশ্ন করল,‘ আপনার বন্ধু এখন কেমন আছে, স্যার?’

নাদিম জানাল, ‘ ভালো আছে।’

‘ উনি কি শেষমেশ পরীক্ষাগুলো দিচ্ছেন?’

নাদিম ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ আমার বন্ধুর যে পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল না সেটা তুমি কি করে জানলে?’

মৌশি হেসে বলল,

‘ আমি জানি। আমি অনেক কিছুই বুঝে ফেলতে পারি।’

নাদিম বিরস কণ্ঠে বলল,
‘ ও আচ্ছা।’
মৌশি বোধহয় খানিক হতাশ হলো। নাদিম প্রত্যুত্তরে কিছু জিগ্যেস করবে, সামান্য কৌতূহল দেখাবে এমনটাই হয়ত আশা করেছিল মৌশি। মৌশি মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ আমি আরেকটা বিষয় বুঝে ফেলেছি।’
‘ কি বিষয় বুঝে ফেললে?’

‘ আপনি অতিশীঘ্রই আমাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিবেন। মৌশি নামের একটা মেয়েকে যে পড়াতেন সেটাও ভুলে যাবেন। আমি ঠিক বলছি না স্যার?’

নাদিম হাসল, ‘ আমি তোমার মতো আগাম বুঝে ফেলতে পারি না মৌশি। আমার মনের কোনো ঠিক-ঠাকানা নেই। সকালে নেওয়া সিদ্ধান্ত বিকেলে এসেই বদলে যেতে পারে।

তুমি তোমার পড়ায় মনোযোগ দাও। আমার তোমার বাড়ি আসা বন্ধ করে দেওয়াটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।’

মৌশি কৌতুহল নিয়ে বলল,‘ আগে আপনি মাঝে মাঝেই অন্যরকম করে কথা বলতেন। এখন কেন বলেন না?’

‘ ইচ্ছে করে না তাই।’

‘ এখন আমাকে পড়াতেও ইচ্ছে করে না, তাই না?’

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৌশির দিকে তাকাল। মেয়েটির বুকে কান্না। কণ্ঠটা কি একটু কাঁপল? কিন্তু সেই কাঁপা কণ্ঠটা অগোছালো নাদিমকে ছুঁয়ে দিতে পারল না। সে শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ হুম, ইচ্ছে করে না।’মৌশি কিছু বলল না। মাথা নিচু করে

গ্রামারটিক্যাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নাদিম আগের মতোই নিরুদ্বেগ বসে রইল। মৌশির খাতা চেইক করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ল, অন্তুর আজ ড্রেসিং করার ডেইট। ঠিক পাঁচটায় হাসপাতালে যেতে হবে। নাদিম তাড়াহুড়ো করে ঘড়ির দিকে তাকাল। ব্যস্ত ঘড়ির কাটা এখন চারটার গড়দোড়ায়।

বিকেল পাঁচটা। চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে আরফান। কালো চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে চেম্বার থেকে বেরুতেই নম্রতাকে চোখে পড়ল তার। নম্রতা নাদিম আর অন্তুর সাথে ড্রেসিংরুমের দিকে যাচ্ছে। নম্রতাকে দেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে গেল আরফান। গরমে ত্যক্ত-বিরক্ত নাদিমের চোখ এড়াল না আরফান।

আরফানকে এদিকে আসতে দেখেই নম্রতার মাথায় চাটি মারল সে। ফিসফিস করে বলল,

‘ তোমার পিরিতি থুক্কু পত্রপ্রেমিক চইলা আসছে, মামা। ডাক্তাররে ফান্দে যেহেতু ফালাইছস কড়ায় গন্ডায় শোধ করুন লাগব। ডাক্তার প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও যদি হাসপাতালের ঔষধপত্র কিনে খাওয়া লাগে তাইলে তো যন্ত্রণা। ব্যাটাকে

বল, আমাগো ঔষধের টাকা ফিরাই দিতে। নয়তো হাত, পা কিচ্ছু ধরতে দিবি না। তোরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিমু। ক্যাশ বন্ধ তো ডেলিভারিও বন্ধ।'নাদিমের কথায় হেসে ফেলল অন্ত। নম্রতা গরম চোখে তাকাল। ততক্ষণে বেশ খানিকটা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে আরফান। আরফানকে কাছাকাছি

এসে দাঁড়াতে দেখেই হেসে হাত বাড়াল নাদিম,

‘ আসসালামু আলাইকুম, আরফান ভাই। কেমন আছেন?’

নম্রতা অবাক হলো। এই অল্পদিনে নাদিম আরফানের সাথেও বন্ধুত্ব করে নিয়েছে নাকি? আশ্চর্য! কিন্তু কিভাবে? আরফান হাত মিলিয়ে হাতটা বুকে ছুঁইয়ে হাসল।

মোলায়েম কণ্ঠে বলল,‘ আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা?’
‘ ভালোই আছি। একটা মাথা পাগল আরেকটা হাত ভাঙা নিয়ে ঘুরলে যতটা ভালো থাকা যায় ঠিক ততটা। আপনি একটু মাথা পাগলটাকে পাহাড়া দেন ভাই। আমি আর অন্তু পাঁচ মিনিটে আসছি।’
আরফান যেন সুযোগটা লুফে নিল। হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বলল,

‘ শিওর।’

নম্রতাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জায়গাটা থেকে সরে পড়ল অন্তু-নাদিম। আরফান এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক হাতে পকেটে ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নম্রতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল,‘ কেমন আছেন?’

নম্রতা আরফানের দিকে তাকাল। আরফানের ঠোঁটের কোণে হাসি।

নম্রতা নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল,

‘ ভালো। আপনি?’

‘ আমিও আলহামদুলিল্লাহ।’

কথাটা বলে নম্রতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আরফান। আরফানের কথার প্রেক্ষিতে আর কোনো কথা খুঁজে পেল না নম্রতা। আরফানকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে

নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ বিশেষ হলো না। সময়ের সাথে সাথে অস্বস্তিটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। নম্রতা অতিষ্ঠ হয়ে আরফানের দিকে তাকাল। আরফান মাথাটা একটু উঁচু করে অনেকটা ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না। পলক পড়ছে না। গম্ভীর, বিষণ্ণ চোখজোড়ার উপর পুরু ভ্রু'জোড়া

হালকা কুঁচকে আছে। নম্রতা বিরক্ত কণ্ঠে বলল,‘ সব ঠিকঠাক? এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? কি দেখছেন?’

আরফান হাসল। সরল কণ্ঠে বলল,

‘ আপনাকে দেখছিলাম। আপনি বোধহয় একটু বেশিই সুন্দর, তাই না?’

আরফানের স্পষ্ট, সাবলীল কথাটা কানে যেতেই বিস্ফারিত চোখে

তাকাল নম্রতা। চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে কিছু কড়া কথা বলার প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলল। কিন্তু হায়! ওই বিষণ্ন, শিশুসুলভ চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে পৃথিবীটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নম্রতার। তার বিষণ্ন চোখ আর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসি দেখতে দেখতে নম্রতা হঠাৎ-ই উপলব্ধি করল, তার লজ্জা লাগছে। ভীষণ লজ্জা লাগছে। নম্রতা মুখ

ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। সাথে সাথেই ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল অপ্রতিরোধ্য লাজুক হাসি।ঘড়িতে কয়টা বাজে সেদিকে খেয়াল নেই নম্রতার। কফি হাতে,ঘরময় পায়চারী করে আবোল তাবোল কথার ঝুড়ি খুলেছে সে। নীরা বিছানায় বসে ঘুমে ঢুলছে। নম্রতা উত্তেজনা নিয়ে বলল,

‘ও যে হঠাৎ এমন কিছু বলবে বা বলতে পারে তা আমি কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। হুট করেই বলে ফেলল, আপনি হয়ত একটু বেশিই সুন্দর,তাই না ? আমি জাস্ট বোকার মতো তাকিয়ে ছিলাম। ওই সময় নাদিম আর অন্তু না ফিরলে আমার যে কি হতো! ভাবতে পারছিস ?’

নীরা হাসল। মাথা দুলিয়ে বলল,

‘ভাবতে পারছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না।’

নম্রতা বিছানায় এসে বসল। অস্থির হয়ে বলল,

‘তাহলে আমার কি অবস্থা হয়েছিল একবার ভাব ? একদম আনএক্সপেক্টেট কিছু!’

নীরা হাসছে। আরফান নামক ব্যক্তিটাকে তার বেশ লাগছে। নীরা বালিশে ঠেস দিয়ে আয়েশ করে

বসল। ঠোঁটে দুষ্টু হাসি ঝুলিয়ে বলল,‘আগে আগে দেখো হতা হ্যা কিয়া!’

কথাটা বলে চোখ টিপল নীরা। নম্রতা হাসতেই আবারও বলল, ‘আমরা হয়ত লোকটিকে ঠিক চিনতে পারিনি নমু। লোকটা সবার সামনে যেমনটা শো করে আসলে তেমনটা নয়। ভিন্ন রকম।’নম্রতা উত্তর দিল না। সুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গালে হাত দিয়ে আরফানকে ভাবতে লাগল। ভিন্ন রকম? সত্যিই লোকটি একটু অন্যরকম।মাঝে মাঝে গম্ভীর তো মাঝে মাঝে ভীষণ চঞ্চল।চোখ ভর্তি ছেলেমানুষি আর কৌতূহল।

বর্ষার শেষ আর শরতের শুরু। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় সকালটা ঝকঝকে, পরিষ্কার। গাছের পাতায় ল্যাপ্টে থাকা জল আর মিষ্টি সোনালী রোদে ভরা চারপাশ। নিশ্চুপ

সকালে অচেনা পাখির কিচিরমিচির শব্দ। দক্ষিণের জানালাটা খোলা। বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছে ধবধবে সাদা পর্দা। বিশাল আম গাছের পাতার ফাঁক গেলে এক মুঠো রোদ এসে দুষ্টুমি জুড়েছে আরফানের বোজে রাখা চোখে আর গলায়। সকালের নরম আলোয় ভেসে যাচ্ছে নির্জন ঘর, বিছানায় শুয়ে থাকা ঘুমন্ত যুবক। হঠাৎ চুড়ির টুনটান

আর বেলীফুলের তীব্র সুগন্ধে জেগে উঠল আরফানের মস্তিষ্ক। ঘুমটা ছুটে গিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকাল। মনের অজান্তেই বিড়বিড় করে ডাকল,

‘ শ্যামলতা?’প্রায় সাথে সাথেই মুখের ওপর এসে পড়ল এক মুঠো ভেজা বেলীফুলের পাঁপড়ি। আরফান তৎক্ষনাৎ চোখ বোজল। পুরু ভ্রু জোড়া খানিক কুঁচকাল। এতোক্ষণ

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আরফান এবার ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল। বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর সুন্দর এক রমনী। পরনে তার সাদা ধবধবে শাড়ি। হাত ভর্তি শুভ্র কাঁচের চুড়ি। চঞ্চল চোখদুটোতে মায়া মেশানো কাজল। সারা শরীরে তাজা বেলীফুলের অলংকার। স্নিগ্ধ মুখটি সকালের নরম আলোয় ভেজা বেলী ফুলের মতোই কোমল, সুন্দর।

আরফান ঘুমু ঘুমু চোখ নিয়েই উঠে বসল। সামনে দাঁড়ানো যুবতী আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল,‘ কেমন দেখাচ্ছে আমায়?’

আরফান হেসে বলল,

‘ বেলীফুলের থেকেও সুন্দর। কিন্তু হঠাৎ এতো সাজগোজ?’

মেয়েটি হাসল। তার হাসিতে প্রগাঢ় চঞ্চলতার ছাপ।

‘ শরৎে আকাশ ভর্তি সাদা মেঘের পদচারণ। তুমি কি জানো? শরৎের প্রেমিকা হলো মেঘ। তাই আমি মেঘ সেজে শরৎকে প্রেম নিবেদন করছি। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাকে মেঘের মতো লাগছে না?’কথাটা বলে চরকির মতো ঘুরে নিজেকে প্রদশর্ন করার সুযোগ করে দিল সে। আরফান হেসে ফেলল। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চার-

পাঁচ মাস যাবৎ ছাঁদের ঘরটিকেই আপন করে নিয়েছে আরফান। বিশাল ছাঁদের এক কোণায় ছোট্ট তার ঘর। সামনে এক টুকরো ছিমছাম, সুন্দর বারান্দা। বারান্দার দরজায় দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সারিবদ্ধ বেলীফুলের গাছ। আগে একটি ছিল। এখন অসংখ্য। সবই আরফানের লাগানো। আরফান বুক ভরে শ্বাস নিল। বেলীফুলের সুগন্ধটা

নাকে যেতেই চোখে-মুখে খেলে গেল নিদারুণ চঞ্চলতা। আজ অনেকদিন পর বেলীফুলের সুবাস পাচ্ছে সে। তার চারপাশটা সুবাসে সুবাসে ভরে যাচ্ছে। আরফান চোখ ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি প্রসন্ন হাসি নিয়ে দোলনায় দোল খাচ্ছে। শাড়ির আঁচল ল্যাপ্টে আছে মাটিতে। তাকে দেখে সত্যিই মেঘের মতো লাগছে। আকাশ থেকে নেমে

আসা এক টুকরো শুভ্র, সুন্দর মেঘ। আরফান বেতের সোফায় বসতে বসতে বলল,‘ বর্ষার ফুল দিয়ে শরতের মেঘ সাজাটা কি ঠিক হলো? এটা অন্যায় হয়ে গেল না? তোমার উচিত ছিল শরতের কোনো ফুল দিয়ে মেঘ সাজা। বর্ষার ফুল দিয়ে মেঘ সাজাটা উচিত কাজ হয়নি। শরৎ রাগ করতে পারে।’

মেয়েটি সরু চোখে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ বর্ষার ফুল শরৎ কালে ফুটলে আমার কী দোষ? বর্ষার ফুলেরা যদি আমায় রাণী হিসেবে ঘোষণা করে তাতেই বা আমার কী দোষ?’

আরফান হাসল। বেলীফুলের গাছগুলোতে থোকা থোকা ফুলের বাহার। আরফানের বুকের গহীনে

বিনা অনুমতিতেই বেজে উঠল একটা নাম, ‘শ্যামলতা।’

‘ তুমি কি বিয়ে করবে না?’

‘ তুমি সবসময়ই একই প্রশ্ন কেন করো?’

হাসিমুখে প্রশ্ন করল আরফান। এই মেয়েটিকে সে পৃথিবী সমান ভালোবাসে। কিছুতেই রাগ করতে পারে না। মেয়েটি কৃত্রিম মন খারাপ নিয়ে বলল,‘ তোমার জন্য অপেক্ষা

করতে করতে আমিও যে বিয়ে করতে পারছি না। বুড়ি বয়সে বিয়ে করলে বুড়ো বুড়ো বর জুটবে। আমি বুড়ো বর বিয়ে করতে রাজি নই।'

' তাহলে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। আমার বিয়ে নিয়ে কেন পড়েছ?'

মেয়েটি সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে বলল,

' কি বলছ? তুমি জানো না? মা আর আমি কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করেছি।

তুমি আগে বিয়ে না করলে মা আমায় বিয়ে দিবে না আর আমিও বিয়ে করব না। দেখলে না? বড় ভাইয়ার সাথে কেমন ইন্সিডেন্ট ঘটে গেল। সব কি আমার দোষ ছিল ভাইয়া?'নিদ্রার শেষ বাক্যটা বড্ড বিষণ্ন শোনাল আরফানের কানে। নিদ্রার সাথে কখনোই অতটা সখ্যতা ছিল না আরফানের। ছোট থেকেই পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আরফান

বোনের সাথে খুব একটা সহজ হয়ে উঠতে পারেনি। নিদ্রাও ধারে কাছে আসত না। নিদ্রার সকল বায়না, দুষ্টুমি, পাগলামো ছিল আরফানের বড় ভাই নেহলকে কেন্দ্র করে। নেহালও ছিল আমোদপ্রিয়, চঞ্চল। ছোট বোনটাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। কিন্তু হঠাৎ-ই সব পাল্টে গেল। ভাইয়ার আকস্মিক মৃত্যু। তার এক বছর পর বাবার

অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে কিভাবে যেন নিদ্রার সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলো আরফানের। তবুও কোথাও একটা বিস্তর ফারাক। আরফান চেষ্টা করেও নেহালের মতো অতোটা ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে না। বোনটা যে তার বড্ড ভালোবাসার কাঙাল। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ তুলে তাকাল। চোখের কোণে জল জমেছে তার। সকালের রোদে

চিকচিক করছে সেই অশ্রু। নিদ্রা নিস্তব্ধ। আরফান ধীর পায়ে নিদ্রার পাশে দোলনায় বসল। ডানহাতটা কোলে নিয়ে আদুরে কণ্ঠে বলল,‘ তোমার কোনো দোষ ছিল না, নিদু। ইট’স অল আবাউট ডিস্টেনি।’

নিদ্রা অসহায় চোখে তাকাল। আরফানের বুকে আলতো মাথা রেখে বলল,

‘ ইট’স আ ডিস্টেনি?’

আরফান হালকা হাতে বোনকে জড়িয়ে নিয়ে বলল,
‘ ইয়াপ। ইট’স আ ডিস্টেনি।’
কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধ কাটার পর হঠাৎই কথা বলল আরফান,
‘ তোমাকে আমার অপিনিয়নটা জানানো হয়নি নিদু।’
নিদ্রা কপাল কুঁচকে বলল,
‘ অপিনিয়ন? অপিনিয়ন অফ হোয়াট?’

আরফান ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলল,‘ এবাউট দেট গার্ল!’

নিদ্রা চোখ বড় বড় করে তাকাল।

আরফান রহস্যময় হাসি দিয়ে বলল,

‘ মেয়েটি আসলেই মারাত্মক সুন্দরী।’

নিদ্রা এবার মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ মেয়েটার সাথে দেখা হয়েছিল তোমার?’

‘ হ্যাঁ। হয়েছিল।’

‘ কিভাবে?’

‘ হসপিটালে। তার বন্ধু আমার পেশেন্ট ছিল।’

‘ তুমি তাকে বকোনি?’

আরফান হেসে মাথা নাড়ল। নিদ্রা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল,

‘ তোমার রাগটা কি মোটামুটি থেকে শূন্যে নেমে গিয়েছে?’

আরফান হেসে বলল,

‘ মনে হচ্ছে।’

‘ তুমি কি তাকে বিয়ে করছ?’

মেয়েটির চোখে বিস্ময়। আরফান কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,‘ বিয়ে করছি কি-না জানি না। তবে সম্ভবনা আছে। আমি তার একটা সিক্রেট জেনে গিয়েছি। সেই সিক্রেটটা পুরোপুরি এক্সপোজ করার আপেক্ষায় আছি। আমার ধারণা সে

আমার সাথে গেইম খেলার চেষ্টা করছে।’

নিদ্রা লাফিয়ে উঠে বলল,

‘ তারমানে তুমি বিয়ে করছ! আমি এক্ষুনি মাকে জানাচ্ছি যে নিষ্প্রভ ভাইয়া বিয়ে করছে। মেয়ে টেয়ে ঠিকঠাক। এখন শুধু বাসর সাজানো বাকি।’

আরফান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল,

‘ বিয়ে করছি কখন বললাম?’‘ এইমাত্রই বললে। আচ্ছা মেয়েটির নাম কি? মাকে তো ডিটেইলস জানাতে হবে, তাই না? আচ্ছা? সে-কি সবসময়ই জিনিসপত্র ফেলাফেলি করে? নাকি দেখে দেখে ল্যাপটপ জাতীয় জিনিসগুলোই ফেলে? টাইম মেইন্টেইন করে ফেলে? নাকি যখন তখন ফেলে? আচ্ছা! তুমি উত্তরগুলোর লিস্ট বানাতে থাকো।

আমি আগে মাকে ইনফর্ম করে আসি। শী শুড নো দ্যা গ্রেট নিউজ।’ কথাটা বলেই চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেল নিদ্রা। ঘটনার আকস্মিকতায় আরফান হতবিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎই ডেকে উঠে বলল,‘ বাট আই ডোন্ট ইভেন নো শী ইজ এনগেজড অর নট! নিদু? নিদু? দাঁড়াও।’

নিদ্রার দেখা পাওয়া গেল না। সিঁড়িতে বেজে উঠা পায়ের শব্দগুলো মিলিয়ে গেল দূরে। আরফান ছোট্ট শ্বাস টেনে দোলনায় গা এলাল। ঠোঁটের কোণে অযথায় ফুটে উঠল হাসি। চোখদুটো বোজার সাথে সাথেই ভেসে উঠল আকর্ষণীয় সেই পা। নেশা ধরানো সেই তিল। সেইসাথে নম্রতার বিস্মিত, আশ্চর্য দুটো চোখ।দুই দিন হলো ফাইনাল

পরীক্ষা শেষ। গঁদ বাধা পড়াশোনা থেকে খনিকের মুক্তি। ঘাসের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে বন্ধুরা। অন্তুর ভাঙা হাতও এখন ঠিকঠাক। সেইসাথে ঠিকঠাক তার মাথাও। গত একমাস যাবৎ নীরার সাথে কোনোরূপ ঝামেলা সে করেনি। একদম স্বাভাবিক থেকেছে। শান্তভাবে পরীক্ষাগুলোও দিয়েছে। কয়েক মাস আগে এডমিশন হওয়ায়

নতুন নতুন ছাত্রছাত্রীতে ভরে গিয়েছে ক্যাম্পাস। সব ফ্রেশারস্। প্রতিবারের মতোই মেয়েগুলো মাত্রাতিরিক্ত সুন্দরী। নাদিম, অন্তু, রঞ্জন নতুন মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করছে। ছোঁয়া গভীর মনোযোগে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। নম্রতার মুখ ফুলিয়ে বসে আছে। গোটা এক মাসে আরফান একবারের জন্যও যোগাযোগ করার

চেষ্টা করেনি। একবারের জন্যও না। মানুষটা সত্যি সত্যিই বিয়ে করে সংসারী হয়ে গেল না তো আবার? নম্রতার রাগ লাগছে। আরফান যদি সত্যিই বিয়ে করে থাকে তাহলে তাকে একদম দেখে নিবে নম্রতা। পত্র দিবে তাকে আর বিয়ে অন্য কাউকে? এত সোজা? এমন হলে গলায় ছুঁড়ি ঝুলিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। দরকার হলে সতীন

নিয়ে সংসার করবে। নয়তো আরফানকে খুন করে জেলে গিয়ে বসে থাকবে। শান্তি ! নাদিম গিটার কোলে নিয়ে বসে ছিল। পাশ দিয়ে দুটো মেয়েকে যেতে দেখতেই ভদ্র ছেলের মতো কাছে আসতে বলল। মেয়েগুলো প্রত্যুত্তর না করে সামনে এসে দাঁড়াল। দুই জনের চোখ-মুখই রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ে এখনই জ্ঞান

হারাবে। নাদিম বিরস কণ্ঠে বলল,‘ নাম কি? কোন ডিপার্টমেন্ট?’

মেয়েদুটো ভয়ে ভয়ে নাম বলল। তাদের গলা কাঁপছে। চোখদুটো কাঁদো কাঁদো। আজকালকার ফ্রেশারদের এমন ন্যাকা ন্যাকা ভাব দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় নাদিমের। নাদিম গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘ পানি আছে? ঠান্ডা পানি খাওয়াও তো।’

দুই জনের মাঝে লম্বা মেয়েটি যন্ত্রের মতো করে ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করল। বোতলটা নিতে গিয়ে নাদিম খেয়াল করল, মেয়েটা ঠকঠক করে কাঁপছে। এক ঢোক পানি গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে ছোঁয়ার হাতে দিল সে। ছোঁয়া বোতলটা নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ করল। চশমাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে গন্ধ শুকল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘

এটা কি মিনারেল ওয়াটার? অথবা ফোটানো।'

' জি না আপু। ভার্সিটি থেকেই নিয়েছিলাম।'

ছোঁয়ার মুখভঙ্গি দেখার মতো হলো। চোখ-মুখ কুঁচকে বোতলটা নাদিমের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,

' সরি! আমি মিনারেল ওয়াটার ছাড়া খাই না। কতশত ব্যাকটেরিয়া আছে। ছিঃ।'

নাদিম বোতল দিয়েই ছোঁয়ার মাথায় থাপ্পড় লাগাল। চোখ রাঙিয়ে বলল, ‘ বালের মিনারেল ওয়াটার মারাইতে আসছিস। আমি এইডা বুঝি না তোর মতোন গবেট ইংরেজরে এখনও এই দেশে রাখছেটা ক্যান? আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ আ লাত্থি। বিশ্বাস কর দোস্ত, তোর মতো গবেটরে বেশি হইলে ড্রেনের পানি

খাওয়ানো যায়। এর থেকে শুদ্ধতম কিছু তোর লাইগা বাংলাদেশে নাই।’ ছোঁয়া চোখ রাঙিয়ে তাকাল। নাদিম ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে বাকি পানিটুকু শেষ করে বোতলটা ফিরিয়ে দিল। বেশ আয়েশ করে বসে বলল,‘ আমাগো ডিপার্টমেন্টেই তো ভর্তি হইছ। চিনে আমাগো?’

মেয়েদুটো অসহায় মুখে মাথা নাড়ল। যার অর্থ চিনে না। নাদিম আগলা কণ্ঠে বলল,

‘ মামা! চিনে না তো। এই দুঃখে ছাঁদ থাইকা লাফ দিয়া মইরা যাইতে মন চাচ্ছে।’

আতঙ্কে মেয়েদুটোর গলা শুকিয়ে এসেছে। তাদের সচেতন মস্তিষ্ক জানান দিচ্ছে র্যাগিং-এর মতো বিশ্রী

প্রথাটার মধ্যে তারা ফেঁসে গিয়েছে। নম্রতা রয়ে সয়ে বলল,

‘ কষ্ট পাইস না দোস্ত। না চিনলে এখন চিনবে। সমস্যা কই? কি, সমস্যা আছে?’

মেয়েদুটো দ্রুত মাথা নাড়ে, সমস্যা নেই। নম্রতা ঠেস দেওয়া কণ্ঠে বলল,

‘ এই তিনটা ভাইয়ের মধ্যে কার উপর ক্রাশ খাইছ? নাকি ক্রাশ খাও নাই?’

মেয়েদুটো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। কি বলবে বুঝতে পারছে না। নম্রতা আবারও ধমকে উঠতেই একজন রঞ্জনকে ইশারা করে বলল,‘ এই ভাইয়াটাকে ভালো লাগে।’

নীরা চোখ ছোট ছোট করে বলল,

‘ এই মেয়ে? এতো সাহস কোথায় পাও? সিনিয়রদের আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছ। যাওয়ার সময় সালামও দাওনি। কাহিনী কি? সিনিয়র মনে হয় না?’

‘ সরি আপু।’

নম্রতা বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ রঞ্জনকে ভালো লাগছে! মাই গড। তুমি আমার বরের ওপর কিভাবে

ক্রাশ খেতে পারো? তোমার এতো সাহস কোথাকে?'

রঞ্জন হেসে ফেলল। নাদিম হাই তুলতে তুলতে বলল,' বহুত বড় অন্যায় করে ফেলছ। আমার বান্ধবী বিশাল কষ্ট পাইছে। জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছে। এই জ্বালাপোড়া কমাতে পানি লাগবে। তোমার কাজ হলো, ভার্সিটির শেষ মাথায় যে চাপকল আছে ওখান থেকে বোতল ভরে

পানি আনা। সময় মাত্র পনেরো মিনিট। এক মিনিট এপাশ-ওপাশ হলে খবর আছে। আর হ্যাঁ... চোরের ওপর বাটপারি করার চেষ্টা করবে না। বাটপারিতে আমরা হেডমাস্টারি করে এসেছি। টাইম স্টার্টস নাও...’

মেয়েটা কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে হন্তদন্ত পায়ে ছুঁটে গেল। এতো বড় ভার্সিটি এড়িয়ায় কোথায় খুঁজবে সেই চাপকল? প্রথমত কিছু চিনে না

তারওপর মাত্র পনেরো মিনিট! ছোঁয়া চশমা ঠিক করতে করতে দ্বিতীয় মেয়েটিকে বলল,‘ তুমিও রঞ্জনের ওপর ক্রাশড? কেন? অন্তকে দেখে ক্রাশ খেলে না কেন? অন্ত দেখতে বিশ্রী? তুমি ওকে অপমান করার চেষ্টা করছ?’

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বলল,

‘ না আপু। অন্ত ভাইয়াও খুব কিউট।’

‘ এই! তুমি সিনিয়র ভাইকে কিউট বললা? এতো সাহস কই পাও?’

মেয়েটি যেন অকূল পাথারে পড়ল। দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইল। নম্রতাদের কঠিন কথার ঘোরপ্যাঁচে ঠোঁট চেপে কান্না আটকাল । দশ মিনিটের মাথায় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ডিপার্টমেন্টের দিকে হাঁটা দিল। নীরা বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল,‘ এবারের ফার্স্ট ইয়ারগুলো

ভয়ানক বিচ্ছু। সামনে দিয়ে চলে যায় তবু সালাম দেয় না। আর কিছু বললেই ভ্যা ভ্যা করে কাঁদতে লেগে যায়। আমরা যে পরিমাণ ঝাঁগ খেয়েছি তার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টও ওদের দেওয়া হয় না। ন্যাকাবাজ একেকটা।'

বন্ধুদের মধ্যে এই নিয়ে চলতে লাগল আলোচনা। নম্রতার হুট করেই মন খারাপ হয়ে গেল। উফ!

আরফান তার খোঁজ কেন নিচ্ছে না? নম্রতার কি উচিত তার খোঁজ নেওয়া?ক্যান্টিনে এতোগুলো মানুষের সামনে নীরার ক্রোধের এমন নগ্ন প্রকাশ ঘটবে তা কখনো চিন্তাই করতে পারেনি অন্তু। বন্ধুরাও নীরার এমন রূপে স্তব্ধ, বিস্মিত। একটু আগেই ক্যান্টিনের যে টেবিলটিতে চলছিল আড্ডার বহর সেখানে এখন ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। আড্ডার মাঝেই

হঠাৎ ফোন বাজল নীরার। ফোন কানে নিয়ে বাইরে গেল ঠিক। কিন্তু ফিরে এলো ভয়াবহ রূপে। কথা নেই বার্তা নেই অন্তর গালে কষে এক চড় বসাল। এমন কিছুর জন্য বন্ধুমহলের কেউই প্রস্তুত ছিল না। সবার চোখেই আতঙ্ক আর প্রশ্ন। রঞ্জনের মতো শান্ত ছেলেও আজ বিভ্রান্ত।' আমার তোর প্রতি ঘেন্না হচ্ছে অন্ত। অতটা নীচ তুই কি

করে? বারবার বলেছিলাম বন্ধুত্বটা রাখতে দে। বন্ধু হিসেবে বাঁচতে দে কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম নিমকহারামরা কখনও বন্ধু হতে পারে না। যে কুক্ষণে তুই আমার বন্ধুর তালিকায় যুক্ত হয়েছিলি সেই কুক্ষণকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমি। ওইদিনটি আমার জীবনে না এলেই পৃথিবীর সবথেকে সুখী মেয়ে হতাম আমি।’

রাগে শরীর কাঁপছে নীরার। চোখদুটোতে জল টলমল করছে। ফর্সা মুখটা হয়ে উঠেছে লাল। নম্রতা থতমত খেয়ে বলল,‘ কি বলছিস এসব? এটা পাব্লিক প্লেস। আমরা পরে আলোচনা...’

নম্রতাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল নীরা,

‘ তুই চুপ কর নমু। দয়া করে আমার ব্যাপারে আর মাথা ঘামাতে

আসিস না। আমার অন্তুর কাছে শুধু একটা প্রশ্নেরই উত্তর চাই। কেন ভেঙে দিলি বিয়েটা? বিয়ের ডেইট ফিক্সড হয়ে গিয়েছিল অন্তু। সবাইকে দাওয়াতও দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমার চরিত্রে কলঙ্ক লাগিয়ে তোর কি লাভ হলো? আমার একটা ছোট বোন আছে অন্তু। ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়ে ভাঙার মানে কী আদৌ জানিস তুই? আমার জীবন

সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তোর?

অন্তু জবাব দিল না। রাগে দুঃখে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য নীরা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,‘ পাগলামো! পাগলামো! সত্যি করে বল তো, এই পাগলামো কিসের জন্য? আমার জন্য নাকি আমার সুন্দর শরীরের জন্য? তোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও আমার ঘেন্না লাগছে এখন।’

অন্তু এবার চোখ তুলে তাকাল। নীরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রাখল। দুই জনের চোখেই সীমাহীন রাগ। অন্তু নীরার ডান হাতের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে কটমটে কন্ঠে বলল,

‘ যা করেছি বেশ করেছি। ভালোবাসি বলে দাম নেই, না? খুব তো বিয়ের জন্য নাচছিলি। যা কর এখন বিয়ে।’

নীরার এখন হাউমাউ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে অসহায় বলে বোধ হচ্ছে। নীরা খুব জলদিই নিজেকে সামলে নিল। অন্তুর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রচন্ড ব্যথাতুর কণ্ঠে বলল,‘ তুই মরে যাচ্ছিস না কেন, বল তো? আই উইশ, এক্সিডেন্টের দিনটাই তোর শেষ দিন হতো।’

অন্তু দূর্বোধ্য হাসল। প্রচন্ড রাগে আবারও কষে চড় বসাল নীরা। চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ তোর হাসি আমার সহ্য হচ্ছে না।’

‘ আর তোর সুখ আমার সহ্য হচ্ছিল না।’

নম্রতা দুই হাতে মুখ চেপে বসে আছে। নীরা যথেষ্ট বাস্তববাদী মেয়ে। নিজেকে সংযত করার শক্তি তার প্রচন্ড। সেই নীরার এমন দশায় বুক

বেয়ে কান্না আসছে নম্রতার। ক্যান্টিনের সবাই ‘হা’ করে মজা গিলছে। অবস্থা বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। অন্তুকে টেনে সরিয়ে নিয়ে নম্রতাকে ইশারা করল। নাদিম হতভম্ব চোখে তাকিয়ে আছে। কাকে ধমক দিবে, কাকে সান্ত্বনা দিবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। প্রেম, ভালোবাসার মতো ঠুনকো বিষয়গুলো এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বেও

এতোবড় সংকট তৈরি করতে পারে? নম্রতা নিজেকে সামলে নিয়ে নীরার কাঁধে হাত রাখল। অসহায় কণ্ঠে বলল,‘ দোস্ত! সবাই দেখছে।’ নীরা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অন্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। কারো সাথে কথা বলল না। কারো দিকে এক পলক তাকাল না পর্যন্ত। অন্তুও রঞ্জনকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

তারপর বাইক নিয়ে নিরুদ্দেশ। বাকি চারজন দিশেহারা পথিকের মতো চেয়ে রইল। কাকে বুঝাবে? কাকে শাস্তি দেবে? দুই জনেই যে প্রাণ। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে হলের উদ্দেশ্য রওনা দিল নম্রতা। নীরাকে কোনোভাবেই একা ছাড়া চলবে না। কিছুতেই না। ছোঁয়া গাড়ির চাবিটা টেবিলের ওপর রেখে

রঞ্জন আর নাদিমের দিকে তাকাল। শান্ত ও শীতল তাদের দৃষ্টি। বিছানার পাশে ফ্লোরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে নীরা। হল ফাঁকা। প্রায় সময়টাতে প্রায় সবাইই হলের বাইরে থাকে। নীরা এই প্রথম হাউমাউ করে কাঁদছে। মুখে ওড়না গুঁজে কান্না নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে। মায়ের বলা কথাগুলো ঘুরেফিরে বুকে কাঁটার মতো বিঁধছে,' তোকে

আমি পেটে ধরেছি এই দুঃখেই মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। হারামজাদী, তুই কী মরে যেতে পারিস না? এক বোতল বিষ খেয়ে মরে যা না। এক বছর ধরে পাত্র খুঁজতে খুঁজতে যাই একটা জুটলো সেটাতেও বাগরা। ঢাকায় তুই প্রেম করে বেড়াস? নাগর জুটাইছিস? আর কি কি করিস সেখানে? বিয়ে কেন ভেঙে দিল তারা? তোর

কাকারা তো পারলে ঢোল পেটাচ্ছে পাড়ায়। আমি নাকি পড়ার নামে মেয়েকে ঢাকায় বে....'নীরা আর ভাবতে পারে না। ওর সত্যিই মরে যেতে ইচ্ছে করছে। অন্তু এতো পাগল কেন? এতো বড় সর্বনাশটা কেন করল ও? এমন সর্বনাশা ভালোবাসা তো নীরার চাই না। অন্তু ওকে এতটা অসম্মান কি করে করল? পাড়ায় এখন নীরার

জয়জয়কার। নীরা ঢাকায় প্রেম করে। প্রেমিকের সাথে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই বিয়ে ভেঙেছে। গ্রামের মানুষ নিশ্চয় আরও বিশ্রী বিশ্রী কথায় জর্জরিত করছে মাকে? এবার কী আরও পাত্র আসবে ঘরে? নীরা নিজের কথা ভাবছে না। তার ছোট একটা বোন আছে। যার বড় বোনের চরিত্রে এতো বড় দাগ তাকে বিয়ে দেওয়াটা কী অতো সহজ

হবে? কি পোড়াকপালি নীরা। কেন এসেছিল সে ঢাকায়? কেন ভর্তি হয়েছিল এই অভাগা বিশ্ববিদ্যালয়ে? তার থেকে কোনো মধ্যবয়স্ক লোকের বউ হয়ে নির্যাতন সহ্য করাটাও কি ঢের ভালো ছিল না? নীরা রাগে-দুঃখে হাতের কাছে থাকা কাঁচের মগটা ছুঁড়ে মারল দূরে। প্রচন্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাঁচের মগ।অসচেতনতায় বিছানার নিচে

থাকা অপ্রয়োজনীয় লোহার শিকরা ঢুকে গেল হাতে। নীরা শিক বের করা নিয়ে তেমন কোনো ব্যস্ততা দেখাল না। উদাসী ভঙ্গিতে বসে রইল। ভেসে যাক সব রক্ত। সে মরে গেলেই শান্ত হবে পৃথিবী। মায়ের লজ্জা, অন্তর পাগলাটে ভালোবাসা সব ফুরাবে। নীরার মৃত্যুটাই তো চাই। কিন্তু এই মৃত্যুও বড় বিশ্বাসঘাতক। নিমোকহারাম।

এমন সময়ে হন্তদন্ত করে ছুঁটে এলো নম্রতা। নীরাকে এমন অগোছালো হয়ে বসে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল সে। ফ্লোরে রক্ত গড়াতে দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো তার। তাড়াহুড়ো করে নীরার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। ডানহাতটা তুলে নিয়ে চোখ-মুখ খিঁচে শিক টেনে বের করল। হাতটা ওড়না দিয়ে বেঁধে দিয়ে অসহায় কণ্ঠে

বলল,‘ এসব কী নীরুপাখি? এতো কেন ভাবছিস তুই? দুনিয়া ভেসে যাক, আমি তোর সাথে আছি। যে তোর দিকে আঙ্গুল তুলবে তার আঙ্গুল কেটে রেখে দেব। কাঁদিস না সোনা। তুই কাঁদলে আমিও কেঁদে দেব। পরে কিন্তু থামাতে পারবি না।’

নীরা এবারে নম্রতার ওপর হামলে পড়ল। দুই হাতে জাপটে ধরে

কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই এক আশ্রয় তার। এই মেয়েটা তাকে একটু হলেও বুঝে। অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। নীরার এমন কান্নায় ভেতরটা ফেঁটে গেলেও নিজেকে সামলে নিল নম্রতা। নীরাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে হসপিটালে যেতে রাজি করাল। লোহার শিক ঢুকে গিয়েছে ইনজেকশন দিতে হবে নয়তো ইনফেকশন হতে পারে। নীরা

বুঝদার বাচ্চাদের মতো বুঝল। নম্রতার কথামতোই চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে শান্ত হলো।নীরার হাতে ইনজেকশন আর ব্যান্ডেজের কাজ শেষ হয়েছে সেই অনেকক্ষণ আগে। এখন নীরার ব্রেইন ওয়াশের জন্য খাবারের নামে তাকে নিয়ে হাসপাতালের আশেপাশেই কোনো রেস্টুরেন্টে বসেছে রঞ্জন। নম্রতা ইচ্ছে করেই সাথে যায়নি। রঞ্জন খুব

ভালো বুঝাতে পারে। নীরার এই ম্যান্টাল প্রেশার কমিয়ে আনার ক্ষমতা রঞ্জনের আছে। এই সময়ে রঞ্জন আর নীরাকে একা ছেড়ে দেওয়ায় উত্তম। তাছাড়া নম্রতারও বেশকিছু কাজ বাকি। মেডিক্যালে এসে ডাক্তারের খোঁজ না নিয়ে চলে যাবে তা তো হয় না। এই লোক আসলে করছেটা কী? এই দুনিয়ায় আছে? নাকি বিয়ে-শাদী করে

সাজেক ভ্যালির মেঘে হাবুডুবু খাচ্ছে? নম্রতাকে তো জানতে হবে। নম্রতা আরফানের চেম্বারের সামনে এসে উঁকি দিল। চেম্বারের সামনে এসিস্ট্যান্টকে দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে আরফান আছে কি নেই সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। নম্রতা কপাল কুঁচকে আবারও উঁকি দিল। সাথে সাথেই পেছন থেকে কেঁশে উঠল কেউ। নম্রতা বিদ্যুৎ বেগে

পেছনে ফিরে তাকাল। আরফান ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোণে শ্লেষাত্মক হাসি,‘ কি অবস্থা? কাউকে খুঁজছেন?’

আরফানের কথায় হেঁচকি উঠে গেল নম্রতার। বুকে হাত দিয়ে বার দুই হেঁচকি তুলে মাথা নাড়ল। আরফানও নম্রতাকে অনুসরণ করে মাথা নাড়ল। বলল,

‘ খুঁজছেন না?’

নম্রতা মিনমিন করে বলল,
‘ আমি কাকে খুঁজব?’
আরফান পকেটে হাত মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল,
‘ সেটা তো আপনিই ভালো জানেন।’
‘ আমি কাউকে খুঁজছি না।’

কথাটা বলে আবারও হেঁচকি তুলল নম্রতা। আরফান বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বলল,

‘ তাহলে নিশ্চয় চুরি করতে এসেছিলেন।’

নম্রতা চোখ রাঙিয়ে বলল,‘ হসপিটালে কেউ চুরি করতে আসে?’

আরফান আলগা কণ্ঠে বলল,

‘ আসতেই পারে। চুরের কি আর ধর্মজ্ঞান আছে?’

নম্রতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,
‘ কি এমন আছে আপনার চেম্বারে যে আমায় চুরি করতে হবে? আমাকে কি ভিখারি মনে হয়?’
আরফান হেসে বলল,
‘ না তা মনে হয় না। তবে...’
আরফানের কথার মাঝেই কয়েকবার হেঁচকি তুলল নম্রতা। আরফান ঠেস মারা কন্ঠে বলল,

‘ চেম্বারে বসুন, পানি খাওয়াই। হাজার হলেও আমাদের হসপিটালে চুরি করতে এসেছেন।’

নম্রতা চোখ রাঙাতেই কথা পাল্টাল আরফান,‘ না মানে বেড়াতে এসেছেন। আপ্যায়ন তো করতেই হয়। চলুন ম্যাম।’

কথাটা বলেই চেম্বারের দরজার দিকে এগিয়ে গেল আরফান। দরজাটা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে

রইল। নম্রতা ‘না’ করবে করবে করেও আর ‘না’ করতে পারল না। নম্রতা চেম্বারে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল। আরফান স্টেথোস্কোপটা টেবিলে রেখে শার্টের হাতা গোটাল। চেয়ার টেনে ধীরে স্থিরে নম্রতার মুখোমুখি বসল। টেবিল ওয়েটটা দুই আঙুল দিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে গভীর চোখে নম্রতার দিকে তাকাল। আরফানের এমন চাহনীর সামনে

অসহায় হয়ে পড়ল নম্রতা। অস্বস্তিতে হাসফাস করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে প্রশ্ন করল আরফান,' কি খাবেন?'

' হঠাৎ এতো আপ্যায়ন?'

আরফান জবাব না দিয়ে বলল,

' কফি খেতে হলে বাইরে কোথাও বসতে হবে। যেতে চান?'

আরফানের চোখদুটো আটকে আছে নম্রতার ঠোঁটে। নিচের ঠোঁটের মাঝ

বরাবর কালো, ছোট্ট তিলটিতে। গোলাপী রঙে ছোট্ট কালো তিলটা কি সুন্দর মানিয়েছে। এই একবিন্দু কালো রঙেই যেন পৃথিবীর সব নেশা ধ্বংস আজ। নম্রতা জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজাল। সাথে সাথেই ভিজে উঠল সেই অদ্ভুত সুন্দর তিল। কৃত্রিম আলোয় চিকচিক করে উঠল কালো রং। আরফান চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। তারপর আবারও

আড়চোখে তাকাল নম্রতার ঠোঁটে। নম্রতা স্পষ্ট কণ্ঠে বলল,‘ আমি কফি খাই না।’

‘ তাহলে কি খান?’

কথাটা বলে রহস্যময় হাসি হাসল আরফান। নম্রতা কপাল কুঁচকে বলল,

‘ হাসছেন কেন?’

আরফান এবারও উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ আপনার বিয়ের কী হলো?’

নম্রতা ফট করেই বলল,

‘ বিয়ের আবার কি হবে? বিয়ে হবে।’

‘ কবে হবে?’

‘ খুব শীঘ্রই।’

আরফান অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ ও।’কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল আরফান। টেবিলে রাখা পানির

গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে নম্রতার পাশে এসে দাঁড়াল। আরফানকে এতো কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে দেখেই ধুকপুক করে উঠল বুক। গলা শুকিয়ে এলো। ভাবনাগুলো হয়ে পড়ল এলোমেলো। আরফানের কাটা কাটা আকর্ষণীয় চোয়ালের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল নম্রতা। ভারী জিহ্বা নেড়ে বলল,

‘ কি হয়েছে?’

আরফান চোখের ইশারায় পানির গ্লাসটা দেখিয়ে বলল,

‘ পানি খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলাম। পানি খাবেন না?’নম্রতা বিভ্রান্ত চোখে আরফানের দিকে তাকাল। কাঁপা হাতে পানির গ্লাসটা নিয়ে আড়চোখে আরফানকে পর্যবেক্ষণ করল। আরফান একবিন্দুও নড়ল না। আগের জায়গাতেই ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল। চোখ

দুটো আটকে রইল নম্রতার মুখে, ঠোঁটে। নম্রতা অস্বস্তি নিয়ে পানি খেলো। পানি খেতে খেতেই আড়চোখে আরফানের দিকে তাকাল সে। আরফান তাকিয়েই ছিলো। চোখে চোখ পড়ল। কিছুটা সময় এভাবেই, অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়েই কেটে গেল তাদের। নম্রতা গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখতেই দুই হাত ভাজ করে টেবিলে ঠেস দিয়ে

দাঁড়াল আরফান। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,

‘ বিয়ের শপিং শেষ? একমাসে শেষ তো হওয়ার কথা, তাই না?’নম্রতা হালকা কেশে বলল,

‘ বিয়ের শপিং কী অতো সহজে শেষ হয়? বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত চলতে থাকে।’

‘ তা হোক। কাল আপনি আমার সাথে লাঞ্চ করছেন। ঠিক একটায়।’

কথাটা বলে চঞ্চল চোখে নম্রতার ঠোঁটের দিকে চেয়ে রইল আরফান। নম্রতা বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ লাঞ্চ?’

‘ আপনি চাইলে ডিনারের দাওয়াতও দিতে পারি।’

আরফানের কথায় তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নম্রতা। আরফানের ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি দেখে বলল,

‘ আপনি মানুষটা খুব খারাপ।’

আরফান হেসে বলল,‘ আপনার বিয়েটা সাকসেসফুল হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

‘ হুটহাট উধাও হয়ে যাওয়া মানুষ থেকে কোনোরূপ দাওয়াত আমি একসেপ্ট করি না।’

‘ কেউ একজন আমার কল রিসিভ করেনি।’

নম্রতা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

‘ বেশ করেছে। আমার পানি খাওয়া শেষ। এখন হলে ফিরব। পানির জন্য ধন্যবাদ।’

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ চলুন পৌঁছে দিই।’

নম্রতা সরু চোখে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ আপনি কেন পৌঁছে দিবেন? হসপিটালে আসা সব পেশেন্টদের

পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আছে নাকি আপনার?’

আরফান ফোনটা পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বলল,

‘ পেশেন্টদের পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেই। তবে হসপিটালে যারা চৌর্যবৃত্তি আর উঁকিঝুঁকি দিতে আসে তাদের পৌঁছে দেওয়া যায়। এদের বিশ্বাস নেই। অন্যকারো চেম্বারে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফেলতে পারে। আমি

রিস্ক নিতে রাজি নই।’নম্রতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ আমি একা যেতে পারি।’

আরফান হেসে বলল,

‘ আমিও পৌঁছে দিতে পারি।’

রিক্সায় পাশাপাশি বসে আছে নম্রতা আর আরফান। কারো মুখে কথা নেই। তবুও মনের সাথে মনের চলছে বিস্তর কথা দেওয়া নেওয়ার খেলা। রিক্সার ঝাঁকিতে অনিচ্ছায়

ছুঁয়ে যাওয়া দুটো হাত। একটু স্পর্শেই শরীরময় শিহরণ। রাজ্যের অস্বস্তি আর ভাবনাতীত ভালো লাগা। মনজুড়ে কতই না অনুভূতির খেলা। পুরোটা রাস্তা অসহনীয় এক ঘোরের মাঝেই কাটিয়ে দিল নম্রতা। আরফানের ঠোঁটেও কথা ফুটলো না। হলের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎই নম্রতার হাতের উপর হাত রাখল আরফান। ডানহাতের মুঠোতে একটা

কাগজ ধরিয়ে দিয়ে দ্রুতই সরিয়ে নিল হাত। নম্রতা চমকে তাকাল। আরফানের ভাবলেশহীন মুখ তখন অন্যদিকে ফেরানো। আরফানের মনের ভাব বুঝা গেল না। নম্রতা হলের সামনে নেমে যেতেই প্রথম কথা বলল আরফান। কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব নিয়ে বলল,

‘ কাল তবে দেখা হচ্ছে। ভালো থাকবেন।’

আরফানের ফিরতি রিক্সাটির দিকে মোহাচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইল নম্রতা। রিক্সাটা মোড়ের বাঁকে হারিয়ে যেতেই হাতের মুঠোয় থাকা কাগজটির দিকে তাকাল সে, ‘ নীল চিরকুট!’ঘন্টা দুই আগে সন্ধ্যা মিলিয়েছে। হলের প্রতিটি রুমে রুমে জ্বলে উঠেছে টিমটিমে আলো। নির্জন পথগুলোতেও ভূতগ্রস্তের মতো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে

ল্যাম্পপোস্ট। অন্ধকারের দুষ্টুমিতে তারা প্রায় ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত। হলের পাশের ঝোপঝাড়গুলোর মাথায় তখন জমাট বাঁধা অন্ধকার। ইট-পাথরের শহরেও সানন্দে আলো ছড়াচ্ছে দুই একটা ঝিঁঝি পোকার দল। দুই তলার বারান্দা থেকে সেসবই লক্ষ্য করছিল নম্রতা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল গাছের প্রতিটি পাতার হেলদোল। গায়ে তার

বাইরের পোশাক। এখনও পাল্টানো হয়নি। পাল্টানো হবে বলেও মনে হচ্ছে না। বুকের ভেতর ধুপধাপ হাতুড়ি পেটানো হৃদপিণ্ডটা একটা বারের জন্যও নিষেধ শুনছে না। শরতের শিরশিরে বাতাসের সাথে ভেসে আসছে বেলীফুলের সুগন্ধ। পাশের রুমের কেউ একজন দিন কতক আগে বেলীফুলের চারা লাগিয়েছে বারান্দায়। সেই গাছে দু-

দিন হলো ফুল এসেছে। সেই গন্ধেই ম ম করছে চারপাশ। বেলীফুলের সুগন্ধটা নাকে আসতেই হৃৎস্পন্দনটা থেমে গেল নম্রতার। হাতে ধরে রাখা নীল চিরকুটটা শক্ত করে চেপে ধরে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে সরে এলো জানালার কাছে। জানালার পর্দা ভেদ করে আসা আলোয় চিঠিটা আবারও মেলে ধরল নম্রতা। ওই এক টুকরো

চিঠিটাই দশম বারের মতো পড়তে আরম্ভ করল। এই তো পরিচিত সেই অক্ষর। পরিচিত সেই স্বাদ। পরিচিত সুগন্ধ। নম্রতা বুক ভরে শ্বাস টেনে টলমলে চোখে চেয়ে রইল নীলাভ কাগজের পাতায়,‘ চিঠিতে সম্বোধন লেখার অভ্যাস আমার কোনো কালেই নেই। চিঠির সম্বোধনে কিছু লিখতে গেলেই মোটা মোটা চোখের অভিমানী একটা মেয়ে

চোখে ভাসে। ভ্রু কুঁচকে বলে, তুমি কখনও সম্বোধনে কিছু লিখ না। সম্বোধনে কিছু না লিখলে কী চিঠি হয়? চিঠি হয় কিনা জানি না। কিন্তু ওই অভিমানী চোখদুটো বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। বুকে শিশির বিন্দুর মতো শুভ্র অনুভূতির বর্ষন হয়। সেই অভিমানীকে অভিমান করার অসংখ্য সুযোগ দিতে ইচ্ছে হয়। অবসরে ভাবতে ইচ্ছে করে তার সেই

অভিমানী মুখের নিখুঁত অবয়ব। কিন্তু পারি না। প্রত্যেকবারই মনে হয়, সে এমন নয়। অন্যরকম। সবচেয়ে অন্যরকম তার চোখ। সে কল্পনা থেকেও কল্পনাময়। রূপকথার থেকেও স্নিগ্ধ, সরল। আমি তাকে যত ভাবি সে আমায় তত ভাবায়। এসাইনমেন্টের খাতায় ভুল করে তার নাম লিখে ফেলি। পাতার পর পাতা লিখে যাই একটাই নাম। নতুন

করে এসাইনমেন্ট করি সেখানেও সেই একই ভুল। আহ্ কি যন্ত্রণা! আজকাল প্রেসক্রিপশনের পাতাতেও লেখা হয়ে যায় তার নাম। কাটি। আবার লিখি। আবার কাটি। শেষমেশ নতুন কাগজ টেনে প্রেসক্রিপশন লিখি। আশেপাশে কারো পায়ে নুপুরের শব্দ হলেই চমকে তাকাই। কারো পায়ে তিল দেখলে চমকে উঠি। কিন্তু সবার

পায়ের তিল তো তার মতো নেশাতুর নয়। ওমন মিষ্টি আর পবিত্রও নয়।আমি জানি না, তুমি কে। তবে তোমার পা’জুড়ো আমার ভাবনার খুব কাছে। আমি তোমাকে চিনতে পারছি না ঠিক। তবে, তোমার চোখদুটো আমায় টানছে। সেই চোখজোড়ায় উপচে পড়া অভিমানগুলো বারবার আমার অভিমানীর সাথে মিলে যাচ্ছে।

আমার কল্পনায় তুমি ছিলে অন্যরকম। তাই বাস্তবের হঠাৎ সাক্ষাতের জটিলতাটা আমি ধরতে পারছি না। তবে কী আমি প্রেমিক হিসেবে ব্যর্থ? শুনো বিষব্যথা। নির্ঘুম রাত্রির নীলব্যথা, আমি আবারও একবার দুঃখ পেতে চাই। মিষ্টি দুঃখ, মিষ্টি ব্যথা পেয়ে স্বার্থক এক প্রেমিক হতে চাই। আমি খুব চেষ্টা করেও নম্রতা নামের মেয়েটির প্রেমে

পড়তে পারছি না। তার চোখদুটো আমায় টানলেও সেই চোখ আমায় আকৃষ্ট করতে পারছে না। আমি এক জনম, হাজার জনম শুধু শ্যামলতাকেই চাই। তার প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে ব্যথায় ব্যথায় মরে যেতে চাই।প্রতিটি মুহূর্তে আমি শুধু তার প্রেমেই পড়তে চাই। আগামীকালের সেই দুপুরবেলায়, ঘেমে-নেয়ে ক্লান্ত হয়ে আমি আমার

পরিচিত শ্যামলতাকেই দেখতে চাই। আমার অভিমানীকে কাল ফিরিয়ে দিও প্লিজ![বিঃদ্রঃ শ্যামলতাকে বলবে আমার শেষ চিঠির উত্তর সে দেয়নি। সেই উত্তরটা আমার চাই।]
‘

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুই ফোঁটা টসটসে জল। ঠোঁটের কোনো ফুটল প্রাপ্তির হাসি। সেই কতদিন পর ফিরে

পেলো সেই দমবন্ধ করা অনুভূতি। কিশোরী বয়সের অনুভূতিগুলো যৌবনেও কত তাজা! কত মিষ্টি! কত সুন্দর। প্রগাঢ় অনুভূতি নিয়ে বারান্দা পা মুড়ে বসে পড়ল নম্রতা। দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বোজল। বেলীফুলের তীব্র সুগন্ধটা নাকে আসতেই নম্রতার মনে পড়ল পুরনো এক চিঠির লাইন,

‘ তোমার আঙিনা বেলীফুলের গাছে গাছে ভরিয়ে দেব শ্যামলতা। রোজ সকালে মুগ্ধ চোখে সাদা ফুলের রাজ্য দেখবে তুমি আর আমি দেখব তোমাকে। তোমার সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে ল্যাপ্টে থাকবে কাজল। ঠোঁটে থাকবে নিষ্পাপ হাসি। সেই হাসিটা দেখার জন্য হলেও তোমার জন্য বেলীফুলের রাজ্য বানাব আমি। সেই

রাজ্যের রাণী হবে তুমি। শুধুই তুমি। আর....” কাঁদছিস?’

নম্রতা চমকে চোখ মেলল। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ কখন এলি? বুঝতেই পারিনি।’

নীরা ফোড়ন কেটে বলল,

‘ স্বপ্নে প্রেমিকের বাহুডোরে আঁটকে থাকলে আশেপাশের খেয়াল কি আর থাকে সোনা?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে বলল,

‘ বাজে কথা।’

নীরা নিঃশব্দে হাসে। তারপর হঠাৎই গম্ভীর মুখভঙ্গি নিয়ে চুপ হয়ে যায়। নীরাকে নীরব হয়ে যেতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নম্রতা। বেশ রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল,

‘ মন খারাপ?’

নীরা অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল,

‘ মন খারাপ কেন হবে?’নম্রতা কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থেকে বলল,

‘ ভাই তুই এতো স্বাভাবিক থাকিস কিভাবে? রোবট তো নস। তবুও অনুভূতিশূন্যের মতো ব্যবহার।’

নীরা হাসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,‘ বাড়িতে খুব ঝামেলা হচ্ছে। কাকারা খুব বাজে

বাজে কথা শুনাচ্ছে ভাইয়া আর মাকে। পুরো পাড়া জুড়ে বিশ্রী একটা খবর ছড়িয়ে গিয়েছে। মা আমাকে খুব দ্রুত মরে যেতে বলেছে। ভাইয়া কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কাছের মানুষ, কাছের বন্ধুটি থেকে অপ্রত্যাশিত একটা ধাক্কা জুটেছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে আমার কাছে দুটো পথ খোলা আছে নমু। এক. নিজের

কপাল চাপড়ে কান্নাকাটি করা নয়তো সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়া। দুই. নিজেকে এতোটা শক্ত করা যাতে এই বিষবাক্যগুলো প্রতিবেলার খাবারের সাথে খুব সহজেই হজম হয়ে যায়। সমাজের নীতিবাক্যগুলো ছুঁড়ির মতো ঢুকতে চাইলেও শরীরের প্রতিরোধে বারবারই ব্যর্থ হয়। আমি দ্বিতীয় অপশনটা চুজ করেছি। এই

ব্যথাগুলো হজম করার চেষ্টা করছি। আমি যে পরিবার থেকে বিলং করি সেখানে এতো ইমোশন থাকা উচিত নয়।’

কথাটুকু বলে থামল নীরা। নম্রতার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল,‘ আমাদের পৃথিবীতে খুব অন্যায় একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মের সাথেই বেঁধে গিয়েছে আমাদের ভাগ্য। এখানে কারো কারো জীবন

থাকে সুখের ফুলে মোড়ানো। এরা কখনো সত্যিকারে দুঃখ সওয়ার সুযোগ পায় না। আবার কারো কারো জীবন থাকে দুঃখ ফুলে মোড়ানো। এরা কখনো সত্যিকারের সুখ ফুলের সন্ধান পায় না। কল্পনায় সুখ ফুলের অবয়ব এঁকেই পাড় করে দেয় গোটা জীবন।'

নম্রতা চুপ করে রইল। নীরাও আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ করেই নিজস্ব

ভাবনায় ডুব দিল। নম্রতা মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ অন্তুকে তুই ঘৃণা করিস না নীরু। ছেলেটা তোকে খুব ভালোবাসে বলেই...’

নীরা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল,‘ অন্তু আমায় ভালো না বাসলেই হয়তো সুখ ফুলের অবয়ব আঁকাটা একটু সহজ হতো। সে জানে, ভালোবাসা অর্থ পাওয়া। আর আমি

জানি, ভালোবাসা অর্থ দেওয়া। আফসোস, অন্তু আমায় ন্যূনতম সম্মানটুকুই দিতে পারল না।'

নম্রতা ব্যস্ত হয়ে বলল,' তুই যেমনটা ভাবছিস তেমনটা কিন্তু নয়। আমি মানছি, ও ভুল করেছে। কিন্তু অপরাধটা যতটা ঘৃণ্যভাবে তোর সামনে এসেছে ততটা ঘৃণ্য কিন্তু নয়। অন্তু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেছিল। মেনে নেওয়ার চেষ্টাও

করেছিল সবটা কিন্তু সেদিন যখন তোর বিয়ের কার্ডের ছবি দেখালি তখন ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি ওকে শান্ত করার জন্যই সত্যটা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, তুইও ওকে ভালোবাসিস কিন্তু পরিস্থিতির চাপে সেই ভালোবাসাটা তোয়াক্কা করছিস না। কষ্ট তুইও পাচ্ছিস। তাই ওর উচিত নিজেকে সামলে নেওয়া যেমনটা তুই সামলে

নিচ্ছিস। অন্তু আমার কথা বুঝেছিল। শান্তও হয়েছিল। কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি যে ও এমন একটা কাজ করবে। আমি সরি দোস্ত।'নীরা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল,

' তোকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম নমু।'

নম্রতা অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ ভুল বুঝিস না প্লিজ। আমি তোকে হার্ট করতে চাইনি। আর না অন্তু চেয়েছিল। অন্তু তোর হবু বরের অফিসে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ভদ্রলোককে খুবই নম্রভাবে বুঝিয়েছে, সে তোকে ভালোবাসে। আর তুইও ওকে ভালোবাসিস। পরিবারের চাপে বিয়েটা তোকে বাধ্য হয়েই মেনে নিতে হচ্ছে। প্রমাণ হিসেবে আমাদের একটা গ্রুপ ছবি

দেখিয়েছে যেখানে তুই আর অন্তু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছিস। আরেকটা ছবি দেখিয়েছে, যেখানে অন্তুর কাঁধে হাত রেখে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছিস তুই। দুটোই গ্রুপ ফটো ছিল। তোর নামে বাজে কিছু বলা তো দূর, তোর এক্সট্রা কোনো ছবি পর্যন্ত দেখায়নি ও। অন্তু আমাদের বন্ধু নীরু। তুই একটাবার চিন্তা করে দেখ, অন্তু, নাদিম, রঞ্জন

এমন কিছু করতে পারে যার জন্য আমাদের সাফার করতে হবে? কখনও করেছিল এমন কিছু? ওই হারামি ব্যাটা তার আর তোর ফ্যামিলিকে কি আলতু ফালতু বুঝিয়েছে আল্লাহ জানে। আজকালকার যুগেও যে এমন থার্ড গ্রেড মানসিকতার মানুষ থাকতে পারে তা ভেবেই অবাক হচ্ছি আমি।’

নীরা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,‘ এতো ভালোবাসা দেখাতে কে বলেছিল তোদের? বিয়েটা আমি নিজের ইচ্ছেই করছিলাম নমু। অন্ত কাজটা যেভাবেই করুক ফলাফল তো একই তাই না?’

নম্রতা হতাশ চোখে তাকাল। ব্যর্থ নিঃশ্বাস ফেলে ঘাড়টা হালকা কাত করল। বলল,

‘ নিজের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য শেষ চেষ্টা করার অধিকার তো সবার আছে নীরু। অন্তু তোর বন্ধু বলে তার থেকে তুই হাই লেভেলের কিছু এক্সপেক্ট করতে পারিস না। যে ছেলেটা চার চারটা বছর থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছে তার কাছে সব কিছু মুখবুজে সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতা আশা করলে তো চলবে না। তুইও জানিস, অন্তুর রাগ

বরাবরই বেশি। ও যে রাগের মাথায় কিছু....’

নীরা ফুঁসে উঠে বলল,‘ তাহলে তুই কি বলতে চাইছিস? অন্তু আমার সাথে যা করেছে তা কম হয়ে গিয়েছে? তুলে নিয়ে ধর্ষণ করলে পার্ফেক্ট কিছু হতো? অথবা এসিডে ঝলসে দেওয়াটাই এক্সপেক্ট করছিলি তুই?’

নম্রতা প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আগেই উঠে চলে গেল নীরা। নম্রতা হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। নীরার ক্ষতি সে উপলব্ধি করতে পারছে। তাই বলে, অন্ধভাবে অন্তকে ঘৃণা করাটাও তো ঠিক হচ্ছে না নীরার। ছেলেটা ওকে ভালোবাসে বলেই তো..... কথাগুলো ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নম্রতা।রাত গড়িয়ে সকাল হতেই অস্থিরতা বেড়ে গেল নম্রতার। ভার্সিটি যাওয়ার

সময়টুকু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল। ক্লাস, আড্ডা সবই যেন উবে গেল আজ। টলমলে আবেগ নিয়ে চিঠি লিখল। পছন্দ না হওয়ায় অসংখ্যবার কেটে-কুটে ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে। আবার লিখল। ফ্লোরটা নীল কাগজে ভরিয়ে ফেলে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল বিছানায়। আকাশে সূর্যের তেজ বাড়তেই বিছানার নিচে থাকা লাগেজ ঘেঁটে

লাল পেড়ে সাদা শাড়ি খুঁজে বের করল নম্রতা। তারপর, অনেকদিন আগে চিঠিতে যেমনটা লিখেছিল দু'জনে। যেভাবে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল ঠিক সেভাবেই তৈরি হয়ে নিল সে। শাড়িটা সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতো খুব যত্ন করে পড়ল। চোখে গাঢ় করে কাজল টানল। পাতলা ঠোঁটদুটো লাল রঙে রাঙাল।ঘন

চুলগুলো পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে হাতে পরল কাঁচের চুড়ি। লাগেজের জিনিস, কাপড়ের ফাঁক সব উল্টেপাল্টে ছোট্ট একটা আলতার শিশিও উদ্ধার করল সে। তারপর খুব যত্ন করে ফর্সা পায়ে আলতা লাগাল। কপালে পরল ছোট্ট লাল টিপ। কানে ঝুমকো পরতে পরতেই ঘড়ির কাঁটা বারোর ঘরে এসে ঠেকল। সাথে সাথেই নম্রতার ফোনে

ম্যাসেজ টুন বাজল। আরফানের দেওয়া ছোট্ট একটি বার্তা, ‘ অপেক্ষা করছি।’ এতোক্ষণ শান্ত থাকলেও শেষ মুহূর্তে এসে নার্ভাস হয়ে পড়ল নম্রতা। হাত-পা কাঁপতে লাগল। অস্বস্তি আর লজ্জায় ঢিপঢিপ করতে লাগল বুক। নম্রতা কিছুক্ষণ ঘরময় পায়চারী করল। দাঁত দিয়ে নখ কাটল। বারান্দা থেকে নিচের রাস্তায় উঁকিঝুঁকি দিল। ঠিক তখনই দ্বিতীয়

বার্তাটি এলো, ‘ বারোটা বিশ বাজে মিস.নম্রতা।’ নম্রতা বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল। আয়নায় নিজেকে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে। দুই তলা থেকে গেইট পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে অসংখ্যবার একটা চিন্তায় মাথায় খেলে গেল তার,‘ বেশি সেজে ফেললাম না তো? আরফান কি ভাববে তাকে?’

পরমুহূর্তেই ভাবল,
‘ কি ভাববে? সে মোটেও ডাক্তার আরফানের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে একান্তই নিজের মানুষটির সাথে দেখা করতে। তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সে এর সাথে দেখা করতে। এতো অস্বস্তি তাকে মানাবে কেন?’
গেইটের কাছেই রিকশায় বসে অপেক্ষা করছিল আরফান। গায়ে

তার নীল পাঞ্জাবি। ডান হাতের কব্জিতে কালো রঙের ঘড়ি। একহাতের মুঠোয় কালো ফ্রেমের চশমা। সূর্যের তেজে অনেকক্ষণ আগেই ঘাম ছুঁটেছে তার শরীরে। আরফান দুই হাতে মুখ ঢেকে জোড়াল শ্বাস ফেলল।মুখ থেকে হাত সরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখল। তারপর বেখেয়ালি দৃষ্টিতে একবার গেইটের দিকে তাকাল। গেইট

থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েই কপাল কুঁচকে ফেলল সে। ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে আবারও গেইটের দিকে তাকাল। গেইটে দাঁড়িয়ে থাকা রমণীকে দেখেই কপালের ভাঁজটা সরে গিয়ে মসৃণ হয়ে গেল মুখ। ধবধবে ফর্সা নম্রতার গায়ে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। মায়াবী চোখগুলোতে ঘন কাজল। আরফান ঢোক গিলল। পাঞ্জাবির কলার টেনে ঠিক করতে

করতে চোখ ফেরাল সামনে। তারপর আবারও তাকাল নম্রতার চোখে। ঘোর লাগা মুগ্ধ দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে পায়ের কাছে এসে ঠেকলো। সুন্দর পা-জুড়ো আজ আলতায় রাঙা। হাতে রিনিঝিনি কাঁচের চুড়ির শব্দ। আরফানের মুখটা ধীরে ধীরে উজ্জল হয়ে উঠল। চোখে পর্দায় থাকা দ্বিধাটা সরে গেল মুহূর্তেই।

রিকশার এক পাশে সরে বসে নির্বিকার কণ্ঠে বলল,
‘ উঠে আসুন। এতো রোদ, গরমে মারা যাচ্ছি।’আরফানের নির্বিকার কণ্ঠে চোখ তুলে তাকাল নম্রতা। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিয়ে রিকশায় উঠে বসল। রিকশায় উঠতে গিয়েই বাহুতে বাহুতে স্পর্শ লাগল দু’জনার। আরফান এবার আর

আগের মতো সরে বসল না। দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে বলল,

‘ ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করালেন আমায়।’

নম্রতার কাট কাট জবাব,

‘ ত্রিশ মিনিটেই ক্লান্ত? মেয়েরা চাইলে চার বছরও অপেক্ষা করতে পারে। অপেক্ষা করতে পারে অনন্ত জীবন। আচ্ছা? চার বছরে কত মিনিট হয় জানেন? চার বছরে হয়,

বিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শ মিনিট। সেই হিসেবে ত্রিশ মিনিট খুবই অল্প। তাই নয় কি?’

আরফান জবাব দিল না। চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে নিয়ে নম্রতার চোখে চোখ রাখল। গাঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ অপেক্ষা কী সবসময় একপাক্ষিকই হয়?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে তাকাল,

‘ হয় না?’আরফান নিশ্চুপ চেয়ে রইল নম্রতার চোখে। খুবই সাধারণ মুখটিতে জ্বলজ্বল করা অভিমানী চোখদুটোতে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে হঠাৎই বলল,

‘ আপনাকে দুটো বিষয় জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্য। প্রথমত, আপনার “অতি শীঘ্রই হয়ে যাওয়া” বিয়েটা কখনোই হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত,

সন্ধ্যার আগে আপনার হলে ফেরাটাও হচ্ছে না।’

আরফানের কথায় প্রগাঢ় অধিকারবোধের ছাপ পেয়ে ভীষণ অবাক হলো নম্রতা। মনের সুপ্ত কোনো গহ্বরে বয়ে গেলো ভালো লাগার হাওয়া। আনন্দে নাকি বিস্মিয়ে হতভম্ব হয়ে জানা নেই নম্রতা ক্ষণকাল নিশ্চুপ চেয়ে থেকে বলল,

‘ ডক্টর আরফান আপনি...’

আরফান তাকিয়েই ছিল। চোখে তার চঞ্চল দৃষ্টি। নম্রতাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে একদম অন্যরকম কণ্ঠে বলল,

‘ নিষ্প্রভ।’

নম্রতা একদম ক্ষীণ কণ্ঠে আওড়াল,‘ নিষ্প্রভ?’

আরফানের চোখে খেলে গেল তৃপ্তির হাসি। খোশমেজাজী কণ্ঠে বলল,

‘ কিছু কিছু মানুষের কণ্ঠে আমার নামটা একটু বেশিই মিষ্টি লাগে। এক্ষেত্রে ক্রেডিটটা আমার নামের নাকি বিশেষ কারো কণ্ঠের, ঠিক বুঝতে পারছি না।’

তারপর বাচ্চাদের মতো খুব ছেলেমানুষী কণ্ঠে জানতে চাইল,

‘ আপনি বুঝতে পারছেন?’ঘর্মাক্ত দুপুরে গাধার মতো খেটে-খুটে মাত্রই বাসায় ফিরেছেন আনিসুল সাহেব।

তেতে উঠা রোদে মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মতিঝিলের অফিস থেকে ধানমন্ডি আসতে সময় লাগে সতেরো মিনিট। অথচ, অানিসুল সাহেবের লেগেছে এক ঘন্টা বিশ মিনিট। এই অসহ্য গরমে লোকাল বাস মানেই বিশ্রী ব্যাপার। সতেরো মিনিটের পথ অতিক্রম করতে ঘন্টাখানেক জ্যামে ফেঁসে থাকা তার থেকেও বিশ্রী ব্যাপার। চারপাশে

ঘামের গন্ধ, ধুলাবালি, দমবন্ধ গরম বাতাস আর অযথা চেঁচামেচির মাঝে ঘন্টাময় বসে থাকলে কোনো ভদ্রলোকেরই মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। আনিসুল সাহেবেরও নেই। তবে তার মেজাজ খারাপের পুরো দোষটা জ্যামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। যার ছেলে হুটহাট উধাও হয়ে যায়, তার মেজাজ খারাপ হওয়ার জন্য জ্যামের অপেক্ষা রাখে

না। আনিসুল সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলেন। স্ত্রী জাহানারা নিঃশব্দে খাবার বেড়ে দিতেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিনি,‘ কাল রাতে কোথায় ছিলে?’

অন্তু ভাতে হাত দিয়েছে মাত্র। বাবার প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে মাথা নুইয়ে চুপ করে রইল। আনিসুল সাহেব আবারও একই প্রশ্ন করলেন। আগের বারের থেকেও ঠান্ডা শোনাল

তার কণ্ঠ। অন্ত ভাতের দলাটা গিলে নিয়ে নম্র কণ্ঠে বলল,

‘ এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম আব্বা।’

আনিসুল সাহেবের চোয়াল শক্ত হলো। ধীরে ধীরে তপ্ত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর,

‘ কেন? ঢাকা শহরে তোমার নিজস্ব বাসায় নিজস্ব রুম থাকা সত্ত্বেও বন্ধুর বাসায় থাকতে হলো কেন?

আমি তোমার উত্তরের পেছনে কোনো যৌক্তিকতা পাচ্ছি না।’

অন্ত উত্তর না দিয়ে ভাত মাখাতে মনোযোগ দিল। আনিসুল সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,‘ তুমি রাতে ফিরছ না। এই সংবাদটা বাসায় জানানো উচিত ছিল বলে কি তোমার মনে হচ্ছে না?’

‘ জি। মনে হচ্ছে।’

‘ তাহলে জানাওনি কেন?’

অন্তু উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব বসে থেকে হুট করেই অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিয়ে বসল,

‘ আমি বিয়ে করতে চাই আব্বা।’

আনিসুল সাহেব হতভম্ব চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শীতল কণ্ঠে শুধালেন,

‘ কি বললে?’

অন্তু নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল,

‘ আমি বিয়ে করতে চাই।’

আনিসুল সাহেব খাবার খাওয়ায় মনোযোগী হলেন। কয়েক লোকমা খাবার খেয়ে খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,

‘ তুমি কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছ? রাতের সময়টা তার সাথেই কাটিয়েছ বা কিছু?’

‘ জি না।’

আনিসুল সাহেব ঠান্ডা চোখে তাকালেন,‘ তাহলে হঠাৎ বিয়ে করতে চাইছ কেন?’

‘ আমার প্রয়োজন।’

এবার যেন বিস্ফোরণ ঘটল। টেবিলে থাকা কাঁচের জগটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললেন আনিসুল সাহেব। জগটা তীব্র ঝনঝন শব্দ তুলে ইহলোক ত্যাগ করল। অন্তর দশম শ্রেণী পড়ুয়া ভাই টেলিভিশন বন্ধ করে

ভীত চোখে চেয়ে রইল বাবা আর ভাইয়ের দিকে। অন্তুর মা আঁতকে উঠে বললেন,

‘ আহ! অযথা জিনিসপত্র ভাঙছ কেন বল তো? ছেলেটাও তো মাত্র ফিরল। খাওয়া শেষ করেও তো কথা বলা যায় নাকি?’

আনিসুল সাহেব গর্জে উঠে বললেন,‘ চুপ। একটা কথা বলবা তো থাপ্পড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব

বেয়াদব মহিলা। আমার টাকায় কেনা জিনিস আমি ভাঙব তাতে তোমার সমস্যা কই? যেখানে সমস্যা হওয়ার কথা সেখানে তো তোমায় দেখা যায় না। একমাত্র তোর জন্য ছেলেগুলো এতোটা বেয়ারা হয়েছে। সবার মতো যদি বউ পেটাতে পারতাম। পিটিয়ে পিঠের চামড়া তুলতে পারতাম তাহলে ছেলেও থাকত টাইট। তোকে পিটিয়েই

ছেলে ঠিক করতে হবে আমায়। সারাদিন বাসায় বসে করিস কি তুই? ছেলে সামলাতে পারিস না?'

অন্তু শীতল অথচ কড়া কণ্ঠে বলল, ' আম্মাকে তুই-তোকারি করবেন না আব্বা। যা বলার আমাকে বলুন। আম্মা? ঘরে যাও।'

আনিসুল সাহেবের রাগ এবার আকাশ ছুঁলো। গর্জন করে বললেন,' তোকে বলব! কয় দিনের পোলা

হইছিস তুই? বিয়ে করবি! প্রয়োজন দেখাস? এই তুই রোজগার করিস? নিজেই তো আমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছিস। বউরে খাওয়াবি কি? নিজের রক্ত পানি করে তোদের শখ-আহ্লাদ পূরণ করছি আর তোরা ভার্সিটির নামে মেয়েবাজী করে বেড়াস? দেবদাস হইতে চাস? ওই হারামজাদা, তোর বাপের কি জমিদারি আছে যে দেবদাস হবি

তুই? তোর বাপের কেরানির চাকরীতে দেবদাসগিরিও ফুটব না হারামীর বাচ্চা।’

‘ অযথা গালাগালি করবেন না আব্বা। সামান্য বিয়ে করা নিয়ে এতো হট্টগোল করার কিছু নেই।“ এটা সামান্য! এই কু** বাচ্চা। তুই আমারে শিখাবি কোনটা সামান্য আর কোনটা জগন্য? সামান্য কেরানীর চাকরি করে পরিবারটাকে এই

জায়গায় টেনে এনেছি আমি। নিজের শখ আহ্লাদ ভুলে তোদের আহ্লাদ পূরণ করেছি। ভালো স্কুল, কলেজে পড়িয়েছি। যখন যা চেয়েছিস সব দিয়েছি। লোন নিয়ে বাইক কিনে দিয়েছি। তার বিনিময়ে চেয়েছি, ছেলেগুলো ভালো করে পড়াশোনা করুক। প্রতিষ্ঠিত হোক। সমাজে একটু মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াই। আর তোরা? বিয়ে করবি? বিয়ে করে

ফুটানি দিয়ে ঘুরবি? বেয়াদব। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কি তুই শুয়** বাচ্চা?’

‘ সেটা আমার ব্যাপার আব্বা। আমার বউয়ের দায়িত্ব আমার। আপনার দায়িত্ব বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া। নিয়ে যাবেন ব্যস।” তোর দায়িত্ব? জীবনে এক টাকা রোজগার করছিস? টাকা কামাইতে কত কষ্ট বুঝিস? পৃথিবীটা এতোই সোজা?

সিনেমা পাইছিস? আমার বাড়িতে থেকে এসব সিনেমা চলবে না। এতোদূর পড়াশোনা করানোর পর তুই বাসের কন্ট্রাক্টারগিরি করে ভাত খেতে চাস? তোর চাকরীর ন্যূনতম যোগ্যতা আছে?'

অন্ত উত্তর দিল না। আনিসুল হক নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন,

‘ আজকের পর বিয়ে-টিয়ের কোনো কথা যেন আমার বাড়িতে না উঠে। আর ওই নীরা মেয়েটার আশেপাশেও যেন তোমায় না দেখি।’ অন্তু চমকে তাকাল। বাবার তো নীরার ব্যাপারটা জানার কথা নয়। অন্তু বলেনি, তাহলে? প্রশ্নটা করতে গিয়েও চুপ করে রইল অন্তু। আনিসুল হক খানিক চুপ থেকে বললেন,‘ এসব ফালতু বন্ধু বান্ধবের

কোনো প্রয়োজন নেই। এসব নষ্ট ছেলেপুলের সাথে এতো মাখামাখি কিসের তোমার? সব বাউণ্ডুলে বন্ধু জুটিয়েছ তুমি। সব কয়টা বেয়াদব। সেদিন হসপিটালের সামনে তোমার এক বন্ধুকে দেখলাম। গিটার নিয়ে ঘুরে যে ছেলেটা। হসপিটালের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। আমাকে দেখে সিগারেট ফেলার প্রয়োজনটুকু বোধ করল না।

সিভিলাইজেশ্যন বলে তো একটা কথা আছে নাকি?’

অন্তু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

‘ আপনি মেইন পয়েন্ট থেকে সরে যাচ্ছেন আব্বা। আলোচনাটা আমাকে নিয়ে হচ্ছিল। আমার বন্ধুদের সিভিলাইজেশ্যন নিয়ে নয়।’

ক্ষুব্ধ আনিসুল সাহেব ভাতের প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। হুট করেই চড়

বসালেন তার জোয়ান ছেলের গালে। রাগে টলমল কণ্ঠে বললেন,

‘ আজকাল মুখে মুখে কথা বলাও শিখে গিয়েছ তুমি। ওইসব বেয়াদববদের সাথে থেকে থেকেই বুঝি এই অধঃপতন?’

ছেলেকে চড় মারতে দেখেই আতঁকে উঠলেন জাহানারা। দৌঁড়ে স্বামীর কাছে গেলেন। ডান বাহুটা টেনে ধরে বললেন,‘ কি করছ! এতোবড়

জোয়ান ছেলের গায়ে কেউ হাত তুলে? মাথাটা শান্ত করো। ওর...’

জাহানার কথার মাঝপথেই গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল অন্তু,

‘ বিয়েটা আমি করছি আব্বা।’

কথাটা কানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই জাহানারার গালে দানবীয় এক চড় বসালেন আনিসুল সাহেব। আকস্মিক চড়ে টেবিলের ওপর ছিঁটকে পড়লেন জাহানারা। হতভম্ব

চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। চোখদুটো টলমল করছে তার। পরিস্থিতিটা কেমন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন ঠেকছে। ক্ষুব্ধ আনিসুল সাহেব কিছু বলার আগেই আরও একবার বিস্ফোরণ ঘটল ঘরে। অন্তু সামনে থাকা চেয়ারটা মাথায় তুলে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। চেয়ারের আঘাতে ভেঙে টুকরো হলো বসার ঘরে থাকা একুশ ইঞ্চির টেলিভিশন সেট।

অয়ন লাফিয়ে সরে দাঁড়াল। ভয়ে কেমন কুঁকড়ে গিয়েছে সে। ওয়ারড্রবের উপর থাকা ফুলদানিটাও তুমুল শব্দ তুলে ভাঙল। ভাঙল এক দুটো কাঁচের গ্লাস। নিস্তব্ধ ঘরটিতে মুহূর্তেই বয়ে গেল সরব এক ধ্বংসযজ্ঞ। অন্তু লাল চোখে বাবার দিকে তাকাল। প্রচন্ড ক্রোধে কাঁপছে তার শরীর।‘ আম্মার গায়ে হাত তোলার সাহস করবেন না আব্বা।

সমস্যা আমার সাথে আম্মার সাথে না।'

' তুই আমাকে ধমকি দিচ্ছিস? এতোবড় সাহস? বের হ আমার বাড়ি থেকে। এই মুহূর্তে বের হবি। তোর মতো নালায়েক, বেয়াদব ছেলে আমার প্রয়োজন নেই।'

' আপনার বাড়িতে থাকার ন্যূনতম ইচ্ছে আমার নেই। বিয়ের প্রস্তাব যদি নিয়ে যেতে পারেন তো বাড়িতে

ফিরব নয়তো এই বাড়ির ছায়াও মাড়াব না আর। আম্মা? তোমার বরকে বলে দিও, বিয়েটা আমি এই মাসের মধ্যেই করতে চাই। আর তা না হলে, ছেলের কথা ভুলে যাও। আর এটাও বলে দিও, তোমার দুই ছেলের একটাও এখন বাচ্চা নাই। আম্মার গায়ে হাত উঠলে সেই হাত ভেঙে গুড়ো করতে দ্বিতীয়বার সে ভাববে না।’কথাটা বলে এক মুহূর্ত

দাঁড়াল না অন্তু। সামনে থাকা ছোট্ট টোলটা লাথি দিয়ে প্রচন্ড শব্দ তুলে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। আনিসুল সাহেব হতভম্ব চোখে ছেলের যাওয়ার দিকে চেয়ে আছে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। ছেলের এমন রূপ দেখে বাবা হিসেবে ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে তার। এই দীর্ঘ জীবনে সংসারের পেছনে দেওয়া শত শত বলিদান চোখের সামনে

ভাসছে তার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রক্ত পানি করে কাদের জন্য করেছেন এসব? কাদের জন্য করেছেন এতো ত্যাগ? এতো পরিশ্রম? আনিসুল সাহেবের চোখ ফেঁটে জল গড়াতে চায়। কিন্তু অনেক বছরের শক্তপোক্ত বেড়িবাঁধ পেরোনোর সাহস তাদের হয় না। জল গড়ায় না। চোখ দুটো রক্তিম থেকে রক্তিম হয়ে উঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বড় ভাইয়ের ধ্বংসলীলা দেখে ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে বাবার দিকে চেয়ে আছে অয়ন। বাবা নিশ্চয় ভাইয়ের রাগ মেটাতে তাকেই বেদারম মারবে এখন? মাকেও কি মারবে? অয়নের পিকনিকে যাওয়াটাও বুঝি ক্যান্সেল হবে। এতোকিছুর পর বাবার কাছে টাকা চাওয়ার সাহস কি অয়নের হবে? সাহস দেখিয়ে বাবাকে বললেই কি বাবা দিবে? অয়ন জানে,

দিবে না। কখনোই দিবে না। অয়নের কান্না পেয়ে যাচ্ছে। ভাইয়ের প্রতি তার প্রচন্ড অভিমান হচ্ছে। রাগ হচ্ছে বাবার প্রতিও। বাবা কেন মারল মাকে?

প্রচন্ড গরম। গাছ-গাছালিতে ঝকঝকে, উত্তপ্ত রোদ। রোদের তাপে নুইয়ে পড়েছে গাছের কচি পাতা। তেতে উঠেছে ঘাস, পিচ ঢালা রাস্তাঘাট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

মানিক মামার চায়ের স্টল। পাশাপাশি দুটো কাঠের বেঞ্চ রেখে বিরস মুখে চা বানাচ্ছেন তিনি। গরমের দুপুরে চায়ের খদ্দর কম। নাদিম দুই বেঞ্চের একটিতে বসে সিগারেট টানছে। কালচে ঠোঁট জোড়ায় জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরে মোহনীয় এক সুর তুলেছে গিটারে। এমন সময় কোথা থেকে ছুঁটে এলো ছোঁয়া। নাদিমের পাশে

ধপ করে বসে পড়ে রুমালে মুখ মুছল। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করার চেষ্টা করে বলল,‘ উফ! এতো রোদ। শরীর জ্বলছে।’

নাদিমের গিটারে ছন্দপতন হলো। চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ তা তুই তোর মাখনের অঙ্গ নিয়া রোইদে বাড়াইছিস কেন? ফ্রিজে ঢুইকা বসে থাকতে পারলি না? শরীর জ্বলছে! বা... খারাপ কথা

আইসা গেছিল মুখে। দূরে গিয়া বস, হারামি।’

ছোঁয়া মুখ ফুলিয়ে তাকাল। ব্যাগ থেকে মিনারেল ওয়াটার বের করে গলা বেজাল। তারপর কৌতূহলী কণ্ঠে বলল,

‘ রঞ্জন কই রে? ক্লাসও তো করেনি আজ।’

‘ রঞ্জন জাহান্নামে গেছে। ডিপার্টমেন্টের ছাঁদ থেকে লাফ দিয়ে

তুইও জাহান্নামে চলে যা বইন। দয়া কর। তোর এই ইস্টাইল মার্কা বাংলা শুনলে মেজাজ খারাপ হইয়া যায় আমার। বালের ইস্টাইল।'

ছোঁয়ার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত মেজাজ খারাপে কান্না পেয়ে যাচ্ছে। নাদিমের এইসব থার্ডক্লাস কথাবার্তা শুনলে গা জ্বালা করে তার। একটা মানুষের মুখের ভাষা এতো অশ্লীল হয় কি করে?

ছোঁয়া রাগে গজগজ করতে করতে বলল,‘ নমু আর নীরুও ভার্সিটি আসেনি আজ। ফাজিলগুলো আমাকে একবার বললেই পারত। এসব তাদের প্রি-প্লেনড। ওরা আসবে না জানলে মরে গেলেও আসতাম না আমি। আর না তোর মতো ফাজিলের সাথে মুখ নাড়তে হতো।’

‘ নাড়স কেন মুখ? আমি কইছি মুখ নাড়তে? তোর কি দুনিয়াতে আর

কোনো কাম নাই বাপ? সবসময় আমার গায়ের লগে ঢলাঢলি করস ক্যান? সরে বস।’

ছোঁয়া এক লাফে সরে বসল। চোখ-মুখ কুঞ্চকে ফেলল বিরক্তিতে,

‘ ছিঃ কথার কি ছিঁড়ি! মাম্মাম ঠিকই বলে, তুই একটা থার্ড গ্রেড ছেলে। আই শুড এবোয়েড ইউ।’

ছোঁয়ার কথায় দাঁত বের করে হাসল নাদিম। লম্বা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার

মাথায় চাটি মারল। সিগারেটে একটা সুখ টান দিয়ে বলল,

‘ ওহে ইংরেজের বাচ্চা বলদা ! প্লিজ, প্লিজ এবোয়েড মি। তোর মতো বলদ আমায় এবোয়েড করলে জানে বাঁচি। তু...’নাদিমের কথা শেষ না হতেই অন্তুর আগমন ঘটল। এসেই কোনোরূপ কথাবার্তা ছাড়া লাথি দিয়ে উল্টে ফেলল কাঠের বেঞ্চি। ছোঁয়া চোখ বড় বড় করে

চেয়ে আছে। নাদিম শান্ত চোখে চেয়ে সিগারেটে শেষ টান দিল। অন্তু রাগে ফুঁসছে। প্রচন্ড রাগে উল্টে পড়া বেঞ্চিতেই ক্রমাগত লাথি দিচ্ছে। নাদিম শান্ত ভঙ্গিতে সিগারেটটা ফেলে পায়ে মাড়িয়ে আগুন নেভাল। ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করল,‘ এই যে লায়ক শাকিব খান? কাহিনী কিতা মামা? এসেই

এ্যাকশন মুভি শুরু কইরা দিছস ক্যারে?’

অন্তুর রাগ কমছে না। বেঞ্চে আরও দুটো লাথি দিয়ে নিজের চুল খামচে ধরল সে। মুখ দিয়ে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বের করে দুই হাতে মাথা চেপে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। অন্তু ছোঁয়ার পাশে বসতেই সরে গিয়ে নাদিমের গা

ঘেঁষে বসল ছোঁয়া। নাদিমের শার্ট খামচে ধরে ফিসফিস করে বলল,

‘ দোস্ত? অন্তুর সাথে কি প্যারানরমাল কিছু ঘটছে নাকি? ভূত-প্রেত টাইপ কিছু? আমার ভয় লাগছে।’

নাদিম রাগে কটমট করে বলল,

‘ আল্লাহ! ছোঁয়াইয়া রে! চড় থাপড়া না খাইতে চাইলে ছাঁড় আমারে।

গরমে মইরা যাইতাছি। তারওপর গায়ে আইসা পড়তাছিস। সর সর....’ ছোঁয়া ভয়ে ভয়ে সরে বসল। নাদিম কপাল কুঁচকে বলল,‘ হইছেটা কি? বাম মাছের মতো লাফাইতেছিস ক্যান?’

অন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ এরা চাইতাছে আমি মরে যাই। আমি মরলে এদের শান্তি। শালার সব কয়টাকে খুন করতে পারলে

শান্তি পাইতাম। ঝঝড়া করে দিল কলিজা।’

নাদিম হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্তর দিকে চেয়ে রইল। ছোঁয়ার চোখে মৃদুমন্দ ভয়।

ঘড়ির কাটা তিনটা ছুঁই ছুঁই। রবীন্দ্র সরোবরে লেকের পাশে বসে আছে আরফান-নম্রতা। দু’জনেই নিশ্চুপ। এই নিশ্চুপ অনুভূতিগুলোই কত প্রবল, কত তীব্র। নিঃশ্বাসের

শব্দগুলো যেন একেকটা বার্তা। অপ্রকাশিত কিছু অভিমান। বিকালের তেরছা আলো এসে পড়ছে লেকের জলে। চিকচিক করছে টলটলে পানি। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরফান।‘ গত আড়াই ঘন্টা থেকে নিশ্চুপ বসে আছি আমরা।’

নম্রতা তাকাল। গরম আর ঘামে কাজলের রেখা খানিক ল্যাপ্টে

গিয়েছে চোখে। ঘর্মাক্ত, তেলতেলে মুখটা বড্ড স্নিগ্ধ লাগছে। আরফান অভিমানী চোখদুটোতে নিষ্পলক চেয়ে থেকে ঢোক গিলল। নম্রতার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটতেই চোখদুটো গিয়ে আটকাল পাতলা ঠোঁটজোড়াতে।

‘ আপনি সবসময় টাইম টু টাইম কাজ করেন? এক মিনিট এপাশ-ওপাশ নয় কাট টু কাট?’

আরফান নম্রতার ঠোঁট থেকে চোখ সরিয়ে চোখের দিকে তাকাল।

‘ আমি অযথা সময় নষ্ট করতে পারি না। ছোটবেলার অভ্যাস।’

‘ হুটহাট হারিয়ে যাওয়াও হয়ত কিছু মানুষের ছোটবেলার অভ্যাস।’

আরফান ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,‘ আপনি কথায় কথায় এতো ফোঁড়ন কাটেন কেন বলুন তো?’

‘ সত্য বললে মানুষ ফোঁড়নই ভাবে।’

কথাটি বলে মুখ ঘুরাল নম্রতা। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল,

‘ আমাদের কী আর কোনো কথা নেই?’

‘ আপনার পুরো নাম কি? আরফান-নিষ্প্রভ ব্যাপারটা কী? ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?’

আরফান হাসল। নম্রতার রক্তিম মুখটির দিকে চেয়ে বলল,

‘ ছদ্মবেশ কোথায়? আরফান-নিষ্প্রভ দুটোই আমার নাম।’

‘ তবে নিশাদ ভাইয়া জানে না কেন এই নাম? উনি তো আপনার ভালো বন্ধু, না?’

‘ নিশাদ আমার কলেজের বন্ধু। তাছাড়া, স্কুল-কলেজ বা ভার্সিটিতে কাউকেই জানানো হয়নি এই নাম।

নিষ্প্রভ নামটা আমার ব্যক্তিগত। এই নামে ডাকার অধিকার শুধুই কিছু ব্যক্তিগত মানুষদের।“ মানুষ আবার ব্যক্তিগত হয় নাকি?’

অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করল নম্রতা।

আরফানের হাস্যোজ্জ্বল উত্তর,

‘ আপনার ‘সে’ যদি ব্যক্তিগত হতে পারে তাহলে মানুষ ব্যক্তিগত কেন হবে না? আপনি কোনোভাবে

আপনার ‘সে’ কে পশুশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করে ফেলেননি তো?’

আরফানের কথায় হেসে ফেলল নম্রতা। আরফানও হাসল। লেকের জলে দৃষ্টি রেখে হঠাৎই প্রশ্ন করল সে,

‘ আপনি নিষাদকে ওভাবে খুঁজছিলেন কেন? আমি তো ভেবেছিলাম ওর সাথে আপনার বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে।’

‘ সেটা আমি বলব না। পারলে নিজে খুঁজে বের করুন নয়তো কৌতূহল দমন করুন।’

আরফান হেসে বলল,‘ আপনার বিষয়ে কৌতূহল দিনকে দিন বাড়ছে বৈ কমছে না। এই অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল দমন করাও যাচ্ছে না। এতো এতো কৌতূহল মাথায় নিয়ে আজ রাত থেকে আমার ঘুম হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

নম্রতা সন্দিহান কণ্ঠে বললেন,

‘ তার আগে বলুন আপনার প্রিয় মানুষটি কে? কার জন্য অতো উতলা হয়ে উঠতেন আপনি? পাঁচটা বাজতেই কার কাছে ছুটে যেতেন? বিয়ে টিয়ে করে ফেলেননি তো?’

আরফানের গম্ভীর উত্তর,

‘ বিয়ে করে ফেললে কি করবেন?’নম্রতা জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ নীরব দৃষ্টি

বিনিময়ের পর হঠাৎই অদ্ভুত এক কাজ করে বসল নম্রতা। আরফানের পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরে নিজের দিকে টেনে নিল। শক্ত কণ্ঠে বলল,
‘ খুন করে ফেলব। প্রেম করবেন একজনের সাথে আর বিয়ে অন্যজনকে? এতো সহজ?’
নম্রতার হঠাৎ আক্রমনে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল আরফান। চোখ ঘুরিয়ে একবার নম্রতার হাতের

দিকে তাকাল। তারপর চোখদুটো নিবদ্ধ করল নম্রতার ক্ষ্যাপাটে মুখে। নম্রতার টানা টানা অভিমানী চোখ। ছোট্ট, সুন্দর মুখটা এতোটা কাছে পেয়ে বুকের ভেতরে অবাধ্য, তরল এক চাওয়া উঁকি দিয়ে গেল। খুবই সন্তপর্ণে চোখ নামিয়ে নম্রতার ঠোঁটের দিকে তাকাল সে। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল,

‘ তাহলে আপনি এতো নাচানাচি করে বিয়ের শপিং করলেন যে? একজনকে প্রেমে ডুবিয়ে অন্যজনকে বিয়ে করার এতো তাড়া?’আরফানের কথায়, চাহনীতে কি ছিল জানা নেই। তবে, হঠাৎই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল নম্রতা। আরফানের কলার ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল সে। ঠোঁটে ঝুলতে লাগল অপ্রতিরোধ্য লাজুক হাসি।

আরফানও হাসল নিঃশব্দে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেলীফুলের মালা বের করে বলল,

‘ পাঁচটা থেকে সাতটা সময়টুকু শ্যামলতা আর আমার একান্ত কিছু সময়। ওই সময়টুকুতে, এমনই কোনো একটা বেঞ্চে বেলীফুলের মালা হাতে বসে থাকতাম আমি। শ্যামলতা তখন খুব আয়োজন করে আমার কল্পনায় আসত। পাশে

বসত। পরনে থাকত সাদা-লাল শাড়ি। খোলা চুল। চোখে কাজল। শ্যামলতা নিরন্তর গল্প করত। হাসত। অভিমান করত। আমি তাকে ফুল দিতেই সে খুশিতে ঝুমঝুম করে ফুল নিয়ে চুলে বাঁধত। কখনও শহরের অলিতে গলিতে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে আমার দস্যি শ্যামলতাটাকে খুঁজে বেড়াতাম। কখনও বা গ্রন্থাগারের ধূলিমাখা বইগুলোতে

চেয়ে থাকতাম নির্নিমেষ। আবার কখনও শ্যামলতার বেলীফুলের রাজ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতাম। উল্টেপাল্টে দেখতাম তার ছেলেমানুষী প্রেমপত্র।’এটুকু বলে থামল আরফান। নম্রতার দিকে ফিরে তাকিয়ে চঞ্চল কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি কি জানেন? আমি শ্যামলতাকে বিয়ে করে ফেলেছি, আমার কল্পনায়। কল্পনায় সে আমার

স্ত্রী।বড় অবাধ্য স্ত্রী। সেদিন আপনি জড়িয়ে ধরার পর থেকে বউ হারিয়ে বিপত্নীক হয়ে গিয়েছি আমি। বউ কল্পনায় হানা দিচ্ছে না। আমার পাশে বসছে না। তার জায়গায় সদর্পে বসে আছেন আপনি। আপনিও বড় অবাধ্য। আর এই বেলীফুলের মালাটাও বড় অবাধ্য। অবাধ্য রমণীটির চুল ছাড়া

অন্যকারো চুলে বাঁধা পড়তে তার খুব বেশিই আপত্তি।'

নম্রতা উঠে দাঁড়াল। আরফানের হাতে চিঠির খামটা ধরিয়ে দিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,' বেলীফুলের মালাকে বলে দিবেন, এই অবাধ্য রমণী তাকে গ্রহণ করতে পারছে না। অবাধ্য রমণীর রাজ্যে তীব্র অবরোধ চলছে। যদি কখনও অবরোধ ভেঙে জোয়ার আসে। অভিমান ভেঙেচুড়ে

লজ্জা আসে। সেদিন ভেবে দেখা যাবে। ততদিন অপেক্ষা চলুক। বেলীফুলের আজ তীব্র অপেক্ষার দিন।’কথাটা বলে ফেরার পথে পা বাড়াল নম্রতা। দুয়েক পা এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে হাত আঁকড়ে ধরল কেউ। নম্রতা ফিরে তাকানোর আগেই ঘাড়ের কাছে পেল গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ। নম্রতার শরীরে কাঁপুনি দিয়ে উঠল। নিঃশ্বাস হলো

ঘন। কেউ একজন খুব যত্ন করে মালা জড়াল তার চুলে। হাতটা ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল,

‘ অবাধ্য বেলীফুলের অত ধৈর্য্য নেই অবাধ্য সুন্দরী। অত অপেক্ষা তার সইবে না।’

নম্রতা এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। এই লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তার নিশ্চিত মৃত্যু! অনুভূতিময় ভয়ানক

মৃত্যু!আজ সপ্তাহ খানেক পর মৌশিকে পড়াতে এসেছে নাদিম। গোটা সপ্তাহ নিরুদ্দেশ থাকার পরও তাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করা হয়নি। কেন প্রশ্ন করা হয়নি তা ঠিক ধরতে পারছে না নাদিম। ধরার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা চালাচ্ছে এমনটাও নয়। তার চোখ-মুখে বিন্দুমাত্র চিন্তা বা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। মৌশি মাথা নিচু করে ইংরেজি ট্রান্সলেশন

করছে। গায়ে কটকটে লাল কামিজ। রোজকার চেহারাটা আজ একটু বেশিই সতেজ। চোখে-মুখে হাসি হাসি ভাব। মৌশি লেখা থামিয়ে মাথা উঁচিয়ে তাকাল। চোখে তার প্রগাঢ় চঞ্চলতা। নাদিম ভ্রু কুঁচকে বলল,‘ কি ব্যাপার?’

মৌশি হাসল। সাথে সাথেই যেন বাম গালের এক চিমটি মাংস অদৃশ্য হলো কোথাও। গালের মাঝ বরাবর

ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি হলো। ভারি মিষ্টি দেখাল সেই মুখ। পাতলা ঠোঁট নেড়ে শুধাল,

‘ আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করবেন স্যার? প্লিজ?’

মৌশির আশাভরা সকৌতুক চোখের দিকে তাকিয়ে খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল নাদিম,

‘ না।’

মৌশির মুখটা মুহূর্তেই চুপসে গেল। এই লোকটা ভারি অভদ্র। বিন্দুমাত্র ম্যানার্স নেই। মুখের ওপর কথা বলতে দুই সেকেন্ডও ভাবতে হয় না তার।

‘ না শুনেই না করে দিলেন কেন? এভাবে কাউকে না করতে নেই। মিছে মিছেও তো রাজি হতে পারতেন। আমি নিশ্চয় ভয়াবহ কিছু চাইতাম না।’

মৌশির কণ্ঠে তরল অভিমান। নাদিম মৃদু হেসে বলল,‘ আমি অযথা মিথ্যা বলি না মৌশি।’

‘ তাই বলে এভাবে অপমান করবেন?’

‘ অপমান করলাম নাকি?’

‘ করলেনই তো। এটলিস্ট ইচ্ছেটা জিগ্যেস করতে পারতেন!’

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ তোমার ইচ্ছে শোনার ইচ্ছে আমার হয়নি বলেই জিগ্যেস করিনি। নিজের ইচ্ছেকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্যের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেওয়া আমার পছন্দ নয়।’

মৌশির মুখের অন্ধকার কেটে গেল। বই খাতা গুছিয়ে রেখে উৎসাহী কণ্ঠে বলল,

‘ আজ পড়ব না। শিখব।’

নাদিম ভ্রু কুঁচকাল,‘ কী শিখবে? বই-খাতা বন্ধ করে রাখলে শিখবে কিভাবে?’

নাদিমের প্রশ্নে খুশি হয়ে গেল মৌশি। উজ্জ্বল মুখে বলল,

‘ বই-খাতা দিয়ে হবে না। প্রেকটিক্যালি শিখব।’

‘ মানে?’

মৌশি দ্রুত হাতে টেবিলের ড্রয়ার খুলল। ড্রয়ার থেকে সাদা কাগজে

মোড়ানো একটি সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল। মৌশির ড্রয়ারে সিগারেট আর দেশলাই দেখে অবাক হলো নাদিম। কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল মৌশির অদ্ভুত সব কর্মকান্ড। মৌশি একটা সিগারেট বের করে উল্টো করে মুখে দিল। সিগারেটের প্যাকেটটা নাদিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ সিগারেট খাওয়া শিখব। নিবেন স্যার? আপনার পছন্দের সিগারেট। বেনসন। এক প্যাকেটে দুইশো আশি টাকা নিয়েছে। দামটা ঠিক আছে?’

নাদিম সিগারেট নিলো না। তবে জবাব দিল,‘ হ্যাঁ। দাম ঠিক আছে।’

‘ আমার হাতে সিগারেট দেখে অবাক হচ্ছেন না,স্যার?’

‘ একদমই হচ্ছি না তা নয়। তবে যতটুকু হয়েছি ততটুকুও হওয়া উচিত হয়নি। মেয়েদের হাতে সিগারেট থাকাটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। অনেক মেয়েই সিগারেট খায়।’

মৌশি একটু অসন্তুষ্ট হলো। মুখ থেকে সিগারেটটা সরিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ সব মেয়ের সাথে আমার তুলনা করবেন না। আমি সব মেয়েদের মতো নই। সিগারেটের প্যাকেটটা আমি আপনার জন্য কিনেছি। আপনি কী আমার সামনে বসে একটা সিগারেট খাবেন?’

‘ না।’মৌশির চোয়াল শক্ত হলো। নাদিমের মুখে স্থির দৃষ্টি রেখে বলল,

‘ আপনার জন্য সিগারেটের প্যাকেট কিনেছি বলে কী আপনার মনে হচ্ছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি?’

নাদিম হাসল। মৌশি কড়া কণ্ঠে জবাব দিল,

‘ হাসবেন না। আমি আপনার প্রেমে পড়েছি এমন ভুল ধারণাও রাখবেন না। সেদিন আপনাকে সিগারেট খেতে দেখে হঠাৎই সিগারেট কিনতে মন চাইল। আমি এমনই

একটি প্যাকেট ড্রাইভারকেও গিফ্ট করেছি। এটা বড় কোনো ব্যাপার না।’

মৌশির রূঢ় কথার কোনটিই নাদিমকে তীব্র আঘাত হানল বলে মনে হলো না। মৌশি বিরক্ত চোখে চেয়ে রইল। নাদিম ফোন হাতে উঠে দাঁড়াল। অত্যন্ত দায়সারা কণ্ঠে বলল,‘ তুমি নিজেই নিজেকে ডিসক্লোজ করছ মৌশি। তুমি কাকে

কী গিফ্ট দিচ্ছ আর কাকে দিচ্ছ না তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে দামী গাড়ি নিয়ে ছায়ার মতো কাকে লক্ষ্য করে বেড়াচ্ছ তাতেও আমার আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ খুবই সীমিত। আমার সীমিত আগ্রহে তুমি বা তুমি সম্পর্কিত কোনো ব্যাপার নেই।’

মৌশি মাথা নিচু করে ফেলল। খুবই সুনিপুণভাবে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। দূর থেকে নাদিমের আড্ডামহলে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার ব্যাপারটা খুবই নগ্নভাবে জেনে গিয়েছে নাদিম। খেয়ালও করেছে। লজ্জায় আর অপমানে ভেতরটা টলমল করছে তার। মৌশির গলা দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। বহু কষ্টে বলল,

‘ আপনি কাল আসবেন না,স্যার?’ নাদিম তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল, ‘ আমি অভদ্র মেয়েদের ঠিক সহ্য করতে পারি না মৌশি।’মৌশির টলমলে চোখদুটোতে এবার বর্ষণ হলো। আত্মসম্মানের এমন রূঢ় বলিদানে টলমল করছে তার বুক। প্রচন্ড রাগে জ্বলে যাচ্ছে শরীর। নাদিমের এই মুখের ওপর কথা বলে দেওয়ার স্বভাবটাই একসময় অসহ্য

লাগত মৌশির। রাগ লাগত, বিরক্ত লাগত। দূর্ভাগ্যবশত, আজ নাদিমের এই স্বভাবটার জন্যই তাকে এতো ভালোবাসে মৌশি! নাদিম সব সময় কেন এতো অবহেলা করে তাকে? দুই টাকার দামও দেয় না। মৌশি কী এতোটাই তুচ্ছ? টাকা-পয়সা, সৌন্দর্য্য কোনো কিছুতেই পিছিয়ে নেই মৌশি। তবুও কেন এতো বিরাগ নাদিমের? এইযে মৌশি

লুকিয়ে চুরিয়ে নাদিমকে দেখে। তার সিগারেট খাওয়ার মতো তুচ্ছ স্বভাবটাতেও ভাবনাতীত মুগ্ধ হয়। মেয়ে বান্ধবীরা তাকে একটুখানি ছুঁয়ে দিলেই কেঁদে ভাসায়, এসব কি চোখে পড়ে না নাদিমের? মৌশির মতো অতো আয়োজন করে কেউ কী ভালোবাসতে পারবে তাকে? তবু নাদিম উদাসীন। আচ্ছা? আর কী চাই নাদিম? নাদিমের চাহিদাটা

মৌশির মাঝেই কেন নেই?আধঘন্টা হলো হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছে আরফান। গায়ে তার হাজার টন ক্লান্তি। গত তিনদিন ভয়ানক ব্যস্ততায় সময় কেটেছে তার। নম্রতার সাথে যোগাযোগটাও হয়ে উঠেনি। যোগাযোগটা মূলত আরফান ইচ্ছে করেই করেনি। আরফান নম্রতাকে সময় দিতে চায়। একটু সময় তার নিজেরও প্রয়োজন।

একটা সম্পর্ক এগিয়ে নিতে যে মানসিক বোঝাপড়াটা দরকার তা এখনও গড়ে উঠেনি তাদের। আরফান বাইরের পোশাক গাঁয়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। পুরো ঘরে বেলীফুলের সুবাস। জানালার ভারী পর্দা ভেদ করে আসছে শরতের শিরশিরে বাতাস। চাঁদের আলোয় চকচক করছে থোকা থোকা বেলীফুলের রাজ্য। সেই রাজ্যে

মুহূর্তেই উদয় হলো শ্যামলতা। সেই লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। আলতা রাঙা খালি পায়ে পায়েল বাজছে। বেলীফুলের সৌরভে ভরে আছে তার শরীর। দু'চোখে তীব্র অভিমান নিয়ে চিঠির কথাগুলোই আওড়ে চলেছে পাতলা, সুন্দর ঠোঁট নেড়ে,"শুনো, আজ আমার মনটা খুব খারাপ। এই মনটা খারাপ ছিল দীর্ঘ চার বছর। প্রগাঢ় এক মন খারাপ নিয়েই

কিশোরী থেকে যুবতী হয়েছি। নিতান্তই বাচ্চা থেকে পরিপূর্ণ নারী হয়েছি। তুমি প্রশ্ন করেছিলে, তুমি হারিয়ে গিয়েছ নাকি হারিয়ে ফেলেছ আমায়? আমি প্রশ্ন করতে চাই, তুমি কি ভালোবেসেছিলে নাকি জাদু করেছিলে আমায়? না দেখে, না শুনে এক কাল্পনিক পুরুষের প্রতি এই প্রগাঢ় ভালোবাসা কি করে তৈরি হয়েছিল, জানি না। কি করে তাকে

পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলাম, জানি না। হয়ত কিশোরী ছিলাম বলেই। তুমি একবার বলেছিলে, কিশোরীরা খুব যত্ন করে চিঠি লিখতে পারে। যুবতীদের সেই গুণ থাকে না। আজ পরিপূর্ণ যুবতী রূপে অধিষ্ঠিত হয়ে বুঝতে পারছি, সেই গুণটা আসলেই যুবতীদের থাকে না। থাকতে নেই। তোমার নামে এই চিঠিটা আমি

লিখতে পারছি না। কালো অন্ধকার শব্দ ভান্ডারে ছোট্ট ছোট্ট ভালোবাসাময় শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বারবার আঁটকে যাচ্ছে কলম। ইচ্ছে হচ্ছে নীলাভ এই কাগজটিতে মন খারাপের দীর্ঘ গল্পটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই। সেই ভয়ানক মন খারাপের সাথে তোমার অস্তিত্ব যে কতটা প্রগাঢ় ছিল তা তুমি দেখো। একটিবারের জন্য হলেও চমকে

উঠো। উপলব্ধি করো, তুমি বড় নিষ্ঠুর।এই চারবছরে অনেক বদলেছি আমি। হারিয়েছি আমার চঞ্চলতা। হারিয়েছি এক সমুদ্দুর চোখের জল। এতোকিছু হারিয়েছি শুধু তোমার জন্য। কতো কতো প্রশ্নমাখা চিঠি জমিয়েছি শুধু তোমার নামে। সব কয়টার উত্তর চাই আমার। প্রশ্নমাখা চিঠিগুলো আকাশে উড়িয়ে আমাকে শাপমুক্ত করো

প্লিজ। এই বন্দিনী রাজকন্যাকে শেকলমুক্ত করে অনুভূতির সাগরে ভাসিয়ে দাও। আমি সত্যিই ভাসতে চাই। শরতের মেঘের মতোই উড়তে চাই। আমার বড্ড দুঃখ বুঝলে? আমি খুব দুঃখী।গত চারবছর, চার হাজার তিনশো আশিটি রাত শুধু তোমায় দেওয়া শাস্তির কথা ভেবেই কাটিয়েছি আমি। কতটা দুঃখ তোমায় দেব বলে জমিয়ে

রেখেছিলাম,জানো? কিন্তু তুমি যখন সত্যিই এলে তখন কেমন অসহায় হয়ে পড়লাম দেখো! কিভাবে এতো দুর্বল হয়ে পড়লাম আমি? আমি তোমাকে ক্ষমা করতে চাই না। কিন্তু, এই না চাওয়াটা আমার কথা শুনছে না। তোমাকে তীব্র দুঃখ দিতে চেয়েও পারছি না? বড় দুঃখ হচ্ছে আমার। এই দুঃখ কী করে তাড়াই বলো?’

তোমার শ্যামলতা”

পাশ থেকে খিলখিল হাসির শব্দে ভাবনা কাটে আরফানের। চোখ মেলে পাশে তাকায়। আরফানের পাশেই অর্ধেক শরীর বিছানার বাইরে ঝুলিয়ে শুয়ে আছে নিদ্রা। খিলখিল করে নিরন্তর হেসে চলেছে। হাসির দাপটে তার শরীর কাঁপছে। আরফান নিজেও হাসল।

উঠে বসতে বসতে বলল,‘ হাসছ কেন?’

নিদ্রা উঠল। বিছানায় পা মুড়ে বেশ আরাম করে বসে বলল,

‘ তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সাথে কথা বলছিলে? খুবই অড টাইপ কথা বলছিলে। আমি শুনে ফেলেছি।’

‘ অড টাইপ? কখনো নয়। আমি খুবই মিষ্টি একটা মেয়ের সাথে কথা বলছিলাম। মিষ্টি মেয়েদের সাথে

মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হয়। আমি নিশ্চয় মিষ্টি কোনো কথা বলেছি। তুমি মিথ্যা বলছ।’

নিদ্রা চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ মিষ্টি মেয়ে? ও মাই গড! হু ইজ দিজ সুইট গার্ল? তুমি কী প্রেমে পড়েছ?’

আরফান উঠে দাঁড়াল। জানালার পর্দাটা পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে ভারি

নিশ্বাস নিল। রহস্যময়ী হেসে বলল,‘ অনেকটাই।’

নিদ্রা লাফিয়ে উঠে বলল,

‘ কি বলছ? কে সেই মেয়ে?’

‘ তুমি তাকে চেনো।’

নিদ্রা ভাবে। বেশ কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করে লাফিয়ে উঠে বলল,

‘ ও মাই গড! ও মাই গড! ওই ছুড়াছুঁড়ি মেয়েটা? তুমি ওই ছুঁড়াছুঁড়ি

মেয়েটার প্রেমে পড়েছ? সাংঘাতিক।

‘

নিদ্রার এমন অদ্ভুত সম্বোধনে হেসে ফেলল আরফান।

‘ ওর নাম ছুঁড়াছুঁড়ি নয়। ওর নাম শ্যামলতা।’

নিদ্রা অবাক হয়ে বলল,

‘ শ্যামলতা! বেশ মিষ্টি নাম তো। শ্যামলতাও কারো নাম হয়?’

‘ হ্যাঁ হয়।’

নিদ্রা নাম নিয়ে খুব একটা ঘাটাঘাটি করল না। আপ্লুত কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি তবে বিয়ে করছ?’

‘ মনে হয়।”‘ তার মানে আমি বুড়ি হওয়ার আগেই হ্যান্ডসাম একটা বর পেয়ে যাচ্ছি?’

আরফান হেসে ফেলল। নিদ্রা খুশি হয়ে মায়ের কাছে ছুটলো। তাকে দূর্দান্ত এক খবর দিতে হবে। এখনই এবং এখনই দিতে হবে। আরফান

বাইরের কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হলো। তারপর ছাঁদের মাঝ বরাবর বেলীফুলের রাজ্যে চেয়ার টেনে বসল। ছাঁদের সব লাইট অফ করে পুরাতন এক হারিকেন জ্বালাল। নম্রতা চিঠিতে একবার বলেছিল, তার ছোট্ট ঘরে লণ্ঠন থাকবে। আরফান বহু কসরত করে এই প্রাচীন লণ্ঠন জোগার করেছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। আকাশে হলদেটে

চাঁদ। চারদিকে সাদা বেলীফুলের রাজত্ব। তার মাঝে লন্ঠনের আলোয় একেলা এক যুবা প্রিয়তমাকে চিঠি লিখছে। শরতের শিরশিরে হাওয়ায় মৃদু মৃদু উড়ছে যুবকের কপালে পড়ে থাকা চুল। বেলীফুলের রাজ্যেও হচ্ছে আনন্দময় হেলদোল।এক টুকরো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে নম্রতা। মেজাজ তার চূড়ান্ত খারাপ। এই নিষ্প্রভ নামক

ছেলেটিকে একদম দেখে নিবে সে। পেয়েছেটা কি? নম্রতার প্রতি বিন্দুমাত্র টান আছে তার? কই? নম্রতা তো খুঁজে পায় না। তিনদিন যাবৎ কোনো যোগাযোগ নেই অথচ দেখা হলে গদগদ সংলাপ? আরেকবার শুধু আসুক কাছে। ধাক্কা দিয়ে যদি মেইনহলে না ফেলেছে তো তার নাম নম্রতা না। অভদ্র একটা। নম্রতা এবার সত্যি সত্যি

বিয়ে করে ফেলবে। শুধু বিয়ে করেই সে শান্ত হবে না। অতি শীঘ্রই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে আরফানের হাসপাতালেই ডেলিভারি করাবে। ভয়ানক প্রতিশোধ তুলবে সে। এতো সহজে ছাড়বে না। কক্ষনো না। নম্রতার ভাবনার মাঝেই পেছন থেকে ডেকে উঠল নীরা,

‘ শেষ হলো? চল।’নীরার মুখ থমথমে। সকাল থেকেই কেমন

গম্ভীরভাবে চলাচল করছে সে। বেশি কথা বলছে না। নম্রতা বুঝেছে কিছু হয়েছে। কিন্তু কী হয়েছে ধরতে পারছে না। নম্রতা তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সম্মতি জানাল, তার শেষ। নীরা বিরস মুখে বেরিয়ে পড়ল। চারদিনেই কেমন বিধস্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটির মুখ। সবসময় সেজেগুজে থাকা মেয়েটি ঠিকমতো চুল পর্যন্ত আচঁড়াচ্ছে না। নম্রতার

কষ্ট হয়। ভেতরে কোথায় যেন চিনচিনে ব্যথা করে উঠে। এই মেয়েটার জন্য যদি একটু কিছু করতে পারত সে! ভার্সিটিতে পৌঁছে ডিপার্টমেন্টের সামনে আসতেই একরকম দৌঁড়ে এলো একটা হ্যাংলা পাতলা ছেলে। নম্রতা-নীরা প্রথম দফায় চিনতে না পারলেও পরে চিনল। লোকটি ডাক্তার আরফানের এসিস্ট্যান্ট গুছের

ছেলেটি। নম্রতা অবাক হয়ে বলল,‘ আপনি? এখানে?’

ছেলেটি বামহাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে একটা বই এগিয়ে দিল। সাইকোলজির উপর লেখা মোটা ইংরেজি একটি বই। নম্রতা হাত বাড়িয়ে বইটি নিল। আগের থেকেও অবাক হয়ে বলল,

‘ এটা কী?’

‘ স্যার দিয়েছে, আরফান স্যার। বইটা নাকি ফেলে এসেছিলেন আপনি? খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমায় পাঠাল।’ডাহা মিথ্যা কথা। নম্রতা কখনোই কোনো বই ফেলে আসেনি। এই ডাক্তার খুব পাজি। নির্ঘাত কোনো কান্ড ঘটিয়েছে এই বইয়ে? কিন্তু সত্যটাও মুখ ফুটে বলল না নম্রতা। ঠোঁটে ভদ্রতার হাসি ফুটিয়ে ধন্যবাদ জানাল। লোকটি

বিদায় নিতেই অন্যরকম এক অনুভূতিতে বুক ধরফর করে উঠল তার। অভ্যাসবশত বইয়ের মলাটের নিচে হাত দিতেই পেয়ে গেল লেফাফায় মোড়া চিরকুট। নম্রতার উত্তেজনা এবার দ্বিগুণ হলো। প্রথম চিঠি পাওয়ার মতো কাঁপতে লাগল হাত-পা। নম্রতার সেই কাঁপুনি দীর্ঘস্থায়ী হলো না। আকস্মিক এক ঘটনায় কেটে গেল উত্তেজনা আর

তীব্র অনুভূতি। অন্তু নীরাকে হাত চেপে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে নীরাকে? নম্রতা চিঠি ভুলে ওদের পেছনে দৌঁড় লাগাল। কিন্তু মাঝপথেই ঘটে গেল এক অঘটন। নম্রতা কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই সটান চড় পড়ল অন্তুর গালে।চিঠি হাতে নম্রতার মোহাচ্ছন্ন অবস্থাতেই অন্তু এসে দাঁড়াল পাশে।

চোখদুটোতে রাত জাগার ক্লান্তি। নীরা তাকে দেখেও দেখল না।
‘ তোর সাথে কথা আছে নীরা। একটু এদিকে আয়।’
নীরা অন্যদিকে তাকিয়ে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল। অন্ত চোয়াল শক্ত করে বলল,
‘ আমি তোর সাথে কথা বলছি নীরা।’নীরা এবারও উত্তর দিল না। তাকাল না পর্যন্ত। অন্তর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। প্রতি পদে পদে

নিজেকে ছোট করতে করতে এবার সে ক্লান্ত। অন্ত মুখ ফুলিয়ে শ্বাস টেনে নীরার ডানহাত ধরে হেঁচকা টানে সামনের দিকে পা বাড়াল। অন্তর এমন কাজে মোহভঙ্গ হলো নম্রতার। চিঠি আর বইটা ব্যাগে পুড়ে নীরাদের পেছনে ছুঁটল। নীরদের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই বামহাতে অন্তর গালে কষে চড় বসাল নীরা। অন্ত থমকাল।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য পা আটকে গেল নম্রতার। হতভম্ব চোখে নীরার দিকে তাকিয়ে থেকে দৌঁড়ে গিয়ে ওদের পেছন দাঁড়াল। চোখে-মুখে তার আতঙ্ক। অন্তুর কালো মুখ প্রচন্ড রাগে আরও কালো হয়ে উঠল। নীরার ডানহাতের কব্জিটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল,

‘ সমস্যা কী তোর? কথায় কথায় হাত চলার কারণ কী? কিছু বলছি

না মানে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবি? দোষ আমি করেছি, মানছি। তুই দোষ করিসনি? আমার জীবনটা নরক থেকেও জঘন্য করে তুলেছিস। তোর তো এই একটাই দেমাক, কেন তোকে ভালোবাসলাম? আরেহ! ভালোবাসাটা যদি নিজের হাতে থাকত তাহলে তোকে ভালোবাসার প্রশ্নই আসে না। না পারছি ভালোবাসাতে, না পারছি

ভুলতে। আই জাস্ট হেইট ইউ!’শেষের কথাটা চেঁচিয়ে বলল অন্তু। নম্রতা অসহায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। ডিপার্টমেন্টের জুনিয়ররা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। যাদের মধ্যে এতো ভালো বন্ডিং তাদের আজ এই পরিণতি? কৌতূহল তো থাকবেই। নম্রতা নীরার বামহাতের কনুইয়ে হালকা স্পর্শ করে বলল,

‘ অন্তু যখন কথা বলতে চাইছে তখন কথা বললে সমস্যা কী? নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে কী লাভ? চল অন্য কোথাও গিয়ে বসি, সবাই দেখছে। অন্তু প্লিজ দোস্ত, রাগারাগি করিস না।’

অন্তু চোখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। ঠিক তখনই আয়েশী চালে পাশে এসে দাঁড়াল নাদিম। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ সবাই চোখ-মুখ কালা কইরা দাঁড়ায় আছিস কেন? সবাই চাইয়া আছে, নাটক দেখাইতাছিস নাকি? কি হইছে?’

নম্রতা চোখের ইশারায় কিছু বোঝাল। নীরা কাঠ কাঠ কণ্ঠে বলল,‘ আমি কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নই। কোনো জঘন্য মানসিকতার মানুষের সাথে তো কখনোই নয়।’

নীরার কথাটা শেষ হতেই সজোরে চড় পড়ল তার গালে। নম্রতা দুইহাতে মুখ চেপে হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। নাদিমও বিস্মিত। অন্তুকে সবল হাতে ধাক্কা দিয়ে ধমকে উঠে বলল,

‘ তোর সাহস কেমনে হয় ওর গায়ে হাত তোলার? হিরোগিরি দেখাও?’

অন্তু ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নাদিমের নাক বরাবর ঘুষি

ছুঁড়ল। নাদিমও পিছিয়ে নেই। ডানহাতের পিঠ দিয়ে নাকটা মুছে নিয়ে অন্তুর চোয়াল বরাবর ঘুষি লাগল। নম্রতা ছুঁটে এসে নাদিমের হাত ধরে আটকাল। সেই সুযোগ আরও দু-চার ঘা লাগিয়ে দিল অন্তু। তীব্র ক্ষোভ নিয়ে বলল,

' শুধু আমার দোষটাই দেখিস তোরা? সবার কাছে শুধু আমিই দোষী। জীবনের প্রথম বাপের সাথে

ঝামেলা হয়েছে। বাপের মুখের উপর কথা বলেছি শুধু এই মেয়েটার জন্য। কি করি নাই আমি ওর জন্য? আর এখন আমার মানসিকতা জঘন্য? সব ভুলে গিয়ে, এতো বেয়াদবির পরও শুধুমাত্র আমার কথা ভেবে আব্বায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল বাসায়। আর ও কী করেছে জানিস? মুখের উপর না করে দিয়েছে। এতো দেমাক!’

নাদিম ফুঁসে উঠে বলল,‘ না করছে তো জোর করিস কেন? জোর করে বিয়ে করতে চাস? শালা জচ্চুর।’

অপমানে ভেতরটা থমথমে হয়ে গেল অন্তর। এতোটা অসম্মান। এতোটা অপমানের সম্মুখীন আদৌ কখনও হতে হয়েছিল তাকে? অন্ত তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল,

‘ আই স্পিট অন ইউর ফ্রেন্ডশিপ। কখনও আমার পরিস্থিতিটা বোঝার

চেষ্টা করেছিলি কেউ? এতোগুলো বছর ধরে পুড়ছি তখন তোদের বন্ধুত্ব কই ছিল? বন্ধুত্ব শুধু ওর জন্য? ও মাইয়া বলেই এতো টান? সুন্দরীদের প্রতি গদগদ টান তো থাকবেই!" মুখ সামলায় কথা বল অন্ত।'

' এতোদিন তো কিছুই বলি নাই। কিছু না বলেও দোষী হয়েছি। নতুন করে আর দোষের কী? আব্বায়

আমার জন্য আম্মার গায়ে হাত তুলছে। কতটুকু জ্বলছে আমার ধারণা আছে তোর? শুধু মাত্র এই মেয়েটার জন্য....'

কথাটা বলে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল অন্তু,

' বাপ-মায়ের মর্যাদা তুই কী বুঝবি? বাপ-মায়েরে ঠিকঠাক চিনিসই না তো তুই। একমাত্র বোনের খোঁজ খবর নিস না প্রায় চার বছর।

এখানে এসে মূল্যবোধ শেখাতে আসিস? সুন্দরী মেয়ে বলে মূল্যবোধ! শালা ফ্রড!’

ক্ষুব্ধ নাদিম আবারও তেড়ে এলো। পুরো ভার্সিটির সামনে বন্ধুত্বের এক নগ্ন মৃত্যু ঘটে গেল। নম্রতা মাথায় হাত দিয়ে দু’পা পিছিয়ে দাঁড়াল। টলমলে চোখে দেখতে পেল বন্ধুত্বের মাঝে তীব্র এক কম্পন। ভয়াবহ এক ধস। এই ধসের ক্ষতিপূরণ

করার সাধ্য কী তাদের আছে? দুপুরের কড়া রোদ এসে ঝিলিক দিচ্ছে কাঁচের দরজায়। ভেতরে এয়ার-কন্ডিশনারের মৃদু ঝিমঝিম শব্দ। রঞ্জন-পূজা রেস্টুরেন্টের টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে। পূজার গাঁয়ে বাদামি আর খয়েরীর মিশেলে সালোয়ার-কামিজ। ঘন কালো চুলগুলো হাত খোপা করা। রঞ্জনের

গায়ে কালো পলো শার্ট। চোখে-মুখে বিস্তর হাসি।

‘ মেশমশাই আমার উপর বিরাট চেতে আছেন মনে হলো।’

‘ তো? চেতবে না? তুমি সব সময় ওমন নাস্তিকদের মতো কথাবার্তা বল কেন? ওসব কথা যত বলার আমার সাথে বলবে। বাবার সাথে কেন?’

রঞ্জন হাসে।‘ তোমার প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসা আসছে আজ।’

পূজা ভ্রু কুঁচকায়। এই ছোট্ট কথাটিতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে আবেগে গলে যায়। মুখ টিপে হেসে ভ্রু নাচিয়ে বলে,

‘ কথা এড়াচ্ছ!’

রঞ্জন হুহা করে হেসে উঠল,

‘ আরে ধুর! সত্যিই। ‘তোমাকে ভালোবাসি’ এই কথাটা ভেবেই

প্রচন্ড সুখ সুখ লাগছে। আর মেশমশাইকে এড়ানোর কী আছে? আমি আর মেশমশাই দু'জনেই জানি বিয়ের পর আমাদের শ্বশুর-জামাইয়ের হেব্বি ফাটবে।'

পূজা হেসে ফেলল। গালে হাত দিয়ে রঞ্জনের ফর্সা সুন্দর মুখটির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে উপভোগ করতে লাগল রঞ্জনের প্রাণোচ্ছল সব কথা। পূজাকে এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকতে দেখে চোখ টিপল রঞ্জন। পূজা আবারও হাসল। লজ্জা রাঙা মুখ নিয়ে বলল,‘ তবুও তুমি একটু সামলে চলো। বাবা যদি একবার রেগে যায় তো সর্বনাশ।’

‘ চিন্তা করো না। তোমার বাবা আমায় পাত্র হিসেবে বেশ পছন্দই করেন। তবুও যদি বাগড়া দেয় তাহলে শশুরমশাইকে ডিরেক্ট কিডন্যাপ করে নিব। তারপর

তোমার বাড়ি গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব। তুমি তো আর পালিয়ে বিয়ে করবে না। আমিও পালিয়ে বিয়ে করব না। তাই যারা যারা ভিলেন হবে সব সাময়িক সময়ের জন্য কিডন্যাপ। প্ল্যানটা ভালো না?’

পূজা খিলখিল করে হেসে উঠল। পূজার ডানহাতটা আলতো ছোঁয়ায় নিজের হাতে তুলে নিল রঞ্জন। মাখনের টুকরো ছুঁতে যেমন

সাবধানতা ঠিকই তেমনই সজাগ তার স্পর্শ। পূজাও হাসি হাসি চোখে রঞ্জনের দিকে তাকাল। রঞ্জন গাঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল,‘ আমার মহারাণী কী চায়?’

‘ তোমাকে চাই।’

‘ আমি তো একযুগ আগে থেকেই তোমার নামে দলিল হয়ে আছি মহারাণী। এর বাইরে কি চাও?

আমি তোমাকে স্পেশাল কিছু দিতে চাই। স্পেশাল কিছু চাও।'

পূজা নির্দ্বিধায় উত্তর দিল,

' তোমাকে চাই।'

' তারপর?'

' তোমাকেই চাই।'

' তারপর?'

' তোমাকেই চাই।'

রঞ্জন হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে বলল,' আমি যে সামনের মাসেই তোমার

তুমিকে নিয়ে উড়াল দিচ্ছি, দূর দেশে। কষ্ট হবে না?’

পূজার মিষ্টি মুখটিতে মুহূর্তেই কালো মেঘ হানা দিল। পরমুহূর্তেই হেসে উঠে বলল,

‘ উঁহু। হবে না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। যার অর্থ, আমি তোমার পুরোটাকেই ভালোবাসি। তোমার অভ্যাস, তোমার স্বপ্ন, তোমার ইচ্ছে, তোমার ভালোলাগা,তোমার পরিবার

এবং বন্ধুমহল সব নিয়ে যে রঞ্জনটা তাকেই ভালোবাসি। তুমি ইউএস যাচ্ছ তোমার স্বপ্ন পূরণের জন্য। নিজের স্বপ্ন পূরণ করে যখন আমার কাছে ফিরবে তখন তোমার চোখে থাকবে তৃপ্তি। মনে থাকবে পরিপূর্ণতা। আমি তোমার সেই তৃপ্তিটা দেখতে চাই। তোমার সব স্বপ্ন পূরণে আমি তোমার পাশে থাকতে চাই। তোমার চোখে

চিকচিক করা খুশিটা দেখতে চাই। আহ্! ভেবেই কী শান্তি লাগছে জানো?'রঞ্জন হাসল। চোখদুটোতে ঝলমল করে উঠল মুগ্ধতা। পূজার ধরে রাখা হাতে আলতো চুমু দিয়ে বলল,

' দেটস মাই লেডি! আমায় এতো বুঝো কেন বল তো?'

পূজা হেসে বলল,

‘ তুমি এতো ভালোবাসো কেন বল তো?’

‘ তোমায় যদি আরও অনেক বেশি ভালোবাসতে পারতাম!’

‘ তুমি আমায় যতটা বুঝো, আমিও যদি তোমায় ততটাই বুঝতে পারতাম!’

তারপর নিশ্চুপ,নিস্তব্ধ কিছু সময় চোখে চোখে কথা হয় তাদের। দুজনের চোখেই খেলে যায় একে

অপরের প্রতি সীমাহীন আকুলতা। একটা সময়, ছোট্ট শ্বাস টেনে নীরবতা ভাঙল পূজা,

‘ অর্নাসটা শেষ করে গেলে হতো না?ওখানে গিয়ে মাস্টার্স করে নিতে।’

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ দাভাই এখনই যেতে বলছে। বাবাও রাজি। পাসপোর্ট, ভিসাও হয়ে গিয়েছে। দাভাই সেখানকার

ইউনির্ভার্সিটির ফর্মালিটিসও শেষ করে নিয়েছে প্রায়। হাফ স্কলারশিপ পাচ্ছি। ভালো ভার্সিটি। সুযোগটা লুফে নেওয়াই উচিত।’

এটুকু বলে থামল রঞ্জন। পূজার উৎসাহী চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,‘ বিয়ে করতে চাও?’

‘ কেন? এখন তো বিয়ের কোনো প্ল্যান ছিল না।’

‘ তোমার যদি আমাকে নিয়ে ভয় থেকে থাকে তো...’

‘ আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কোনো সম্পর্কের বাঁধনে টেনে হিঁচড়ে আমার সাথে বেঁধে রাখতে চাই না। তুমি যেমন আমায় উড়তে দিচ্ছ, আমিও তোমায় তেমনই উড়তে দিতে চাই। আমি তোমার পিছুটান নই।’

‘ তবুও। তুমি চাইলে আমি বাসায় জানাতে পারি। পারিবা...’

‘ আমি যেমন পৃথিবী ফেলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমি জানি তুমিও পৃথিবী ফেলে আমার কাছেই ছুটে আসবে। এসব ভেবো না তো। জাস্ট ফোকাস অন ইউর ক্যারিয়ার। আমিও নিজের ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে নিই।’

রঞ্জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পূজার ডানহাতে হালকা চাপ দিয়ে বাঁকা হাসল। বলল,

‘ আমার আবারও তোমাকে ঝাপিয়ে পড়ে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। পাব্লিক রেস্টুরেন্ট বলে পারছি না।’

পূজা কথাটা না-শুনার ভান করে বলল,‘ তুমি যে ইউএস যাচ্ছ। বন্ধুদের জানিয়েছ?’

‘ আজই তো কনফার্ম হলাম। এখনও জানানো হয়নি। ওদের ছেড়ে থাকতে ভীষণ কষ্ট হবে।’

পূজা কিছু বলবে তার আগেই ম্যাসেজ টুন বাজল। নম্রতার পাঠানো ম্যাসেজটা দেখেই কপালে চিন্তার ভাজ পড়ল রঞ্জনের। পূজার দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ জান এখন উঠি? ওখানে একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছে।’প্রচন্ড মন

খারাপ নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা। এই জানালা দিয়ে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। অন্ধকারে ঢাকা নিকশ আকাশ। তার মাঝে ছড়ানো ছিঁটিনো কিছু তারা। তারাগুলোকে মাঝে মাঝে মুক্তোর মতো মনে হয় নম্রতার। একটা একটা করে সুতোয় গেঁথে বিশাল এক মালা মানাতে ইচ্ছে হয়। নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ভার্সিটিতে হয়ে

যাওয়া বড়সড় ঝামেলাটা বড্ড ভাবাচ্ছে তাকে। অন্তু আর নাদিমের মধ্যে মন কষাকষি স্পষ্ট। বন্ধুত্বটাতে ফাটল ধরবে না তো এবার? নম্রতার ভয় হয়। প্রচন্ড ভয়ে অস্থির লাগে। নীরার প্রতি ঝিমিয়ে থাকা একটা রাগ ফুঁসে উঠে তাকায়। পরমুহূর্তেই নিভে গিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে অন্ধকার আকাশটির দিকে। ঠিক তখনই মনে আসে আরফানের

চিঠিটির কথা। দ্রুত পায়ে ব্যাগের কাছে ছুঁটে যায়। ব্যাগ থেকে চিঠিটা খুঁজে নিয়ে আবারও জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। টিমটিমে আলোয় পড়তে শুরু করে দমবন্ধ অনুভূতির সেই চিঠি,‘ শ্যামলতা,

আমার দুঃখী রাজরাণী। তোমার দীর্ঘ দুঃখ কথনে নামদাগা আসামী আমি। বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর। কিন্তু আমার জ্বলনও খুব কম ছিল না তাতে।

তুমি ভুক্তভোগী। অভিযোগ, অভিমান করেই রক্ষা তোমার। কিন্তু আমার যে রক্ষা নেই। তবে, অভিমান আমারও হয়েছিল। তোমার নামে অভিযোগও জমিয়েছিলাম অনেক। চার চারটা বছর অপেক্ষা করেছি। ছটফট করেছি। বাচ্চাদের মতো অভিমানও করেছি। এই বয়সে এসে কী এসব ছেলেমানুষী অভিমান মানায়? মানায় না। তবুও ফুলেফেঁপে

উঠেছে অভিমানের বহর। চার বছর আগে শেষ চিঠি তো আমার ছিল। চিঠিতে যোগাযোগের নাম্বারটা লিখে দেওয়ার পরও কেন যোগাযোগ করলে না তুমি? কী দোষ ছিল আমার? কেন ঠকিয়েছিলে আমায়? ভীষণ ভারী এই প্রশ্নগুলোর বোঝা টানতে টানতে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি শ্যামলতা। এই চারবছরে তবু তোমায় ঘৃণা করতে পারিনি।

অভিযোগ, অভিমান নিয়েও ভালোবেসেছি। শুধু ভালোবেসেছি। নির্ঘুম রাতগুলোতে তোমার গায়ের একটু পরশ পেতে ছটফট করেছি। বেলীফুলের সুগন্ধহীন অক্সিজেনটাকে বিষের মতো গ্রহণ করেছি। চারটা বছর ভীষণ ফাঁকা ছিল এই বুক। সেই ফাঁকা বুকের গল্প তোমায় চিঠিতে জানাব না শ্যামলতা। এই গল্প জানতে হবে তোমার নিজের

প্রচেষ্টায়। তুমি যেদিন আমার ফাঁকা হাতটা ধরবে পরম নির্ভরশীলতায়। সব সংকোচ ভুলে আমার চোখে চাইবে। আমাকে বুঝবে। আমার চোখে চেয়ে জানতে চাইবে। সেদিন বলব। আমার একটা নির্ভরতা দরকার শ্যামলতা। তুমি শুধু এই আমিটাকে সামলাও। কথা দিচ্ছি, তোমার পুরো পৃথিবীটা সামলানোর দায়িত্ব হবে শুধুই আমার।

ইতি

তোমার ব্যক্তিগত নিষ্প্রভ

চিঠিটা পড়েই কপাল কুঁচকে গেল নম্রতার। চিঠিটা টানা চার-পাঁচবার পড়ল সে। নিষ্প্রভ চিঠি দিয়েছিল? কিন্তু নম্রতার কাছে তো পৌঁছায়নি সেই চিঠি। তবে কোথায় গেল সেই চিঠি?সেদিন রাতে বিছানায় যেতে যেতে ঘড়ির কাটা মধ্যরাতে গড়াল। নম্রতা চিঠিটা সযত্নে তুলে রেখে

বিছানায় বসতেই খেয়াল করল, নীরার শরীর মৃদু কাঁপছে। বিশাল হলরুমটিতে ওরা দুজন ছাড়াও জুনিয়র চারজনের থাকার ব্যবস্থা। প্রশস্ত ঘরের সব আলো নেভানো। কোণার দুটো বিছানায় চার্জারের আলো জ্বেলে গুনগুন করে পড়াশোনা করছে দুজন জুনিয়র মেয়ে। রাত সাড়ে বারোটার পর রুমে আলো জ্বালানো মানেই

সিনিয়রদের তোপের মুখে ভস্ম হওয়া। সিনিয়রদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো। প্রাইভেসি নষ্ট করা। সেই ভয় আর জড়তার জন্যই বিদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে চার্জার ল্যাম্প নামক এই অযাচিত ব্যবস্থা। তাদের চার্জার ল্যাম্পের মৃদু আলোয় উল্টো হয়ে শুয়ে থাকা নীরাকে অস্পষ্ট বুঝতে পারল নম্রতা। টের পেল তার কম্পন। নীরা কী তবে জেগে আছে?

নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। নীরার বিছানার পাশে গিয়ে বসতেই চমকে উঠল। নীরা কাঁদছে! নম্রতা সচেতন হলো। ডানহাতটা আলতো করে নীরার বাহুর উপর রাখল। তারপর তার থেকেও আলতো কণ্ঠে বলল,‘ নীরু?’

নীরার শরীরের কম্পন তীব্র হলো। ভেঙে গেল প্রতিরোধ। হেঁচকি তুলতে তুলতে দু’হাতে মুখ ঢেকে

ফেলল। আড়াল করতে চাইল নিজের কান্নাভেজা চোখ, ভেজা কণ্ঠস্বর। নম্রতা জুনিয়র মেয়ে দুটোর দিকে তাকিয়ে গলা উঁচাল,

‘ জেরিন? নিপা?’

মেয়েদুটো তটস্থ ভঙ্গিতে মাথা তুলল।

‘ জি আপু?’

‘ তোমরা একটু বারান্দায় যাও তো আপু। বারান্দায় গিয়ে দরজাটা

ভেজিয়ে দিবে। না ডাকা পর্যন্ত ভেতরে আসবে না।’

মেয়েদুটো অসহায় ভঙ্গিতে একে অপরের দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াতেই নম্রতা গম্ভীর কণ্ঠে শুধাল,

‘ কাল তোমাদের সিটি আছে? বইটা সাথে নিয়ে যাও। বারান্দার আলো জ্বেলে দিলে পড়তে সমস্যা হবে না।’

মেয়ে দুটোর মুখ উজ্জ্বল হলো। বই আর নোট খাতা নিয়ে একবার আড়চোখে নম্রতার দিকে তাকাল। তারপর দ্রুত পায়ে বারান্দার দিকে চলে গেল। নম্রতা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ কাঁদছিস কেন?’

নীরা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ ঠাঁই শুয়ে থেকে কাঁদল। নম্রতা একটু বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ কাঁদলে কোনো সমাধান হবে না। অল্পতে কাঁদার মেয়ে তো তুই নস। তোর প্রতিরোধ শক্ত। আজ হঠাৎ এতো কাঁদছিস কেন?’

নীরা উঠে বসল। দুইহাতে চোখ মুছে নিয়ে বলল,

‘ তুইও আমায় দোষী ভাবিস না?’

নম্রতা বিরসমুখে বলল,

‘ না। তোর কী দোষ?’

‘ আমার জন্য নাদিম আর অন্তর মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেল। দু’জনেই গোঁয়ার। কেউই এই ঝগড়া মিটিয়ে নিভে না, আমি জানি।’‘ রঞ্জন আছে। আমরাও আছি। কিচ্ছু হবে না।’

কিছুটা প্রাণহীন শোনায় নম্রতার কণ্ঠ। নীরা দু’হাতে কপাল চেপে ধরে বলল,

‘ অন্তু পাগল হয়ে গিয়েছে। ওর এখন কিচ্ছু জ্ঞান নেই। নাদিমের সাথে নিজ থেকে কথা সে বলবে না। আর নাদিম তো কখনোই না।’

নম্রতা ক্লান্ত শ্বাস টেনে বলল,

‘ বুঝিসই যখন তখন কেন এতো গড়াতে দিলি? কী হতো একটু কথা বললে?’

নীরা হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল। চোখ-মুখ ধীরে ধীরে শক্ত হলো।‘ আমি

জানি তুই আমায় দোষী ভাবিস। বাট আই এম নট দি কালপ্রিট। অন্তুর মধ্যে ন্যূনতম ম্যাচিউরিটি নেই। ওর বাবা-মা শখ করে বিয়েতে রাজি হয়নি। চাপে পড়ে রাজি হয়েছে। বিয়ের পর আমরা কেউ ভালো থাকব না। তাছাড়া, এতোকিছুর পর ওকে বিয়ে করা মানে লোকমুখে ছড়ানো মিথ্যাটাকে সত্য করে দেওয়া।'

নম্রতার ভেতরটা থিতিয়ে থাকা রাগে গনগন করে উঠে। মেজাজ খারাপ হয়। মনের কোণে উঁকি দেয় প্রশ্ন, ভালোবাসা কী সত্যিই এতো যুক্তি-তর্ক দিয়ে হয়? নীরা কী সত্যিই অন্তকে ভালোবাসে? নম্রতা তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে নীরার চোখে। উপলব্ধি করতে চায় অন্তর প্রতি তার আকুলতা। না! নেই। নীরার ভেতর বিন্দুমাত্র তরলতা নেই।

এতো শক্ত নীরা! এতো শক্ত তার ভীত!‘ আমি কখনই বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাইনি। কিন্তু কিভাবে কী হয়ে গেল বল তো?’

নীরার কথায় চোখ ফেরায় নম্রতা। উদাস কণ্ঠে বলে,

‘ কে কী চেয়েছিল আর কে কী চায়নি তা আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না নীরু। সত্যটা হলো, আমরা ভেঙে যাচ্ছি। নাদিম, অন্তু ভেঙে গিয়েছে।

ভেঙে গিয়েছিস তুইও। রঞ্জন দেশ ছেড়ে যাচ্ছে । আর বাকি রইলাম আমি আর ছোঁয়া।'

এটুকু বলে থামল নম্রতা। নীরার দিকে হালকা চমকানো দৃষ্টিতে তাকাল। হঠাৎ করেই ভীষণ করুণ কণ্ঠে বলল,

' ওদের ছাড়া কি করে থাকব বল তো? সারাজীবন একসাথে থাকার ওয়াদা কেউ করিনি। কখনো আলাদা

হব সেই চিন্তাটাও ছিল না। অতীত-ভবিষ্যৎ কিচ্ছু জানতাম না। শুধু জানতাম, আমি বলে কিছু হয় না। যা আছে সবই আমরা। আজ হঠাৎ আমরা থেকে আমি হয়ে গিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে নীরু। অসহায় লাগছে।'নীরা কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। নম্রতার মনে ক্ষোভ জন্মায়। তীব্র ক্ষোভে হাসফাস করে। এই ক্ষোভটা আসলে কার উপর

বুঝে উঠতে পারে না। এই ক্ষোভ বুঝি বিস্তৃত। ছয়টা প্রাণেই কত প্রগাঢ় তার অস্তিত্ব। নম্রতার হঠাৎই সব রাগ গিয়ে পড়ে নিষ্প্রভের ওপর। এই লোকটিই যত ঝামেলার মূল। এই লোকটি চলে যাওয়ার পর থেকেই নম্রতার এই বেহাল দশা। সেদিন থেকেই এই ক্ষোভ আর মন খারাপের পৃথিবীতে নম্রতার নিত্য দিনকার পদার্পন।নম্রতা বিছানা

ছেড়ে উঠে যেতেই ডানপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল নীরা। নির্নিমেষ চেয়ে রইল একটু দূরে জ্বালিয়ে রাখা চার্জার ল্যাম্পটার আলোয়। সেই আলোয় চেয়ে থেকেই নিজের অগোছালো জীবনটা নিয়ে ভাবল নীরা। ভাবল অন্তর কথাও। অন্তর সব কথায় নীরার জানা। কিন্তু অন্তর পাগলামোকে মেনে নেওয়ার ভরসাও তার হয় না। নিজের আত্মসম্মান

আর জেদটাকে পাশে রেখে ভাবলেও বড় ভয় করে নীরার। অন্তর চাকরী নেই। অন্তর বাবা বিয়েতে রাজি নয়। অন্তর মাও ভীষণ ক্ষুব্ধ। সব থেকে বড় সমস্যা অন্তর বাবার শর্ত। অন্ত তাকে বিয়ে করলে নীরার পড়াশোনা, খাওয়া-পরার যাবতীয় দায়িত্ব হবে অন্তর। অন্তর বাবা পরিবারের অতিরিক্ত সদস্যের জন্য একটা টাকাও খরচ করতে রাজি

নন। তবে, অন্তু কোথায় পাবে সংসার টানার টাকা? অনার্স পাশের সার্টিফিকেট ছাড়া চাকরিই বা কোথায় পাবে সে? নীরার দায়িত্ব টানতে গিয়ে যদি অন্তুর স্বপ্নই ভেঙে যায়। পড়াশোনা থেমে যায় তাহলে কি হবে এমন ভালোবাসায়? দিনশেষে অন্তুর কী একটা আফসোস থাকবে না? পাগলামির বশে করা এই বিয়ের জন্য কী সে

পস্তাবে না? নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বন্ধুমহলের নিষ্ঠুর বিচ্ছেদের কথা ভেবে অসহায়ত্বটা আরও গাঢ় হয় নীরার। বুক ভারী হয়ে আসে। কান্না পায়। ঢালা বর্ষনে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে সব ঝাঁঝ। সব রাগ। ঘড়িতে দশটা কি এগারোটা বাজে। ভোরের রোদ মাত্রই কংক্রিট পেরিয়ে হাসপাতালের ঝকঝকে ফ্লোরে হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। কোথা

থেকে ভেসে আসছে ফিনাইলের উৎকট গন্ধ। হাসতালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি এ্যাম্বুলেন্স থেকে আসছে স্বজন হারা মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। এমনই এক রৌদ্রজ্বল সকাল বেলায় নম্রতাকে হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সাদামাটা সালোয়ার-কামিজের সাথে পিঠময় খোলা চুল। চোখে হালকা ল্যাপ্টে

যাওয়া কাজল। করিডোর পেরিয়ে আরফানের চেম্বারের সামনে পৌঁছাতেই সাঈদকে চোখে পড়ল নম্রতার। আরফানের এসিস্ট্যান্ট ধরনের ছেলেটা, ফাইলে কি সব সিরিয়াল করছে। হাতের কলমটা নিয়ে দ্রুত হাতে কেটে চলেছে একের পর এক স্লিপ। নম্রতা সাঈদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে হালকা গলা খাঁকারি দিল। মানুষের সাড়া

পেয়ে মাথা তুলে তাকাল সাঈদ। নম্রতাকে দেখে মৃদু হাসলও। নম্রতাকে সে চিনে। আরফানের সাথে নম্রতার যে ইটিশপিটিশ টাইপ কিছু চলছে সেটাও বেশ ধারণা করে ফেলেছে সে। নম্রতাকে চুপ থাকতে দেখে সে নিজে থেকেই বলল,‘ কেমন আছেন আপু?’

‘ আলহামদুলিল্লাহ। আপনি?’

‘ আপনাদের দোয়ায় ভালো।’

নম্রতার মনে হলো সাঈদকে সে আজই প্রথম হাসতে দেখছে। ইতোপূর্বে কখনো এতো হাসি হাসি মুখে কথা বলেছে কি-না মনে পড়ছে না নম্রতার। নম্রতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ নিষ্প্রভ আছে?’

‘ জি? নিষ্প্রভ?’

নম্রতা নিজের ভুলটা দ্রুত সামলে নিয়ে বলল,

‘ আরফান। ডক্টর আরফান আছেন চেম্বারে?’

‘ জি আছেন। তবে ব্যস্ত আছেন। ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার অনুমতি নেই।’

নম্রতা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভাবে। তারপর বলে,‘ আমি ভেতরে যাব না। আপনি কী কাইন্ডলি উনাকে জানাবেন যে আমি এসেছি? উনার সাথে জরুরি প্রয়োজনে দেখা করতে

এসেছি। আমার নাম নম্রতা মাহবুব। নাম বললেই চিনবে।’

সাঈদ ঠোঁট টিপে হেসে মাথা নাড়ল। নম্রতা বিগলিত কণ্ঠে বলল,

‘ মাই গুডনেস। থেংকিউ।’তবে নম্রতার ধন্যবাদটা যেন মাঠে মারা গেল। সাঈদ চেম্বারে ঢুকে আরফানকে খবর পৌঁছানোর আগেই অন্য কোথাও কাজের ডাক পড়ল তার। নম্রতাকে অপেক্ষা করতে বলে

সেই যে হারাল, আধঘন্টার মাঝে তার টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া গেল না। হতাশ নম্রতা বেশ কিছুক্ষণ করিডোরময় পায়চারী করল। অস্থির ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখল কিন্তু সাঈদ ফিরল না। শেষমেশ অধৈর্য্য হয়ে দরজা ঠেলে নিজেই ভেতরে উঁকি দিল নম্রতা। প্রায় সাথে সাথেই তিন জোড়া চোখ তড়াক করে তার ওপর এসে পড়ল। আরফানের

চোখদুটোতে বিষ্ময়। বাকিদুজনের চোখে কৌতূহল। কয়েক সেকেন্ড তীব্র অস্বস্তিতে কাটার পর নড়েচড়ে উঠল নম্রতা। এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। আরফান বিস্মিত ঠোঁটজোড়া হালকা ফাঁক করে বলল,‘ আপনি?’ নম্রতা উত্তর খুঁজে পেল না। সামনে থাকা কৌতূহলী দৃষ্টিজোড়ার সামনে

ভীষণ আগোছালো হয়ে পড়ল। থতমত খেয়ে বলল,

‘ সরি! আমি বরং আসি।’

আরফান ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ দাঁড়ান।’

কথাটা খানিক গলা উঁচিয়ে বলল আরফান। নম্রতা দাঁড়িয়ে পড়তেই চোখদুটো সরিয়ে সামনের মানুষদুটোর দিকে তাকাল সে।

লোকদুটোর চোখে অপার কৌতূহল। আরফান গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ ডক্টর মুহিব, আপনারা একটু বসুন। আই উইল ব্যাক ইন ফাইভ মিনিটস্।’লোকদুটো ঠোঁট বাঁকিয়ে দুর্বোধ্য হাসল। বিনা পরিশ্রমে দুষ্প্রাপ্য কিছু আবিষ্কার করে ফেললে যেমন উত্তেজনা হয়। ঠিক তেমনই উত্তেজনায় চকচক করে উঠল তাদের চোখ। আরফান অবশ্য সে

দৃষ্টিকে বিশেষ পাত্তা দিল না। চুপচাপ চেম্বার থেকে বেরিয়ে নম্রতার মুখোমুখি দাঁড়াল। পকেটে হাত রেখে মেরুদণ্ড সোজা করল। চোখদুটোতে তৃষ্ণার অনল নিয়ে নম্রতার আগাগোড়া নিরক্ষণ করল। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিবিলাস শেষে চোখ দুটো স্থির করল নম্রতার চোখে। ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল,‘ হঠাৎ আমায় মনে পড়ল? কেমন আছেন?’

নম্রতা সে কথার জবাব দিল না। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ ফ্রী হচ্ছেন কখন?’

‘ কেন?’

নম্রতার অকপট উত্তর,

‘ বিয়ে করব।’

আরফান চোখ বড় বড় করে তাকাল। পরমুহূর্তেই হেসে বলল,

‘ আচ্ছা? তো পাত্র কী আমি? নাকি সাক্ষী বানানোর চিন্তা?’

‘ ফাজলামো করবেন না তো। আমি একদমই ফাজলামোর মুডে নেই। কত চিন্তা আমার জানেন?’

আরফান মিটিমিটি হাসছিল। নম্রতার কথায় অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল,

‘ ছোট্ট একটা মাথায় অতো কিসের টেনশন?’

‘ টেনশনের মতো অনেক ব্যাপার ঘটেছে। আপাতত আমি আপনাকে

নিয়ে টেনশন করছি। আপনাকে সর্বোচ্চ আধাঘন্টা সময় দেওয়া হলো। জলদি আসুন নয়তো খবর আছে।’

আরফান হেসে ফেলে বলল,‘ এভাবে হয়?’

‘ তবে ফিরে যাব?’

আরফান এক পা এগিয়ে এলো। চারপাশটা দেখে নিয়ে মাথাটা হালকা নিচু করে মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ আপনার তো ফিরে যাওয়ার পথ নেই নম্রতা। বহু আগেই আটকে গেছেন নিষ্প্রভ নামক দেয়ালে। এই দেয়াল ভাঙবার নয়। আর আপনার মুক্তিও জুটবার নয়। একটু অপেক্ষা করুন। ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি।’ নম্রতার হৃদস্পন্দন দুই-তিন ডিগ্রি বাড়িয়ে দিয়ে ভদ্রপায়ে চেম্বারে ঢুকে গেল আরফান। নম্রতা বুকে হাত দিয়ে জোড়াল শ্বাস ছাড়ল।

করিডোরের কোণার একটি চেয়ারে অলস বসে রইল। আধঘন্টা দশমিনিট পর সাঈদ এলো এক কাপ চা নিয়ে। নম্রতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ স্যার দিতে বলেছেন। আপনি আরও কিছু খেলে.. ‘

নম্রতা হাসার চেষ্টা করে বলল,‘ লাগবে না। আপনি চা-টাও নিয়ে

যান। হসপিটালের পরিবেশে কিছু খেতে পারি না আমি।’

সাঈদ জোড়াজুড়ি করল না। মৃদু হেসে জায়গাটা থেকে সরে এলো। ছেলেটা আজ কারণে অকারণে হাসছে। কেন হাসছে কে জানে? ঠিকঠাক এক ঘন্টা অপেক্ষা করার পর চেম্বার থেকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো আরফান। নীল স্ট্রিপের ভাঁজহীন শার্ট গায়ের

মানুষটিকে এবার একটু চোখ মেলে দেখল নম্রতা। দীর্ঘকায় বিশাল চেহারার মানুষটি শ্যামবর্ণ। চেহারায় আলাদা এক মাধুর্যতা আছে। গালের সাথে ল্যাপ্টে থাকা চাপদাড়িগুলোও কেমন সবল, বলিষ্ঠ। চশমাহীন চোখদুটোতে প্রগাঢ় বুদ্ধির ছাপ। আরফান সতর্ক চোখে ঘড়ি দেখল। কুঁচকানো কপাল নিয়ে শার্টের হাতা ভাঁজ করতে করতে নম্রতার সামনে

এসে দাঁড়াল। উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল,‘ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো, সরি। প্ল্যান ছিল না তো তাই... ‘
নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। মিষ্টি হেসে বলল,
‘ সমস্যা নেই। আমি জানি আপনি চেষ্টা করেছিলেন। ডাক্তারদের কত কাজ। আমারই অসময়ে আসাটা উচিত হয়নি।’

আরফান কিছু বলার আগেই আরফানের ডান বাহু জড়িয়ে ধরে তাড়া দিয়ে উঠল নম্রতা,

‘ চলুন।’

আরফান বিস্ময় নিয়ে নম্রতার হাতের দিকে তাকাল। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নম্রতার মুখের দিকে তাকাল। নম্রতার মুখে তেমন কোনো ভাবাবেগ দেখা গেল না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রেখে বলল,‘ এভাবে

তাকিয়ে থাকলে লজ্জায় মরে যাব। চোখ সরান। হাসপাতালের মাঝে হাত ধরলে কী আপনার ডাক্তারগত প্রেস্টিজের কোনো ক্ষতি হবে?’

আরফান চোখ সরাল না। বিস্ময় ঠেলে হাসল। নম্রতার হাতটা বাহু থেকে সরিয়ে বলিষ্ঠ আঙুলে আবদ্ধ করল। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটা দিয়ে বলল,

‘ চলুন।’আরফান দ্রুত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। হাসপাতালের মাঝে প্রেমিকার হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোটা বড় অস্বস্তির। প্রেমিকার এগিয়ে দেওয়া হাত ছেড়ে দেওয়া আরও বেশি অস্বস্তির। আর সে যদি স্বয়ং শ্যামলতা হয় তাহলে তো কথায় নেই। আরফানের বুক টিপটিপ করছে। বাইরে থেকে বলিষ্ঠ দেখতে পাওয়া মানুষটির ভেতরটা

ফেঁটে যাচ্ছে উত্তেজনায়। শ্যামলতার স্পর্শ! বহু আকাঙ্খিত সেই শ্যামলতা! কথাটা ভাবতেই সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের বাইরে থেকে রিকশা নিয়েই গম্ভীর কন্ঠে বলল আরফান,

‘ আপনি নিজ ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে শুধু ধরতে হয় বলেই আমার হাত ধরবেন না প্লিজ। নিজেকে সময় দিন। আমি ব্যাপারটা ওভাবে

বুঝায়নি।’নম্রতা উত্তর দিল না। মুখ গুজ করে বসে রইল। আরফান যে ফাঁকটা ধরে ফেলেছে বুঝতে পেরে সে অনুতপ্ত। নম্রতা জোড়াল শ্বাস ফেলল। সাথে সাথেই নাকে গিয়ে ঠেকল সেই সুগন্ধ। প্রতিটি চিরকুটে যে সুগন্ধ মেশানো থাকত ঠিক সেই সুগন্ধ। নম্রতার চারপাশটা এবার পরিচিত হয়ে উঠল। গাঁট বেঁধে থাকা শরীরটা ঢিলে হয়ে এলো।

পাশে বসে থাকা মানুষটির হাতে আলতো হাত রাখল। এবার অভিনয় নয় সত্যিকারের অনুভূতি এসেই জমা হলো সেই স্পর্শে। নম্রতা প্রথমবারের মতো কোনোরূপ অস্বস্তি বোধ করল না। এই প্রথমবার তার মনে হলো, পাশে বসে থাকা মানুষটি অন্য কেউ নয় তার নিজস্ব মানুষ। তার সে। যার নাম নিষ্প্রভ। নম্রতা মাথাটা হেলিয়ে দিল আরফানের

কাঁধে। আরফানের শরীরে থাকা সুগন্ধিটা আরও তীব্রভাবে এসে ঠেকল নাকে।নম্রতা দুইহাতে নিষ্প্রভের ডানবাহুটা জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল। চার বছরের বিক্ষিপ্ত মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। পাশের মানুষটিকে হঠাৎই ভীষণ কাছের বলে বোধ হলো। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলল নম্রতা। আরফানের কাঁধে থুতনি ঠেকিয়ে

চুপচাপ চেয়ে রইল আরফানের শ্যামবর্ণ মুখে। খুব কাছ থেকে নিরক্ষণ করল তার কাটা কাটা চেহারা। শক্ত চোয়াল। মনের অস্বস্তিগুলো দূর হয়ে অবাধ্য মন স্বগোতক্তি করল, ‘ হ্যাঁ! এই মানুষটা আমারই। শুধুই আমার। যার জন্য বছরের পর বছর চিঠি লিখেছি। অপেক্ষা করেছি। কেঁদেছি পর্যন্ত।’ নম্রতার কাজে বেশ হকচকিয়ে গেল

আরফান। বিস্ময়ের পর বিস্ময় খেলে যাচ্ছে তার চোখে। সবকিছু ধাঁধার মতো লাগছে। বুকে ধরাম ধরাম ঢোল পেটাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কী মৃদু কাঁপছে না? সবকিছু ছাপিয়ে আরফান এতটুকু বুঝল, নম্রতা তাকে মেনে নিতে পারছে। তার ছোঁয়ায় আগের মতো দ্বিধা নেই। অস্বস্তি নেই। আরফানের বুকে অদ্ভুত এক খুশি ঠেলাঠেলি করে

উঠল। সচেতন কণ্ঠে বলল,‘ পরিচিত লাগছে?’

নম্রতা হাসল। তার হাসিটা বড় মিষ্টি দেখাল এবার,

‘ খুউব।’

আরফান হাঁফ ছেড়ে বলল,

‘ বাঁচা গেল। এ কয়েকদিন কি ভীষণ টেনশনে ছিলাম।’

নম্রতা হঠাৎই সোজা হয়ে বসল। কিছুটা গম্ভীর দেখাল তার মুখ। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ আপনি চিঠি পাঠালে আমি পেলাম না কেন? আপনি সত্যিই চিঠি পাঠিয়েছিলেন? কত তারিখ ছিল সেটা?’

‘ আপনি চিঠি দেওয়ার এক সপ্তাহের মাথায়। যে চিঠিতে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের কবে নাগাদ

দেখা হবে। সেটার উত্তর পাঠিয়েছিলাম।'

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,' কিন্তু আমি তো উত্তর পাইনি। সেই চিঠির পর আরও একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠিটা আপনি রিসিভ পর্যন্ত করেননি। টানা চার বছরের জন্য উধাও হয়ে গেলেন। আরেকটা চিঠি তো দিতে পারতেন!'

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ ছিলাম না তো।’

নম্রতা ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ মানে? একটু ক্লিয়ার করে বলুন প্লিজ। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। ছিলেন না মানে কী? কোথায় ছিলেন?’

আরফান হাসল। শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ এতো অধৈর্য্য হচ্ছেন কেন? আগে রেস্টুরেন্টে পৌঁছাই। লাঞ্চ করতে করতে কথা বলি। আজ পুরো

দিনটাই ছুটি। আপনার জন্য পুরো দিনটা ছেড়ে রাতের ডিউটি নিয়েছি ।’

নম্রতা জেদ ধরা কণ্ঠে বলল,‘ না। অত ধৈর্য্য আমার নেই। আপনি এক্ষুনি বলেন। এক্ষুনি মানে এক্ষুনি।’

আরফান হেসে বলল,

‘ সেই জেদ। জেদটা এখনও কমেনি?’

‘ কমবেও না। বলুন জলদি।’

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ দেশের বাইরে ছিলাম। ভাইয়া প্রায়ই ইউএস যেতো। ওর থেকেই সেখানকার একটা সীম জোগার করে আপনাকে নাম্বার দিয়েছিলাম। শুধুমাত্র আপনি ফোন করবেন সেই আশায় গোটা চারবছর দুই মিনিটের জন্যও অফ রাখিনি সেই সীম। যদি আপনি ফোনে না পান? ভয় হতো।’

নম্রতা অভিমান নিয়ে বলল,‘ ইউএস যাচ্ছেন কখনও বলেননি কেন আমায়? এতোবড় একটা কথা চেপে গেলেন? আমি তো সব বলতাম।’

‘ লাস্ট চিঠিতে বলেছিলাম তো। স্কলারশিপের কথা জানার পাঁচ দিনের মাথায় চলে যেতে হলো। বলার সময় কোথায় পেলাম? তারওপর সেই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর

সময়। আমি ম্যান্টালি খুব উইক হয়ে পড়েছিলাম। আমার আপনাকে খুব প্রয়োজন ছিল তখন।’

নম্রতা আদ্র কণ্ঠে বলল,

‘ ভয়ঙ্কর সময় কেন বলছেন? কি হয়েছিল?’

‘ বাকিটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বলি? ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য রিকশা খুব একটা সুইটেবল ভেহিকল নয়।’নম্রতা উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে

রইল। কপালে হালকা ভাঁজ। আরফানের হঠাৎ-ই নম্রতাকে কাছে টেনে তার কুঞ্চিত কপালে চুমু আঁকতে ইচ্ছে হলো। কয়েক সেকেন্ড নম্রতার উদ্বিগ্ন মুখটির দিকে তাকিয়ে থেকে অবাধ্য ইচ্ছেটাকে ঠেলেঠুলে বন্ধী করে রাখল ঠান্ডা গোপনীয়তায়। অবাধ্য ইচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠতে লাগল বুকে। দৃঢ় প্রতিবাদ জানাল। তবু আরফান

সিদ্ধান্তে অটল। গর্জালে গর্জাক। প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিক শরীরের প্রতিটি কোষ। তবুও নিজেকে অতটা প্রশ্রয় দিতে রাজি নয় সে। তাও আবার এমন একটা পরিবেশে!রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে চলেছে নাদিম। দুপুরের তীব্র গরমে ভিজে উঠেছে শার্ট। আজকাল ভার্সিটি চত্তরটা বড় পানসে লাগে তার। কোনো কিছুতেই স্বস্তি নেই। এই

পরিচিত শহরটাতে আজকাল খুব দমবন্ধ ভাব। বিষাক্ত আলো-বাতাসে নাদিম বড় বিরক্ত। মাঝেমাঝেই এই শহর ছেড়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে তার। হারাবেও একদিন। কিন্তু সেই একদিনটা কবে জানা নেই নাদিমের। নাদিম রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। রাস্তায় চা ফেরি করে বেড়ানো ছেলেটাকে ডেকে এক কাপ চা খায়। কপাল কুঁচকে ঝলমলে

সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই জ্বলাপোড়া করে উঠে চোখ। তবুও চোখ ফেরায় না নাদিম। জ্বালাপোড়া অনুভূতি গাঁয়ে লাগে না তার। নাদিম জানে তার অনুভূতি নেই। ভেতরের মনটা আস্ত পাথর। আজ হঠাৎ সেই পাথরে ফাটল খুঁজে পায় নাদিম। খেয়াল করে, এই পৃথিবীতে তার নিজের কেউ নেই। বন্ধুরা ছিল। এখন নেই।

‘নেই’ শব্দটা মনে পড়তেই বুক জ্বালা করে নাদিমের। সব ঠিক করে আবারও আড্ডায় বসতে ইচ্ছে করে। অন্তু, রঞ্জনের সাথে গলা মিলিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বড্ড অস্বস্তি হয়। বুকের ভেতর থেতিয়ে থাকা ইগোটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বলে, ‘ তোমার কী অভিমান নেই? আত্মসম্মান নেই?’নাদিম অবাক হয়, ‘

আত্মসম্মান? বন্ধুদের সামনে আবার আত্মসম্মান কিসের? ওরা তো আমার নিজের।’

ভেতর থেকে উত্তর আসে, ‘ সত্যিই ওরা নিজের?’

‘ কেন? নয়?’

‘ কখনো নয়। হলে কী সে তোমায় ওভাবে অপমান করতে পারে?’

নিজের ভেতরকার পুরুষটির সাথে শান্ত বাক্য বিনিময় করতে করতেই এগিয়ে যায় নাদিম,

‘ আমিই কী আগে শুরু করিনি? কি দরকার ছিল আগ বাড়িয়ে কথা বলার? ও যে রেগে ছিল!’

‘ ছিঃ নাদিম! এ তোমার কেমন অধঃপতন? ভীষণ সাহেবী হয়ে যাচ্ছ আজকাল। বন্ধুরা যদি তোমার নিজেরই হয় তবে বন্ধুত্বের স্বার্থে

করা তোমার কাজটা কী খুব অন্যায় ছিল? এতো বাছ-বিচার করেই যদি কথা বলতে হয় তাহলে বন্ধু আর রাস্তার মানুষের মাঝে পার্থক্য কী?’নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অসহায়ভাবে বলল,

‘ রেগে থাকলে কী কারো হুশ থাকে? কখন কী বলে ফেলে! আমি কী বলি না?’

‘ না। বলো না। আর যায় হোক বন্ধুর গোপন কষ্টগুলো দিনের আলোয় গলা চিরিয়ে প্রকাশ করো না। এ কী কোনো বন্ধুর মতো কাজ হলো? যে ব্যক্তি বন্ধুর গোপনীয়তা ঢাকতে জানে না সে কখনও বন্ধু হতে পারে না।’

‘ আমার কী আদৌ গোপন কিছু আছে?’

‘ অবশ্যই আছে। আলবাত আছে।’

‘ থাকলে থাকুক। ও না হোক, আমি তো ওর বন্ধু।“ একে বন্ধুত্ব বলে না। তুমি বোকা। তুমি মেরুদণ্ডহীন বলেই তোমার আত্মসম্মান জন্মায় না।’

কথোপকথন বিশেষ এগুলো না। তার আগেই বিশাল সাদা এক মার্সিডিস গাড়ি পথ এলিয়ে দাঁড়াল। নাদিম চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে কপাল কুঁচকে তাকাল। ভ্রু জোড়া

বাঁকিয়ে সচেতন দৃষ্টি ফেলল বিলাসবহুল গাড়িটির ওপর। গাড়ি থেকে সাদা ঝকঝকে পোশাক গায়ে নেমে এলো একজন ড্রাইভার।

‘ আপনারে স্যার ডাকতেছে।’

নাদিমের ভ্রু জোড়া আরও একটু কুঁচকে এলো,

‘ তোমার স্যারকে কী আমি চিনি?’

ড্রাইভার জবাব দেওয়ার আগেই গাড়ির ভেতর থেকে উঁকি দিল

একটি মুখ, ইয়ামেত সাহেব। নাদিম অবাক হলো। ইয়ামেত সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,‘ গাড়িতে উঠো। কথা আছে।’

নাদিম কয়েক সেকেন্ড দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে গাড়িতে গিয়ে উঠল। এই দামী বন্ধী গাড়িতে ইয়ামেত সাহেবের পাশে বসে তেমন অস্বস্তি না হলেও খুব একটা ভালোও লাগছে না নাদিমের। মাথার ভেতরে বিরক্তটা

তরতর করে বাড়ছে। ইয়ামেত সাহেব বেশ রয়ে সয়ে প্রশ্ন করলেন,

‘ কেমন আছ?’

‘ বেশ ভালো। আপনি?’

ইয়ামেত সাহেব জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লেন। মুখের উপর একটি ইংরেজি জার্নাল ধরে বসে রইলেন। নাদিমের মেজাজটা অকারণেই খারাপ হয়ে গেল। এই বয়স্ক জাজকে কিছু নিকৃষ্টতম গালি দিতে

পারলে শান্তি পাওয়া যেত। সব শালারই এক ঢং! ইয়ামেত সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,‘ তুমি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করো?’

‘ খুব বোকা মনে করি না।’

ইমায়েত সাহেব জার্নালটা পাশে নামিয়ে রেখে নাদিমের দিকে তাকালেন। নাদিম আগের মতোই নিঃসংকোচ ভঙ্গিতে বসে আছে।

ইমায়েত সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

‘ আমি তোমার সাথে কী বিষয়ে কথা বলতে চাইছি, তা কী তুমি বুঝতে পারছ?’

নাদিম মাথা নেড়ে বলল,

‘ আংশিক পারছি। তবে, পুরোপুরি ধরতে পারছি না।’

‘ রিসেন্টলি মৌশির মাঝে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তুমি লক্ষ্য করেছ?’

‘ জি না।’

ইমায়েত সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন,‘ মৌশি আজকাল রান্নাবান্না শেখায় মনোযোগী হয়েছে।’

‘ এই বয়সে মেয়েরা রান্নাবান্না শেখে। অস্বাভাবিক কিছু তো দেখছি না।’

ইমায়েত সাহেব শক্ত চোখে তাকালেন।

‘ অবশ্যই অস্বাভাবিক। মৌশি সব ধরনের রান্না শিখতে আগ্রহী হলে তা হয়তো অস্বাভাবিক কিছু হতো না। কিন্তু তা তো ঘটছে না। মৌশির রান্নার তালিকায় শুধু সেই সব খাবারই দেখা যাচ্ছে যেগুলো তুমি পছন্দ করো।’

নাদিম ভ্রু উঁচিয়ে ঠোঁট গোল করে বলল,

‘ ওহ!’

‘ মৌশির ড্রয়ারে আজকাল সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। বারান্দায় মাঝে মাঝেই ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ইট’স আ বিগ চেঞ্জ ফর হার। মৌশি সিগারেট ভীষণ অপছন্দ করত।’

নাদিম কিছু বলল না। মৌশি সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে বসে থাকছে এই খবর শোনার পর কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না।‘ তুমি কী বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?’

‘ জি। বুঝতে পারছি।’

অনেকটা প্রাণহীন কণ্ঠে উত্তর দিল নাদিম। ইমায়েত সাহেব আবারও চুপ হয়ে গেলেন। উদাস দৃষ্টিতে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন

অনেকক্ষণ। সেদিক দৃষ্টি রেখেই বললেন,

‘ মৌশির বইয়ের মাঝে, ড্রয়ারে তোমার অসংখ্য ছবি পাওয়া গিয়েছে। ছবিগুলো খুব সাবধানে, লুকিয়ে তোলা হয়েছে। আমার ধারণা, মৌশি তোমাকে প্রায়ই ফলো করে। ব্যাপারটা কী সত্য?’

নাদিম ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল,‘ এই ব্যাপারে মৌশিই বোধহয় ভালো তথ্য

দিতে পারবে। আপনার ওর সাথে সরাসরি কথা বলা উচিত।’

ইমায়েত সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

‘ মৌশির সাথে আমার কথা হয়েছে। শী ওয়ান্টস টু বি উইদ ইউ। তোমার সঙ্গ ওর ভালো লাগে।’

নাদিম কিছু বলল না। অবাকও হলো না। খবরটা নতুন নয়। মৌশি যে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তা সে

তিন-চার মাস আগে থেকেই জানে। ইমায়েত সাহেব স্বগোতক্তির মতো বিরবির করে বললেন,

‘ শী ইজ গোয়িং ক্রেজি। আমার মনে হয়, ও রাতে ঘুমায় না।’

নাদিম আগের মতোই নিশ্চুপ বসে রইলো। ইমায়েত সাহেব হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে বললেন,‘ ডু ইউ লাইক মৌশি?’

‘ এজ আ হিউম্যান বিয়িং আই লাইক হার। বাট নট লাইক আ ওমেন।’

ইয়ামেত সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

‘ পার্সোনালি আমি তোমাকে পছন্দ করি না। তোমার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি তাতে ভালো রেজাল্ট ব্যতীত পছন্দ করার মতো দ্বিতীয় কিছু তোমার আছে বলেও

মনে হয়নি। ইউ আর আ ইউসলেস ফেলো অলওয়েজ। স্টিল ইউ হ্যাভ আ এট্রাকশন। দূর্ভাগ্যবশত মৌশির সাথে তোমার ইনভলভ হওয়াটা আমায় বাধ্য হয়েই চাইতে হচ্ছে। আই ক্যান চেঞ্জ ইউর লাইফ ওভারনাইট।’নাদিম হাসল। খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজটা দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিয়ে বলল,

‘ আমিও আপনাকে পছন্দ করি না। ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, বিশাল অঙ্কের মালিকানা ছাড়া পছন্দ করার মতো কিছু খুঁজেও পাইনি। দূর্ভাগ্যবশত টাকা কখনোই আমার কাছে পছন্দনীয় বিষয় নয়। তাই লাইফ চেঞ্জ করে নেওয়ার এমন দূর্দান্ত সুযোগটা নিতে পারছি না বলে দুঃখ হলো। ড্রাইভার সাহেব? ডানপাশের রাস্তাটায় গাড়ি থামান। আমার যাত্রা

এখানেই শেষ।’ইমায়েত সাহেব বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অপমানটা সচল মস্তিষ্ক টের পেলেও বিস্ময়ভাবটা কাটল না। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থেকে খুঁজতে লাগলেন অচেনা কোনো বিশেষত্ব। কী আছে এই ছেলের মাঝে? কিসের বলে এমন অকপট, নাকউঁচু আত্মবিশ্বাসে কথা বলে এই ছেলে? বিন্দুমাত্র মাথা নোয়ায় না।

খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে নম্রতা। খাবার মুখে নেওয়ার কোনোরূপ লক্ষ্মণও দেখা যাচ্ছে না। আরফান খেতে খেতেই ভ্রু কুঁচকে তাকাল। ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল,‘ কি ব্যাপার?’

নম্রতা মুখ মেরে উত্তর দিল,

‘ কোনো ব্যাপার না।’

‘ তাহলে খাচ্ছেন না কেন?’

নম্রতা এবার চোখ তুলে তাকাল। অসহায় কণ্ঠে বলল,
‘ পুরো ব্যাপারটা না শুনলে খাবার টাবার গলা দিয়ে নামবে না আমার। আপনি প্লিজ তাড়াতাড়ি খান। খাওয়া শেষ করে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন। দ্রুত করুন।’
আরফান এক গাল হেসে বলল,‘ আপনি এত অধৈর্য্য কেন বলুন তো?

একটুও পেশেন্স নেই। আগেও অবশ্য ছিল না।’

নম্রতা কাটা চামিচটা তুলে নিয়ে আরফানের দিকে তাক করে বলল,

‘ আপনি কথা না বলে তাড়াতাড়ি খাবেন?’

নম্রতার অস্থিরতা দেখে হাসে আরফান। এক চুমুক পানি খেয়ে নিয়ে বলল,

‘ আপনি খাওয়া শুরু করুন। আমি খেতে খেতেই বলছি।’

নম্রতা নড়েচড়ে বসল। উৎসাহী চোখে তাকিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা বলুন।’

আরফান ভ্রু’কুটি করে বলল,

‘ উহু। না খেলে বলব না।’

বাধ্য হয়েই খাবারে হাত দেয় নম্রতা। দুই তিন গ্রাস মুখে তুলে নিয়ে বলে,

‘ এবার তো বলুন।’

আরফান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না। দাঁড়ান আমি একটু গুছিয়ে নিই।’

নম্রতা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল। বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে জোড়াল শ্বাস ফেলল আরফান।

‘ আমি ছোট থেকেই খুব পড়াকু ছিলাম। আর ভাইয়া ছিল ডানপিটে,

চঞ্চল। ভাইয়া তত পড়াকু না হলেও তার বিজনেস আইডিয়া ছিল অসাধারণ। আমার আর নিদ্রার ছোট থেকে ছোট বিষয়ও খুব গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল রাখতো ভাইয়া। ভাইয়ার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, সজাগ। গাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়লেও নজর এড়াত না তার। নজর এড়ানোর উপায়ও ছিল না হয়তো। আমার আর আপনার চিঠি প্রেমের ব্যাপারটা

ভাইয়াই ধরে ফেলেছিল প্রথম। আমার বাবা সাধারণ ব্যাংক কর্মকর্তা ছিলেন। পারিবারিক অবস্থা খারাপ না হলেও আহামরি কিছুও ছিল না। সেই পরিবারকে একা হাতেই এতোদূর টেনে আনলেন ভাইয়া। আমার স্কলারশিপের ব্যাপারটা আমার আগে ভাইয়ারই কানে এসে পৌঁছেছিল। কিভাবে পৌঁছেছিল সেটা আজও একটা রহস্য। আমার ধারণা,

ভাইয়াই কোনো কলকাঠি নেড়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।’এটুকু বলে থামল আরফান। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আবারও বলল,

‘ ভাইয়া স্কলারশিপের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে আমার পার্সপোর্ট আর ভিসার ব্যবস্থাও করে ফেললেন। আমি তখন হসপিটালে প্রেকটিস করি। সারাদিন গাঁধার মতো খেঁটে রাতভর পড়াশোনা

করি। ভাইয়ার মতো অতো সজাগ দৃষ্টি আমার কোনোকালেই ছিল না। তাই পিঠ পিছে ঘটে যাওয়া এতো কাহিনীর টিকিটুকুও ধরতে পারিনি। সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই একটা এক্সিডেন্টে উলোটপালোট হয়ে গেল সব। চট্টগ্রামগামী একটা ট্রাকে থেতলে গেলেন ভাইয়া। ভাইয়াকে যখন হসপিটালে আনা হলো তখন আমি ডিউটিতে। আমি

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাইয়ার শেষ হয়ে যাওয়াটা দেখলাম। সেই দিনটি যে কী ভয়ানক ছিল নম্রতা! নিজের ডাক্তারী পড়াটা বেকার মনে হচ্ছিল। আমার চোখের সামনে পুরো পরিবারটাতে নেমে এলো বিশাল ধস। ভাইয়া মারা যাওয়ার পরের দিন বাবার থেকে স্কলারশিপ সম্পর্কে জেনেছিলাম আমি।একদিকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিলাম

অন্যদিকে ফিন্যানশিয়াল চাপ। সব মিলিয়ে ইউএস যাওয়াটা বাতিলই করতে চেয়েছিলাম। পড়াশোনাতেও মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। আমার ছোট বোন নিদ্রা ভাইয়ার প্রতি প্রচন্ড উইক ছিল। ভাইয়া ব্যবসায়িক কাজ শেষ করে রাতে এসে তাকে খাইয়ে দিলে সে খেত নয়তো খেত না। সারাদিন উপোস বসে থাকত। ভাইয়ার আকস্মিক

মৃত্যুতে নিদ্রাও অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিদ্রা এমন একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল যে ওর বেঁচে থাকা নিয়েই আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। আমি কী করব, কোথায় যাব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।‘ভাইয়া আছে মানে সব ঠিক’ এমনটা জেনেই ছোট থেকে বড় হয়েছিলাম আমরা। কখনও কোনো কিছু নিয়ে ভাবতেই হয়নি। ভাইয়ার

অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর চেনা আদল বদলে গেল। পরিবারকে এমন একটা অবস্থায় রেখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইউএস যাওয়ার কথা তখন চিন্তাও করতে পারছিলাম না। যেতামও না হয়তো যদি-না ভাইয়া মৃত্যুর আগে এডভান্স টিকেট কেটে রাখতেন। বাবাও জোর দিলেন। ভাইয়ার এতো চেষ্টা মাঠে মারা যাবে এমনটা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

দুই দিন দ্বিধাদ্বন্দে ভুগে। একরকম বাবার চাপে পড়েই ভাইয়ার মৃত্যুর পাঁচদিনের মাথায় , নিদ্রাকে হসপিটালে ফেলেই মার্কিন মুলুকে উড়াল দিতে হলো। ইউএস গিয়েও শুরু হলো টিকে থাকার আরেক যুদ্ধ।'

নম্রতা কিছুক্ষণ শান্ত থেকে বলল,' চিঠি! তবে চিঠি দিয়েছিলেন কখন?

এমন একটা পরিস্থিতিতে লাইব্রেরি গিয়েছিলেন আপনি?’

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল নম্রতা। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ লাইব্রেরি যাইনি। যাওয়া সম্ভবও ছিল না। তবে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। ফ্লাইটে উঠার আগে তাড়াহুড়ো করে চিঠি লিখেছিলাম। তাতে আমার স্কলারশিপ নিয়ে ইউএস যাওয়া, ভাইয়ার মৃত্যু আর আমার নাম্বারটা

ছিল। যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। সেই চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমার এক ছোট ভাইয়ের হাতে। ছোট ভাই বলতে ভার্সিটি জুনিয়র। কোথায় রাখতে হবে সেটাও বলে দিয়েছিলাম। ওর মতে চিঠিটা সে সঠিক জায়গাতেই রেখেছিল। এক সপ্তাহেও আপনার কোনো খবর না পেয়ে ওকে কল করেছিলাম আমি। ও ফিলোসোফির বইটির একটা

ছবিও পাঠিয়েছিল। বই চেইক করে জানিয়েছিল, বইয়ে চিঠি নেই। আমি ভেবেছিলাম চিঠিটা হয়তো আপনিই নিয়েছেন।’

নম্রতা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এতোকিছু ঘটে গিয়েছে তার অগোচরে? নম্রতা শুকনো গলায় ঢোক গিলল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘ আপনার সেই জুনিয়রই চিঠিটা

সরিয়ে ফেলেছে এমন কিছু কী হতে পারে?’

‘ না। মুহিব আমার বিশ্বস্ত। তাছাড়া চিঠি সরিয়ে তারই বা কী লাভ?’

নম্রতা উত্তর দিল না। চিন্তিত মুখে বসে রইল। কপালে চিন্তার ভাঁজ। বেশ কিছুক্ষণ দু’জনেই চুপচাপ বসে থেকে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে। চারদিকে নরম

আলো। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পার্কের দিকে হাঁটা দিল তারা। পার্কে তখন বিভিন্ন বয়সী মানুষের সমাহার। রাস্তার পায়ে বাদাম, ছোলা, ফুসকা বিভিন্ন দোকানের আসর। বেশ কিছুক্ষণ পাশাপাশি হাঁটার পর ফুস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল আরফান। হাসার চেষ্টা করে বলল,‘ জীবনটা কি অদ্ভুত তাই না? মেডিক্যাল ফাইনাল প্রুফ দেওয়ার

পর কিছুটা ফ্রী ছিলাম। নিষাদের সাথেও আড্ডা হচ্ছিল অনেকদিন পর। হঠাৎ নিষাদ বলল লাইব্রেরি থেকে কিসব বই নিবে সে। আমাকেও সাথে নিল। লাইব্রেরির দুই তলায় গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলাম। নিষাদ নিজের মতো বই খুঁজতে ব্যস্ত। অযথা বিরক্ত লাগছিল বলে উঠে গিয়ে পাশের তাক থেকে আমিও একটা বই তুলে নিলাম।

পুরাতন, মোটা ফিলোসোফির বই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। ফিলোসোফি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার ছিল না। কৌতূহল বশত বইটা উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। তারপর কিভাবে যেন চিঠিটা হাতে পেয়ে গেলাম। অবসর বসে ছিলাম বলে নিষাদের থেকে এক টুকরো কাগজ নিয়ে চিঠির উত্তরও লিখে ফেললাম। লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে চিঠির

কথাটা ভুলেও গেলাম। এই চিঠিতেই যে একদিন কপোকাত হবো কে জানত?’নম্রতা জবাব না দিয়ে আরফানের দিকে তাকায়। লম্বাচওড়া, বলিষ্ঠ গঠনের মানুষটিকে দেখতে মাথাটা বেশ খানিকটা উঁচু করতে হয় তার। শক্ত চোয়াল আর ব্যাক ব্রাশ করা চুলগুলোতে বিকেলের সোনালী রোদ এসে পড়ছে। নম্রতা আজই প্রথম খেয়াল

করল আরফানের ঘাড়ের কাছে একটা তিল আছে। কুচকুচে কালো তিল। সেই তিলের মাধুর্যেই এক পাশ থেকে আরফানকে আরো বেশি ব্যক্তিত্ববান আর বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে। হঠাৎই তিলটাকে আলতো হাতে ছুঁয়ে দিতে খুব খুব ইচ্ছে জাগল নম্রতার। কিন্তু প্রতিবারের মতোই ইচ্ছের ঝোপ বন্ধ করে বেহায়ার মতো চেয়ে রইল নম্রতা। ডানহাতে

আচমকা আরফানের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকাল সে।পরমুহূর্তেই গম্ভীর, উদ্বেগী কন্ঠে ধ্যানভঙ্গ হলো,' আরেকটু হলেই গর্তে পড়তেন। সাবধানে হাঁটুন।'

নম্রতা মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে মাথা নাড়ল। আরফান মিটিমিটি হাসছিল। বলল,

‘ মনোযোগ কোথায় ছিল? কি দেখছিলেন?’

নম্রতা যেন হোঁচট খেল। একপলক আরফানকে দেখে নিয়েই বুঝতে পারল, চুরি ধরা পড়ে গিয়েছে। এই ডাক্তার খুব একটা সুবিধার নয়। চোখ-কান সজাগ, সতর্ক। তবুও নম্রতা কিচ্ছুটি স্বীকার করল না। আমতা আমতা করে বলল,

‘ আশেপাশে দেখার মতো তো অনেককিছুই আছে। রাস্তার ওপাশে একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল। ওকেই দেখছিলাম।’

আরফান হেসে ফেলল। ঠাট্টা নিয়ে বলল,‘ ও আচ্ছা আচ্ছা।’

নম্রতা খানিক রেগে গিয়ে বলল,

‘ হাসছেন কেন?’

আরফান নম্রতার মতো করেই বলল,

‘ আশেপাশে হাসার মতো তো অনেককিছুই ঘটছে। রাস্তার এপাশে একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল। তার কথা শুনেই হাসছি।’

কথাটা বলে আবারও মিটিমিটি হাসতে লাগল আরফান। নম্রতা রাগ করার চেষ্টা করেও হেসে ফেলল। আরফানের বাহুতে এলোপাথাড়ি কয়েকটি আঘাত করে বলল,‘ আপনি একদম অসহ্য।’

আরফান নিঃশব্দে হাসল। অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল,
‘ অসহ্য কেন? আমি কী একবারও বলেছি যে আপনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন? আমি আপনার কথা সরল মনে বিশ্বাস করেছি। তারপরও অসহ্য?”
নম্রতা নিভে গেল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল মুখ। কি ফাজিল ছেলে! নম্রতা আরফানের বাহুতে বেশ জোরেই

আঘাত করল এবার। কৃত্রিম রাগ নিয়ে বলল,

‘ আমি আপনার সাথে কথায় বলব না আর। এতো ফাজিল আপনি!’

আরফান হাসতে হাসতেই নম্রতার হাত চেপে নিজেকে রক্ষা করল। নম্রতাকে রাগিয়ে দিতেই বলল,

‘ আচ্ছা। কথা বলতে হবে না। আপনি বরং তাকিয়ে থাকুন।’

নম্রতা গর্জে উঠে বলল,‘ আবার?’

আরফানের মুখ ভর্তি হাসি। সেই হাসি নিয়েই বাচ্চাদের মতো আবদার করল,

‘ আপনার হাতটা ধরি?’

নম্রতা ভ্রু বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকাল,

‘ ধরেই তো আছেন।’

আরফান মুখ ভরা হাসি নিয়ে বলল,

‘ যদি নিষেধ করেন তাই আগে থেকেই ধরে আছি। রিস্ক নিতে

চাইছিলাম না। যদিও নিষেধ করলেও ধরতাম। প্রয়োজনে জোর করে।’

নম্রতা চোখ ছোট ছোট করে বলল,

‘ আমি ইভটিজিংয়ের মামলা করে দিতাম।“ আমাকে সাথে নিবেন। আমিও মামলা করব। রাস্তাঘাটে মেয়েরা এমন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলে তো রিস্ক। কেউ কেউ আবার গর্তেও পড়ে যায়।’

কথাটা বলে হাসে আরফান। নম্রতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

' আপনাকে আমি খুন করব।'

আরফান নম্রতার হাতটা চেপে ধরে রাস্তা পাড় হতে হতে বলল,

' আচ্ছা। তার আগে ফুল কিনে দিই চলুন। সবগুলো নিবেন?'বিকেল তিনটা। দুপুরের ঝাঁঝ ধরা উত্তাপটা খানিক মিইয়ে এসেছে। ডিপার্টমেন্টের পাশে লম্বা অশ্বত্থ

গাছের মাথায় ঝলমল করছে পড়ন্ত সূর্য। ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের পাশ কাটিয়ে মাঠে নেমে এলো নীরা। দিনের শেষ ক্লাসটা মাত্রই শেষ হয়েছে। নীরার দৃষ্টি স্থির। চাহনী গম্ভীর। টুলটুলে মুখটা কয়েকদিনের অবহেলায় কিছুটা শীর্ণ। এই শীর্ণতাও যেন বেশ মানিয়ে গিয়েছে তার মুখে। কাটা কাটা চেহারাটা বড্ড চোখে

লাগে। নীরা কাঁধের ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা সকাল থেকে ফোন দিয়ে যাচ্ছে। কেন দিচ্ছে তাও নীরার জানা। নীরা হাঁটতে হাঁটতেই মাকে ফোন লাগাল। বড় ক্লান্ত লাগছে তার। শরীরের সাথে মনটাও কেমন মুড়িয়ে গিয়েছে। এভাবে কী বাঁচা যায়? নীরার মা ফোন তুলেই বললেন,‘ তোর সমস্যাটা কী?’

নীরা শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমার কোনো সমস্যা নেই মা।’

‘ সমস্যা নেই তো বিয়েতে রাজি হচ্ছিস না কেন?’

অবুঝ মায়ের খুব সাধারণ প্রশ্নে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নীরা।

‘ আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না মা।’

‘ চাস না! কিন্তু কেন? ছেলের চরিত্র খারাপ? মদ,গাঞ্জা খায়?

মেয়েমানুষের নেশা আছে? ভদ্রতা জানে না? দেখতে খারাপ?’

নীরা শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ এগুলোর কোনোটাই আমার সমস্যা নয় মা। অন্তু খুবই লয়্যাল একটা ছেলে, আমি জানি।’

নীরার মা এবার তেতে উঠলেন। ভীষণ রাগ নিয়ে বললেন,‘ নিজেই বলছিস লয়্যাল তাহলে বিয়েতে রাজি হচ্ছিস না কেন? ছেলে যেহেতু

পড়াশোনা করছে চাকরি তো একদিন করবেই। ধানমন্ডিতে নিজস্ব বাসা আছে। এই যুগে ঢাকা শহরে বাসা থাকার মানে বুঝিস? ছেলের বাপ সরকারি চাকরী করেন। আহামরি টাকা পয়সা না থাকলেও ছেলের জন্য চাকরীর ব্যবস্থা ঠিকই করবেন। মেয়েটেয়ে নেই, দুটো ছেলেই। অযথা টাকা খরচের বালাও নেই। আমাদের যা অবস্থা সেই

হিসেবে সম্বন্ধটা খুব খারাপ না। ছেলের চাকরী নিয়ে একটু অনিশ্চয়তা আছে ঠিক কিন্তু এদিকেও যে আর পারা যাচ্ছে না। তোর বড় চাচা জমি নিয়ে নতুন করে ঝামেলা শুরু করেছে। তোর বিয়ে ভাঙা নিয়েও বিশ্রী বিশ্রী কথা বলে বেড়াচ্ছে। সম্বন্ধ আসার আগেই পাত্রপক্ষকে কানপড়া দিয়ে বিয়ে ভাঙাচ্ছে। এই সম্বন্ধটাও কখন

বেঁকে বসে তার কোনো ঠিক আছে? ইরারও ভার্সিটিতে দুই বছর চলে গেল। ওকেও বিয়ে দিতে হবে। আর তোর ভাইয়ের কথাও ভাব। ছেলেটা তো খেঁটেই আসছে আজীবন। আপাতত ঠিক বয়সে বিয়েটা করুক। তু...'মায়ের কথার মাঝেই ফোন কাটে নীরা। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। দিশেহারা দৃষ্টিটা খনিকের জন্য

টলমল করে উঠে। হঠাৎ করেই একটা বুঝদার কাঁধের খুব অভাববোধ করে। মনটা ছলকে উঠে বলে, ‘ আজ যদি বাবা থাকত!’ নীরার পাতলা ঠোঁটজোড়া ভেঙে আসে কান্নায়। মা আজ বলছে, সম্বন্ধটা ভালো। নীরার বিয়ে ভেঙেছে, বিপদে পড়েছে বলেই আজ চাকরীহীন ছেলের হাতে মেয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হচ্ছে না মায়ের।

অথচ আজ যদি অন্তুকে সে প্রকাশ্যেই ভালোবাসত। মায়ের কাছে অন্তুকে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরত তাহলেই প্রাচীন সব সংস্কারে ভরে উঠত মায়ের মন। অন্তুর অপূর্ণতাগুলো নিয়ে হাজার হাজার প্রশ্ন উঠত। চাকরীটা হয়ে উঠত সবচেয়ে মূল্যবান আর ভালোবাসাটা ঠুনকো। তারপরই টেনে দেওয়া হতো নিষেধাজ্ঞার

বেড়ি।আর আজ যখন... নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শরতের স্বচ্ছ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে নির্নিমেষ। আজ বাবা থাকলে এমন দ্বিধাভরা জীবন টানতে হতো না নীরার। বাবা নীরাকে বুঝত। নীরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, পথ দেখাত।ধানমন্ডির বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে নিজের জন্য বরাদ্দকৃত ঘরটিতে বসে আছে ছোঁয়া। সাদা বেড

কাভারে ঢাকা বিশাল বিছানাটিতে বইয়ের স্তূপ। মেঝের উপর কফি কাপ, মার্কার, ডট পেইন আরও কতো কি! বিছানার মুখোমুখি বিশাল জানালাটার পর্দা সরানো। বৃষ্টির পানি ঝাপটে পড়ছে গ্লাসে। বাইরের অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো লাগছে মুক্তোর মতো। বিশাল চাদরে ছোট ছোট মুক্তো ছুঁড়ে ফেললে যেমন লাগে, ঠিক তেমন। ছোঁয়া বিছানার

গদিতে ঠেস দিয়ে মেঝেতে বসে ছিল। হাতে ‘দ্য সাইকোলজি অব দ্য সিম্পসনস’ নামে একটি ইংরেজি বই। বইটা এর আগেও দুইবার পড়েছে কিন্তু আজ মনোযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। ছোঁয়া বরাবরই পড়াকু মেয়ে। পড়াশোনায় মন বসছে না এমন অভিজ্ঞতা তার নতুন। ছোঁয়া হাতের বইটা উল্টে রেখে জোড়াল শ্বাস ছাড়ল। কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দ

বৃষ্টি দেখে নিয়ে দামী ফোনটা তুলে নিল হাতে। একবার, দুইবার, তিনবারের সময় ফোনটা রিসিভ করল নাদিম। ফোন রিসিভ করেই ধমকে উঠে বলল,‘ তোর সমস্যা কি বাপ? জ্বালাইতাছিস কেন? মাঝরাতে ঘুম ভাঙাইয়া কানের কাছে কিরিংকিরিং লাগাইছত। বড়লোকি বিছানায় ঘুম আহে না? ফোন রাখ, বাল।’

ছোঁয়া নাক ছিটকে বলল,

‘ তুই আবারও এভাবে কথা বলছিস? ট্রাই টু মেইক আ পার্সোনালিটি। তোর কথা শুনে যে কেউ বমি করে ফেলবে।’

‘ এক থাপ্পড়ে দশবার বমি করাই ফেলমু তোরে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙাইয়া পার্সোনালিটি মেইক করার গল্প শোনাস তুই?তোর এই ইংরেজি আলাপ তোর ইংরেজ বাপের লগে

কর গা। আমার সাথে ইংরেজি মারাইতে আসবি তো তোর খবর আছে ছোঁয়াইয়া।'

ছোঁয়া নিজেকে সামলে নিল। আজকাল তার বুদ্ধি হয়েছে। কাজের সময় নাদিমকে রাগিয়ে দেওয়া যে বোকামো তা সে বোঝে। ছোঁয়া কিছুক্ষণ চুপ থেকে রয়ে সয়ে বলল,' আচ্ছা যা ইংরেজি আর বলব না।

এখন বল সবাই এমন অদ্ভুত বিহেভ কেন করছে? কি হয়েছে?’

নাদিম অকপটে বলে,

‘ আমার বউয়ের ছাবাল হইছে। ইন শর্ট ক্যানা হইছে। তোর কোনো সমস্যা?’

নাদিমের বলা বাক্যটা ঠিক ক্যাচ করতে পারল না ছোঁয়া। কিছুক্ষণ গাড়লের মতো বসে রইল। নাদিমের বলা বাক্যটা বার দুই আওড়ানোর

চেষ্টা করল। হচ্ছে না। ‘ক্যানা হইছে’ মানে কী? এটা কী কোনো বৈজ্ঞানিক নাম? নতুন কোনোও রোগও হতে পারে। ছোঁয়া বুদ্ধি খাটিয়ে বলল,‘ সমস্যা? না, কোনো সমস্যা নাই। তুই চিন্তা করিস না দোস্ত। মেডিকেল সাইন্স এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ক্যানার প্রতিষেধকও জলদি পেয়ে যাবি।’

ছোঁয়ার কথায় হতভম্ব হয়ে গেল নাদিম। বেশ কিছুক্ষণ মুখে কোনো কথা খুঁজে পেল না সে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তীব্র আক্রোশ নিয়ে বলল,

‘ তোরে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বাইরে ফালাই দিয়া আসতে মন চাইতাছে। ’’ক্যানা’ একটা রোগ? বলদের বলদ।’

ছোঁয়া নিভে গেল। অসহায় কণ্ঠে বলল,‘ রোগ নয়?’

‘ তুই আমার সামনে থাকলে নির্ঘাত থাপড়া খাইতি আজ। ভোলাভালা মেজাজটাই বিগড়ে দিলি শালী।’

‘ দেন হোয়াট ইজ ক্যানা? এটা বাংলা শব্দ? তোর বলা বাংলা শব্দ আমি কেন কখনও শুনি না?’

নাদিমের রাগের মাঝেও হাসি পেয়ে গেল। মনের গোমট ভাব বেশ

খানিকটা কেটে যাওয়ায় ধমকা-ধমকি না করে ফুরফুরে মেজাজে বলল,

‘ তুমি বাঙালী হলে শুনতি। তুই ইংরেজ। তোর উচিত ব্রিটেন বা আমেরিকা চলে যাওয়া। এখন ফোন রেখে ক্যানার অর্থোদ্বার কর। অর্থ বের করতে পারলে আমায় কল করবি নয়তো নয়। বেহুদা জ্বালাইছিস তো খবর আছে।’

ছোঁয়া বোকা বোকা কণ্ঠে বলে, ‘ আচ্ছা।’নাদিমের ফোন কেটে ডান হাতে চশমা ঠিক করে ছোঁয়া। মাথায় ঘুরতে থাকে একটায় শব্দ ‘ক্যানা’। ছোঁয়া গুগলে সার্চ দেয়। বানানটা ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে বিভিন্নভাবে লেখে। কিন্তু প্রত্যেকবারই একই লেখা ভেসে উঠে, ‘ ইউর সার্চ ক্যানা ডিড নট ম্যাচ এনি ডকুমেন্টস।’ ছোঁয়া বেশ কিছুক্ষণ অসহায় মুখে বসে

থেকে বাবার লাইব্রেরিতে যায়। পুরো লাইব্রেরি গেঁটে পুরনো-নতুন তিনটা বাংলা অভিধান খুঁজে পায় সে। ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে চশমাটা ঠিক করে চেয়ার টেনে বসে। অভিধানের প্রতিটি পাতা মনোযোগ দিয়ে দেখে, হয়ার ইজ ক্যানা? ঘন্টা দুয়েক পর লাইব্রেরির দরজায় হালকা টোকা পড়তেই চোখ তুলে তাকাল ছোঁয়া। বাবাকে দরজায়

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হালকা হাসল,‘ হেই বাবা। হোয়াটস আপ?’ সালাম সাহেব বিস্ময় নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজা ছাঁড়লেন। ভেতরে ঢুকে সামনে থাকা অভিধানগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন,

‘ নাথিং মাচ। কিন্তু এতো রাতে এসব কী? কি করছ?’

‘ একটা শব্দ খুঁজছি বাবা। ডু ইউ নো? আই এম নট মাচ ফ্লুয়েন্ট ইন ব্যাঙ্গলি।’

সালাম সাহেব চেয়ার টেনে বসলেন। বেশ উৎসাহ নিয়ে বললেন,

‘ বাংলায় দুর্বলতাটা আমারও আছে। ছোটবেলায় ব্যাকরণের বইগুলো না বুঝেই মুখস্ত করতাম আর বাবার কাছে বেদারম মার খেতাম। এনিওয়য়ে, কী শব্দ খুঁজছ?’

‘ ক্যানা। তুমি কী এই শব্দটার অর্থ জানো বাবা?’সালাম সাহেব অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,

‘ এটা কোনো বাংলা শব্দ, তুমি শিওর?’

ছোঁয়া মাথা নেড়ে বলল,

‘ হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট শিওর। নাদিম প্রায় সময়ই বাংলাতে কথা বলে।

যদিও ওর বাংলাগুলো ভীষণ অদ্ভুত।'

সালাম সাহেব মুখ কুঁচকে ফেললেন। বিরক্তি নিয়ে বললেন,

' নাদিম? দেট স্কাউনড্রেল? তুমি এখনও ওর সাথে মিশো?'ছোঁয়া উত্তর দেয় না। উদাস ভঙ্গিতে একের পর এক পাতা উল্টাতে থাকে। মনটা ভালো লাগছে না তার। সারাদিন বইয়ে মুখ ডুবিয়ে থাকলেও

বন্ধু মহলের পরিবর্তনটা চোখ এড়ায়নি ছোঁয়ার। আগের মতো আড্ডা বসছে না। কেউ ঠিকঠাক ক্লাসে আসছে না। আজকাল রঞ্জনও কেমন গম্ভীর। অন্তু, নাদিমের দেখা নেই। নীরা-নম্রতাও তাই। ছোঁয়াকে কেউ কিছু না বললেও সে বুঝে, কিছু একটা ভালো হচ্ছে না। কোথায় একটা বড্ড গোলমাল। ভেঙে যাওয়ার পূর্বাবাস। এই বন্ধুমহল

ছাড়া ছোঁয়ার জীবনে ভিন্ন স্বাদ, আনন্দ বলে কিচ্ছু নেই। ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বোকা,সরল মনটা ভীষণ টনটন করছে। অদৃশ্য একটা ভয়ে কাটা হয়ে উঠছে। এই ভয়টা কী হারানোর ভয়?নাকি হারিয়ে যাওয়ার ভয়?রাতের শেষ ভাগ। ঘরজুড়ে সবুজ রঙের হালকা আলো। বিছানার এক কোণায় মাথা নিচু করে বসে আছে অন্তু। বাকি

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে অয়ন। অন্তু মাথা তুলে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। অয়নের মুখে এখনও বাচ্চাদের ছাপ। সেদিনও 'ভাইয়া' ' ভাইয়া' করে মাথা পাগল করে দেওয়া ছেলেটা এখন ক্লাস টেনে পড়ে ভাবতেই অবাক লাগে অন্তুর। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ সরিয়ে নেয়। মনটা বড় অস্থির। এক জায়গায়

দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দেওয়া কঠিন। অন্তু দিশেহারা চোখে চারপাশে তাকাল। সবুজ আলোয় দৃষ্টিটা ভেসে ভেসে আটকে গেল টেবিলের পাশে রাখা অয়নের গিটারটার উপর। অয়ন গান গাইতে পারে না তবুও তার গিটারের খুব শখ। দুই বছর আগে টাকা জমিয়ে অন্তুই কিনে দিয়েছিল এই গিটার। অন্তু উঠে গিয়ে গিটারটা তুলে নিল হাতে।

সাথে সাথেই চোখের সামনে ভেসে উঠল নাদিমের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। চায়ের স্টলে বসে প্রাণখোলে গান গাওয়া বন্ধুদের আড্ডাটা। অন্তু গিটার হাতে বারান্দায় গিয়ে বসল। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া প্রকৃতির দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। জ্যোৎস্নায় গিটারের গা ভাসল। চিকচিক করে উঠল গিটারের মসৃন গা। অন্তু বেশ

কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীরে ধীরে আঙ্গুলগুলো সচল হয়ে উঠল। মায়াবী জ্যোৎস্নায় বেজে উঠল এক বিরহী সুর। আনমনা অন্ত আজ অনেকদিন পর গলা ছেড়ে গাইল,‘

এখন আমি অনেক ভালো
তোমায় ছাড়া থাকতে পারি
বলে না তো কেউ আমাকে
করো না বাড়াবাড়ি।।

আমার আকাশ, আমার সবই
আমি আমার মতো গুছিয়ে নিয়েছি।
যদি স্বপ্নটাকে আপন করে দেখতে শেখালে
তবে মাঝ পথে হাতটা ছেড়ে কী বোঝালে?
ভালোবাসি তোমায় আমি একথা জানি
তবে বলব না আর আগের মতো, এখন আমি। 'হঠাৎই থেমে গেল

সুর। নিশ্চুপ অন্তু চুপ করে চেয়ে রইল দূরে। একসময় পকেট থেকে ফোন বের করে গ্যালারিতে ঢুকল অন্তু। হাত চলছে যন্ত্রের মতো। প্রাণহীন, অনুভূতিহীন। কুতুবদিয়ার একটি হতশ্রী চা স্টলে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ছয় বন্ধু। সবার মুখেই বিস্তর হাসি। নাদিমের হাতে গিটার। অন্তু দুইহাত ছড়িয়ে দিয়েছে নাদিম আর রঞ্জনের কাঁধে। ছবিটা

দেখতে দেখতে চোখদুটো জ্বালা করে উঠল অন্তর। হঠাৎই হাতের ফোনটা ছুঁড়ে ফেলল ফ্লোরে। নির্জীব ফোনটা দেয়ালের সাথে লেগে ছিটকে পড়ল দূরে। অন্তু দুই হাতে মুখ চেপে বসে রইল। হাত সরিয়ে চুলগুলো খামচে ধরে কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিল। দীর্ঘ চারবছরের পাগলামোতে আজ সে হার মানল। নীরাকে আর চাই না তার। থাকুক

সে তার মতো। শুধুমাত্র নীরাকে পাওয়ার পাগলামোতে কতকিছুই না করেছে অন্ত। পরিবার, বন্ধুমহল সবার থেকে দূরে সরে গিয়েছে। নিজের জীবন থেকেও কী দূরে সরে যায়নি? নীরার অবহেলা,ঘৃণায় ভেতরের ভালোবাসাটা থিতিয়ে গিয়েছে। ভালোবাসাটা গলার কাছে আটকে থেকে দমবন্ধ করে দিতে চাইছে বরংবার। অন্তর ভেতরটা

জ্বলেপুড়ে উঠে। একের পর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকজুড়ে। নীরাকে সে ভুলতে পারবে না ঠিক। কিন্তু তাকে মনে রাখাটাও তো যন্ত্রণার। অপমান, অবহেলা সইতে সইতে অন্তু এখন ক্লান্ত। এবার তার মুক্তি চাই। যত কষ্টই হোক অন্তু লড়বে। যে তাকে চাইছে না তাকে জোরপূর্বক পাওয়ার থেকে নিজের সাথে লড়াই করাটা সহজ। সেই

লড়াইয়ে আত্মসম্মান হারানোর ভয় থাকে না। মাথা নোয়াতে নোয়াতে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার ভয় থাকে না। প্রিয় বন্ধু, পরিবার হারানোর ভয় থাকে না। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অন্তু। মস্তিষ্কের পর্দায় জোর দিয়ে বলে উঠল নাদিম,' দূর শালা! মাইয়া মানুষ নিয়া এতো ভাবুন লাগে

নাকি? তুই খালি ক কেমুন মাইয়া লাগব। আমি আছি না?’

অন্তু হাসল। পরমুহূর্তেই প্রচন্ড অনুশোচনায় হাসফাস করে উঠল মন। নিজের দোষটুকু চোখের সামনে প্রকান্ড হয়ে ধরা পড়লেও নাদিমকে বলার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। বন্ধুদের কী ঘটা করে সরি বলা যায়? সরি বললেই কী সব সমাধান হয়? অন্তুর ভাবনার মাঝেই

বারান্দার দরজা থেকে ভয়ে ভয়ে ডেকে উঠে একটি কণ্ঠ,

‘ ভাইয়া?’

অন্তু চোখ ফিরিয়ে তাকায়। বারান্দার দরজায় জড়োসড়ো অয়নকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে,‘ কি ব্যাপার? উঠেছিস কেন? কিছু বলবি?’

অয়ন ঘুমু ঘুমু কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি যে গিটার বাজাচ্ছিলে। গিটারের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছে।’

‘ ওহ। খেয়াল ছিল না।’

অয়ন দরজার কাছেই ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে বলল,

‘ তোমার কি মন খারাপ ভাইয়া?’

অন্ত গভীর চোখে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে হেসে বলল,

‘ মন খারাপ কেন থাকবে? মন খারাপ না। তুই ঘুমো।’

অয়ন ধীর পায়ে ভাইয়ের পাশে গিয়ে বসল। মিনমিন করে বলল,

‘ তুমি নীরা আপুকে খুব ভালোবাসো না?’

অন্ত হাসল। ভাইয়ের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল,‘ হ্যাঁ বাসি।’

‘ নীরা আপু বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে। তুমি মন খারাপ করো না।’

অন্ত জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আমি মন খারাপ করছি না অয়ু। নীরাকে আমি নিজেই বিয়ে করতে

চাই না। নীরা রাজি হয়ে যাক এমন কিছুও চাইছি না।’

অয়ন অবাক চোখে চেয়ে থাকে। বিস্ময় নিয়ে বলে,

‘ তুমি নীরা আপুকে বিয়ে করবে না?’অন্তু হাসে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকায়। পূর্ব আকাশে তখন লালাভ আভা। অন্তু সকালের সূচনালগ্নে চেয়ে থেকে বিসর্জন দেয় নীরা নামক

মেয়েটিকে। বুক ভরা ভালোবাসাটুকু বন্ধী করে নেয় গোপন কালো কুঠুরে। বাবাকে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবে অন্তু। এই অশান্তি, এই দগ্ধ- বিদগ্ধের খেলার ইতি টানবে এবার।সকালে খাবার টেবিলে বসেই অপ্রত্যাশিত এক খবর কানে এলো অন্তুর। আনিসুল সাহেব যখন জানালেন, ‘ নীরা বিয়েতে রাজি হয়েছে’ তখন কয়েক সেকেন্ডের

জন্য বোবা বনে গেল সে। কানদুটো ঝা ঝা করে উঠল। ‘নীরা রাজি হয়ে গিয়েছে’ এই ছোট্ট খবরটা মস্তিষ্কের নিউরনগুলোতে বিষের মতো ঠেকল। এই একই খবর তিন-চারদিন আগে পেলেও খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ত অন্তু। কিন্তু আজ এই খুশিই তার কাছে ভারী এক বোঝা বলে মনে হলো। নীরাকে সে চাইত, এখন আর চায় না। কিন্তু ভাগ্যের

গুঁটি ভিন্ন।সেই সাথে ভিন্ন তার চাওয়া-পাওয়ার হিসেব। নীরাকে সে বাস্তবিকই ভালোবাসে। কিন্তু সেই ভালোবাসার নির্যাসটা আজ বিদঘুটে, বিষাক্ত। নীরাকে কাছে পেতে চাওয়া মনটা এখন আর নেই। হাজারও ঘাত-প্রতিঘাতে পঁচে গলে গিয়েছে সেই কবেই। অন্ত এখন একটু শান্তি চায়। নিজেকে একটু গুছাতে চায়। কিন্তু তার এই ক্লান্ত জীবনে নীরা

নামক মানবীকে আর চায় না। এই এক নীরাকে নিয়ে এতো জল ঘোলা হয়েছে যে সেই জলে নিজেদের হাসিখুশি চেহারা দেখার উপায় নেই। দুইজনের সম্পর্কটাও তো আগের মতো মসৃণ নেই। ভালোবাসা নামক পাটাতনে অপমান, অস্বস্তি, ক্ষোভ, রাগ, জেদ এতো বেশি জমে গিয়েছে যে সেই পটাতন ধোঁয়ে মুছে মসৃণ করার সাধ্য একা অন্তর নেই। সেই

চেষ্টাটাও সে করতে চায় না। তার শুধু মুক্তি চাই। মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে চায়।অন্ত নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর আগেই খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন আনিসুল সাহেব। অন্তর আর খাওয়া হলো না। মাথায় এক ঝাঁক চিন্তা নিয়ে খাবারের প্লেট ঠেলে উঠে এলো ঘরে। বিছানায় মাথা চেপে ধরে বসে থাকতে থাকতে নীরার চিন্তাটাও মস্তিষ্কে

খেলে গেল তার। অন্তু বিয়েটা নাকজ করে দিলে বেচারী নীরাকে আবারও একবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আগুনে । যে মেয়ের বার বার বিয়ে ভেঙে যায় সেই মেয়ের চরিত্র নিয়ে নানান কথা তো উঠবেই। অন্তুর মুখটা বিরক্তিতে তেতো হয়ে উঠে।সামনে থাকা চেয়ারটায় জোরে লাথি দিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কাঠের চেয়ার মুখ

থুবড়ে পড়ে ফ্লোরে। অন্তুর রাগ কমে না। এই দমবন্ধ জীবন আর ভালো লাগে না। এতোকিছুর পর ভোঁতা হয়ে যাওয়া অনুভূতি নিয়ে নীরাকে কাছে টানা সম্ভব নয়। বিয়ে করে তাকে আগের মতো সুখী করার চেষ্টাও এখন প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে এই বিশ্রী সমাজে মেয়েটাকে একা ছেড়ে দেওয়াও কোনো পুরুষোচিত কাজ নয়। অন্তুর

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে। এই মানসিক চাপের মুখে নাদিমের সাথে দূরত্ব মেটানোর ব্যাপারটা সে বেমালুম ভুলে যায়। খাওয়া শেষেই নাদিমের হলে হানা দেওয়ার সিদ্ধান্তটা হাজারও চিন্তার ভাঁজে চাপা পড়ে। সব ঠিক হতে হতেও এলোমেলো হয়ে যায় সব!“যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

আমি বাইব না
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে গো
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে”

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবি ঠাকুরের গানটি শুনতে শুনতেই ঘুম ভাঙল নম্রতার। সকালের আলো তখন আছড়ে পড়ছে বারান্দায়। স্বচ্ছ কাঁচের জানালায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে

ভোরের প্রথম কিরণ। নম্রতা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। মোবাইল হাতে সময়টা দেখে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বিছানা ছাড়ল। দুইদিন হলো হল ছেড়ে বাড়ি এসেছে নম্রতা। গত দুইদিন যাবৎ এই একই গানে ঘুম ভাঙছে তার। নম্রতা জানে আগামী দুইদিনও এই একই গানে ঘুম ভাঙবে তার। নম্রতার ব্যারেস্টার বাবা সব কাজেই

বিশেষ কিছু প্যাটার্ন মেনে চলেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গান শোনার মাঝেও তার অদ্ভুত এক প্যাটার্ন আছে। নম্রতা ঘুমু ঘুমু চোখে বাড়ির টানা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ব্যারেস্টার নুরুল মাহমুদ কাঠের চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছেন। চোখে ভারী চশমা। ঠোঁটদুটো গানের তালে তালে মৃদু নড়ছে। চেয়ারের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা পুরোনো ক্যাসেট

থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গাইছেন, ‘চুকিয়ে দেব বেচা কেনা মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব .... ‘ নম্রতা এলোমেলো চুলগুলোকে হাত খোপা করতে করতে বলল,‘ শুভ সকাল বাবা।’

নুরুল সাহেব মুখ তুলে চাইলেন। আজ তাঁর মন ফুরফুরে। মেয়েকে দেখেই মনের ফুরফুরে ভাবটা

ঠোঁটের কোণে ধরা পড়ল। মুখভর্তি হাসি নিয়ে বললেন,

‘ শুভ সকাল মা। আয় বোস। চা খাবি?’

নম্রতা অলস পায়ে বাবার কাছে গিয়ে বসল। বাবার গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে বলল,

‘ উহু। আমি এখনও ফ্রেশ হইনি। তোমার মনটা কী আজ খুব ভালো বাবা?’

‘ অবশ্যই। এই চমৎকার দিনে সবারই মন ভালো থাকা উচিত।’

নম্রতা হাসল। সোজা হয়ে বসে বাবার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, ‘ তুমি আজও মাকে ফাঁকি দিয়ে চায়ে চিনি মিশিয়ে নিয়েছ, বাবা?’

নুরুল সাহেবের চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। খুশি হয়ে বললেন,‘ তোর মা পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা মহিলা। এই বোকা মহিলাকে বিয়ে

করাটা আমার উচিত হয়নি। আমি যখন ভার্সিটিতে পড়তাম তখন আমার এক বান্ধবী ছিল, রত্না। প্রচন্ড ইন্টেলিজেন্ট একটা মেয়ে। চোখের দিকে তাকিয়েই ফট করে বলে ফেলত, "তুমি মিথ্যে বলছ নুরুল।" ভাবতে পারছিস? আই শ্যুড হ্যাভ মেরি হার।'

নম্রতা হেসে ফেলল। চেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসল। পত্রিকার

বিনোদনের পৃষ্ঠাটা তুলে নিতে নিতে বলল,
‘ তোমার রত্না নামক ইন্টেলিজেন্ট বান্ধবীর কথা মা শুনে ফেললে কী হবে বাবা?’
নুরুল সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকালেন। পত্রিকাটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। ফিসফিস করে বললেন,‘ তোর মা মারাত্মক মহিলা।

রত্নার ব্যাপারটা জানলে সে আমাকে দুই তলা থেকে ফেলে দিতে দ্বিতীয়বার ভাববে না।’

‘ তাহলে বাসায় একটা ইন্সট্যান্ট ডাক্তার দরকার তাই না বাবা? ধরো, মা তোমাকে দুই তলা থেকে ফেলে দিলো আমরা তোমাকে ঘরে এনে নিজস্ব ডাক্তার দিয়েই ফিটফাট করে ফেললাম। এক্সট্রা টাকা খরচ হলো না। অ্যাম্বুলেন্স খরচও মাফ।’

নুরুল সাহেব সরু চোখে তাকালেন। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন,
‘ তুই কী কোনো ছেলে সম্পর্কে আমায় কনভেন্স করার চেষ্টা করছিস?’
নম্রতা মাথা নেড়ে আবারও বাবার গায়ে গা এলিয়ে দিল। নুরুল সাহেব কুঁচকানো ভ্রু নিয়ে বললেন,‘ হু ইজ দিস রাস্কেল?’

নম্রতা আহ্লাদী কণ্ঠে বলল,

‘ একটা ডাক্তার।’

‘ তোর পত্রপ্রেমিকের কী হলো? গীভ আপ?’

‘ এটাই সেই। পত্রপ্রেমিক থেকে ডাক্তার।’

নুরুল সাহেব চমকে তাকালেন। পরমুহূর্তেই হেসে বললেন,

‘ ব্যাটাকে ধরে ফেলেছিস? গুড জব! গুড জব!’

নুরুল সাহেব আর নম্রতার কথার মাঝেই একরকম উড়ে এলো নন্দিতা। পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে হাত-পা ছড়িয়ে দিল সে। ঘুমু ঘুমু কণ্ঠে বলল,‘ ধরে যখন ফেলেছ তখন চট করে বিয়ে করে ফেলো না বাপু। তোমার জন্য আমার বিয়ে আটকে আছে।’

নম্রতা উঠে বসল। অবাক হয়ে বলল,

‘ তোর বিয়ে আটকে আছে মানে? এই তোর বয়স কত? মাত্র সেভেনে পড়িস আর এখনই বিয়ে?’

‘ তো? সেভেনে পড়ি তো কী হয়েছে? তুমি জানো? দাদির বিয়ের বয়স তেরো। আর আমি ফোর্টিন ইয়ারস্ ওল্ড। এক বছর অলরেডি চলে গিয়েছে।’

নম্রতার বিস্ময় যেন আকাশ ছুঁলো। উঠে গিয়ে নন্দিতার কান টেনে ধরে বলল,

‘ তুমি একটু বেশি পেকে গিয়েছ।’

নন্দিতা বোনের থেকে কান ছাড়িয়ে বাবার কাছে আশ্রয় নিল। বাবার পাঞ্জাবির বোতামে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল,

‘ আমার অতো পড়াশোনা ভাল্লাগে না বাবা। তুমি আমাকে বিয়ে শাদী

দিয়ে দাও তো। রোজ রোজ এই বোরিং অঙ্ক করতে বিরক্ত লাগে। রোজ করি তবুও থার্টি ফাইভ। টিচাররা আমায় আসলে দেখতেই পারে না বাবা। ইচ্ছে করে নাম্বার কম দেয়, সত্যি বলছি।'বোনের ফাঁকিবাজি কথা শোনে হেসে ফেলল নম্রতা। নুরুল সাহেব প্রত্যুত্তরে কিছু বলবেন তার আগেই ফোন বাজল নম্রতার। গোটা পাঁচদিন বাদে ফোন

দিয়েছে আরফান। নম্রতা ফোন তোলার আগেই লাফিয়ে গিয়ে খপ করে ফোন নিয়ে নিল নন্দিতা। দৌঁড়ে গিয়ে বাবার গা ঘেঁষে স্ক্রিনে ভাসা নামটা পড়ল, ‘ডাক্তার’। চকচকে চোখে ফোনটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ বাবা? ডাক্তার! ইউ শুড টেইক আ এপেয়েন্টমেন্ট ফ্রম হিম।’

নম্রতা বার কয়েক ফোন নেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে হেসে ফেলল। চেয়ারে বসে বলল,‘ গো এহেড।’

ততক্ষণে ফোন রিসিভ করে নুরুল সাহেবের কানে ধরেছে নন্দিতা। নুরুল সাহেব কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ওপাশ থেকে নিরেট পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এলো,

‘ হ্যালো ম্যাডাম!’

নুরুল সাহেব শব্দ করে গলা পরিষ্কার করলেন। গমগমে কণ্ঠে বললেন,

‘ হ্যালো।’

নম্রতার বদলে কোনো পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে আসতেই থমকে গেল আরফান। কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে সন্দিহান কণ্ঠে আবারও বলল,

‘ হ্যালো?’

‘ আমি শুনতে পাচ্ছি।’

নুরুল সাহেবের উত্তর শুনে মুখ চেপে হাসি আটকাল দুই বোন।
আরফান থতমত খেয়ে বলল,
‘ আমার জানা মতে এটা নম্রতার নাম্বার। আপনি কে?’
নুরুল সাহেব ধমক দিয়ে বললেন,
‘ হু আর ইউ? নাম কি তোমার?’
আরফান হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কলের পুতুলের মতো বলল,‘ নিষ্প্রভ।’
‘ তুমি ডাক্তার?’

‘ জি।’

‘ তুমি ডাক্তার হয়ে আমার মেয়েকে ফোন দিয়েছ কেন? আমার মেয়ে কী হসপিটাল রিপ্রেজেনটেটিভ? ‘

আরফান কথা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কথার আগা-মাথা গুলিয়ে জগা খিচুড়ি বেঁধে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে নিজেকে শান্ত করল আরফান। জোড়াল একটা শ্বাস নিয়ে

বলল,‘ নম্রতার সাথে আমার কথা ছিল, স্যার।’

‘ আমার মেয়ের সাথে তোমার কী কথা?’

আরফান এবার বিপাকে পড়ল। কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল,

‘ কোনো কথা নেই স্যার। রাখি, আসসালামু.... ‘

আরফানের কথার মাঝেই ধমকে উঠলেন নুরুল সাহেব,

‘ এই ছেলে? একদম ফোন কাটবে না। এমন ম্যা ম্যা করছ কেন? ম্যা ম্যা টাইপ ছেলে আমি একদম পছন্দ করি না। আর কোনো কথা না থাকলে ফোন করেছ কেন? হুয়াই?’

আরফান চুপ করে রইল। নন্দিতা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চেয়ারে। নম্রতা নন্দিতার মাথায় একটা চাটি মেরে আহ্লাদী চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টাল।

নুরুল সাহেব অল্প হেসে ফোনটা টেবিলের উপর রেখে উঠে গেলেন। নম্রতা ঝটপট ফোনটা কানে নিয়ে বলল,‘ হ্যালো?’

পরিচিত কণ্ঠস্বরে আরফান যেন প্রাণ ফিরে পেল। ফিসফিস করে বলল,

‘ আশ্চর্য! কোথায় ছিলেন আপনি?’

নম্রতা উত্তর না দিয়ে বলল,

‘ আপনি ফিসফিস করে কথা বলছেন কেন?’

আরফান কেশে গলাটা হালকা পরিষ্কার করে বলল,
‘ কোথায় ছিলেন আপনি? আপনার বাবা ফোন রিসিভ করে ফেলল আপনি খেয়াল করেননি?’
নম্রতা হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘরে এসে দরজা দিল। ঠোঁট টিপে হেসে বলল,
‘ খেয়াল করব না কেন? আমিই তো দিলাম।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,‘ আপনি দিলেন! মানে কী?’

‘ কেউ যদি আমায় সপ্তাহে একবারও মনে না করে তবে আমার মন খারাপ হয়। সেই মন খারাপের দায়ে এতটুকু পানিশমেন্ট তো ডাক্তারবাবুর প্রাপ্যই।’

‘ ব্যস্ত ছিলাম। আপনিও তো ফোন দেননি। উল্টো ফোন বন্ধ।’

নম্রতা মুখ ভার করে বলল,

‘ এতো কেন ব্যস্ত থাকেন আপনি?’
‘ ডাক্তারদের যে ছুটি নেই তাই। সবসময় অন ডিউটি। কখনও ক্লাস। কখনও রাউন্ড। কখনও পেশেন্ট। সময় কোথায়?’
নম্রতা ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ তাহলে এসব ডাক্তার ফাক্তারকে বিয়ে করা যাবে না। বিয়ের পরও ব্যাচেলরদের মতো টাইম স্পেন্ড করতে হবে। কে

জানে? দেখা গেল, নতুন নতুন ঔষধের নাম মুখস্থ করতে গিয়ে ডাক্তারবাবু তার বউয়ের নামই ভুলে গেল! নাহ্ আমি কোনো রিস্ক টিস্ক নিব না। আমার হাজবেন্ড অন ডিউটি চাই। পার্ট টাইম হাজবেন্ড গ্রহণযোগ্য নয়।’

আরফান হেসে ফেলল। হাস্যোজ্জ্বল কন্ঠে বলল,

‘ তাই নাকি?’

‘ একদম।’

‘ অন ডিউটি হাজবেন্ডের স্যালারী কী হবে? লোভনীয় কিছু হলে ডাক্তারী ছেড়ে হাজবেন্ডের ডিউটি করা যেতেই পারে। স্যালারী কী লোভনীয় খুব?’

নম্রতা লজ্জা পেয়ে গেল। হেসে বলল,

‘ আপনি অসহ্য!’

‘ আচ্ছা! আমি আর কী কী?’বিষণ্ন সন্ধ্যার পর রাত নেমেছে শহরে। নিশুতি অন্ধকার কাটিয়ে বেজে চলেছে সূক্ষ্ম, বিরহী সুর। গিটারের তার আর শিল্পী আঙ্গুলের অবাধ্য নৃত্যে চারপাশটা হয়ে উঠেছে জন্ম দুঃখী। বড় বেশি বিষণ্ন। রঞ্জন ব্যাগ গুছাচ্ছিল। সুরটা কানে আসতেই থমকাল হাত। বুক বেয়ে উঠে এলো তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। ব্যাগটা পাশে ফেলে

নাদিমের সামনে বিছানায় এসে বসল। নাদিমের আঙ্গুল নির্ভুল ছুটছে। রঞ্জন কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলল,

‘ তোদের খুব মিস করব দোস্ত। তোদের ছাড়া থাকতে হবে ভাবতেই দমবন্ধ লাগছে।’

নাদিমের আঙ্গুল থামল। চোখ মেলে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে গিটারটা পাশে রাখল। চেয়ারে গা এলিয়ে

বিছানায় পা দুটো তুলে দিয়ে আরাম করে বসল। ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ মাইয়া গো মতো এতো সেন্টি খাইতাছস ক্যান মামা? এইজন্যই জিগায়, তোর সব ঠিকঠাক আছে নাকি নাই? আমারে কিন্তু কইতে পারস। আমি কাউরে কমু না।’রঞ্জন নাদিমের পায়ে সজোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল,

‘ শালা তুই আসলেই এক নম্বরের হারামি। লাইফে কোনো সিরিয়াসনেস নেই। কাল পরশো আমি চলে যাব অথচ তুই ফাইজলামি করছিস।’

‘ সিরিয়াসনেস দিয়া কোন খাল কেটে ফেলবি বাপ? আইচ্ছা যা, আমি এহন সিরিয়াস। আয় তোরে একটু আদর কইরা দেই। যাবি গা। দীর্ঘ বিরহের আগে মিষ্টি আদর।’

রঞ্জন হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কয়েক সেকেন্ড কটমট করে চেয়ে থেকে ধুম করে লাথি মারল নাদিমের চেয়ারে। নাদিম উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিল। বুকে থুতু ছিটিয়ে বিস্ময় নিয়ে রঞ্জনের দিকে তাকাল,

‘ মামা তুমি তো দেখি ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছ। এতো ভায়োলেন্ট হইলেও কিছু হব না। আমি চুস্মার

বেশি কিছু দিতে পারুম না।’রঞ্জনের মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। নাদিমের কোমর বরাবর লাথি মেরে উঠে দাঁড়াল। শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে বলল,

‘ আজ তোকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।’

নাদিম দাঁত কেলিয়ে বলল,

‘ কাম, কাম। কাম বেবি।’

রাগে ফুঁসতে থাকা রঞ্জনের হাতে বেশ কিছু শক্ত ঘুষি খেয়ে। নিজেও কিছু দিয়ে। অল্প কিছুক্ষণের হাতাহাতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই। আহত চোয়াল,কপালে হাত বুলাতে বুলাতে একে-অপরের দিকে কটমট করে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ থেকে হঠাৎই ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল দু'জনে। নাদিম ডানহাতে নিজের কাঁধটা চেপে ধরে

বলল,‘ বহুত শক্ত মাইর দিছস বা*।’

রঞ্জন নিজের চোয়ালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,

‘ তোর হাতে এতো শক্তি এলো কবে থেকে? চাপার দাঁত নড়ে গিয়েছে নির্ঘাত।’

তারপর কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। বাইরে শন শন বাতাস বইছে। আজ আবারও

ঝড় উঠবে মনে হয়। রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ নীরা রাজি হয়েছে বিয়েতে। অন্তত শেষমেশ পাচ্ছে ওকে।’

নাদিমের বুকে অদ্ভুত এক খুশি দামামা বাজিয়ে গেল। হঠাৎ ঠোঁটে ভাসল সত্যিকারের হাসি। চকচকে চোখে চেয়ে বলল,‘ তাই নাকি? রোমিও জুলিয়েটের উপখ্যান শেষ

হচ্ছে তাহলে। শালারা কি নাটকটাই না দেখাইল।’

রঞ্জন বিষণ্ন চোখে নাদিমের দিকে তাকাল। নাদিমের কাঁধে হাত রেখে বলল,

‘ নিজেদের মাঝে আর ঝামেলা রাখিস না দোস্ত। অন্তু তো সবসময়ই ছেলেমানুষ, শর্ট ট্যাম্পার। কিন্তু তুই তো বুঝিস।’

নাদিমের খুশিটা হঠাৎ-ই থিতিয়ে গেল। মনে তৈরি হলো গুমোট অন্ধকার। অতি সন্তপর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসার চেষ্টা করল,‘ কবে ফিরবি তুই?’

‘ এখনই ঠিক বলতে পারছি না।’

এটুকু বলে থামল রঞ্জন। তারপর খুব উদাস কণ্ঠে বলল,

‘ আমি ফিরে এসে তোদের এভাবেই পাব তো দোস্ত?’

নাদিম রঞ্জনের কাঁধ চাপড়ে বলল, ‘ পাবি না কেন? অবশ্যই পাবি। আমাদের আর কি হবে?’

নাদিমের প্রাণহীন কথাটি রঞ্জনকে খুব একটা শান্তি দিতে পারল না। পুরু ঠোঁটের উপর মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো জড়ো করে চুপ করে বসে রইল। উদাস, চিন্তিত চোখদুটো নিবদ্ধ হয়ে রইল ফ্লোরে। নাদিম আস্তে ধীরে সিগারেট ধরাল। নাকে-মুখে ধোঁয়ার

কুন্ডলী ছড়িয়ে উঠে গিয়ে ব্যালকণিতে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের পরিবেশটা পর্যবেক্ষণ করে বলল,

‘ আজকেও ঝড় হইব মনে হয়। শরৎকালেও ঝড়-বৃষ্টি! স্ট্রেঞ্জ।’রঞ্জন উত্তর দিল না। উঠে গিয়ে নিজের ব্যাগ গুছাতে মনোযোগ দিল। ঝুম বৃষ্টিতে ব্যালকণির রেলিঙটা যখন ভিজে গেল। আকাশটা শুভ্র ঝিলিকে দ্বিখন্ডিত হয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

তারই এক ফাঁকে খবরটা দিল রঞ্জন,

‘ কাল অন্তু-নীরার বিয়ে। ঘরোয়াভাবেই হবে। কোথাও উধাও হয়ে যাস না। আমরা বিয়েতে যাচ্ছি। নম্রতা – ছোঁয়াও আসছে। এই দিনটির জন্য কত পাগলামোই না করেছে অন্তু। তোর মনে....’

নাদিম উত্তর দিল না। রঞ্জনের বাকি কথাগুলো তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছাল

না। সিগারেটের বিষাক্ত নিকোটিন ফুসফুসে টেনে নিয়ে অন্ধকার বৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল। কপালে ফুঁটে উঠল বেশকিছু সরু চামড়ার ভাজ। বজ্রপাতের শব্দকে ছাঁপিয়ে নাদিমের ভেতরের বিদ্বেষী মানুষটি হঠাৎই ভীষণ ক্ষোভ নিয়ে বলে উঠল,' তোমার নিজেকে ঘৃণা করা উচিত নাদিম।'

নাদিম চমকে উঠে বলল,

‘ কেন?’

‘ কেন! কারণ তুমি গুরুত্বহীন। তুমি বোকা! বন্ধুদের জন্য প্রাণ দিতে চাও অথচ বুঝতে চাও না তাদের কাছে তুমি মূল্যহীন। তোমার বিন্দুমাত্র সেল্ফ রেসপেক্ট নেই।’

‘ বাজে কথা। আমি কবে কার মূল্যের আশায় বেঁচে ছিলাম? আমি একা বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত। কারো গুরুত্বের পরোয়া তো কখনো

করিনি। তুমি আমাকে ডিসট্রেক্ট করার চেষ্টা করছ। কাজটা ঠিক হচ্ছে না।“ কোনোদিন কারো গুরুত্বের পরোয়া করোনি ঠিক। কিন্তু এতটা সস্তাও তো হওনি।’

‘ হয়নি? তবে কী আজ হচ্ছি?’

‘ অবশ্যই হচ্ছ। অন্তত সেদিন রেগে ছিল মানছি। তুমি বলেছ, ছেলেটির বড় কষ্ট। সেটাও মানছি। কিন্তু আজ? আজ তো কোনো সংকট নেই

তার। যাকে পাওয়ার জন্য এতোদিনের পাগলামো, তাকেই পাচ্ছে। আজ সে আনন্দিত, সুখী। তার সেই সুখের খবর সবাইকে জানালেও তোমাকে জানানোর প্রয়োজনবোধ সে করেনি। তুমি তার কাছে গুরুত্বহীন বলেই হয়তো তার এতো অপারগতা।’

নাদিম সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল দূরে। নতুন আরেকটা

সিগারেট ধরিয়ে নাক-মুখে ধোঁয়া ছড়াল। বিদ্বেষী মানুষটি হিসহিসিয়ে বলল,‘ এরপরও? এতোকিছুর পরও তার বিয়েতে তুমি যাবে? যে তোমায় চাইছে না তার কাছে এতোটা বেহায়া তুমি হবে নাদিম?’

নাদিম অন্যমনস্ক হয়ে বলল,

‘ ও যে আমার বন্ধু।’

‘ বাজে কথা।’

‘ তবে কী যাওয়া উচিত নয়?’

‘ কক্ষনো নয়।’

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কাছে কোথাও প্রচন্ড শব্দে বাজ পড়ল। নাদিমের মনে হলো বাজটা কাছে কোথাও নয় পড়ল তার মনে। ভগ্ন হৃদয়টা প্রচন্ড অভিমান নিয়ে বলল, ‘ খবরটা আমায় তুই নিজে কেন দিলি না অন্তু? কেন?’শরৎের ঝকঝকে সকাল। কালরাতে ঝড় হয়ে যাওয়ায় আকাশটা এখন পরিষ্কার, ঘন নীল।

গাছের পাতাগুলো ঝরঝরে। বাতাসে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। নীরা খোলা বারান্দার এক কোণে প্লাস্টিকের টোল পেতে বসে আছে। এক টুকরো রোদ এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে তার পায়ের কাছে। চারদিকে ব্যস্ত মানুষের পদচারণ। নীরার হাতে মেহেদী পড়ানো হচ্ছে। হাতের মাঝ বরাবর লেখা হয়েছে অন্তু নামক ছেলেটির নাম। নীরার চোখদুটো

টলমল করছে। বুকের কোথাও একটা কষ্ট আর সুখের ব্যথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বছরের পর বছর অন্তুকে ভালো না বাসার জন্য নিজেকে শাসিয়েছে নীরা। নানাভাবে প্রত্যাক্ষ্যান করেছে তার ভালোবাসা।‘এই মানুষটা আমার জন্য নিষিদ্ধ’ — ভেবেই হাজারও কষ্ট দিয়ে দূরে ঠেলার চেষ্টা করেছে। তার পাগলামোগুলো হেসে উড়িয়ে

দিয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ সেই দিনগুলোর জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে নীরার। সে যদি অন্তর নামেই লেখা ছিল তাহলে কেন এতো কষ্ট, অবহেলার গল্প তৈরি হলো তাদের? কেউ কেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে দিল না, সব মিথ্যা। সব বানোয়াট। শুধু এই ছেলেটাই সত্য। এই ছেলেটার হাতে ধরা পড়তে তুই বাধ্য। নীরার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে

পড়ল। নীরা জানে কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই। তাদের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর একদিনও নীরার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেনি অন্ত। নীরার প্রতি কোনোরূপ উৎসাহ দেখায়নি। এতোকিছুর পর হয়তো উৎসাহ দেখানোর কথাও নয়। তাদের সম্পর্কটা এমন একটা অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে স্নিগ্ধতার আর

কিছুই অবশিষ্ট নেই। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেউ একজন কাঁধে হাত রেখে তেজ নিয়ে বলল,‘ আপু? তুমি আবারও কাঁদছ? সত্যি করে বলো তো, এই বিয়েতে তোমার মত আছে? নাকি মায়ের জোরে বিয়ে করছ?’

ইরার কথায় চোখ ঘুরিয়ে তাকাল নীরা। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ ধূর! মা জোর করতে যাবে কেন বল তো? নিজের ইচ্ছেতেই বিয়ে করছি। অন্তুকে তো তুই চিনিসই।’

ইরা কথাটা ঠিক বিশ্বাস করল না। ফুঁসে উঠে বলল,

‘ তোমার চোখ-মুখের বিরহে দেখে কিন্তু এমনটা মনে হচ্ছে না আপু। অন্তু ভাই যেমনই হোক পুরো ব্যাপারটা আমার কেন জানি ভালো লাগছে না। অন্তু ভাইয়ের ফ্যামিলির

মানুষগুলোকে দেখেছ? হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে কেউ মাথায় বন্দুক ধরে জোরপূর্বক ঘাড়ে তুলে দিচ্ছে মেয়ে। অথচ, প্রস্তাব তো তারাই এনেছিল না?’

নীরা হেসে ফেলে বলল,‘ তুই একটু বেশি বেশি ভাবছিস।’

ইরা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, ‘ আমি কিচ্ছু বেশি ভাবছি না। এরা যদি তোমার সাথে কোনোরূপ খারাপ

ব্যবহার করে তো মুখের উপর ডিভোর্স পেপার ছুঁড়ে চলে আসবে। মায়ের মতো অতো সমাজ নিয়ে আধিখ্যেতা করবে না। এই সমাজ আমাদের দুই বেলা ভাত দিয়ে যায় না। তোমার জীবন তুমি যা ইচ্ছে তা করবে আশেপাশের খালা-ভাবির বাপের কী? কেউ কিছু বললে জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে দিবে। চুপ থাকো বলে এতো বলার সুযোগ পায়। কই!

আমার সামনে তো বলে না। তোমাদের এই আদিম যুগের আদিখ্যেতাটাই ভালো লাগে না আমার। ‘নীরা এই বিদ্রোহী, জেদী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসে। ইরার অত্যাধুনিক তেজী মুখখানার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কেন সে ইরার মতো হলো না? কেন ইরার মতো নিজের উপর প্রতাপ চালানো মানুষগুলোর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠা

শিখল না? ইরার মতো হলে হয়ত নীরাদের সম্পর্কটা এতোটা বিষাক্ত হয়ে উঠত না বরং রূপকথার মতো সুন্দর হতো প্রতিটি পঙক্তিমালা। নীরার হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হলো, ইরারও কী কোনো পাগলাটে প্রেমিক আছে? ইরা কী তাকে প্রশ্রয় দেয়? ভালোবাসে?ফোনের বাজখাঁই শব্দ আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ঘুম ভাঙল নম্রতার। ফোনের স্ক্রিনে

‘ডাক্তার’ নামটা ভাসতেই ঘুম ছুঁটে গেল তার। বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়েই ফোন উঠাল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ হ্যালো?’

ওপাশ থেকে নিরেট পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে এলো,

‘ হেই নম্রমিতা! রোড সাইডের প্রথমেই নীল রঙের দু’তলা বাসাটিতেই কী আপনার বাস?’

নম্রতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় মস্তিষ্কটা কেমন এলোমেলো লাগছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে শুধাল,‘ জি?’

‘ বারান্দায় আসুন।’

নম্রতা বোকার মতো বলল,

‘ কেন? আপনি কী বারান্দায়?’

‘ উহু। বারান্দায় আপনার জামা।’

‘ মানে?’

‘ বারান্দায় আসলেই বুঝতে পারবেন। আসুন।’
আরফানের তাড়ায় এলোমেলো পায়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল নম্রতা। বারান্দার রেলিঙে ঠেস দিয়ে অলস কণ্ঠে বলল,
‘ আসলাম।’
কথাটা বলেই হঠাৎ চমকে উঠল নম্রতা। মস্তিষ্কের ধোঁয়াশা কেটে যেতেই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল,‘ আপনি

কী কোনোভাবে আমার বাসার নিচে ডক্টর?'

' মাই গড! টি-শার্টে আর দুই বেণুণীতে একদম বাচ্চা লাগছে আপনাকে। আপনি এভাবে ঘুমোন রাতে?'

নম্রতা রেলিঙে ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল। সাথে সাথেই রাস্তার ওপাশে ফোন কানে আরফানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। গাঁয়ে

ঢোলা টি-শার্ট। পরনে চেইক টাউজার। পায়ে ক্যাডস। ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। নম্রতা উচ্ছ্বাস আর বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ আপনি! আপনি এখানে কিভাবে?’

‘ কেন? এই এলাকায় কী ডাক্তারদের আসা নিষেধ?’

কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকাল আরফান। তারপর নম্রতার দিকে তাকিয়ে বলল,

‘ কই? কোথাও তো সাইনবোর্ড নেই।’

নম্রতা হেসে ফেলল।‘ ফাজলামো করছেন?’

‘ একটু।’

‘ এতো সকালে এখানে কী চাই?’

‘ চাইলেই দিবেন নাকি?’

‘ উফ! কথা ঘোরাচ্ছেন কেন বারবার? আমার বাসা কিভাবে চিনলেন সেটা বলুন।’

‘ মর্নিং ওয়াকের জন্য বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ আপনার বলা রোড নাম্বারটা মাথায় এলো। তাই ভাবলাম, আজকের সকালটা আপনার বাড়ির উঠোনেই শুভ হোক। আপনি বলেছিলেন রোডের পাশেই আপনার বাসা। আশেপাশের বাসা খেয়াল করতেই সৌভাগ্যবশত বারান্দায় শুকাতে দেওয়া জামাটা

চোখে পড়ল। এই জামাটা আপনি দুইদিন পরেছিলেন। আমি দেখেছি।’

‘ বাপরে!’

আরফানের মুখভঙ্গি পরিবর্তন হলো। ঠোঁটের কোনো হাসি চেপে বলল,‘ আপনি এভাবেই ঘুমোন সবসময়? লুকিং এট্রাকটিভ।’

নম্রতা নিজের দিকে তাকাল। বারান্দায় ছড়িয়ে রাখা ওড়নাটা দ্রুত হাতে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আড়চোখে

আরফানের দিকে তাকাল। আরফান হাসছে। আরফান যে ঠোঁটকাটা স্বভাবের লোক তা ধীরে ধীরে বেশ বুঝতে পারছে নম্রতা। লোকটি যখন যা ইচ্ছে তাই বলে। বিন্দুমাত্র অস্বস্তির বালাই নেই। নম্রতা লজ্জাটাকে ঠেলে দিয়ে ঝাঁঝ নিয়ে বলল,

‘ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্যের বাড়ির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকাই বুঝি ডাক্তারদের স্বভাব?’

আরফান অবাক হওয়ার চেষ্টা করে বলল,‘ বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলাম না তো। আপনি ভুল বলছেন, আমি তো হা করে অন্যকিছু দেখছিলাম।’

কথাটা বলে আবারও হাসল আরফান। নম্রতা নাক-মুখ ফুলিয়ে বলল,

‘ আপনি যাবেন?’

‘ অবশ্যই যাব। তার আগে বলুন, আপনি যাবেন?’

‘ আমি? আমি কোথায় যাব?’

‘ আমার বাসায়।’

নম্রতা ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ আপনার বাসায় কেন যাব?’

‘ নিদ্রা আপনাকে দাওয়াত করেছে তাই।’

নম্রতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,

‘ আজ তো সম্ভব হচ্ছে না।’

‘ কেন? আপনি ব্যস্ত আজ?’

‘ আজ নীরার বিয়ে। আমি বিয়েতে যাচ্ছি।’

আরফান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আচ্ছা।’নম্রতা কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে হঠাৎ বলল,

‘ আপনিও চলুন না আমার সাথে। যাবেন? প্লিজ?প্লিজ?’

আরফান দুঃখী কণ্ঠে বলল,

‘ আমার তো ছুটি নেই।’

‘ আপনি সবসময়ই ব্যস্ত থাকেন।’

নম্রতার কথায় সুপ্ত অভিমানের আঁচ পেয়ে হাসল আরফান,

‘ বিয়েটা কোথায় হচ্ছে?’

নম্রতা উৎসাহ নিয়ে বলল,

‘ রূপগঞ্জ। নীরার গ্রামের বাড়িতে। যাবেন আপনি?’

আরফান আৎকে উঠে বলল,

‘ রূপগঞ্জ! অতোদূর? বিয়ে শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে না?’নম্রতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আরফানের দিকে চেয়ে রইল। নম্রতার মুখে মন খারপের ছায়া দেখে হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরফান। কিন্তু কিছু করার নেই। এভাবে হুট করে ছুটি পাবে না সে। কারো সাথে ডিউটি শিডিউল পরিবর্তন করে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু অতোদূর থেকে ফিরে রাতের ডিউটিও ঠিকঠাক হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। তাদের এই নীরবতার মাঝেই পাশের বারান্দা থেকে নিচের দিকে উঁকি দিলেন একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। গায়ে তার ছাই রঙা পাঞ্জাবি। চোখে মোটা চশমা। মুখে গাম্ভীর্য। ডান হাতে ভাজ করা খবরের কাগজ। ভদ্রলোকটি খানিক ঝুঁকে নম্রতার বারান্দার দিকে

তাকাল। তারপর চশমা ঠিক করে ভ্রু কুঁচকে নিচে আরফানের দিকে তাকাল। আরফান ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে সন্দিহান কন্ঠে বলল,‘ পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকটি কী আপনার বাবা নম্রা?’ নম্রতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের বারান্দার দিকে উঁকি দিল। নুরুল সাহেব গম্ভীর মুখে ভ্রু’কুটি করলেন। নম্রতা মাথা ঘুরিয়ে নিচে আরফানের দিকে

তাকাল। নুরুল সাহেবের দৃষ্টিও নেমে গেল নিচে। আরফান আবারও বলল,

‘ আপনার বাবা?’

নম্রতা অসহায় মুখে মাথা নেড়ে বলল,

‘ হ্যাঁ।’

আরফান বিপন্ন কণ্ঠে বলল,

‘ ওহ শিট!’কথাটা বলেই ফোন কেটে দ্রুত পায়ে জায়গাটা থেকে

সরে গেল আরফান। একটা রিকশা ডেকে দ্রুত রিকশায় উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নম্রতা অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েই বুঝল কল কেটে দিয়েছে আরফান। নম্রতা ভীত চোখে পাশের বারান্দায় বাবার দিকে তাকাল। নুরুল সাহেবও গম্ভীর মুখে মেয়ের দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড গুরুগম্ভীর সময় কেটে যাওয়ার পর হঠাৎই বাবা-

মেয়ে ফিক করে হেসে ফেললেন। নুরুল সাহেব শব্দ করে হেসে বললেন,

‘ ডাক্তার নাকি?’বাইকের ছোট্ট আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে চুল ঠিক করছিল নাদিম। ভ্রু দুটো কুঞ্চকে আছে অজানা কোনো বিরক্তিতে। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে মুখটা তেঁতো করে রঞ্জনের দিকে তাকাল নাদিম।

‘ এই গরমের মধ্যে এইসব সং-ঢং পিন্দার কোনো মানে আছে? টি-শার্ট পিইন্দা বিয়াতে গেলে সমস্যাটা কী মামা? বেহুদা এইসব বা*- ছা* পরাইলি। বিরক্ত লাগতাছে।’

রঞ্জন ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। বাইকের চাবিটা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিতে নিতে বলল,‘ পাঞ্জাবিতে তোকে বন মানুষ থেকে মানুষ লাগছে। ধীরে ধীরে মানুষ হওয়ার

চেষ্টা কর। বিয়েতে কত শত মেয়ে থাকবে। ডোন্ট ফরগেট, ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্যা বেস্ট ইম্প্রেশন দোস্ত।’

নাদিম পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ ছাতার ইম্প্রেশন।’

রঞ্জন হাসল। হাসিটা তাকে মানালও খুব। নাদিম হাতের ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়েই তাড়া দিল,‘

বৌদি কখন আসবে? দশটা তো বাজতে চলল। এই গরমে খাড়াই থাকতে ভাল্লাগতাছে না আর।'

রঞ্জন চিন্তিত মুখে ফোনে সময় দেখল। পূজাকে আজ সাথে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সে। কাল সন্ধ্যায় ফ্লাইট। বিদেশের মাটিতে আত্মাহুতি দেওয়ার আগে আজকেই তার শেষ দিন। এই দিনে মেয়েটাকে সময় দিতে না পারলে রঞ্জনের নিজেরই

বড় অস্থির লাগবে। ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।রঞ্জন রাস্তার দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল,

‘ বলল তো বেরিয়েছে। আমি পিক করতে চাইলাম। নিষেধ করে বলল প্রায় চলে এসেছে।’

‘ নমু-ছোঁয়াও কি অন্তুদের বাসাতেই যাবে নাকি? আমরা সব বরযাত্রী?’

রঞ্জন হেসে বলল,‘ নমু-ছোঁয়া কনেপক্ষ। ওরা ডিরেক্ট রূপগঞ্জ

যাবে। আজ ওরা আমাদের বেয়াইন। বেয়াইন বলে না ওটাকে?’

নাদিম জবাব না দিয়ে হাসল। রঞ্জন কৌতুক করে বলল,

‘ আজ বান্ধবী টান্ধবী বাদ। অনলি বেয়াই-বেয়াইন সম্পর্ক। প্রচুর ফ্লার্টিং চলবে।’

নাদিম দাঁত বের করে হাসল। ফিচেল কণ্ঠে বলল,

‘ নমুকে তো চিনো না মামা। একবার যদি বুঝে তুমি তার প্রতিপক্ষ তাহলে বিশ্বাস কর, তোর কলিজা তোর কলিজা বের করে ছেড়ে দিবে। আর জান বের করার জন্য সাথে তোর জানপাখি তো আছেই।’

রঞ্জন প্রত্যুত্তর করার আগেই হঠাৎ বলে উঠল নাদিম,

‘ আরেহ! ফোনটা তো রুমেই ফেলে আসছি দোস্ত। সকালে চার্জে দিয়ে আর খুলতে মনে নাই। তুই থাক। আমি আনতাছি।’রঞ্জনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হলের দিকে ছুটে গেল নাদিম। পাঁচ দশ মিনিটের মাঝে ফিরে এসে দেখল পূজা এসে পৌঁছেছে। রঞ্জনের সাথে মিলিয়ে খয়েরী জামদানী শাড়ি তার গাঁয়ে। দুজনকে পাশাপাশি হাস্যোজ্জল মুখে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনের গুমোট ভাবটা খানিক কেটে গেল নাদিমের। বুকের ভেতর চাপা আনন্দ নিয়ে ওদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জন রওনা দেওয়ার জন্য তাড়া দিতেই নাদিম হালকা অস্বস্তি নিয়ে বলল,

‘ সরি দোস্ত! আমি যেতে পারছি না। বড় মামা ফোন দিয়েছিল একটু

আগে। আমাকে একটু মামার বাড়ি দর্শন দিয়ে আসতে হবে। আর্জেন্ট।’ রঞ্জন অবাক চোখে তাকাল। নাদিমের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে হাতেগুণা কয়েকটা কথা ছাড়া কিচ্ছু জানে না তারা। নাদিমের যে কোনো মামা আছে তা এই জীবনে আজই প্রথম শুনছে বলে তার ধারণা। রঞ্জন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,‘ মামার বাড়িই তো। কাল যাস। বিয়েতে না

গেলেও এটলিস্ট অন্তুর সাথে সাক্ষাৎটা করে যা।'

নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। প্রসন্ন হাসি হেসে বলল,

' আরে ধূর! বিয়া তো আমাগো নীরুরেই করতাছে। অত সাক্ষাৎ টাক্ষাৎ করা লাগব না। প্রায় দশটা বাজে, সাড়ে এগারোটায় ট্রেন ধরব। স্টেশনে পরিচিত লোক আছে, টিকেট হয়ে যাবে।'

রঞ্জন হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
‘ এমন কী দরকার যে আজকের দিনটা ম্যানেজ করতে পারবি না তুই? বাই এনি চান্স, তুই অন্তুর উপর রেগে আছিস বলে....’রঞ্জনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পাত্তাহীন কণ্ঠে বলল নাদিম,
‘ আরে ধূর! রাগের কী? ওই ছোট্ট একটা ইস্যু নিয়ে বসে থাকার কোনো মানে আছে? মামা আজ প্রায়

সাড়ে চার বছর পর তলব করেছে আমায়। ব্যাটার কাহিনীটা তো এবার দেখতেই হয়!’

এটুকু বলে থামল নাদিম। রঞ্জনের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ যেতেই হবে দোস্ত।’কথাগুলো বলতে বলতেই চোয়াল শক্ত হয়ে এলো নাদিমের। রঞ্জন অবাক চোখে চেয়ে থেকেই বিদায় দিল নাদিমকে। নাদিম রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যেতেই

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঞ্জন। নাদিম আর অন্তুর মাঝে ঘটে যাওয়া ঝামেলাটা নতুন কিছু নয়। এর থেকেও বড় বড় ঝামেলা হয়েছে তাদের। ইচ্ছেমতো মারপিট করে ঘন্টা ঘুরতেই এক সঙ্গে সিগারেট ধরিয়েছে। হেসেছে। ফাজলামো করেছে। দূরত্ব অভিমান বাড়ায়। অভিমান থেকে জন্মায় ক্ষোভ। ক্ষোভ থেকে অহং। তারপর ধীরে ধীরে

তৈরি হয় ধারালো এক ফলা। সেই ফলাতেই ক্ষতবিক্ষত হয় সুন্দর কিছু সম্পর্ক। ঝামেলাটা হওয়ার পর অন্ত আর নাদিম যদি একটাবার সামনা-সামনি দাঁড়াত তবেই সমাপ্ত হতো এই স্নায়ু যুদ্ধ। উবে যেত এই মান-অভিমানের খেলা। রঞ্জনও তাই চাইছিল কিন্তু.... রঞ্জন আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুই ভালো লাগছে না তার। মনের মাঝে তীক্ষ্ণ

একটা কাটা নিয়েই দেশ ছাড়তে হচ্ছে তাকে। মনে সূক্ষ্ম এক ভয়, সব আগের মতোই থাকবে তো? অন্তর মেজাজ খারাপ। তার এই মেজাজ খারাপ ভাবটা সময়ের সাথে সাথে তরতর করে বাড়ছে। আশেপাশের মানুষগুলোকে অযথায় ধমকাতে ইচ্ছে করছে। দুই একটা চড় থাপড়াও দিতে ইচ্ছে করছে। বিছানার উপর রাখা সাদা

শেরওয়ানির দিকে তাকিয়ে থেকে ভ্রু কুঁচকাল অন্তু। সাধারণ ঘরোয়া বিয়েতে এমন ভারী শেরওয়ানি পরার কোনো মানে হয়? অন্তু কোমরে হাত রেখে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। পায়ের কাছে থাকা জুতোটা লাথি দিয়ে সরিয়ে চেঁচিয়ে অয়নকে ডাকল। অয়ন সেজেগুজে বাবু হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছিল। সমবয়সী কাজিনদের মধ্যে আজ তার কদরই

বেশি। মেজাজটাও ফুরফুরে। ভাইয়ের এমন রাগান্বিত চিৎকারে মুখটা চুপসে গেল তার। ঘরের মাঝে উঁকি দিয়ে দ্বিধা নিয়ে বলল,‘ ভাইয়া ডেকেছ?’

অন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ আমার ফোন কোথায়?’

অয়ন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাইয়ের রক্তচক্ষুতে আরও একটু গুটিয়ে গিয়ে অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ আমি জানি না ভাইয়া।’

অন্তু ধমকে উঠে বলল,

‘ একদম মিথ্যা বলবি না। তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই পাঁচ মিনিটে ফোন খুঁজে নিয়ে আসবি নয়তো থাপ্পড় দিয়ে গাল ফাটিয়ে দেব।’অয়ন মুখ কাঁচুমাচু করে চেয়ে রইল। সকালে ভাইয়ার ফোন নিয়ে গেইম খেলেছিল সে। গেইম খেলতে খেলতে কখন যে চার্জ শেষ হয়ে

গিয়েছে বুঝতেই পারেনি। মাত্রই চার্জে বসিয়েছে। খুব একটা চার্জ হয়েছে বলেও মনে হয় না। অন্তু আবারও ধমকে উঠতেই চুপসানো মুখ নিয়ে ফোন আনতে গেল অয়ন। তিন পার্সেন্ট চার্জসহ ফোনটা এগিয়ে দিতেই কটমট করে তাকাল অন্তু। অয়ন মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকেই এক দৌঁড়ে অন্তুর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

অন্তু নিজেকে খানিক শান্ত করার চেষ্টা করল। টি-টেবিলটা লাথি দিয়ে সরিয়ে ফোন চার্জে বসাল। ফোনটা চার্জে লাগিয়েই নাদিমকে একের পর এক কল লাগাতে লাগল। প্রতিবারই লাইন ব্যস্ত। অন্তুর খিটমিটে মেজাজটা আরও একধাপ খারাপ হলো এবার। কাল সারাদিন নিজের রুমে পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে অন্তু। বিকেল দিকে রঞ্জনের ফোন পেয়ে

ঘুম ভেঙেছে। রঞ্জনকে বিয়ের ব্যাপারটা শর্টকাট জানিয়ে দিয়ে আবারও ঘুমিয়েছে। রাতে বন্ধুদের জানানোর কথা মনে হতেই নাদিমকে ফোন দিয়েছিল সে। কিন্তু নাদিমের ফোন বন্ধ। ঝড়-বৃষ্টি চলাকালীন পুরোটা সময় চেষ্টা করেও নাদিমকে পাওয়া যায়নি। অন্ত ক্লান্ত হয়ে রঞ্জনের নাম্বার ডায়াল করল। প্রথমবারেই ফোন

উঠাল রঞ্জন। অন্তু মেজাজ দেখিয়ে বলল,‘ নাদিম তোর পাশে থাকলে ধুমিয়ে একটা ঘুষি মার ওর গালে। রাত থেকে কল দিচ্ছি কোনো খোঁজ খবর নাই। সমস্যাটা কী ওর?’

রঞ্জন শান্ত কন্ঠে বলল,

‘ রাতে ফোন বন্ধ ছিল ওর। এখন ট্রাই কর। আমার সাথে কথা হলো মাত্র।’

অন্তু কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কথা হলো? কথা হলো মানে কী? নাদিম তোর সাথে নেই? তোরা আসছিস না?’

‘ আমি আসছি। নাদিম আসছে না।’

‘ কেন?’

‘ তুই ওকে বলছিলি? কেন যাবে ও?’

‘ বলার জন্য তো ফোনে পেতে হবে রে বাপ। বাচ্চাদের মতো জেদ কী ওকে মানায়?’

রঞ্জন উত্তর দিল না। অন্তু কল কেটে আবারও নাদিমের নাম্বারে ডায়াল করল। যাবে না মানে কী? নাদিম যাবে না তো ওর বাপ যাবে। ফাজলামো নাকি?রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে নাদিম। ইচ্ছুক চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ফ্যাকাশে সাদা চামড়ায় কালো রঙের পাঞ্জাবিটা বেশ মানিয়ে গিয়েছে। কয়েক মাসের অযত্নে বেড়ে উঠা

চুলগুলো কপাল আর ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। বামহাতে মাথাভর্তি চুলগুলো গোছাতে গোছাতে ঘড়ির দিকে তাকাল নাদিম। প্রচন্ড গরম পড়েছে। ঘন চুলের অত্যাচারে গরম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এবার ঢাকা ফিরেই চুল কেটে ন্যাড়া হয়ে যাবে নাদিম। চুল নিয়ে এক্সট্রা মাথা ঘামানোর সময় তার নেই। নাদিমের ভাবনার মাঝেই ঝকঝক শব্দ তুলে

স্টেশন পাড় করল একটি ট্রেন। ছুটন্ত ট্রেনের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎই আনমনা হয়ে গেল নাদিম। মানুষের জীবনটা কী ট্রেনের মতোই ছুটন্ত নয়? ট্রেনের যেমন নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা হয় না। অযথা কোনো বিশ্রাম হয় না।ঠিক তেমনই মানুষের জীবনটাও হয় বিশ্রামহীন। জীবনের সূচনালগ্ন থেকে শুরু হয় এই ছুটে চলার খেলা। ছুটতে ছুটতে

মানুষ ক্লান্ত হয় কিন্তু ক্ষান্ত হয় না। হয়ত, ক্ষান্ত হওয়ার সুযোগটাই তাদের হয়ে উঠে না। মানবজন্মটাই কী ভাসমান নয়? ঠিকানাহীন, গন্তব্যহীন নয়? সেই ভাসমান জীবনে স্টেশনের মতো ক্ষনিকের স্বস্তি হয়েই কী আসে না প্রিয় কিছু মুখ? মানুষ থমকায়। ক্ষনিক বিশ্রাম চায়। তারপর আবারও ছুটে চলে ভাসমান গন্তব্যে। সেই গন্তব্যে

ছুটতে ছুটতেই হঠাৎ হারিয়ে যায় মৃত্যু নামক অতল গহ্বরে। তার বাবার জীবনটাও কী এমনই এক ভাসমান ট্রেন ছিল না? মায়ের সাথে সাক্ষাৎ হওয়াটা কী নেহাৎই ক্ষণিকের বিশ্রাম ছিল না?কোনো ট্রেনই সারাজীবন স্টেশনে আটকে থাকে না। বাবাও থাকেনি। মা চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। মা হয়তো ট্রেনের থিওরিটা জানত না। জানলে

কখনো আটকানোর চেষ্টা করত না। নাদিমও এভাবেই ভেসে যাবে। হারিয়ে যাবে। পার্থক্য এতটুকুই বাবার মতো তাকে কেউ আটকানোর চেষ্টা করবে না। নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ট্রেন চলে এসেছে। নাদিম শেষ বারের মতো ঘড়িটা দেখে নিয়ে ট্রেনে গিয়ে উঠল। চ বগিতে নিজের সিটটা খুঁজে নিয়ে বসতেই ফোন বাজল। ফোনের

স্ক্রিনে অন্তুর নামটা দেখে ভ্রু কুঁচকাল। কয়েক সেকেন্ড ফোন হাতে বসে থেকে ফোনটা তুলতেই ওপাশ থেকে উত্তেজিত কন্ঠে বলে উঠল অন্তু,‘ শালা তুই আছিসটা কই? সারারাত ফোন বন্ধ করে বসে থেকে এখন ঢং মারাইতাছস? আধ ঘন্টার মধ্যে বাসায় আসবি। অপেক্ষা করছি।’

‘ ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে দোস্ত। ময়মনসিংহ যাওয়াটা খুব জরুরি নয়তো এতোক্ষণ তোর বাসায় থাকতাম।’

‘ ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে মানে কী? ফাজলামো করছিস আমার সাথে? তুই আসবি কি-না বল? তোকে ছাড়া যাব না। বিয়ে ক্যান্সেল।’

নাদিম হেসে বলল,

‘ পাগল নাকি? তুই বিয়া করতে না গেলে বিয়ার খাওয়ন পামু কই? শোন, বিয়েতে যাইতে পারতাছি না বলে কিন্তু আমারে রাইখা খাইতে বইসা যাবি না। আগে আমার জন্য প্যাক করবি তারপর খাইতে বসবি। নয়তো খবর খারাপ কইরালামু।’

অন্তু গরম কণ্ঠে বলল,‘ সবসময় ফাজলামো ভালো লাগে না নাদিম। আমি এখন সিরিয়াস। তুই না

আসলে বরযাত্রী যাবে না। বিয়েও হবে না। ব্যস।’

‘ আরে ফ্যাসাদ। মাইয়া গো মতো এতো সেন্টি খাইস না তো মামা। আমি তো আর হারায় যাইতাছি না। কালকের মাঝেই চলে আসব। রঞ্জন, নমুরা তো আছেই।’

অন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। নাদিম হেসে ফেলে বলল,

‘ ঘরের বউয়ের মতো রিয়েকশন দিচ্ছিস ক্যান মামা? আচ্ছা, আমি রাত বারোটার আগে তোর বাসায় থাকলেই তো হলো? এখন দয়া কইরা বিয়ে করতে যা। আর জরুরি ভিত্তিতে দুই-তিনটা শালী নিয়ে আয়। নীরুরে রাইখা আসলেও চলব কিন্তু শালী রাইখা আসা চলব না। নীরু তো নিজে গো মানুষ। ওরে এতো আদর-যত্ন করে ঘরে তোলার

কিছু নাই। ওর যা স্পিরিড, ওই হারামি একা একাই আসতে পারব।’অন্তু মৃদু হাসল। নাদিম ফোন রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের মাঝে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সে। ভেতরের অহংবোধটা মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজ অন্তুর বিয়ে ছেড়ে পালিয়ে আসার পেছনে কি এই অহংবোধটা একটুও দায়ী নয়? শুধুমাত্র বড়

মামার ফোন পেয়েই কি এভাবে ছুটে যাচ্ছে সে? এর পেছনে কী অন্য কোনো কারণ ছিল না? নাদিম জানে, ছিলো। তার চারপাশটা যে ধীরে ধীরে বিষণ্ণ বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে তা খুব টের পাচ্ছে নাদিম। এই দমবন্ধ শহরটা তাকে বাঁধতে চাইছে। আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। কিন্তু রক্ত যে কথা বলে! শোবার ঘরের বিশাল আয়নাটার

সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোঁয়া। বিছানা আর ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য জামা, শাড়ি আর অলংকার। সবসময় জিন্স-টপস পরা ছোঁয়া শাড়ি পরতে জানে না। বুদ্ধি হওয়ার পর কখনও শাড়ি পরেছে বলে মনে পড়ে না। তবুও শাড়ি পরতে হবে। নম্রতা তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, নীরার বিয়েতে দুজনেই নীল রঙের জামদানী পরবে। একই সাজে দুজন

গুট গুট করে ঘুরে বেড়াবে। ভাবতেই ভালো লাগে। ছোঁয়ারও ভাবতে ভালো লাগছে। নম্রতার সাথে গিয়ে নীল রঙা জামদানীও সে কিনেছে। কিন্তু ছোঁয়ার মা সিঁথি হকের ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। সিঁথি নিজে ডিজাইন করে মেয়ের জন্য শাড়ি আর ব্লাউজ বানিয়েছেন। তার ধারণা ছোঁয়াকে সেই পিচ রঙা শাড়িতে অপ্সরার মতো সুন্দর

দেখাবে। এইসব ব্যাকডেটেড শাড়ির তার প্রয়োজন নেই। ছোঁয়ার একটু মন খারাপ হয়েছে। একটু নয় ভয়ানক মন খারাপ হয়েছে।কিন্তু সেই মন খারাপে কিছু আসে যায় না। ছোঁয়া জানে, তাকে শেষমেশ মায়ের ডিজাইন করা শাড়িটাই পরতে হবে। সবসময় তাই-ই হয়। ছোঁয়ার পৃথিবীতে বন্ধুমহল ছাড়া বাদ বাকি সবই তার বাবা-মার পছন্দ-

অপছন্দের উপর ভিত্তি করেই চলে। এইযে ছোঁয়া রোজ সকালে ব্রেড, ফ্রুটস আর কফি খায় এটাও তার মায়েরই নিয়ম। ছোঁয়া কখন কোন লিপস্টিপ লাগাবে, কোন নেইলপালিশ লাগাবে , তার কোন কোন বই পড়া উচিত সবই তার মায়েরই ঠিক করা। ছোঁয়ার গোছাল রুম। গোছাল চাল-চলন। গোছাল কথাবার্তা সবই তার মায়ের পছন্দ।

মা যদি অগোছালো থাকতে পছন্দ করত তবে ছোঁয়াকে অগোছালোই থাকতে হতো। ছোঁয়ার জীবনটা ঘড়ির কাটায় কাটায় নিয়ন্ত্রিত। ছোঁয়া এই নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়েছে। ছোট থেকে এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জীবনের কোনো পর্যায়েই সে অবাধ্য নয়। শুধু বন্ধুমহল নিয়েই তার যত নীরব বিদ্রোহ। তার বদ্ধ জীবনে এই বন্ধুমহলটাই শুধু তার নিজের।

একান্তই নিজস্ব। এখানে কেউ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। হাই ক্লাস ফর্মালিটি মেইনটেইন করতে হয় না। বন্ধুরা যখন গলা ছেড়ে গান গায়। হুটহাট উদ্ভট সব কাজ করে। ক্যান্টিনের রমরমা আড্ডা ছেড়ে হঠাৎ বৃষ্টিতে নেমে যায়। রেস্টুরেন্টে পেট পুড়ে খেয়ে বিল না দিয়েই দৌঁড়ে পালায়। আবার কখনও ফুটপাতে ওই নোংরা বাচ্চাদের

পাশে বসে বিস্তর খায়, খাওয়ায়, গল্প করে।সিনেমা হলে গিয়ে প্রাণ খোলে ছিটি বাজায়। তখন ছোঁয়া অবাক হয়ে দেখে। সেই সময়টুকু সে বিস্মিত সুন্দর এক পৃথিবী দেখে। প্রাণ খোলে হাসে। তার ধরা বাঁধা জীবনটাতে ওই মানুষগুলোই যেন বড্ড তৃপ্তির। ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে মায়ের কাছে শাড়ি পরায় মনোযোগ দেয়। মুখটা হাসি হাসি করে রাখে।

দামী অলংকার গায়ে বড়োলোকি অহং মাখে। আপাতদৃষ্টিতে ছোঁয়ার কোনো দুঃখ নেই। বিলাসিতার চাদরে ঘেরা জীবনটা তার খুব সুন্দর আর গোছাল। তবুও ছোঁয়ার বড় কষ্ট হয়। সহজ-সরল মনটা ধুঁকে উঠে বলে, আমার জীবনটা কেন নমু আর নীরু মতো স্বাভাবিক নয়? মধ্যবিত্ত ঘরনার টানাপোড়েন কেন আমার নেই? সেই টানাপোড়েনই বুঝি

আনন্দ! বেঁচে থাকার অদ্ভুত এক স্বাদ! সংকটহীন বেঁচে থাকাটা আদৌ কী বেঁচে থাকা?দুপুর গড়িয়ে আসন্ন বিকেলে পদার্পন করেছে সূর্য। উঠোনের উত্তর দিকে ভিন্ন রঙের চাঁদোয়া টানিয়ে সাজানো হয়েছে বিয়ের আসর। একদম আড়ম্ভরহীন, সাদামাটা আয়োজন। প্যান্ডেল থেকে কিছুটা দূরে ইট বিছিয়ে করা হয়েছে রান্নার আয়োজন। আলুথালু স্বাস্থ্যবান

এক ভদ্রলোক কোমরে গামছা পেচিয়ে বিশাল ডেকচিতে খুন্তি নাড়ছেন। কপালে জবজবে ঘাম। মুখভর্তি পান। আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রান্নার অন্যান্য সামগ্রী। সহযোগীদের কেউ সবজি কুটছে। কেউবা মাখছেন মাংস বা মাছের মিশ্রণ। শুকনো লাকড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের শিখা, কমলা রঙের আগুন।শেষ দুপুরের তেরছা

আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে উত্তপ্ত ডেকচির গা। কিছু অল্প বয়স্ক তরুণ ব্যস্ত ভঙ্গিতে খাবার পরিবেশন করছে। কারো উপর মাংস দেওয়ার দায়িত্ব, কেউবা দিচ্ছে রোস্ট,ডাল,মাছ ভাজা। নম্রতাদের খাওয়া শেষ হয়েছে মাত্র। প্যান্ডেলের পাশে নীল রঙের টাংকিতে হাত ধোঁয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোঁয়ার কাছে এসব নতুন। অসংখ্য মানুষ

একই সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছে। বিষয়টা নিঃসন্দেহে বিদঘুটে। ছোঁয়া চোখ-মুখ কুঁচকে হাত পরিষ্কার করল। হাত ধুতে গিয়ে পানি ছিটে ভিজে গেল শাড়ি। বড় বিরক্তিকর সব। হাত ধোঁয়া শেষে নম্রতার সাথে বরের স্টেজের দিকে এগিয়ে গেলো ছোঁয়া। নম্রতাদের আসতে দেখেই বিগলিত হাসল রঞ্জন। চাহনী যথাসম্ভব নিষ্পাপ করার চেষ্টা করে

বলল,‘ কলিজা? জুতো কোথায় লুকিয়েছ বলবে না?’

নম্রতা দাঁত বের হাসল। হাত বাড়িয়ে বলল,

‘ পাঁচ হাজার টাকা দে, বলে দেব।’

রঞ্জন মুখ কালো করে বলল,

‘ এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না কলিজা। তুমি টাকার লোভে বারবার নিজের বরকে ভুলে যাচ্ছ, বিষয়টা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। গেইটেও জেদ

ধরে পাঁচ হাজার টাকা উশুল করে নিয়েছ। এসব তো ঠিক না বউ।'

রঞ্জনের কথায় হেসে ফেলল পূজা। নম্রতা কোমরে হাত দিয়ে ভ্রু উঁচিয়ে তাকাল,' রাখ তোর কলিজা। আগে টাকা দে। টাকা ছাড়া বউ বউ করবি তো খবর আছে। ডিরেক্ট ডিভোর্স।'

রঞ্জন অত্যন্ত দুঃখী কন্ঠে বলল,

' আমাদের এতো এতো ভালোবাসাকে তুমি এই সামান্য

টাকার কাছে বলি দিতে পারলে বউ? শুধুমাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্য? আহ্! আমি মরে যাচ্ছি না কেন?’

রঞ্জনের কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল নম্রতা। পূজার দিকে চেয়ে বলল,

‘ বউদি? তোমার বরকে কিছু বলবে? নাকি মাথা ফাটিয়ে স্মৃতিহারা এতিম বানিয়ে দেব?’

রঞ্জন ভাব নিয়ে বলল,
‘ আজ আমাদের দলটা হালকা বলে এতো জোর চালাচ্ছিস। নাদিমটা সাথে থাকলে বুঝিয়ে দিতাম বরযাত্রী কাকে বলে!’প্যান্ডেলের পেছন দিকে মাটির মোটা রাস্তা। রাস্তার পাশে বিশাল এক জামগাছ। আরফান দ্রুত হেঁটে জামগাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আরফানকে আসতে দেখেই গাড়ি

থেকে সবিনয়ে নেমে এলো ড্রাইভার।

‘ স্যার খাওয়ন-দাওয়ন শ্যাষ?’

আরফান গাড়ি থেকে কালো চামড়ার ব্যাগটা বের করতে করতে ছোট্ট করে উত্তর দিল,

‘ হু।’

ড্রাইভার বেশ আগ্রহ নিয়ে আরফানের কার্যকলাপ দেখতে লাগল। মানুষটাকে তার খুব পছন্দ

হয়েছে। ছোঁয়ার অন্যান্য বন্ধুদের মতো খিকখিক না করাটাই ভালো লাগার প্রধান উৎস। ম্যাম সাহেব বলেন, স্বল্প কথা বলা জ্ঞানী লোকের লক্ষ্মণ। আরফান কথা বলে অল্প। চুপচাপ থেকে হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়। কথাবার্তায় জ্ঞানের ছটা। ড্রাইভার মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে। আরফান পকেট থেকে ফোন বের করে ফোনে মনোযোগী হল।

ড্রাইভার গদগদ কণ্ঠে বলল,‘ স্যার আপনি মানুষটা খুব ভালা আছেন। আপনারে আমার খুব পছন্দ হইছে।’ আরফান জবাব না দিয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। সে আহামরি ভালো কোনো কাজ করেছে কি-না বুঝার চেষ্টা করল, মনে পড়ছে না। নম্রতার মন খারাপ দেখে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে আসতে হয়েছে তাকে। তারওপর নীরাও ফোন দিয়ে ঝুলে

পড়ল। বাধ্য হয়েই ডিউটি শিডিউল পরিবর্তন করে নম্রতাকে সঙ্গ দিতে হলো। গাড়িটা নম্রতার বান্ধবীর। এই ড্রাইভারকে সে চিনে না। প্রথম দর্শনেই খুব পছন্দ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো কথা তাদের হয়নি। আরফানের ভাবনার মাঝেই নম্রতাকে আসতে দেখা গেল। এক হাতে শাড়ির কুচি সামলে ধীরে ধীরে হাঁটছে সে। নম্রতার দিকে এক

নজর তাকিয়েই বড় আফসোস নিয়ে বলল ড্রাইভার,‘ একটা কথা বলি, মাইন্ড কইরেন না স্যার। এই আফামনির সাথে আপনারে তেমন মানায় নাই। আফামণি দেখতে মা-শা-আল্লাহ কিন্তু অতিরিক্ত কথা কয়। মাইয়া মানুষ এতো কথা বলা ভালা না। মাইয়া মানুষ থাকব চুপচাপ। দশটা বেতের বাড়িতেও ‘ও’ শব্দ করত না। চুপচাপ মাইয়া মানুষ

দিয়েই সংসারে সুখ আসে। পটরপটর মাইয়ারা কোনো কামের না। মাইন্ড করলেন স্যার?’

আরফান উত্তর দিল না। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মনোযোগী চোখে ফোন ঘাটতে লাগল। কপালটা হালকা কুঁচকানো। চোখ-মুখ থমথমে। আরফানের থমথমে মুখ দেখে কথা এগুনোর সাহস পেলো না ড্রাইভার। নম্রতা পাশে দাঁড়িয়ে

ফোনের দিকে একটু উঁকি দিয়ে মিষ্টি হাসল। হাসির বদলে হাসি ফিরে এলো না। আরফান আগের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নম্রতার দিকে ফিরেও তাকাল না। আরফানের থমথমে মুখ খেয়াল করে কিছুটা অপ্রস্তুত হলো নম্রতা। দ্বিধা নিয়ে বলল,‘ আপনি ঠিক আছেন ডক্টর?’

আরফান তাকাল না। ছোট্ট করে বলল,

‘ হু।’

নম্রতা সাবধানে বলল,

‘ আপনাকে আপসেট দেখাচ্ছে নিষ্প্রভ। কিছু হয়েছে?’

আরফান গাড়ির দরজা খুলে নিজের স্যুটটা তুলে নিল। প্রচন্ড শব্দে দরজাটা বন্ধ করে বলল,

‘ না।’

নম্রতা বুঝল আরফান রেগে আছে। তার রাগ প্রকাশের ধরন সে ধরতে পারছে। নম্রতা অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।’

আরফান তাকাল না। একহাতে কালো চামড়ার ব্যাগ। অন্যহাতে ভাজ করা স্যুট নিয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াল। নম্রতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্যদিকে মনোযোগী

হওয়ার চেষ্টা করল।‘ রেগে আছেন কেন?’

আরফান তাকাল। অদ্ভুত ঠান্ডা তার দৃষ্টি। শীতল কন্ঠে বলল,

‘ আপনার বন্ধু আপনাকে ওভাবে সম্বোধন কেন করল?’

নম্রতা ব্যাপারটা ঠিক ক্যাচ করতে পারল না। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লেগে গেল। ভ্রু কুঁচকে

চিন্তা করল। পরমুহূর্তেই হেসে বলল,

‘ ও! রঞ্জনের কথা বলছেন? ও ওমনই। ভীষণ কিউট না? ওর সব কিছুই কিউট। বাই এনি চান্স, রঞ্জন যদি মুসলিম হতো এবং আমার বন্ধু না হতো তাহলে আমি ড্যাম শিওর আমি ওর উপর ক্রাশড হতাম। প্রেমে পড়তাম। বিয়েও করে

ফেলতে পারতাম।’আরফান শীতল কণ্ঠে বলল,

‘ গুড।’

নম্রতা আড়চোখে আরফানের দিকে তাকাল। আরফানের থমথমে মুখ আরও বেশি থমথমে দেখাচ্ছে এবার। শ্যামবর্ণ মুখটিতে রক্তিম আভা। আরফান নিজের ব্যাগ আর স্যুটটা নিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। নম্রতা বোকার মতো কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থেকে আরফানের পিছু ছুটল। বিস্মিয় নিয়ে বলল,

‘ কোথায় যাচ্ছেন?’

আরফানের ছোট্ট উত্তর,

‘ ঢাকায়।’

নম্রতা আরফানের ডানবাহু চেপে ধরে বলল,

‘ আপনি আমায় এবোয়েড করছেন?’

আরফান দাঁড়াল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে সাবলীল কণ্ঠে বলল,
‘ হ্যাঁ।’
নম্রতা খানিক অবাক হয়ে বলল,
‘ কেন! আচ্ছা, আপনি কী জেলাস?’
আরফান উত্তর দিল না। হাঁটার গতি কী খানিকটা বেড়ে গেল? হয়ত। নম্রতা আরফানের সাথে পেরে উঠতে না পেরে বলল,‘ আমরা শুধুই মজা করছিলাম। উই আর জাস্ট

ফ্রেন্ডস নিষ্প্রভ। আপনি অযথায় রাগ করছেন।'

আরফান দাঁড়াল। চোয়াল শক্ত করে বলল,

' দেন হুয়াই হি কেয়ার ইউ সো মাচ? আমি খেয়াল করেছি। লঞ্চে ও আপনাকে কোলে নিয়েছিল। কেন নিবে?'

শেষের কথাটাতে যেন এক রাশ অভিযোগ ছুঁড়ে দিল আরফান। ভারি

বাচ্চামো প্রশ্ন, কেন নিবে? নম্রতার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। আরফানের রাগ দেখে বুকের ভেতর অদ্ভুত এক প্রশান্তি খেলে গেল। চারপাশের বাতাসটাকে মনে হলো, স্বর্গীয়। নম্রতা নরম কণ্ঠে বলল,‘ আমি কোনো ফ্যাক্ট নই। আমার জায়গায় নীরা বা ছোঁয়া হলেও রঞ্জন ঠিক একই কাজ করত। রঞ্জন সবসময়ই

কেয়ারিং। কাছের মানুষগুলোকে আগলে রাখতেই পছন্দ করে ও।' আরফানের গনগনে রাগ কমল বলে মনে হলো না। প্রচন্ড রাগ নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল, কথা বলল না। নম্রতা মৃদু হেসে বলল,' রঞ্জনের পাশে থাকা অতিরিক্ত সুন্দরী মেয়েটি ওর হবু বউ। মেয়েটাকে ও পাগলের মতো ভালোবাসে। এতো সুন্দরী বউ

রেখে রঞ্জন আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড কেন হবে বলুন তো?’

আরফান ফিরে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে নম্রতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল,

‘ আপনার সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণায় নেই নম্রতা। না জেনে লেইম রেফারেন্স টানবেন না।’

আরফানের কথাটা খুব স্নিগ্ধ শোনাল নম্রতার কানে। পুলকিত চোখে চেয়ে

রইল আরফানের শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারায়। আরফানের দৃষ্টিও তখন নম্রতার চোখে নিবদ্ধ। বিকেলের মিষ্টি আলোয় কিছুটা সময় একান্তে কেটে গেল তাদের। বেশ কিছুক্ষণ পর হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিল আরফান। শক্ত গলায় বলল,‘ আপনাকে কেউ উদ্ভট সব সম্বোধন করবে তা আমার পছন্দ নয়। আমি ছোট থেকেই হিংসুটে

প্রকৃতির ছেলে। যা আমার নিজের তা শুধুই আমার নিজের। আমার জিনিসে কেউ তাকালেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি খুব একটা জেন্টেলম্যান নই নম্রমিতা।’

এক প্রকার ঠান্ডা ধমকি দিয়ে নম্রতার দিকে তাকাল আরফান। কথাগুলো ধীরেসুস্থে বলা হলেও কথার ধরনে ভেতরের তপ্ততা টের পেল নম্রতা। আরফান তার ঠান্ডা

অথচ তীব্র চাহনি দিয়েই বুঝিয়ে দিল, তার প্রতিটি কথা কতটা সত্য এবং গম্ভীর।দুপুরের শেষ ভাগে বড় মামার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল নাদিম। গ্রামের মাঝে বিশাল জায়গা নিয়ে বড় মামার বাড়ি। গেইট দিয়ে ঢুকতেই একপাশে দুটো বড় বড় চৌচালা ঘর। একটা ধানের গোদাম। অন্যপাশে পুরনো একতলা বাড়ি। ডানপাশে টিনের চালা দেওয়া

বৈঠকঘর। বৈঠক ঘরের পাশে শান বাঁধানো বিরাট পুকুর। পুকুরের পাশে হাঁসের খামার। হাঁসের খামারটা নতুন হয়েছে। পাঁচ বছর আগে যখন এসেছিল তখন এই হাঁসের খামারটা দেখেনি নাদিম। নাদিম ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ির সামনে ধান শুকানোর বড় মাঠটা পাড় করে উঠোনে পা রাখতেই বেশ কিছু প্রাণী নীরবে তাকে পর্যবেক্ষণ

করল। প্রায় সবাই চাকর শ্রেণীর মানুষ। এদের কাউকেই নাদিম চেনে না। নাদিমকে তারা চিনবে এমনটাও আশা করা যায় না। নাদিম বেশ কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একজন উৎসুক কণ্ঠে শুধাল,‘ আপনি কেডা? কারে খুঁজেন?’

নাদিম উদ্বেগহীন কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি কে? বড় মামাকে গিয়ে বলো নাদিম এসেছে।’

লোকটির চোখ সরু হলো। নাদিমের পরিচয় বুঝতে পেরে বলল,

‘ ভাইজান তো পরিষদে গেছে। আপনে বাড়ির ভিতরে চলেন। ভাবিজানরা আছেন ভিতরে।’

নাদিম সপ্রতিভ পায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণের মাঝেই বাড়ির ভেতর হালকা এক সুর ধ্বনি খেলে গেল। হাজারও আদিখ্যেতা মাখা প্রশ্ন-উত্তরের পর বড় মামী তাকে

বিশ্রাম নিতে বলে রান্নার তোড়জোড় করতে ছুটলেন। নাদিমকে যে মেয়েটা ঘর দেখিয়ে দিল তার নাম পরী। শ্যামলাটে মিষ্টি মুখটা পরীর মতোই সুন্দর, স্নিগ্ধ। নাদিম কলতলা থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত মেয়েটি তার পিছু পিছুই ঘুরল। ঘরে ফিরে বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল নাদিম। ভ্রু কুঁচকে বলল,‘ তুই পরী

না? বড় হয়ে গিয়েছিস অনেক। কোন ক্লাসে পড়িস?’

পরী উজ্জল মুখে তাকাল। চঞ্চল পায়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখভর্তি হাসি নিয়ে বলল,

‘ এইবার এসএসসি দেব নাদিম ভাই।’

‘ বাহ্! ভালো।’

পরী উৎসুক কন্ঠে বলল,

‘ তুমি এতোদিন আসোনি কেন নাদিম ভাই? আব্বা তোমার কথা রোজ বলত। আমিও বলতাম।’

নাদিম হাসল। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বলল,

‘ কী বলতি? আমি যখন এই বাড়িতে শেষবার আসি, তখন তো তুই বেশ ছোট ছিলি। আমায় তো মনে থাকার কথা নয়।’

পরী অবাক হয়ে বলল,‘ যাও! তোমাকে মনে থাকবে না কেন? তুমি তখন কি সুন্দর দেখতে ছিলে। একদম সাদা রঙের। পরীদের ছেলের মতো। খুব মনে আছে আমার।’

নাদিম শব্দ করে হাসল।

‘ পরীদের ছেলের মতো? তুই পরীদের ছেলে দেখেছিস?’

পরী অধৈর্য হয়ে বলল,

‘ উফ! না দেখলেই বা কী? আমার নাম পরী না? আমি সব জানি। পরীর ছেলেরা খুব খুব সুন্দর হয়। তখন তোমাকেও ঠিক পরীর ছেলের মতোই লাগত।’

‘ তখন লাগত, এখন লাগে না?’

‘ এখন তো তোমায় তার থেকেও বেশি সুন্দর লাগে। আগে ছেলের মতো লাগত এখন বরের মতো লাগে। পরীদের বরের মতো।’কথাটা

বলে লাজুক হাসল পরী। নাদিম কয়েক সেকেন্ড চুপ করে চেয়ে রইল পরীর চোখে-মুখে। কিছু একটা বুঝার চেষ্টা করছে। তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল। মনের ভেতর থেকে সুপ্ত মানব খেক খেক করে হেসে উঠে বলল,

‘ মুরগী নিজেই এসেছে শিয়ালের কাছে বাগি হতে। বড় মামাকে জব্দ করার চরম সুযোগ।’

নাদিম নিজের মনে হেসে বলল,

‘ তুমি সবসময় আমায় ডিসট্রেক্ট করার চেষ্টা করো। বড় মামাকে জব্দ করা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই।’

‘ আরে ব্যস! এখন আমার দোষ? মেয়েটাই তো পটে গেল। পটে গেল

বলেই না বললাম। ভোলা চেহারা দেখে পটে গেলে আমার কি দোষ?"

দূর হও। আমি ঘুমাব।'

সুপ্ত মানব মনের এক কোণায় বসে কৌতুকমাখা হাসি হাসতে লাগল। বিষয়টাতে তার খুব আনন্দ লাগছে। আনন্দ লাগছে নাদিমেরও। পৈশাচিক আনন্দ।খাওয়া শেষে দীর্ঘ এক ভাত ঘুমের পর বড় মামার সাথে দেখা করল নাদিম। বড় মামা মাত্রই

পরিষদ থেকে ফিরেছেন। ঘামে ভেজা ক্লান্ত শরীর নিয়ে বৈঠক ঘরের বারান্দায় বসে আছেন। চোখে-মুখে আগের সেই জৌলুশ নেই। বার্ধক্য হানা দিয়েছে শরীরে। শক্তপোক্ত শরীরটা ঢিলেঢালা, থলথলে হয়ে গিয়েছে। মামার সামনে বেতের মোড়ায় বসে কৌতূহলী চোখে সবটা পর্যবেক্ষণ করল নাদিম।‘ আপনার

শরীরটা বোধহয় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না মামা।'
বড় মামা চোখ মেলে তাকালেন। ম্লান হেসে বললেন,
' বয়স হচ্ছে।'
' ততটাও বয়স হয়নি। ডাক্তার দেখান।'
বড় মামা মাথা নেড়ে চুপ করে রইলেন। বড় বড় দম নিয়ে গ্লাসের

বাকি শরবতটুকু এক চুমুকে শেষ করলেন। নাদিম উৎসুক কণ্ঠে বলল, ‘ মিষ্টিকে নিয়ে কী বলছিলেন ফোনে?’

বড় মামা জবাব না দিয়ে বললেন,‘ তোমার চেহারার দশা দেখে তো আমাদের বংশের ছেলে বলে মনে হচ্ছে না বাবা। মাথায় পাখির বাসা। গালেও দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল। ঢাকা

শহরে গুন্ডামী করে বেড়াও নাকি হে?’

নাদিম হাসল। বড় মামা তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন নাদিমের পুরু ঠোঁট জোড়ার দিকে। পরিচিত! খুব পরিচিত সেই হাসি। নাদিম হেসে বলল,

‘ আমি তো আপনাদের বংশের ছেলে নই বড় মামা। আমার বংশ ভিন্ন।’

বড় মামা কিছুক্ষণ চুপ করে নাদিমকে লক্ষ্য করলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন,

‘ মায়ের বংশ কী নিজের বংশ নয়?’

‘ হওয়ার তো কথা নয়।’

বড় মামা বিড়বিড় করে বললেন,‘ আমি মতিনকে বলে দিচ্ছি। বাড়ি এসে চুল,দাড়ি ছেঁটে দিয়ে যাবে তোমার। ভদ্রলোকদের এভাবে থাকতে নেই।’

নাদিম মাথার ঘন চুলগুলো ঝাঁকিয়ে বলল,

‘ সে দেখা যাবে। আপনি বরং মিষ্টির কথা বলুন। ওর জন্যই তো এতো জরুরি তলব। কেন ডেকেছেন?’

বড় মামা চওড়া চেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজলেন।

‘ অতো তাড়া কীসের? আজই এলে, বিশ্রাম নাও। কাল সকালে নাহয় কথা হবে।’

‘ কাল সকাল পর্যন্ত তো থাকতে পারছি না মামা। আসার সময় ফেরার টিকেট করেই এসেছি। সন্ধ্যায় ট্রেন। রাতের মধ্যে ঢাকা পৌঁছাতে হবে।’

বড় মামা অবাক হয়ে বললেন,‘ সে কি! এতোদিন পর এসে আজই

ফিরে যাবে? কিছুদিন থাকো। টিকেটের ব্যবস্থা আমি করে দেব।’

‘ টিকেটটা কোনো ব্যাপার না বড় মামা। ব্যাপারটা আমার ঢাকা ফেরা নিয়ে। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।’

নাদিমের উত্তরটা বড় মামার ঠিক পছন্দ হলো না। বিস্বাদ মুখে বললেন,

‘ বন্ধু অপেক্ষা করলেই ছুটতে হবে নাকি? থাকো ক’দিন। গ্রামে-গঞ্জে

ঘুরে বেড়াও। তোমার মামিও বোধহয় এতো তাড়াতাড়ি ছাড়বে না। ভেতর বাড়িতে রান্নার বিশাল আয়োজন চলছে।’

নাদিম জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। ধীর কণ্ঠে বলল,

‘ মিষ্টির কি হয়েছে? কেন ডেকেছেন?’

বড় মামা এবার যেন হঠাৎই আগের রূপে ফিরে এলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খেলে

গেল চোখে মুখে। মুখের ভঙ্গিমা পাল্টে বললেন,‘ তোমার বোন যে এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে জানো?’ কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা করলেন তিনি। তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বললেন,

‘ জানো না, জানি। জানার প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভিন্ন। মিষ্টি বড়

হয়েছে। ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।'

নাদিম ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল। মিষ্টির বিয়ে? ওই ছোট্ট পুচকো মেয়েটার বিয়ে? ওর কী আদৌ বিয়ের বয়স হয়েছে? এই সেদিনও না লাল ফ্রক পরে বোকা বোকা চোখে চেয়ে থাকত মেয়েটা? নাদিম মিষ্টির মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। মনে পড়ছে না। শেষ কবে

দেখেছিল সেটাও মনে পড়ছে না। নাদিম চিন্তিত চোখদুটো বড় মামার মুখের উপর স্থির করল। বড় মামা উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকায় খানিক নড়ে চড়ে উঠল নাদিম। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ কোন ক্লাসে পড়ে মিষ্টি? এখনই বিয়ে কেন? পড়াশোনা করুক।’

বড় মামা অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল,

‘ রক্ত কথা বলে বাবা। ওই মেয়ের বিশ্বাস আছে? কখন কী কান্ড ঘটিয়ে ফেলে। মেয়েটাকে বিয়ে দিতে পারলে আপদ বিদেয় হয়।’নাদিমের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করল, সে রেগে যাচ্ছে। বড় মামাকে ধরে বেধরাম পেটাতে ইচ্ছে করছে। শালা, পিশাচ! নাদিমকে বিরক্ত মুখে বসে থাকতে দেখে মৃদু হাসলেন বড় মামা। ভারি

বুদ্ধিদীপ্ত চোখে তাকালেন।সেই কুটিল চোখ দুটোর দিকে চেয়ে নাদিমের কী ঘেন্না হলো? হওয়ার কথা না। নাদিম মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে মজা পায়। প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে গালি দেয়। বেধরাম পেটায়ও। কিন্তু ঘেন্না করে না। নাদিম সূক্ষ্ম চোখে চেয়ে বড় মামার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। বড় মামা চাকর শ্রেণীর কাউকে ডেকে কিছু একটা আনতে

বললেন। তারপর চিন্তিত হওয়ার ভান করে বললেন,‘ আজকাল বিয়ের বাজার খুব সোজা নয় বাবা। তারওপর মেয়ে হলো জারজ। জেনে-শুনে জারজ মেয়েকে ঘরের বউ কে করবে শুনি? টাকা-পয়সা দিয়ে পাড় করা ছাড়া তো আর কোনো উপায় দেখি না বাপ।’

নাদিমকে বিরক্ত মুখে বসে থাকতে দেখে বড় মামা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ তোমায় ওসব ঝামেলায় জড়াতে হবে না বাবা। যেমন আছো তেমনই থাকো। ব্যবস্থা যা করার সব আমিই করব। কিন্তু টাকা-পয়সার ব্যাপারটা তো তোমাকেই দেখতে হবে বাবা। মেয়ের ভাই যেহেতু তুমি সে হিসেবে দায়িত্ব তো তোমারই বলো?এই মেয়ের সাত-পাঁচে না থেকেও বহুত টেনেছি আমি। আর কত? আমারও দু-দুটো মেয়ে আছে। অত টাকা-

পয়সায় আমিই বা কোথায় পাব বাবা?’বড় মামার উদ্দেশ্য এবার স্পষ্ট বুঝল নাদিম। চোয়াল শক্ত করে চুপচাপ চেয়ে রইল বড় মামার থলথলে মুখটার দিকে। চাকরটা এসে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ দিয়ে যেতেই ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করে নাদিমের দিকে এগিয়ে দিলেন। নাদিম ভ্রু কুঁচকে

কাগজটা হাতে নিতেই বড় মামা বিগলিত কণ্ঠে বললেন,

‘ তুমি তো বাবা বছরেও এদিকে মাড়াও না। কোথায়, কী করো আল্লাহ মালুম। তাই বলছিলাম কী? তোমার নামে বাবা যে চার একর জমি রেখে গিয়েছেন। সেই জমিটা বরং ছেড়ে দাও। অযথা পড়ে আছে। ওগুলো বিক্রি করে মিষ্টির বিয়েটা....’বলতে বলতে থেমে

গেলেন বড় মামা। সামনে বসে থাকা ছেলেটির শক্ত চোয়াল। অকপট চাহনি দেখে হঠাৎই চমকে উঠলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আদিবকে বিভ্রম হলো তার। নাদিম কাগজটা বড় মামার কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল,

‘ মিষ্টির বিয়ের কথা ভুলে যান মামা। ওর বিয়ের বয়স হয়নি।’

নাদিমের কণ্ঠে আদিবের সেই অকপট, ভয়হীন কণ্ঠের আভাস পেয়ে কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পেল না বড় মামা। সম্মোহনের মতো নাদিমের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ বয়স হয়নি, বিয়ের পর বয়স হয়ে যাবে। তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো দায়-দায়িত্ব

নেই। তবুও অযথা বোঝা বইতে যাব কেন? তোমারই বা কী প্রয়োজন? তুমি টাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাও। বাকিটা আমি দেখব।’

নাদিম দৃঢ় কন্ঠে বলল,‘ মিষ্টির বিয়ে নিয়ে আর কোনো আলোচনা না হওয়ায় ভালো বড় মামা। ওর বিয়ের বয়স হয়নি।’

বড় মামা চাপা রাগ নিয়ে বললেন,

‘ ওর বিয়ের বয়স হয়েছে কিনা তা তুমি শেখাবে আমায়? কখনও খোঁজ নিয়েছ ওর? আজ হঠাৎ বোনের প্রতি এত দরদ, হ্যাঁ?’

নাদিম শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি ক’দিন খোঁজ নিয়েছেন ওর? আপনার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো বলে মনে হচ্ছে না। খুব বেশিদিন বাঁচবেন বলেও মনে হয় না। শেষ বয়সে এসে আপাতত

হিসেবী চিন্তা-ভাবনা বাদ দিন। বিশ্রী কুটিলতা থেকে বেরিয়ে একটু মানুষ হোন।'বড় মামা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তার গ্রাম, তার বাড়িতে বসে কেমন অকপট কথা বলছে ছেলেটা। অপমান করছে। ভয় নেই? আদিবেরও ছিল না। বড় মামা চাপা গর্জন করে বললেন,

' কি বলতে চাইছ তুমি? আমি অমানুষ? আমি অমানুষ হলে তোমার

ওই জারজ বোনকে এতোদিন দেখেছে কে?’

‘ সেটা তো আমারও প্রশ্ন। কে দেখেছে ওকে? আপনি তো দেখেননি।’

এটুকু বলে থামল নাদিম। হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,‘ মিষ্টি কোনো চাইল্ড হাউজে থাকে না, তাই না মামা? আপনি ওকে সরিয়ে দিয়েছেন। কোথায় থাকে ও?’

বড় মামা থতমত খেয়ে গেলেন। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল মুখ। অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, এই দুইদিনের বাচ্চা ছেলেটাকে খানিক সমীহ করছে তার মন। নাদিম শক্ত চোখে চেয়ে রইল। বোনের প্রতি প্রগাঢ় কোনো টান কোনো কালেই উপলব্ধি করেনি সে। সংগত কারণেই তার সুখ-দুঃখের কথাও কখনও চিন্তা করা হয়নি। তবুও আজ হঠাৎ ভীষণ

রাগ লাগছে তার। সামনে বসে থাকা লোকটিকে রড দিয়ে পিটিয়ে চমড়া ফাটিয়ে দেওয়ার এক দূর্দমনীয় ইচ্ছে জাগছে।বিষণ্ন সন্ধ্যা মিলিয়ে রাত নেমেছে শহরে। শরতের ঝিরিঝিরি বাতাসে উড়ছে পূজার খয়েরী শাড়ির আঁচল। গোছালো চুলগুলো ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়ছে ক্লান্ত, সুন্দর মুখটিতে। চাঁদের আলোয় মোমের পুতুলের মতোই স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তার

নিখুঁত মুখশ্রী। তার থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে, তার দিকেই মগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুপুরুষ এক যুবক। প্রিয়তমার মুখের প্রতিটি ভাঁজ যেন গুণে গুণে মুখস্থ করছে সে। পূজা কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছিল। বেখেয়ালি হাতে অগোছালো চুলগুলো গোছাতে গোছাতে বলল,‘ অন্তদাদের ছাঁদটা

বেশ খোলামেলা। বাতাস হয় খুব। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।’

রঞ্জন রেলিঙে ঠেস দিয়ে হাত ভাঁজ করে দাঁড়াল,

‘ আমারও খুব পছন্দ হয়েছে।’

পূজা বুঝতে না পেরে ভ্রু কুঁচকাল। ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ কী?’

‘ তোমাকে।’

রঞ্জনের ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি। পূজা হেসে অন্যদিকে তাকাল। রঞ্জন বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে পূজার সামনে এসে দাঁড়াল। রঞ্জনকে কাছাকাছি দাঁড়াতে দেখে চোখ তুলে তাকাল পূজা। চোখে তার হাজারখানেক প্রশ্ন। দমকা বাতাসে এক গাছি চুল আছড়ে পড়ল পূজার কপালে। আলতো হাতে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে সম্মোহিত,মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল

রঞ্জন। হাত বাড়িয়ে রঞ্জনের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে কপাল কুঁচকাল পূজা। আদুরে কণ্ঠে বলল, ‘ কি দেখছ? কি হয়েছে?’রঞ্জন জবাব দিল না। আগের মতোই নির্নিমেষ চেয়ে থেকে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাজ করে বসল। পকেট থেকে সিঁদুর কৌটা বের করে পূজার সিঁথি রাঙাল গাঢ় সিঁদুরের রেখায়। মোমের মতো ফর্সা খাড়া নাকে

উজ্জ্বল হয়ে উঠল সিঁদুরের লাল রঙ। মুখটিতে ভর করল গাঢ় মায়া। কপালে সিঁদুর ল্যাপ্টানো প্রিয়তমাকে হঠাৎই প্রতিমা বলে বোধ হলো তার। লুকায়িত সৌন্দর্যটুকু ডানা মেলে ঝলসে দিতে চাইল তার গাঢ় দৃষ্টি, সম্মোহিত মন। পূজার হতভম্ব দৃষ্টি উপেক্ষা করে পূজার ডানহাতটা নিজের হাতে তুলে নিল রঞ্জন। খুব মনোযোগ দিয়ে হাতের চুড়িগুলো

গুণার চেষ্টা করল। প্রতিটা চুড়ি আলাদা করতে করতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বলতে লাগল,‘ ভালোবাসি। ভালোবাসি। ভালোবাসি।’

রঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকা পূজার দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে লাগল। হতভম্বভাব শেষে ফুটল গাঢ় কোমলতা। তারপর দীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় সুর। এতোদিন কঠোর

নিয়মে সামলে রাখা পূজা এবার ডুকরে কেঁদে উঠল। রঞ্জনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। রঞ্জন আলতো হাতে সামলে নিল তাকে। ভালোবাসার প্রতিমাটিকে বুকের সাথে ল্যাপ্টে নিয়ে ঘন চুলে ঠোঁট ছোঁয়াল। ভীষণ আবেগ নিয়ে বলল,

‘ ভালোবাসি!’পূজার কান্নার আওয়াজ দৃঢ় হলো। দুইহাতে খামচে ধরল

রঞ্জনের পাঞ্জাবি। যেন ছেঁড়ে দিলেই ফুরিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে অনেক দূর দেশে। রঞ্জনের ভারী পাপড়ি খানিকটা ভিজে উঠল কী? হয়তো। সিক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ তোমাকে বুক পকেটে ক্যারি করার ক্ষমতা থাকলে দূর্দান্ত হতো পূজা। বিশ্বাস করো, বুক পকেটে খুব যত্ন করে লুকিয়ে রাখতাম তোমায়। হঠাৎ হঠাৎ বের করে মন ভরে

দেখতাম। অল্প একটু দুষ্টু আদর করতাম। ইচ্ছেমতো ভালোবাসতাম। তারপর আবারও লুকিয়ে রাখতাম বুক পকেটের এক কোণায়। তোমার ঠাকুর নাকি সব পারে? দিতে বলো তো আমায় এমন ক্ষমতা। আমার খুব দরকার তোমায়। খুব বেশিই দরকার।'

পূজা মাথা তুলে তাকাল। ডান হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে ভ্রূ

কুঁচকাল।‘ ঠাকুর শুধু আমার? তোমার নয়?’

‘ উহু। আমার নয়। আমার ওসবে বিশ্বাস নেই।’

‘ তাহলে সিঁদুরে বিশ্বাস কী করে এলো?’

রঞ্জন হেসে বলল,

‘ সিঁদুরটা তো তোমার বাবার জন্য। সুন্দরী বউ রেখে দেশ ছাড়ছি। সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে না?

সিঁদুর পরিয়ে সীল গালা করলাম। ছবি তুলে দলিল করব। সেই দলিল তোমার বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে ট্যাগ মার্কে লিখব, “রঞ্জনের ব্যক্তিগত জিনিস”। ‘

পূজা চোখ ছোট ছোট করে বলল,

‘ সব সময় ফাজলামো না?’

রঞ্জন হেসে ফেলল। পূজাকে কাছে টেনে নিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল,‘ আরে, আমি সিরিয়াস!’

পূজা প্রত্যুত্তর না করে চুপ করে পড়ে রইল বুকে। রঞ্জন জোড়াল শ্বাস নিয়ে কৌতুকমাখা কণ্ঠে বলল, ‘ এখন একটু কেঁদে নাও তো। কাল এয়ারপোর্টে কিন্তু কান্নাকাটি চলবে না। কান্নাকাটি চলবে না আগামী পাঁচ বছর। আমি ফিরলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাকি কান্না কাঁদবে। আজ ফার্স্ট রাউন্ড। স্টার্ট, স্টার্ট।’পূজা হেসে ফেলল।

পরমুহূর্তে, বাস্তবিকই কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিল রঞ্জনের বুক। সারাদিন যে থমথমে কান্না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তা যেন বুক বেয়ে বেরিয়ে এলো এবার। রঞ্জনের হাতের বাঁধন শক্ত হলো। ঠোঁটদুটো নিবদ্ধ হলো প্রেয়সীর কপালে। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তো আমায় সীল গালা করলে না, পূজা।' ঠিক সেই সময় বাড়ির সামনে এসে

দাঁড়াল একটি লম্বাকৃতি ছায়া। ল্যাম্পপোস্টের ফিকে আলোয় ক্লান্ত দেখাল তার মুখ। রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা নেড়ি কুকুর দুটো ঘেউঘেউ করে এলাকা মাথায় তুলল। রূপালী চাঁদটা কারো ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে লাজুক মুখ লুকাল শরতের শুভ্র মেঘের ছায়ায়। কালো পাঞ্জাবি গায়ে ক্লান্ত যুবকটি বাড়িতে প্রবেশ করতেই ঝিমিয়ে থাকা আড্ডাটা

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এগারোর ঘরে পৌঁছে যাওয়া ঘড়ির কাটাটা যেন নিমিষেই সন্ধ্যেতে নেমে এলো। উচ্ছ্বসিত, কলোরবে মুখরিত হল বন্ধুমহল।মেয়েটা যখন মারা গেল তখন ঘড়িতে বারোটা কি একটা বাজে। এক্সিডেন্ট কেইস। দশদিন হাসপাতালে ভর্তি থেকে এগারো দিনের মাথায় মৃত্যু। আরফান যখন শেষবার চেকআপ করল তখন

মেয়েটি বেঁচে ছিল। লাইফ সাপোর্টে নিঃশ্বাস চলছে, ক্লিনিক্যালই ব্রেইন ডেথ। বাঁচার সম্ভবনা ক্ষীণ। আরফান মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। নিজের পেশার খাতিরেই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে সে। এই সকল মৃত্যু খুব একটা স্পর্শ করে না তাকে। মানসিক পীড়া দেয় না। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম কিছু ঘটল। চেকআপ শেষে, মেয়েটির

স্বামীকে যখন চেম্বার ডেকে বলল,‘ রোগীর বাঁচার আশঙ্কা কম। আপনারা ম্যান্টালি প্রিপেয়ার থাকার চেষ্টা করুন। এক দুই ঘন্টার মাঝেই খারাপ কোনো সংবাদ শুনতে হতে পারে। আপনারা চাইলে এখনও লাইফ সাপোর্টে রাখতে পারেন। তবে, লাভ বিশেষ হবে বলে মনে হয় না।’

আরফান কথাগুলো খুব প্রফেশনালি বলেছিল। সবসময় যেমন বলে, ঠিক সেভাবেই। কিন্তু সামনে বসা ছেলেটির হতভম্ব, অসহায় দৃষ্টি যেন তার মনের কপাটে শক্ত এক আঘাত হানল। পুরোটা সময় ছেলেটি দিশেহারা চোখে আরফানের মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটা কথাও বলল না। একসময় আরফানের সন্দেহ হলো, ছেলেটি তার কথা

শুনছে তো? আরফান এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিয়ে বলল,‘ আপনি ঠিক আছেন?’

ছেলেটি একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঝকঝকে পরিষ্কার গ্লাসটির দিকে, জবাব দিল না। আদৌ কিছু বুঝতে পারছে বলেও মনে হলো না। ছেলেটির চোখ-মুখের অসহায়ত্ব, দিশেহারা ভাব দেখে জানে না কেন হঠাৎ নম্রতার মুখটা ভেসে উঠল

আরফানের চোখে। বুকে স্পষ্ট এক ব্যথা তরতর করে বাড়তে লাগল। ছেলেটি উদভ্রান্তের মতো চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও সেই ব্যথাটা রয়ে গেল। মাংস খামচে বসে রইল আরফানের বুকে। শুরু হলো অস্থিরতা। বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করল, গোটা ডাক্তারি জীবনে এই প্রথম কোনো রোগীর মৃত্যুতে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু

এমনটা তো হওয়ার নয়। হয়নি কখনও। তবে আজ কেন? আরফান অস্থিরতায় হাসফাস করে । কাজে মন বসে না। ঘুরেফিরে মনে পড়ে যায় মৃত মেয়েটির মুখ। সেই মুখটা যদি নম্রতার হতো তবে? আরফান কেঁপে উঠে। নম্রতার প্রতি তার প্রগাঢ় দুর্বলতা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে।অন্তুদের বাসা থেকে ফিরে মাত্রই বিছানায় গা এলিয়েছে নম্রতা।

সারাদিনের দৌড়ঝাঁপ। ঢাকায় ফিরে বাসর ঘর সাজানো। বন্ধুদের সাথে আড্ডা সব মিলিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গা। দুই চোখ ভার করে আসতে চাইছে রাজ্যের ঘুম। কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্নও হয়ে পড়েছিল নম্রতা। ভাসা ভাসা কিছু স্বপ্নও বোধহয় দেখছিল। ঠিক তখনই ফোনের ঘন্টি বাজল। নম্রতা ঘুমের মাঝেই চমকে উঠল। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে 'ডাক্তার'

নামটা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল নম্রতা। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখল, একটা বিশ। আরফান যেখানে সপ্তাহে তিন থেকে চারদিনের বেশি ফোন দেয় না সেখানে এতো রাতে তার ফোন পেয়ে বোকা বনে গেল নম্রতা। ফোন রিসিভ করে সন্দিহান কণ্ঠে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ল আরফান,' কেমন আছেন আপনি?'

বিষয়টা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল নম্রতার। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে বলল,

‘ হঠাৎ এতো রাতে?’

‘ উচিত হয়নি? রেখে দেব?’

নম্রতা ব্যস্ত হয়ে বললাম,

‘ না। তা কেন? এখনও রেগে আছেন?’

‘ না।’

‘ তাহলে কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন? আপনি ঠিক আছেন?’

আরফান লম্বা একটা শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,

‘ আমি হয়তো আপনাকে মিস করছি নম্রমিতা। আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। এই মুহূর্তে দেখতে ইচ্ছে করছে। এই অদ্ভুত ইচ্ছে কেন হচ্ছে আমার?’আরফানের কণ্ঠে কি ছিল জানা নেই। কিন্তু সেই কণ্ঠে বলা

বাক্যগুলো হঠাৎ-ই বড় সুমধুর ঠেকল নম্রতার কানে। আরফানের অকপট প্রকাশে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে। আরফানের করা প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া গেল না। খুঁজার চেষ্টায় হয়ত করল না নম্রতা। কানের মাঝে বৃষ্টির শব্দের মতো ছন্দ তুলে বাজতে লাগল আরফানের কণ্ঠস্বর। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ

থাকার পর মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল আরফান,

‘ কালকের দাওয়াতটা নিচ্ছেন?’

‘ দাওয়াত?’

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল নম্রতা।

‘ নিদ্রার পক্ষ থেকে লাঞ্চের দাওয়াত। আজ তো পারলেন না। কাল হবে?’

নম্রতাকে চুপ থাকতে দেখে কাতর স্বরে অনুরোধ করে বসল আরফান,

‘ প্লিজ!’

আরফানের কথার ধরনে বারবার অবাক হচ্ছে নম্রতা। আরফান কখনোই এতোটা দুর্বল ছিল না। তাদের সম্পর্কের শুরু থেকেই আরফানের চেয়ে নম্রতার দূর্বলতাটাই ছিল বেশি। নম্রতাই কাছে আসার চেষ্টা করত, ভালোবাসার চেষ্টা করত। পাগলামো, বাচ্চামো সবটাই ছিল নম্রতার। তবে

আজ হঠাৎ এই অস্থিরতা কেন?বেলী আর গোলাপে ঢাকা বিছানায় শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে নীরা। অপরিচিত এই ঘরটা বেলী ফুলের তীব্র গন্ধে মৌ মৌ করছে। বেলী ফুলের ঝাঁঝাল গন্ধে দমবন্ধ লাগছে নীরার। খুব পরিচিত একজনের অপেক্ষায় হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। বুকের ভেতর দামামা বাজাচ্ছে হৃদপিন্ড। বন্ধু থেকে স্বামী হয়ে উঠা মানুষটি

তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে ভাবতেই অস্থির লাগছে। চিরায়ত স্বামী-স্ত্রীর মতই কি কাটবে তাদের রাত? অন্তু কিভাবে নিবে তাকে? বেলী আর গোলাপের শোভামন্ডিত ঘরটিতে হালকা নীল আলো জ্বলছে। দরজার পাশে ছোট্ট টেবিলটিতে ভিন্ন রঙের মোমও জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। নিশুতি রাত দ্বিতীয় প্রহরে গা ভাসাতেই রাতের শান্ত ঝিমঝিম

শব্দে ধরফর করে উঠছে বুক। চারদিকে অস্বস্তিকর নীরবতা। সেই নীরবতাকে আরও বেশি গা ছমছমে করে দেওয়ার জন্যই হয়ত ঘরজুড়ে বেলীফুলের তীব্র সুগন্ধ। হঠাৎ হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসছে বেশ কিছু উৎসুক মানুষের আনন্দিত কণ্ঠস্বর। ক্ষীণ হাসির শব্দ। ওগুলো কী তবে নাদিম-রঞ্জন? হতে পারে। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ক্লান্তিতে চোখদুটো

বোজে আসছে তার। ভারী শাড়ি আর অনেকক্ষণ টানা বসে থাকার জন্য ঝিমঝিম করছে পা। ভ্যাপসা গরমে চুলকাচ্ছে শরীর। নীরা অসহায় চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল, একটা বিশ। অন্তু কি তবে ঘরে আসবে না? একটি চিন্তার রেশ ধরে ধীরে ধীরে অসংখ্য চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল মস্তিষ্কে। অন্তুর মনোভাব জানার ইচ্ছেয় ছটফট করে উঠল

ভেতরটা। চিরায়ত স্বামীদের মতো অন্তুও কী খুব ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে আজ? নাকি দূর্ব্যবহার করবে তার সাথে? বন্ধু অন্তুকে নীরা চিনে। বন্ধু অন্তুর আগাগোড়া পড়ে ফেলার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু স্বামী হিসেবে অন্তু কী রকম হতে পারে তার বিন্দু বিসর্গও ধারণা করা যাচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে ভয় আর অনিশ্চয়তায় গলা শুকিয়ে আসছে।

এক চুমুক জলের জন্য হাপিত্যেশ করে মরছে হৃদপিণ্ড।নীরার হাজারও জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘরে এলো অন্তু। ঘড়ির কাটা তখন দেড়টা ছুঁই ছুঁই। অন্তু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে ফ্যানের সুইচ চাপল। কয়েক সেকেন্ড বিলম্ব করে ভো ভো শব্দ তুলে ঘুরতে লাগল বৈদ্যুতিক পাখা। অন্তু শেরওয়ানির

বোতাম খুলতে খুলতে ফ্যানের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। টি-টেবিলে থাকা পানির গ্লাসটা তুলে নিয়ে গলা ভেজাল। প্রতিটি কাজই সে করল অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। নীরার দিকে তাকাল না। অন্তকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অস্বস্তিতে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল নীরা। তীব্র অস্বস্তি নিয়ে অন্তর দিকে এক পলক তাকাতেই দৃষ্টি থমকে গেল তার।

চোখের পলকে বিশ্বাস করে নিল, সাদা শেরওয়ানি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি পৃথিবীর সবথেকে সুপুরুষদের একজন।অন্তর শ্যাম কালো মুখের বিগলিত মায়ায় নারী অহংকারের সবটায় যেন ভেসে গেল নীরার। বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল গুচ্ছ গুচ্ছ অনুভূতির বহর। বন্ধু থেকে স্বামীত্ব বরণ করা মানুষটির দিকে অপলক চোখে চেয়ে

থেকে হঠাৎই উপলব্ধি করল, এই মানুষটিকে প্রচন্ড ভালোবাসে নীরা। তাকে দেখা মাত্রই তীব্র অনুভূতিতে ঝাপসা হয়ে আসে সব। অন্ত শেরওয়ানিটা খুলে রেখে আলমারি থেকে টি-শার্ট, টাউজার বের করল। নীরার সামনে বিছানায় একটি সুতি শাড়ি রেখে নিঃশব্দে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। পুরোটা সময় অন্তকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল নীরা।

অন্তর বেখেয়ালি চাহনী। প্রশস্ত কাঁধ। অনাবৃত রোমশ বুক। কপালের কুঞ্চন থেকে শুরু করে হাঁটা-চলা সব। পনেরো মিনিটের মাথায় ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো অন্ত। সারামুখে বিন্দু বিন্দু পানির ছঁটা।চুলগুলো ভেজা, অগোছালো। নীরা আবারও অপলক চোখে চেয়ে রইল অন্তর চোখে-মুখে। তবে, অন্তর মাঝে কোনো ভাবাবেগ

দেখা গেল না। তার হাবভাব দেখে মনে হল, তার নিজস্ব বিছানায় নীরা নামক মেয়েটার বসে থাকা। তার দিকে অহর্নিশ চেয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। অতীতে ঘটেছে। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটছে। ভবিষ্যতেও এমনটাই ঘটবে। অন্তু হাতের তোয়ালেটা চেয়ারের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। নীরার দিকে পিঠ ফিরিয়ে চুপচাপ

বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। একটা বারের জন্যও নীরার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। নীরার উদ্দেশ্যে একটা কথাও বলল না। নীরাও আগ বাড়িয়ে কথা বলার সাহস পেল না। শুকনো মুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে অন্তর দেওয়া শাড়িটা নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। দরজা লাগানোর আগমুহূর্তেও অসহায় চোখে চেয়ে রইল সাদা টি-শার্ট গায়ে

অন্তর পিঠে।মুখের সাজগোজ তুলে গোসল করে বেরুতে বেরুতে প্রায় একঘন্টা লেগে গেল নীরার। ওয়াশরুম থেকে বেরিয়েই দেখল অন্ত ঘুমাচ্ছে। বিছানায় ফুলের অংশবিশেষও অবিশিষ্ট নেই। ধবধবে সাদা চাদরে, সাদা টি-শার্ট গায়ে ঘুমিয়ে আছে শ্যাম কালো এক যুবক। নীরা ধীর পায়ে বিছানার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। বামপাশে

একজনের শোয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা রেখে ডানপাশ ঘেঁষে শুয়েছে অন্তু। বামহাতটা মাথার নিচে দিয়ে ডানহাতটাকে কপালের উপড় আড়াআড়িভাবে স্থান দিয়েছে সে। কপালটা হালকা কুঁচকে আছে। নীরা বুঝল, তার এই বিছানায়, অন্তুর পাশে ঘুমানোর অনুমতি আছে। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় বসল। অভিমান ভরা চোখে অন্তুর মুখের

দিকে চেয়ে রইল অল্প কিছুক্ষণ। বালিশ টেনে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়তেই টপাটপ চোখের জলে বালিশ ভিজল। জীবনের প্রথম কোনো পুরুষের বিছানায় এসে মনের একটা অংশ অস্বস্তিতে কাদা হয়ে গেলেও অপর একটি অংশ খুব করে চাইতে লাগল, অন্তত তাকে জড়িয়ে ধরুক। বুকের খুব কাছে নিয়ে খুব যত্ন করে ঘুম পড়াক।

কতদিন ঘুমায় না নীরা! অন্তু নাহয় এবার একটু ঘুম পাড়ানী ঔষধ হোক।সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্তুকে বিছানায় পেল না নীরা। ঘড়ির কাটা তখন সাড়ে আটের ঘরে। নীরা দরফর করে উঠে বসল। হাতে-মুখে পানি দিয়ে বিছানা গোছাল। ঘড়িতে নয়টা বাজতে চললেও কেউ ডাকতে এলো না তাকে। নতুন বউ হয়ে নিজ উদ্যোগে

বাইরে যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝে উঠতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অন্তর দূর সম্পর্কের বোন দরজা থেকেই বাইরে আসার জন্য ডেকে গেল। নীরা অস্বস্তি আর অনিশ্চয়তা নিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই মহিলাদের ফিসফাস কানে এলো। রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অন্তর দুই ফুপু

আর খালা। নীরাকে বেরুতে দেখেই চোখ কপালে তুলে বলল,

‘ নতুন বউয়ের কী এতো ঘুমালে চলে নাকি? আমাদের সময় ফজরের ওয়াক্ত উঠে মশলা বাটতে হয়েছে। একশো মানুষের রান্না করতে হয়েছে। নতুন বউ মশলা বাটতে পারো?’

নীরা মাথার কাপড় ঠিক করে নিয়ে মাথা নাড়ল। অন্তর বড় ফুপু এক

গামলা পেঁয়াজ, রসুন আর কাঁচা মরিচ ধরিয়ে দিয়ে বললেন,‘ এগুলো বেঁটে ফেলো তো। তোমাদের তো বৌভাত হচ্ছে না। আমরা আজই পত্রপাঠ বিধেয় হচ্ছি সব। যাওয়ার আগে অন্তুর বউয়ের হাতে রান্না খেয়ে যাই।হাঁসের মাংসটা মরিচ বাটা দিয়ে রাঁধবা। বড় ভাবি? দুপুরে অন্তুর বউ রাঁধব। আপনার ছুটি।’কড়াইয়ে খুন্তি চালাতে

চালাতেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন জাহানারা। থমথমে মুখে নীরাকে একবার পর্যবেক্ষণ করে আবারও নিজের কাজে মন দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই নীরাকে শীল-নোড়া ধরিয়ে দেওয়া হলো। নীরা টু শব্দ না করে মশলা বাটতে বসল। কাল নম্রতা-ছোঁয়া ফিরে যাওয়ার আগে জোরপূর্বক কয়েক লোকমা খাইয়ে রেখে গিয়েছিল তাকে। তখন

মানসিক চাপ আর চিন্তায় খেতে পারেনি নীরা। গা গুলাচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল। এখন ক্ষুধায় পেট জ্বালা করছে অথচ খাবার মুখে দেওয়ার উপায় নেই। অতোগুলো পেঁয়াজ,রসুন ছিলে বাটতে বাটতেই চোখ-মুখে জ্বালা ধরে গেল নীরার। এক পর্যায়ে হাতের মাংস পেশিগুলোতেও চিনচিনে ব্যথা করে উঠল। হাতদুটো বার দুয়েক ঝাঁকিয়ে

আবারও নিজের কাজে মন দিল নীরা। কাঁচা মরিচ বাটতে গিয়ে কচি হাতদুটোতে যেন আগুন ধরে গেল। সেই সাথে ফুপু-খালা শাশুড়ীদের ঝাঁঝাল কথার তোড়ে চোখ ফেঁটে জল গড়াতে চাইল নীরার। ফুপু শাশুড়ী হৈ হৈ করে বললেন,

‘ এভাবে কেউ মশলা বাটে? সারা পাটায় ছড়িয়ে ফেলছে দেখি। কাজের মিল-মিছিল জানো না।

আমাদের সময় হলে শাশুড়ী একদম মুখে গুঁজে দিত। আমাদের স্বর্ণা কি সুন্দর মশলা বাটে!’এমন হাজারও কথায় বুকটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল নীরার। হঠাৎ করেই মায়ের মুখটা ভেসে উঠল চোখে। বাবা মারা যাওয়ার পর হঠাৎ করেই অভাব-অনটনে পড়ে গিয়েছিল তারা। কত টানাপোড়েনে জীবন কাটাতে হয়েছে। খেয়ে-না-খেয়ে দিন কাটাতে

হয়েছে। এতোকিছুর পরও মেয়ে দুটোকে বুকে আগলে বড় করেছেন মা। সময়ে-অসময়ে ঝাঁঝাল, ভারী কথাও শুনিয়েছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই পরম মমতায় আগলে নিয়েছেন বুকে। হাত জ্বলার ভয়ে মরিচ কাটতে না দেওয়া তার মেয়েটি আজ মরিচ বাটতে বসেছে দেখলে কি মা আঁতকে আঁতকে উঠত না? মেয়ের জ্বালায়, মেয়ের আগেই কি তার

চোখে জল টলমল করত না? নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মাথা নিচু করে অসহ্য জ্বালা আর ব্যথা সহ্য করতে করতেই বুঝল, বাড়ির বউ আসলে বাড়ির কেউ নয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এই সমাজের সবচেয়ে বড় অন্যায়। পরিষ্কার, ঝকঝকে পবিত্র সমাজটা কী অতোবড় অন্যায় করতে পারে? কক্ষনও নয়।চোখের উপর কড়া

রোদের ঝাপটায় ঘুম ভাঙল নাদিমের। পায়ের দুই আঙ্গুল দিয়ে জানালার পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে উল্টো হয়ে শুল। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ পড়ে থেকেও ঘুমের দেখা পাওয়া গেল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। একটু আগে খুব ফালতু একটা স্বপ্ন দেখায় মেজাজটা চটে গিয়েছে। স্বপ্নে বড় মামা হাসতে হাসতে রক্ত বমি করে পৃথিবী ভরিয়ে

ফেলছেন। মানুষ কখনও হেসে হেসে রক্ত বমি করে কি-না জানা নেই নাদিমের। রক্তবমি কখনোই আনন্দের কোনো ব্যাপার নয়। বমি করাও যথেষ্ট পরিশ্রমের ব্যাপার। কাঁদতে কাঁদতে বমি করলেও ঠিক ছিল। কেউ হাসতে হাসতে বমি করবে কেন? আর বমি করলেও, বমিতে বমিতে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেলতে হবে কেন? নাদিম বড়

মামাকে বিশ্রী কিছু গালি দিয়ে উঠে বসল। স্বপ্ন নিয়ে থিওরিটা আজ মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে তার। মাথার চুলগুলো ঝাঁকিয়ে বেখেয়ালে পাশের বিছানায় তাকাতেই চমকে উঠল নাদিম। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বুকে থুতু ছিটাল। বিশাল একটা হাই তুলে বিশ্রী একটা গালি দিয়ে বলল,‘ ডর দেখাই দিছিলি, শালা।’

অন্তুর জবাব না দিয়ে কপাল কুঁচকে তাকাল। পায়ের জুতোটা নাদিমের দিকে ছুঁড়ে মেরে বলল,

‘ তোর ভাষা ভয়ানক বাজে হচ্ছে দিন দিন। এতো অশ্লীল গালি আমি মনেও আনতে পারিনি কোনোদিন।’

নাদিম দাঁত বের করে হাসল। জুতোটা লাথি দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে বলল,

‘ আরে মামা! আমি সিঙ্গেল মানুষ হয়ে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না। আর তুই বাসর-টাসর সেড়ে ধানমন্ডি থেকে শাহাবাগ চলে এলি? বাহ্! রাতে কী ঘটল?’

কথাটা বলে ভ্রু নাচিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল নাদিম।

‘ ঘড়ি দ্যাখ বলদ। অলমোস্ট দেড়টা বাজে। তুই উঠিস নাই বলে যে সূর্য

উঠে নাই এমন নয়। এতোক্ষণে দশবার বাসর করে ফেলা যাবে।'

অন্তুর কথায় শব্দ করে হেসে উঠল নাদিম। অন্তু চোখ পাকিয়ে বলল,' হাসছিস কেন?'

নাদিম হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। কোনরূপ হাসি চেপে বলল,

' রাতে তাহলে এই ঘটল? দশবার! আমাদের নীরু তোর বউ বইলা কিছু

কইতেও পারতেছি না। মনোভাবটা বুইঝা নে প্লিজ।’

কথাটা বলে আবারও দৈত্যের মতো হাসতে লাগল নাদিম। অন্তু পাশ থেকে বালিশ ছুঁড়ে মেরে বাজে একটা গালি দিল। নাদিমের হাসি যেন আরও বিস্তৃত হলো। ঠিক সেই সময় রুমের ভেতরে এলো রঞ্জন। হাতে খাবারের ব্যাগ। ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে বিছানার উপর

বসল। নিচু হয়ে জুতো খুলতে খুলতে বলল,
‘ এভাবে হাসছিস কেন? কি হয়েছে?’
নাদিম হাসি চেপে উঠে বসল। অন্তু চোখ রাঙিয়ে তাকাতেই আবারও হেসে ফেলল। রঞ্জনকে পুরো ঘটনাটা রসিয়ে রসিয়ে শুনাতেই নিঃশব্দে হাসতে লাগল রঞ্জন। নাদিম বিছানা থেকে টুপ করে নেমে

গিয়ে খাবারের ব্যাগটা তুলে নিল। ব্যাগের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল,‘ কাহিনি কী?’

রঞ্জন সোজা হয়ে বসল। হেসে বলল,

‘ পূজা পাঠিয়েছে। আবার মাও প্যাক করে দিল। সব মিলিয়ে এতো খাবার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় ফ্লাইট, ভাবলাম আজকের লাঞ্চটা আপাতত একসাথেই খাই। নমু-নীরা খায় না

বলে মাংস আনিনি। রোস্ট, মাংসের ঝুল রেস্টুরেন্ট থেকে নিলেই হবে।’

নাদিম ততক্ষণে ঢাকনা খুলে ফেলেছে। আলুর একটা টুকরোও তুলে নিয়েছে হাতে। অন্তু বালিশে ঠেস দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসল। উচ্ছল হেসে বলল,

‘ ছোঁয়া থাকলে বলত, এই তুই হাত ধুয়েছিস? দাঁতও ব্রাশ করিসনি। ছিঃ কি জঘন্য! আমার তো ভাবতেই বমি

পাচ্ছে।’অন্তুর কথা বলার ঢং-এ হেসে ফেলল রঞ্জন। ফোন বের করতে করতে বলল,

‘ নমুকে ফোন লাগাই। হলে তো ঢুকতে পারবে না। ছোঁয়াকে নিয়ে লেকের পাড়ে চলে আসতে বলি। ছোটখাটো একটা পিকনিক হয়ে যাবে। খোলা আকাশের নিচে বসে খাওয়ার মজাই আলাদা।’

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রঞ্জন। অন্তুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

‘ কিন্তু নীরু?’

অন্তুর মুখটা চুপসে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল,

‘ ফোন দিয়ে জিগ্যেস কর। আসতে চাইলে আমি গিয়ে নিয়ে আসব।’

নাদিম আলুর টুকরোটা চিবোতে চিবোতে বলল,

‘ আসতে চাইলে মানে? অবশ্যই আসবে। আর ফোন দে মানে কী? তোর বউ তুই ফোন দিবি। রঞ্জনরে কস ক্যান?’

অন্তু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ বউ টানোস ক্যান? বউ বাড়িতে, এখানে তো নয়। এই মুহূর্তে তোদেরও যা, আমারও তাই। আর দাওয়াত তো রঞ্জনের। আমার হলে নাহয় আমি ফোন দিতাম। রঞ্জনের দাওয়াত

রঞ্জন দিব। তাছাড়া আমার ফোনে ব্যালেন্স নাই।’

নাদিম কিছু বলতে গিয়েও বলল না। রঞ্জন দুই তিনবার ফোন দেওয়ার পরও নীরাকে ফোনে পাওয়া গেল না। নাদিম-রঞ্জন প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে অন্তুর দিকে তাকাতেই অস্বস্তিতে পড়ে গেল অন্তু। ঠোঁট দিয়ে জিহ্বা ভিজিয়ে নিয়ে বলল,

‘ আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? বাড়ি ভর্তি মেহমান। নতুন বউকে এভাবে বের হতে দেবে বলে মনে হয় না। বড় ফুপু তো কেয়ামত করে ফেলবে। আমাকে কেউ কিছুই বলবে না, ঘুরেফিরে প্রশ্নের মুখোমুখি ওকেই হতে হবে।’

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাদিম রক্তিম চোখে চেয়ে রইল, কিছু বলল না।দুপুরের খা খা রোদে, রিকশায়

বসে অপেক্ষা করছে আরফান। গায়ে ঘর্মাক্ত সাদা শার্ট। আজ নম্রতা তাদের বাসায় যাবে বলে হাসপাতাল থেকে সোজা নম্রতাকে রিসিভ করতে এসেছে সে। শরীরে এক টন ক্লান্তি। নম্রতাকে সময় দিতে আজও দুপুরের দিকটায় ছুটি নিয়েছে সে। কয়েকদিন যাবৎ ঘন ঘন ছুটি নেওয়ায় হালকা ঝাঁঝাল কথাও শুনতে হয়েছে তাকে। মেজাজটা

খানিক চটে আছে। ব্যাপারটা তার ব্যক্তিত্বে তীব্রভাবে আঘাত হেনেছে। গরমের মাঝে অপেক্ষা করতে করতে সেই রাগ, ক্ষোভ যেন তরতর করে বাড়ছে। আরফান কপাল কুঁচকে ঘড়ি দেখল। প্রায় সাথে সাথেই গেইট পেরিয়ে বেরিয়ে এলো নম্রতা। গায়ে কাঁচা হলুদ রঙের সালোয়ার-কামিজ। ফর্সা গায়ে রঙটা ফুটে উঠেছে। নম্রতাকে

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসতে দেখেই বিরক্তিটা উবে গেল তার। নম্রতার শান্ত, স্নিগ্ধ মুখটা দেখে সমস্ত রাগ, মন খারাপ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। নম্রতা রিক্সার পাশে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আরফান একটু হেসে বলল,‘ কী হলো? উঠুন।’

নম্রতা অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবারও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আরফান কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কোনো সমস্যা?’

নম্রতা আমতা-আমতা করে বলল,

‘ আজ না যাই?’

আরফান অবাক হয়ে বলল,

‘ মানে? কাল তো আপনি নিজেই রাজি হলেন। তাহলে আজ কেন?’

নম্রতা প্রচন্ড অপরাধবোধ নিয়ে বলল,
‘ আসলে আজ রঞ্জন চলে যাচ্ছে। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে? আজকের দুপুরটা ও...’
নম্রতাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আরফান শীতল কণ্ঠে বলল,
‘ ফাইন।’
নম্রতা বুঝল আরফান রেগে গিয়েছে। নম্রতা মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ সরি! আপনি কী রাগ করলেন?’ আরফান অত্যধিক শীতল কণ্ঠে বলল,

‘ না।’নম্রতা কি বলবে বুঝতে না পেরে অসহায় চোখে চেয়ে রইল। আরফানের থমথমে, রক্তিম মুখ দেখে বুঝল আরফান প্রচন্ড রেগে আছে। সেদিনের থেকেও বেশি। নম্রতা কথা গুছিয়ে নিয়ে কিছু বলবে তার আগেই রিকশা চালককে তাড়া

দিয়ে জায়গাটা ছেড়ে গেল আরফান। ভদ্রতাস্বরূপ একবার বিদায়টা পর্যন্ত নিল না। নম্রতা মুখ কালো করে চেয়ে রইল। সাথে সাথেই বেজে উঠল ফোন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে লাগল সে। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।একই আকাশে চড়ে বেড়ানো ছয় রঙা উচ্ছল ঘুড়ি আজ সময়ের তালগোলে ক্লান্ত। আজও তারা একই সুতোয় গাঁথা। ভিন্ন স্বাদের

ঘুড়িগুলো আজও একই টানে মত্ত। তবুও কোথাও একটা ছন্নছাড়া ঢঙ্কা। প্রাণপণে কাছে টানলেও দূরত্ব বাড়ার শঙ্কা। নতুন সম্পর্ক, নতুন সময়, নতুন স্বপ্নে তাদের আকাশটা আজ ভিন্ন থেকে ভিন্নতর। কারো আকাশে পরাধীনতার ছোঁয়া, কেউবা সম্পর্কের টানাপোড়েনে ক্লান্ত। কারো আকাশে স্বপ্নের ছোঁয়া তো কেউ সমাজের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত। কেউবা

অতীতের ঘ্যাঁড়াক্যাচে বন্ধী। আবার কারো আকাশে নতুন ভালোবাসার সূর্যোদয়।শেষ বিকেল। গোধূলি হানা দিয়েছে দরজায়। এক টুকরো সোনালি রোদ এসে পড়েছে থালা-বাসন দেওয়ার সিংকে। জলের কল খোলা। চুড়ির টুটাং শব্দ তুলে থালা-বাসন ধুচ্ছে নীরা। ছোট ছোট দুষ্ট চুলগুলো অবহেলা ভরে পড়ে আছে কপালে। নীরা ভেজা হাতে ঘোমটা

টানল মাথায়। কন্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। বুক আর পেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে প্রায় ঘন্টাখানেক হলো। এতোগুলো মানুষের রান্নার জোগার আর খাওয়ার যোগান দিতে গিয়ে সকাল থেকে কিছু মুখে তোলার সুযোগ হয়নি তার।জাহানারা দুই একবার খাওয়ার কথা বললেও এতো মেহমান আর খালা-ফুপু শাশুড়ীর ভিড়ে খেতে বসার সাহস

হয়নি নীরার। এমনিতেই খুঁতের পর খুঁত বলে বেড়াচ্ছে। এখন খেতে বসলে নিশ্চয় আরও কিছু কথা শুনাবে তাকে? বুক-পিঠে চাপ দিয়ে ধরতেই থালা-বাসন ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল নীরা। চোখদুটো বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল। হচ্ছে না। নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতেই চাপ দিয়ে ধরছে বুকে। নীরা অসহায় চোখে এদিক-

ওদিক তাকাল। ডানহাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আবারও হাত দিল কাজে। প্রায় ঘন্টাখানেক পর, রান্নাঘরের কাজটুকু শেষ করে বসার ঘরের কাছাকাছি আসতেই থমকে গেল পা। কানে এলো অন্তর খালা-ফুপুর মধ্যকার নিচু স্বরে চলা রুচিহীন আলোচনা,' বড় ভাবি? অন্তর বউ নাকি অন্তর থেকে বয়সে বড়? এটা কোনো কথা? আমাদের

বংশের ছেলেদের এই একটা সমস্যা। চোখে পট্টি বেঁধে মেয়ে পছন্দ করে। বাপ-মায়ের সাথে যুদ্ধ করে বিয়েটা যখন করলিই তখন কচি মেয়ে দেখে বিয়ে কর। তা-না দামড়া মেয়ে পছন্দ করে বসে আছে। মেয়ের চরি. .'

নীরা আর দাঁড়াল না। শব্দহীন পায়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার এক

কোণায় ফ্লোরে গিয়ে বসল। চোখ দুটো টলমল করে উঠল নিঃশব্দ, বোবা কান্নায়। বুকে প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে শাড়ির আঁচলে মুখ গুজল। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শরীর। জীবনে প্রথমবারের মতো মনের কোণায় উদয় হলো আত্মহত্যার কথা। মরে গেলে কী মুক্তি পাবে নীরা? একটু স্বস্তি পাবে? ক্ষণিকের জন্য কী কেউ তাকে বুকে

আগলে ধরে কাঁদবে? একটু বোঝার চেষ্টা করবে? নীরার কান্নার মাঝেই ফোন বাজল। বিছানার উপর পড়ে থাকা ফোনটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে ফোন তুলল। সাথে সাথেই ওপাশ থেকে নরম স্বরে কথা বলে উঠল রঞ্জন,‘ নীরু বলছিস?’

নীরা অস্ফুট স্বরে বলল,

‘ হু।’

‘ আধা ঘন্টা পর আমার ফ্লাইট দোস্ত। তোর সাথে দেখা হলো না। যেতে চেয়েছিলাম তোর শশুরবাড়ি, কিন্তু হলো না। তোর ফুপু শাশুড়ী নাকি খুব কনজারভেটিভ? আমি গেলে যদি আবার কথা টথা উঠে, তাই যাইনি।’

এটুকু বলে থামল রঞ্জন। তারপর খুব আদুরে কন্ঠে বলল,

‘ তুই ভালো আছিস নীরা?’

এই ছোট্ট প্রশ্নটা শুনেই হুহু করে কেঁদে উঠল নীরা। মুখ চেপে কান্না চাপার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো এবার। কতদিন পর কেউ একজন সত্যিকার অর্থে জানতে চাইল, তুই ভালো আছিস নীরা? এই ছোট্ট প্রশ্নটা কতদিন শুনে না নীরা। নীরার কান্নার শব্দে আৎকে উঠল রঞ্জন। ব্যস্ত হয়ে বলল,‘ নীরু? কাঁদছিস কেন দোস্ত?’

নীরা উত্তর দিল না। নীরার কান্নার শব্দেই যা বোঝার বুঝল রঞ্জন। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,
‘ আমাদের জীবনটা অবজেকশন আর এলিগেশনে ভর্তি নীরা। এই অবজেকশন কারো কম, কারো বেশি, পার্থক্যটা এখানেই। তোরা বলিস না? আল্লাহ যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। যাচাই করে।

তারপর হুট করেই বিশাল এক সারপ্রাইজ দিয়ে সব দুঃখ-কষ্ট ভালোবাসায় মুড়িয়ে দেয়। সেই হিসেবে তুই আল্লাহর অনেক প্রিয় একজন সৃষ্টি। এই সৃষ্টিটাকে আল্লাহ অনেক বেশি ভালোবাসেন বলেই তোর দুঃখগুলোর দিকে তাঁর এতো মনোযোগ। আল্লাহ হয়ত তোকে স্ট্রং হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন। তোকে এমন কান্নাকাটি মানায় না

দোস্ত।হেরে যাওয়াও মানায় না। শক্ত হয়ে দুঃখের ঝড়টা পাড় করে যা। দেখবি হঠাৎ একদিন বিশাল এক সারপ্রাইজ আসবে তোর জীবনজুড়ে। অপেক্ষা কর। সৃষ্টিকর্তা কাউকে ফেরান না। তিনি নিজের উপর কোনো অভিযোগ রাখেন না। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। জীবনের শেষ দিনটিতেও যদি সারপ্রাইজটা না মেলে তাহলে এটলিস্ট সৃষ্টিকর্তার

সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, আমি অপেক্ষা করেছিলাম। আমার পাওনাটা তুমি দাওনি। তুমি অভিযুক্ত।’

নীরার কান্না থেমে গিয়েছিল। রঞ্জনের কথা থামতেই নাক টানল নীরা। রঞ্জনের কথা তার মনে ধরেছে। বন্ধু মহলের ঝকঝকে বিকেল আর মায়ের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই

আত্মহননের চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলেছে। মনের সুপ্ত এক অংশ তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, এই পৃথিবীতে গুটিকতক মানুষ তাকে বাস্তবিকই ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে। নীরা বসে যাওয়া ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বলল,' তুই চলে যাচ্ছিস। তুই চলে গেলে আমাদের এভাবে বুঝবে কে, বল তো?'

রঞ্জন হেসে ফেলল।

‘ সবাই তো রইল বোকা। আর আমিই বা যাচ্ছি কোথায়? খুব জলদি ফিরব।’

রঞ্জনের কথার মাঝেই ফোন টেনে নিল কেউ। অত্যন্ত ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল,

‘ এই নীরু ভতী, দুপুরে খাইছিস তুই? রঞ্জন আজ ট্রিট দিছে, তুই তো ফক্কা খাইলি মামা। আইচ্ছা কান্দিস না। তোর জামাইয়ের কাছে খাওয়ন

দিয়া দিতাছি। তাও নজর লাগাবি না। ভতী মানুষের নজর লাগে বেশি। চোখ ভরলেও হেগো পেট ভরে না। হলে বাথরুমের কমোড ভাইঙা গেছে। রাইতে-বিরাতে পেটে খিঁচ পড়লে সমস্যা। নজর লাগাবি তো তুই শ্যাষ!'

নাদিমের কথায় হেসে ফেলল নীরা। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল, এই ছোট্ট ছোট্ট হাসি নিয়ে বেঁচে থাকাও

খুব কষ্টকর নয়। এদের এই ছোট্ট ছোট্ট যত্নটুকু পাওয়ার লোভে পড়েও এই বিষাক্ত জীবনটা বয়ে বেড়ানো যায়।লম্বা টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা। চারদিকে ধূসর সন্ধ্যার হাতছানি। একটু পরেই ঝুপ করে নেমে আসবে নিশুতি অন্ধকার রাত। সামনের রাস্তায় জ্বলে উঠেছে ল্যাম্পপোস্ট। নিরন্তর ছুটে চলেছে বিভিন্ন আকৃতির যান। নম্রতা ছোট্ট

নিঃশ্বাস ফেলে ফোনের দিকে তাকাল। গত দুই ঘন্টায় দুই থেকে তিনবার আরফানকে ফোন দিয়েছে নম্রতা। আরফান রেগে থাকলেও ফোন তুলেছে। শান্ত কণ্ঠে কথাও বলেছে। আরফানের রাগ অদ্ভুত। রাগ প্রকাশের ধরনও ভিন্ন। রেগে গিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া তার স্বভাব নয়। উচ্চবাচ্যও করে না। শান্ত,শীতল কণ্ঠেই প্রকাশ পায়

তার ভয়ানক, হৃদয় কাঁপানো রাগ। নম্রতা আবারও ফোন লাগাল। বুকের ভেতর টিপটিপ করছে ভয়। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠ ভেসে এলো,' বলুন।' নম্রতা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল,

' কি করছেন?'

নম্রতা প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারল, বিরাট ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছে।

এমন উদ্ভট প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। গত দুই ঘন্টায় সে বার দুয়েক এই একই প্রশ্ন করেছে। তৃতীয়বারে প্রশ্নটা বড় খাপছাড়া আর অদ্ভুত শুনাচ্ছে কানে। আরফান শীতল কণ্ঠে বলল,‘ ডিউটিতে আছি।’

‘ ব্যস্ত?’

আরফানের সহজ স্বীকারোক্তি,

‘ হ্যাঁ।’

নম্রতা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল,

‘ আপনি কী খুব রেগে আছেন?’

‘ না।’

‘ তাহলে এভাবে কথা বলছেন কেন?’

‘ কিভাবে কথা বলছি?’

‘ আপনার কণ্ঠ শুনেই বুঝা যাচ্ছে আপনি ভয়ানক রেগে আছেন। রাগ করে থাকবেন না প্লিজ।’

‘ আচ্ছা।’নম্রতার মন খারাপ হয়ে গেল। এর থেকে চিল্লাচিল্লি, ধমকা-

ধমকি করাটাই কি ভালো ছিল না? অন্তু-নাদিমের মতো রাগে হিতাহিত ভুলে দুই-চারটা চার থাপ্পড় লাগালেও রক্ষা। কিন্তু এভাবে সব শর্ত মেনে নিয়ে রেগে বসে থাকলে কিভাবে রাগ ভাঙাবে নম্রতা? নম্রতা বেশ রয়ে সয়ে বলল,

‘ আমাকে কাল আপনার বাসায় ঘুরতে নিয়ে যাবেন ডক্টর?’

আরফানের দায়সারা জবাব,

‘ ইচ্ছে হলে যাবেন। আমি ব্যস্ত।’ নম্রতা ফোন কেটে দিল। আরফানের এহেন ব্যবহারে কান্না পেয়ে যাচ্ছে তার। ইট দিয়ে আঘাত করে নিজের এবং আরফানের দুই জনেরই মাথা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। নম্রতার ভাবনার মাঝেই লাফাতে লাফাতে পাশে এসে দাঁড়াল নন্দিতা। ভীষণ বিজ্ঞ কণ্ঠে বলল,‘ আচ্ছা আপু? তোমাদের সাইকোলজি বইয়ে

এমন কোনো মানসিক রোগের নাম লেখা নেই? যে রোগ হলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে বিয়ে করে ফেলতে হয়?’

নম্রতা চোখ বন্ধ করে রাগ নিয়ন্ত্রণ করল। ডানহাতটা কোমরে রেখে চোখ লাল করে তাকাল। নন্দিতা সরল কণ্ঠে বলল,

‘ এভাবে তাকাচ্ছ কেন? নেই? থাকলে ভালো হতো।’

নম্রতা কটমট করে বলল,

‘ দেখ নিদু। আমার মেজাজ এখন প্রচন্ড খারাপ। তোর এসব আউল ফাউল প্যাঁচাল বন্ধ করে দ্রুত কেটে পড়।’

নন্দিতার শ্যামলা মুখটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্ছল কণ্ঠে বলল,

‘ কেন? কেন? ডাক্তার ভাইয়ার সাথে ঝগড়া হয়েছে তোমার? কেমন ঝগড়া? কঠিন নাকি তরল?’

নম্রতা প্রত্যুত্তর করার আগেই পেছন থেকে সন্দিহান কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল কেউ,‘ এই ডাক্তার ভাইয়াটা কে?’ মায়ের আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে পেছনে ফিরে তাকাল নম্রতা। মায়ের কটমটে দৃষ্টি খেয়াল করে অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ আমি চিনি না আম্মু। তোমার পীর বাবার কসম।’

নম্রতার মা সরু চোখে তাকালেন। নম্রতার কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না করে বললেন,

‘ এই তুই প্রেম করিস? এতোবড় সাহস। আমি এক্ষুনি তোর বাবাকে বলছি। মেয়ে ঢ্যাং ঢ্যাং করে প্রেম করে বেড়াচ্ছে আর বাবা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, এটা কেমন কথা? আমার বাড়িতে এসব প্রেম ফ্রেম চলবে না।’

নম্রতা চোখ ছোট ছোট করে কটমট দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাল। নন্দিতা দাঁত বের করে হেসে মাথা চুলকাতে চুলকাতে মায়ের পেছনে ছুটল। যেতে যেতেই মাকে সাঁই দিয়ে বলল,‘ হ্যাঁ। একদম প্রেম ফ্রেম চলবে না। এজন্যই বলছি আমায় চট করে বিয়ে দিয়ে দাও। পরে প্রেম টেম করে ফেললে তো আমাকে দোষ দিবা।’

নম্রতা বারান্দা থেকে মায়ের প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পারলেও নন্দিতার কথায় হেসে ফেলল। মেয়েটা দূর্দান্ত ফাজিল হয়েছে।অন্তু যখন বাসায় ফিরল তখন রাত দশটা কি এগারোটা বাজে। মেহমানদের প্রস্থানে বাড়ি এখন ফাঁকা। অন্তু বাড়িতে ঢুকেই আশেপাশে তাকাল। কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল,

‘ আম্মা-আব্বা কই?’

অয়ন তখনও দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। ভাইয়ের প্রশ্নে দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে সোফায় গিয়ে বসল। টিভির চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে বলল,

‘ ঘুমোচ্ছে। টেবিলে তোমার খাবার দেওয়া আছে।’অন্তু দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে একবার টিভির দিকে তাকাল। ডিসকোভারি চ্যানেল চলছে। সাদা চামড়ার এক ইংরেজ যুবক বিশাল এক সাপ কোলে নিয়ে বসে আছে।

অন্তু আগ্রহ পেলো না। নিজের ঘরে গিয়ে লাইট জ্বালাল। বিছানার এক কোণায় গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছে তার বউ, নীরা। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাতে থাকা খাবারের ব্যাগটা টি- টেবিলে রেখে ফ্রেশ হতে গেল। ওয়াশ রুম থেকে বেরিয়ে আরও একবার নীরার দিকে তাকাল অন্তু। কয়েক সেকেন্ড কপাল কুঁচকে চেয়ে থেকে নীরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হালকা নিচু হয়ে ডানহাতটা রাখল নীরার কপালে। জ্বর নেই। চোখের কোণায় কান্নার চিন্হ। অন্তু সরে দাঁড়াল। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। অয়নকে উদ্দেশ্য করে বলল,‘ সবাই খেয়েছে?’

টিভিতে মগ্ন থাকা অয়ন ছোট্ট করে জবাব দিল,

‘ হু।’

‘ তোর ভাবি খেয়েছে?’

অয়ন নজর ফিরিয়ে তাকাল। ভাবি মানুষটা তাদের পরিবারে নতুন। ভাবি শব্দটার সাথে অভ্যস্ত হতে খানিক সময় লাগবে তার। চট করে ভাবি সম্বোধনে কেমন গুলিয়ে যায় সব। অয়ন একটু ভেবে বলল,

‘ নীরা আপুর কথা বলছ? আমি দেখিনি। খেয়েছে হয়ত।’

অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজের খাবারটা টেনে নিয়ে বলল,

‘ ওকে ডেকে তুলে খেতে বল। টেবিলের উপর খাবারের প্যাকেট রেখে এসেছি। তোর রঞ্জনদা পাঠিয়েছে।’

অয়ন বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ তুমি ডাকলেই তো পারো।’‘ কেন? তুই ডাকলে কী মুখে ফোসকা

পড়বে? যাবি? নাকি টিভি তুলে আছাড় মারব?’

অয়ন ঝট করে উঠে দাঁড়াল। অন্তর ভরসা নেই। কিছুদিন আগেও আস্ত এক টেলিভিশন ভেঙেছে সে। আবারও ঘটনার পূনরাবৃত্তি করা তার জন্য মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। অয়ন দ্রুত পায়ে অন্তর রুমের দিকে ছুটল। নীরা চোখ বোজে শুয়ে ছিল।

অয়নের প্রথম ডাকেই চোখ মেলে তাকাল। দূর্বল হাসি দিয়ে বলল,

‘ কিছু বলবে?’

অয়ন বিছানার উপর বসল। নীরার ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে বলল,‘ তুমি রাতে খেয়েছ নীরা আপু?’

পরমুহূর্তেই শুধরে নিয়ে সরল কণ্ঠে বলল,

‘ আপু না, ভাবি। এখন তো ভাবি হও আমার। মনে থাকে না।’

শেষ কথাটা বলে ঠোঁট উল্টে হাসল অয়ন। মাথা ঘুরিয়ে টি-টেবিলের দিকে ইশারা করে বলল,

‘ ওখানে তোমার খাবার রাখা। রঞ্জনদা পাঠিয়েছে। খেয়ে তারপর ঘুমাও।’

এটুকু বলেই নীরার ফোনে গেইম খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অয়ন। খেলার মাঝপথে আবারও একবার তাড়া দিতেই উঠে বসল নীরা। কিন্তু

খুব বেশি খেতে পারল না। অল্প একটু মুখে দিতেই বুকে-পিঠে চাপ দিয়ে ধরল। নীরাকে মুখ কুঁচকে ফেলতে দেখে কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করল অয়ন,' খেতে ভালো নয়?'

নীরা অল্প হাসল। ঠিক সেই সময় খাওয়া শেষ করে ঘরে এলো অন্তু। ঘরে ঢুকতেই চোখাচোখি হলো। সারাদিনে এই প্রথম মানুষটিকে দেখতে পেয়ে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল

নীরার। অন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই চোখ ফিরিয়ে নিল। বিছানার কাছাকাছি এসে অয়নের মাথায় চাটি মেরে বলল,

‘ এটা তোর গেইম খেলার জায়গা? যা ভাগ।’অয়ন মুখ কালো করে বেরিয়ে গেল। পুরোটা সময় খাওয়া থামিয়ে তৃষ্ণার্ত চোখে অন্তুর দিকেই চেয়ে রইল নীরা। বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করল, অন্তুর ছোটখাটো

কথাও চুম্বকের মতো টানছে তাকে। অন্তুর অঙ্গভঙ্গি, কুঁচকানো কপাল সবই যেন কালো জাদুর মতো হঠাৎই তীব্রভাবে মুগ্ধ করছে তাকে। অন্তু জগ থেকে পানি ঢেলে পানি খেলো। টি-টেবিল থেকে গ্লাসভর্তি পানি নিয়ে নীরার পাশে বেড সাইড টেবিলে রাখল। তারপর স্বাভাবিকভাবেই নিজের জায়গায় গিয়ে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পড়ল।

একহাত বুকের উপর রেখে অপর হাত কপালে আড়াআড়িভাবে রেখে চোখ বোজল। নীরা অন্তর দিকে চেয়ে হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্ত কী আজও তার সাথে কথা বলবে না? এক বিছানায় এতোটা কাছাকাছি থেকেও কী বেপরোয়া অন্তর অভিমান গলবে না? বহু প্রত্যাশিত ঘুমের একটুও অনিয়ম করবে না?সকালে ঘুম থেকে উঠে

যথারীতি অন্তুকে পাশে পেলো না নীরা। নীরা তড়িঘড়ি করে বিছানা ছাড়ল। আজও ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গিয়েছে তার। কোনোরকম চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল নীরা। জাহানারা রান্নায় ব্যস্ত। চোখমুখ থমথমে,গম্ভীর। নীরা ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। মিহি কন্ঠে বলল,

‘ আর কিছু রান্না করবেন মা? আমি করে দিই?’জাহানারা উত্তর দিলেন না। থমথমে মুখে কড়াইয়ে খুন্তি চালাতে লাগলেন। নীরা জাহানারার উত্তরের আশায় কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে রইল। যখন বুঝল, জাহানারা উত্তর দেবেন না তখন নিজ উদ্যোগেই পাশে রাখা গামলায় সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে হাত বাড়াল। জাহানারা এবারও কিছু

বললেন না। দুটো ডিমের খোঁসা ছাড়ানো শেষ হতেই আক্রোশ নিয়ে বলে উঠলেন জাহানারা,

‘ রাতে ভাত খাওনি কেন? টেবিলের উপর খাবার বেড়ে রেখেছিলাম দেখোনি? আমি একা মানুষ কতদিকে তাকাব? সবাইকে তো আর তুলে তুলে খাইয়ে দেওয়া সম্ভব না। এটা তোমার বাপের বাড়ি না। শশুর বাড়ি অতো আরাম চাইলে তো

চলবে না। নিজের খাবার নিজের হাত দিয়েই তুলে খেতে হবে। অতো আদিখ্যেতা আমি করতে পারি না।’

নীরা ডিমের খোঁসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল,‘ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা।’

জাহানারা বিরক্ত চোখে তাকালেন। তরকারির কড়াইটা নামিয়ে রেখে বললেন,

‘ না খেয়ে ঘুমাবে কেন? নিজের খাওয়ার কথাও মনে থাকে না?

খাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখন এসিস্ট্যান্ট রাখতে হবে আমায়? মানুষ ছেলে বিয়ে করায় শেষ বয়সে আরাম করার জন্য। আর আমার কপাল দেখো।’

এটুকু বলে থামলেন জাহানারা। চুলোয় নতুন কড়াই চড়াতে চড়াতে গজগজ করতে লাগলেন,

‘ শশুরবাড়ি এসে একদিনেই শুকিয়ে চিমসে লেগে যাচ্ছ। না খেয়ে থেকে

বুঝাতে চাও আমরা তোমাকে খাবার-দাবার দিই না?’

নীরা উত্তর দিল না। মাথা নুইয়ে নিজের কাজে মন দিল। জাহানারা নীরার হাতের গামলাটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে বললেন,‘ ভাত-তরকারি হয়েছে নিজ হাতে বেড়ে খেয়ে নাও। নাকি বেড়ে হাতে তুলে দেওয়া লাগবে?’

নীরা মিহি কণ্ঠে বলল,

‘ কাজ টুকু শেষ প্রায়। শেষ করে পরে খাই?’

জাহানারা ধমকে উঠলেন।

‘ সকাল নয়টায় ঘুম থেকে উঠে কাজ দেখাও? অতটুকু সাহায্য তোমার না করলেও চলবে। হাত দুটো এখনও অচল হয়ে যায়নি। যতদিন বেঁচে আছি খাটিয়ে মারো। ছেলের বউ বলে কথা। শশুর-শাশুড়ীকে বেতের আগায় না রাখলে

চলবে নাকি?’নীরা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে খেতে গেলো। নীরাকে তাড়াহুড়ো করে খেতে দেখে আবারও ধমকা-ধমকি করলেন জাহানারা। নীরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজ উদ্যোগেই থাল-বাসন পরিষ্কার করতে নেমে গেল। অন্তু যখন বাড়ি ফিরল তখন দশটা কী সাড়ে দশটা বাজে। আনিমুল সাহেব খাবার টেবিলে বসে পত্রিকা

পড়ছেন। অয়ন ডালে ভিজিয়ে পরোটা খাচ্ছে। অন্তু একটা চেয়ার টেনে বসেই অয়নকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘ অয়ু? তোর ভাবিকে গিয়ে রেডি হতে বল। সাড়ে এগারোটায় ক্লাস আছে। আমার সাথে ভার্সিটি যাবে।’

অয়ন বাবার ফোনে মগ্ন ছিল। ভাইয়ের কথায় বিরক্ত চোখে তাকাল।

‘ এটুকু তো তুমিই বলতে পারো। নীরা আপু থুক্কু ভাবি তো রান্না ঘরেই আছে।’

অন্তু চোখ লাল করে বলল,

‘ তুই যাবি? নাকি ঠাটিয়ে চড় লাগাব?’অয়ন মুখ ভার করে উঠে দাঁড়াল। আধ খাওয়া পরোটাটা হাতে তুলে নিয়ে বলল,

‘ নীরা আপুর বিয়েটাও আমার সাথেই দিয়ে দিতে। সব কাজ তো আমাকে দিয়েই করাও।’

কথাটা বলে বাবার দিকে তাকাতেই আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল অয়ন। বাবার রক্তচক্ষু দেখে মুখটা পাংশুটে হয়ে গেল তার। একটা শুকনো ঢোক গিলে নিয়ে জায়গাটা থেকে সরে দাঁড়াল। জাহানারা স্বামীকে চা

দিচ্ছিলেন। অন্তুর কথাটা কানে যেতেই বললেন,

‘ নীরার ভার্সিটি যাওয়ার কী দরকার? বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে তখন পড়াশোনা নিয়ে এতো লাফালাফি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোর বউয়ের পড়াশোনা বহুত হয়েছে আর লাগবে না।’

অন্তু শান্ত চোখে মায়ের দিকে তাকাল। মুখের খাবারটুকু গিলে নিয়ে বলল,

‘ আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে আম্মা। বিয়ের পর আমি পড়তে পারলে নীরা কেন পারবে না? পড়াশোনা কমপ্লিট করা ওর ইচ্ছে। আর ওর পড়াশোনা কমপ্লিট করানো আমার দায়িত্ব। বিয়ের সময় পড়াশোনা করাব না বলে কোনো শর্ত তো

দিইনি আম্মা।’জাহানারা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,

‘ দিসনি তো কি হয়েছে? এখন দিবি। তিনজনের পড়াশোনার খরচ টানার সামর্থ আছে নাকি তোর আব্বার? সংসারের বাদ বাকি খরচও কি কম? সংসারে একজন এক্সট্রা মানুষ পালাও বহুত খরচার বিষয়। খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়। এখন আবার পড়াশোনা?’

অন্তু বুঝল, যুক্তিগুলো একান্তই আব্বার। যুক্তিগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আম্মার মগজে। অন্তু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আম্মা। বিয়ে করার আগেই তো বলেছিলাম, আমার স্ত্রীর খাওয়া-পরা, পড়ালেখা সবকিছুর দায়িত্ব আমার। ওর জন্য আপনাদের একটা টাকাও খরচ করতে হবে না।’

জাহানারা চোখ কপালে তুলে বললেন,
‘ তোর দায়িত্ব? তুই কোথায় পাবি অত টাকা? বাচ্চা একটা ছেলে। চাকরী বাকরিও করিস না।’
‘ আমি ব্যবস্থা করে নিব।’আমিনুল সাহেব খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। তাচ্ছিল্য নিয়ে বললেন,

‘ তোমার ছেলে এখন বউয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে গিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে বাসের কন্ট্রাক্টরের চাকরি নেবে নাকি জিগ্যেস করো তো জাহানারা।’অন্ত খাওয়া ছেড়ে আনিমুল সাহেবের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে উঠে গেল। মাথায় হাজারও দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তার। কিভাবে কী ম্যানেজ করবে কিচ্ছু

বুঝতে পারছে না। গত দুইদিন রাত-দিন খুঁজেও কোনো টিউশনি পাওয়া যায়নি। আপাতত একটা দুইটা টিউশনি পেলেও চলে যেত অন্তর। আপাতত নীরার প্রয়োজনটুকু তো মিটতো। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই রুমে গিয়ে শার্ট খুলল অন্তু। আলমারি থেকে আরেকটা শার্ট বের করে পরতে নিতেই চোখ আটকে গেল আয়নায়। কুঞ্চিত

কপালটা আরও খানিকটা কুঁচকে গেল। অন্তুর কাঁধের বামপাশে থাকা ট্যাটুটা বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে ধরা দিচ্ছে আয়নায়। প্রায় তিন বছর আগে কাঁধের কাছে ‘এন’ লিখে ট্যাটু করিয়েছিল অন্তু। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে শার্টের কলার টেনে ঢেকে ফেলল কাঁধ।নীরার জন্য এমন অনেক পাগলামোই করেছে অন্তু। তখন বড্ড ছেলেমানুষ ছিল সে।

বয়স আর কত হবে তখন? বিশ অথবা একুশ? অন্তু এখনও ছেলেমানুষই আছে। বয়সের হিসেবে দুই-তিন বছর বৃদ্ধি পেয়েছে এই যা। কিন্তু এই দুই-তিন বছরে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে নীরার অবহেলার ধরন। সেই সাথে পরিবর্তন হয়েছে অন্তুও। দীর্ঘ এই অবহেলার জ্বালা মেটাতে যখন আগাগোড়া পরিবর্তন

হতে চাইল অন্তু। সামলে নিতে চাইল জীবন। প্রাণভরে একটু শ্বাস নিতে চাইল ঠিক তখনই রি-সাইকেলের মতো আবারও জীবনের সাথে ল্যাপ্টে গেল নীরা। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইকের চাবিটা তুলে নিল হাতে।নীরা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তু হয়তো খেয়ালই করল না তাকে। বাইরে গিয়ে অয়নকে দিয়ে নীরাকে ডাকতে

পাঠাল অন্তু। নীরা ঢিপঢিপ করে বাজতে থাকা হৃদপিণ্ড নিয়ে অন্তুর বাইকে গিয়ে বসল। অন্তুর কাঁধে হাত রাখতেই ভিন্ন এক অস্বস্তিতে কাটা হয়ে রইল মন। ধানমন্ডি থেকে শাহাবাগ পুরোটা রাস্তা নিশ্চুপ কাটল তাদের। ভার্সিটির সামনে এসে নীরা বাইক থেকে নামতেই একটা পাঁচশ টাকার নোট এগিয়ে দিল অন্তু। নীরা অবাক চোখে তাকাল। সংকুচিত

মনে নোটটা হাতে নিয়ে অন্তুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। অন্তু বাইকে স্টার্ট দিতে দিতে সামনের দিকে তাকিয়েই বলল,‘ হাত খরচের টাকা।’

কথাটুকু বলে মুহূর্তেই বাইক নিয়ে ভার্সিটির গেইট পেরিয়ে গেল অন্তু। নীরা ফ্যালফ্যাল চোখে অন্তুর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। হাত-পা

শিরশির করে উঠল অদ্ভুত, অচেনা এক অনুভূতিতে।

শরতের মাঝামাঝি। আবহাওয়ায় হালকা শুষ্ক ভাব। ভ্যাপসা গরম, জ্যাম আর ধুলোবালির সাথে নিরন্তর যুদ্ধ করে বাস যখন রাজেন্দ্রপুর এসে থামল, তখন ঘড়িতে বারোটা বাজে। মাথার উপর দগদগ করে জ্বলছে সূর্য। নাদিমের মাথা ভর্তি চুল তখন ধুলোয় ধূসর। পরনের

গোলাপি শার্ট, কালো প্যান্টে ধুলোবালির পাতলা আস্তরণ। নাদিম বাস থেকে নেমে ডানহাতের কব্জিতে পরা ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়ির স্বচ্ছ কাচটি ঘোলা হয়ে এসেছে মিহি ধুলোয়।প্যান্টের গায়ে ঘড়িটা ঘষে কাচ পরিষ্কার করল নাদিম। চোখ ছোট ছোট করে আশেপাশে তাকাল। পকেট থেকে কাগজের ছোট্ট টুকরোটা বের করে ঠিকানা দেখল।

দ্বিতীয় গন্তব্য, বাংলাবাজার। অটোরিকশায় বাংলাবাজার পৌঁছানোর পর যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল নাদিম। খা খা দুপুরে দোকানপাটের অধিকাংশই ফাঁকা, নিস্তব্ধ । নাদিম বেশ কয়েকটি দোকানে খোঁজ নিয়েও কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে খুঁজে পেল না। দোকানের সবাই প্রায় নতুন কর্মচারী, স্থানীয় বাসিন্দাদের খুব

একটা চেনে না। নাদিম ক্লান্ত হয়ে একটি চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। এক কাপ চা খেয়ে মধ্যবয়স্ক দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই চা ওয়ালা চোখ ছোট ছোট করে বলল,‘ মকবুল ওয়াহেদ চৌধুরী আবার ক্যাডা? এই নামে তো কাউরে চিনি না ভাইসাব।’

নাদিমের ভ্রু জোড়া বিরক্তিতে ত্রিভুজাকার রূপ ধারণ করল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ আপনারে দেইখা তো স্থানীয় মানুষই মনে হইতাছে চাচা। কয় বছর আছেন এই এলাকায়?’

দোকানদার দ্রুত হাতে চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলল,

‘ জন্মের পর থাইকাই তো এইখানেই আছি ভাইসাব।’

‘ তাহলে তো মকবুল ওয়াহেদ চৌধুরীকে চেনার কথা। শুনেছি উনার বড়সড় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টেরি আছে এলাকায়। গাজীপুরে নাকি রিসোর্ট টিসোর্টও আছে। তারওপর স্থানীয় মানুষ। চিনেন না ক্যান?’

দোকানদার নাদিমের মুখের দিকে খানিক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে

রইল। কিছুক্ষণ আনমনা বসে থেকে বলল,

‘ আপনে কী মুকুল ভাইয়ের কতা জিগাইতেছেন নাকি ভাইসাব?’নাদিমের পুরু ভ্রু আরও খানিকটা কুঁচকে গেল। মুকুল ভাই? এই মুকুল ভাইয়ের কাহিনিটা কী? বড় মামার ভাষ্যমতে মিষ্টিকে মকবুল ওয়াহেদ চৌধুরী নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে দশ লক্ষ টাকার

বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কাগজে লেখা ঠিকানাটাও তার। এর মাঝে মুকুল ভাই নামক ব্যক্তির এন্ট্রি কিভাবে হলো বুঝা যাচ্ছে না। নাদিমকে চুপ থাকতে দেখে দোকানদার নিজ উদ্যোগেই বলল,' স্থানীয় বাসিন্দা গো মধ্যে মুকুল ভাইই বিরাট ধনী মানুষ। গারমেন্স কারখানা আছে। হুনছি বড়লোকী হোটেলও নাহি আছে দুই একটা।

ভাইজানের বাড়ি বাজার থাইকা দশ মিনিটের রাস্তা। রিকশা লইয়া চইলা যান। মকুল ভাইয়ের বাড়ি বেবাকেই চিনে। মকুল ভাইয়ের বাড়ি যামু কইলেই দিয়া আইব।’

নাদিম জবাব দিল না। কপালে সূক্ষ্ম ভাজ ফেলে কিছু একটা ভাবল। আরও এক কাপ চা খেয়ে মুকুল ভাইয়ের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। রিকশাওয়ালা যখন নাদিমকে মকুল

ভাইয়ের বিশাল বাড়িটির সামনে পৌঁছে দিল, তখন ঘড়িতে পৌনে দুইটা বাজে। মাথার উপর ঝা ঝা করছে স্বর্ণালী রোদ। ঘেমে-নেয়ে একাকার নাদিমকে গেইট থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছাতে বহু কসরত করতে হলো। তাকে যে বসার ঘরে বসতে দেওয়া হলো তার সাজসজ্জা আলিশান। ছিমছাম সবুজ গালিচা বিছানো মেঝে। ঝকঝকে,

দামী আসবাব। সেই আলিশান, বিলাসিতায় মোড়া বসার ঘরে বসে থেকে জীবনে প্রথম বারের মতো নাদিম উপলব্ধি করল, মিষ্টি নামক মেয়েটির জন্য তার চিন্তা হচ্ছে। সাত-আট বছর আগে যে মেয়েকে টাকার বিনিময়ে কিনে আনা হয়েছে, তার সাথে কী রকম আচরণ করা হতে পারে ভেবেই তার গা শিউরে উঠছে । বার বার জানতে ইচ্ছে

করছে, মেয়েটা কি আদৌ বেঁচে আছে? নাদিমের সূক্ষ্ম চিন্তার মাঝেই সুপ্ত মানবের আবির্ভাব ঘটল। মনের গহীন থেকে তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বলে উঠল,‘ তুমি একজন মেরুদণ্ডহীন মানুষ নাদিম। তোমার মাঝে কোনো প্রতিশোধস্পৃহা নেই। এই মেয়েটির জন্য এতো চিন্তা তোমায় মানায় না। কেন করছ এতো হাহাকার?’

নাদিম চমকে উঠে বলল,

‘ হাহাকার করছি?’

‘ অবশ্যই করছ।’

‘ বোনের জন্য হাহাকার করা খারাপ তো কিছু নয়। মিষ্টি আমার ছোট বোন।’

সুপ্ত মানব আক্রোশ নিয়ে বলল,

‘ বাজে কথা। মিষ্টি কখনোই তোমার বোন নয়। সে তোমার দুর্দশার কারণ। তোমার মায়ের দুঃখের কারণ। কেন ভুলে যাচ্ছ বারবার?

ফিরে যাও। ছেড়ে দাও তার পিছু। অতীত ঘেঁটে কী লাভ? ভালো আছো, ভালো থাকো।'

নাদিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,' তোমার সত্যিই মনে হয় মিষ্টিই সকল দুর্দশার কারণ? কারো পক্ষে কারো দুর্দশার কারণ হওয়া কী আদৌ সম্ভব? ইট'স অল এবাউট ডেসটিনি। মানুষের পক্ষে হয়ত

ভাগ্যের বাইরে গিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়।’

‘ তুমি বলতে চাইছ, তোমাকে ঠকানো হয়নি?’

‘ হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মিষ্টি দায়ী হতে পারে না। সেও ঠকেছে। তাকেও ঠকানো হয়েছে। হয়ত, আমার থেকেও বেশি।’নাদিমের কথার প্রত্যুত্তর এলো না। তার আগেই বিশাল লম্বা,স্বাস্থ্যবান এক

ভদ্রলোক নাদিমের সামনে সোফায় এসে বসল। লোকটি লম্বায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। থলথলে শরীরে হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। পরনে ধবধবে সাদা লুঙ্গি। পান খেয়ে ঠোঁটদুটো টকটকে লাল। তীর্যক নাকের নিচে মাঝারি আকারের তিল। নাদিম সরাসরি ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। লোকটি ভ্রু কুঁচকে নাদিমকে দেখে নিয়ে বললেন,

‘ তুমি কে? আমার সাথে দেখা করতে চাওয়ার কারণ কী? কম কথায় উত্তর দাও। বেশি কথা আমার পছন্দ নয়।’

নাদিম ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে নিয়ে সরাসরিই প্রশ্ন করল,‘ আপনার নাম মকবুল ওয়াহেদ চৌধুরী?’

লোকটি তীর্যক দৃষ্টি মেলে বললেন,

‘ হ্যাঁ। কেন?’

‘ প্রায় সাত-আট বছর আগে ময়মনসিংহের একটা এতিমখানা থেকে আট বছরের একটা বাচ্চাকে কিনে এনেছিলেন আপনি। মেয়েটির নাম ছিল মিষ্টি। চিনেন তাকে?’

মকবুল সাহেবের মুখ মুহূর্তেই থমথমে রূপ ধারণ করল। চোয়াল শক্ত করে নাদিমের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,‘ তুমি কে?’

নাদিম হেসে বলল,

‘ আপনি বোধহয় উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। অযথা ঘাবড়াবেন না। আমি আহামরি কেউ নই। আমার নাম নাদিম হোসেন। সম্পর্কে মিষ্টির ভাই। আমি মিষ্টির সাথে দেখা করতে চাই। ওর সাথে দেখা করা কি সম্ভব?’

মকবুল সাহেব আগের মতোই নিশ্চুপ বসে আছেন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও ধারাল।

‘ যা বিক্রি করে দিয়েছ তার প্রতি হঠাৎ এতো উৎকণ্ঠা? বিক্রিত জিনিস মাত্রই বিক্রিত জানো না? মিষ্টি মানুষ হোক বা বস্তু আমি তাকে নগদ টাকা দিয়ে কিনেছি। অযথা ঝামেলা না বাড়িয়ে নিজের চরকায় তেল দাও।’

নাদিম মকবুল সাহেবের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ আপনার কথায় একটু ভুল আছে মকবুল সাহেব। মিষ্টিকে আমি বিক্রি করিনি। বিক্রি করেছে অন্যকেউ। মিষ্টির এই মালিকানা বদলের রহস্য আমার অজানা। তবে আমি মিষ্টিকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি। আমি শুধু ওর সাথে দেখা করব। দুই একটা কথা বলব। তারপর চলে যাব।’

নাদিমের কণ্ঠে কিছু একটা ছিল। মকবুল সাহেব খানিক শান্ত হলেন। নাদিমকে অবাক করে দিয়ে একজন কাজের লোককে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

‘ তোমার আপা মণিকে ডেকে আনো তো শামছুল।’

চাকর শ্রেণীর লোকটি মাথা হেলিয়ে সরে যেতেই মকবুল সাহেব চোখ-মুখ শক্ত করে তাকালেন। শাসানোর

মতো করে আঙ্গুল উঁচালেন। হিংস্র চোখে চেয়ে বললেন,

‘ এইবারই শেষ। এই এলাকায় ফিরে আসার সাহস করবে না আর। এরপর তোমাকে এই এলাকায় দেখলে কেটে ফেলে দেব।’নাদিমের মাঝে কোনো ভাবাবেগ দেখা গেল না। রক্ত কণিকাগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠল। হৃদপিণ্ডটা টিপটিপ করছে। তবে মিষ্টি বেঁচে আছে? বেশ

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি বেয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলো ষোল-সতেরো বছরের এক যুবতী। গায়ের রঙ মিষ্টি শ্যামলা। মুখের গড়নে আদিবের অবয়ব স্পষ্ট। মিষ্টির অবনত মুখটির দিকে চেয়ে বুকের ভেতর চিনচিনে ব্যথা করে উঠল তার। হাত-পায়ের শিরায় টান পড়ল। মেয়েটি ঠিক বাবার মতো দেখতে হয়েছে। নাদিমের চেহারায়

বাবার ছাপ অল্প, মায়ের ছাপ বেশি। নাদিমের থিতিয়ে থাকা রাগটা ফুঁসে উঠতে চাইল। পুরো পৃথিবী ছারখার করে দেওয়ার অদম্য ইচ্ছেই ক্ষ্যাপাটে হয়ে উঠল মন। কিন্তু মিষ্টি নামের মেয়েটা যখন বড় বড় চোখ মেলে নাদিমের দিকে তাকাল।ঠিক তখনই শান্ত হয়ে এলো নাদিমের মস্তিষ্ক। টলমলে নিষ্পাপ সেই চাহনীর সামনে নাদিমের সকল

বিতৃষ্ণা যেন থিতিয়ে গেল। ফনা তোলা রাগটা মাথা নুইয়ে শান্ত হয়ে পড়ে রইল বুকের এক কোণায়। দুই জোড়া চোখ চুপচাপ চেয়ে রইল প্রায় অনেকক্ষণ। মকবুল সাহেব মিষ্টিকে সোফায় বসতে বললেন। মিষ্টি বাধ্য মেয়ের মতো সোফায় গিয়ে বসল। মুখোমুখি সোফায় বসে থাকা যুবতী মেয়েটির সারা গায়ে সদ্য যৌবনের চঞ্চলতা। আনত মুখটিতে এক রাজ্য

মায়া। সেই মায়াবী মুখটির দিকে চেয়ে নাদিমের হঠাৎই মনে হলো, মিষ্টি শব্দটা বোধহয় কোন এককালে এই মেয়েটির জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন বিধাতা। মিষ্টি নামটি রেখেছিলেন বাবা।নাদিমের তখন সাত বছর বয়স। এমনই একটি গোধূলি বিকেলে মায়ের নামের সাথে মিলিয়ে বাচ্চা মেয়েটির নাম রেখে ফেললেন মিষ্টি। মলি- মিষ্টি। মা খুব

চোটপাট করেছিলেন সেদিন। ছোট্ট মিষ্টিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন মাটিতে। বাবা বারান্দায় বসে গম্ভীর মুখে পুরো ব্যাপারটা দেখলেন অথচ উঠে এলেন না। উচ্যবাচ্য করলেন না। বাবার চেহারা এখন আর মনে নেই নাদিমের। কিন্তু সেই তারস্বরের কান্নাটা মাঝে মাঝেই কানে ভাসে। এখনও কত জীবন্ত সেই কান্না। নাদিমের ভাবনার মাঝেই বসার ঘর

থেকে উঠে গেলেন মকবুল সাহেব। নাদিম ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবারও মিষ্টির দিকে তাকাল। মিষ্টি উৎসুক চোখে চেয়ে আছে। বড় বড় চোখদুটোতে চিকচিক করছে কৌতূহল। সত্যিই কি কৌতূহল? নাকি টলমলে জল? নাদিম হাতের ইশারায় মিষ্টিকে ডাকল। বলল,‘ এদিকে এসো।’

মিষ্টি ইতস্তত পায়ে এগিয়ে গিয়ে নাদিমের পাশে বসল। নাদিম গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,

‘ কোন ক্লাসে পড়?’

মিষ্টি জবাব দিল না। নাদিমের দিকে নির্ণিমেষ চেয়ে থেকে বলল,

‘ তুমি আমার ভাইয়া?’নাদিমের বুকের কোথাও একটা চাপা যন্ত্রণা খেলে গেল। বলতে ইচ্ছে হলো, না। আমি তোমার কেউ নই। কেউ না।

কিন্তু বলা হলো না। মিষ্টির বলা ভাইয়া শব্দটা হৃদপিণ্ডের সাথে সমান তালে লাফাতে লাগল পুরো বুকেজুড়ে। নাদিমের উত্তর না পেয়ে মিষ্টি নিজে থেকেই কথা বলল। তার মিহি কন্ঠে খেলে গেল রাজ্যের অস্বস্তি,

‘ আমার ভাইয়ার গালে তিল ছিল। তোমারও আছে। এই দেখো

আমারও আছে। তুমি আমার ভাইয়া না?’

নাদিম চোখ উঠিয়ে মিষ্টির বাম গালে তাকাল। একই জায়গায় আদিবেরও তিল ছিল। নাদিম ডানহাতে ঘাড় চুলকে এদিক ওদিক তাকাল। কি বলবে বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ তোমার আমাকে মনে আছে?’মিষ্টি মাথা নাড়ে। তারপর খুব অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি আমায় পছন্দ করো না, না? কেন পছন্দ করো না? কি করেছি আমি?’

নাদিমের ভেতরটা টলমল করে উঠল। এই বিশ্রী পৃথিবীর সব অশ্লীল, কপটতাকে ঠেলে দিয়ে ছোট্ট একটি বোন বিশাল অভিমানের ঝুঁড়ি

নিয়ে ভাইয়ের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ল। নাদিমের মনে হলো, সেই প্রশ্নটা নাদিমের ভেতরটাকে চোখের পলকে তীব্র এক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত করে দিল। নরম কণ্ঠে বলল,‘ কে বলল আমি তোমায় পছন্দ করি না?’

‘ সবাই বলত। আমি জানি।’

কথাটা বলে থামল মিষ্টি। ভীত হাতে নাদিমের বাহুতে হাত রাখল।

অপলক চোখে নাদিমের দিকে চেয়ে থেকে বলল,

‘ মায়ের চেহেরা আমার মনে নেই। তুমি কী মায়ের মতো দেখতে? মাকে খুব মনে পড়ে আমার। মামা বলেছিল, আমি নাকি মাকে মেরে ফেলেছি। আমার জন্যই মরে গিয়েছে মা। মামার কথা কী সত্য ভাইয়া? তুমি যা বলবে আমি বিশ্বাস করব। মামার কথা আমার বিশ্বাস

হয় না। মামা আমার সাথে.... ‘এটুকু বলে থেমে গেল মিষ্টি। মাথা নিচু করে বসে রইল চুপচাপ। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল টপাটপ বৃষ্টি। তার ছোট্ট আদুরে মুখ দেখে মনে হলো, অভিমানিনী এক কিশোরী গাল ফুলিয়ে একের পর এক নালিশ করছে। জীবন সম্পর্কে হাজারও নালিশ ভাইয়ের জন্য জমা রেখেছিল সে। ভাইয়ের প্রতি তার অগাধ

ভরসা। ভাইয়েরা সব পারে! নাদিমের চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল এক ফোটা অশ্রুবিন্দু। এই প্রথম মিষ্টি নামক মেয়েটির জন্য বড় মায়া হলো তার। বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,‘ মামা মিথ্যে বলেছেন। উনার কথা বিশ্বাস করো না। মা তোমাকে ভালোবাসত। আমায় বলেছে।’

মিষ্টির মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল।

‘ তুমিও আমায় ভালোবাসো?’
নাদিম এক পলক মিষ্টির দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল,
‘ হ্যাঁ। বাসি।’
‘ আব্বুও বলেছিল যে তুমি আমায় ভালোবাসো। মামা মিথ্যে বলেছে।’
নাদিম সন্দিহান চোখে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে বলল,
‘ আব্বু?’দুপুরের রাশভারি সূর্যটা ঘন্টা দুই হলো কোমল আলো

ছড়াচ্ছে। শহরের গায়ে আছড়ে পড়ছে বিকেলের মিষ্টি আলো। আরফান কিছুক্ষণ আগেই রাউন্ড শেষ করে নিজস্ব চেম্বারে এসে বসেছে। ক্লান্ত শরীরে দুটো রোগীও দেখেছে। প্রেসক্রাইভ করেছে। তারপর গা এলিয়েছে চেয়ারে। মনটা বোধহয় ভালো নেই তার। কেমন যেন খাপছাড়া মন খারাপ সময়ে-অসময়ে তাড়া দিচ্ছে তাকে।

পৃথিবীর সবকিছু রঙহীন, লক্ষ্যহীন বিতৃষ্ণা বলে বোধ হচ্ছে। আরফানের ক্লান্ত চিন্তার মাঝেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সাঈদ। আরও একজন রোগী অপেক্ষা করছে জানিয়ে সসম্ভ্রমে বেরিয়ে গেল। আরফান মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে সোজা হয়ে বসল। টেবিলে রাখা মোবাইল স্ক্রিনে উঁকি দিল। লক স্ক্রিনে নম্রতার ছবি। আরফান

বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে রইল সেই স্ক্রিনে। এই স্নিগ্ধ,সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে থাকতে তার ভালো লাগে। যতবার দেখে ততবার অবাক হয়। মুগ্ধ হয়। ততবার ভালোবাসে। আরফানের ভাবনার মাঝেই দরজা ঠেলে ভেতরে এলো দুজন। আরফান ফোনের দিকে নজর রেখেই বলল,‘ বসুন।’

‘বসুন’ শব্দটা উচ্চারণ করে বেখেয়ালে সামনের দিকে তাকাল আরফান। চোখ নামিয়ে নিয়ে ফোনটা পাশে রাখতে গিয়েই যেন চমকে উঠল সে। চোখ উঠিয়ে সচেতন চোখে তাকাল। মুহূর্তেই গলা শুকিয়ে গেল আরফানের। হকচকিয়ে গেল। বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মুখোমুখি বসে থাকা নম্রতা, বাবার চোখ বাঁচিয়ে খুব সাবধানে

ডানচোখটা টিপে দিতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল আরফানের মুখ। নম্রতার এমন কাজে বিস্মিত হলো। মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে সরাসরি তাকাল। কিছুটা অস্বস্তি হলেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল আরফান। যথেষ্ট প্রফেশনাল কণ্ঠে বলল,

‘ পেশেন্ট কে?’

নম্রতা দ্রুত উত্তর দিল,

‘ দুজনই।’আরফান সন্দিহান চোখে তাকাল। নম্রতার দুধে-আলতা ফর্সা মুখটা খুব স্নিগ্ধ লাগছে আজ। জলপাই রঙের সুতি সালোয়ার কামিজে ফুটে উঠেছে রং। চুলগুলো ভিন্নভাবে বেঁধেছে বলে কিশোরীদের মতো উচ্ছল দেখাচ্ছে তাকে। আরফান চোখ সরিয়ে নিল। প্রেমিকার বাবার সামনে প্রেমিকার দিকে ‘হা’ চেয়ে থাকা নিশ্চয় ভালো

ছেলের লক্ষ্মণ নয়। আরফান যথা সম্ভব গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ ওহ। বেশ! তো সমস্যা বলুন।’

নুরুল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে ছিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,‘ কিছুদিন যাবৎ শরীরটা খুবই দুর্বল। শুয়ে বসে থেকেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। হুটহাট রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে আবার কখনও হুট করেই কমে যাচ্ছে। খবর কাগজ পড়তে গেলেও চোখ

ব্যথা করছে। রাতের দিকে প্রচন্ড পা ব্যথার জন্য ঘুমুতে পারছি না। ক্ষুধা লাগছে কিন্তু খেতে পারছি না। বুক পিঠেও ব্যথা করছে আজকাল।'

আরফান মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে বলল,

' চোখের জন্য আলাদা ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

‘ দেখালাম সেদিন। ঔষধ চলছে। কিন্তু লাভ বিশেষ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। বাসার নিচে দাঁড়িয়ে কেউ হাই,হ্যালো করলে দু’তলা থেকে স্পষ্ট দেখতে পারি না।’

আরফান যেন হোঁচট খেল এবার। বামহাতের আঙ্গুল দুটো কপালে হালকাভাবে বুলিয়ে নিয়ে প্রেসক্রিপশন লেখায় মনোযোগ দিল। শেষ বাক্যটা না শোনার ভাব

করে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল,‘ আপনার বয়স কত?’

‘ পয়ষট্টি।’

‘ আর নাম?’

‘ নুরুল মাহমুদ।’

‘ ডায়াবেটিস আছে আপনার? পরীক্ষা করেছিলেন কখনও?’

‘ তা একটু আছে। তবে আন্ডার কন্ট্রোল।’

আরফান চোখ তুলে তাকাল।

‘ লাস্ট কবে পরীক্ষা করেছিলেন?’
‘ এইতো বছর দুই আগে।’
আরফান বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বলল,‘ দুই বছর আগে পরীক্ষা করিয়ে বলছেন ডায়াবেটিস আন্ডার কন্ট্রোল? ডায়াবেটিস প্যাশেন্টদের প্রতিমাসে একবার করে চেকআপ করা উচিত। আমার মনে হয় আপনার ডায়াবেটিসটা বাড়াবাড়ি রকম বেড়ে

গিয়েছে। ডায়াবেটিস থেকে হৃদরোগের উপসর্গও দেখা দিতে পারে। খুব শীঘ্রই ডায়াবেটিস পরীক্ষা করুন। তার সাথে আরও কিছু টেস্ট দিচ্ছি। রিপোর্টগুলো খুব দ্রুত আমাকে দেখাবেন।’

নুরুল সাহেব অসন্তুষ্ট চোখে আরফানের দিকে তাকালেন। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন,‘ ডাক্তাররা টেস্ট ফেস্ট ছাড়া কিছু দিতে পারে না

নাকি? সামান্য জ্বর হলেও এক গাদা টেস্ট। হাঁচি দিলেও টেস্ট। ইট'স অল এবাউট পলিটিক্স। আজকাল হাসপাতালেও রাজনীতি। টাকা কামানোর রাজনীতি।'

আরফান অসহায় চোখে তাকাল। কথাটা নুরুল সাহেব না বলে অন্যকেউ বললে নির্ঘাত চটে যেত আরফান। মেজাজ খারাপ হতো। কিন্তু এই মুহূর্তে চটে যাওয়া যাচ্ছে

না। প্রেমিকার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে চুপ করে রইল আরফান। ‘টেস্ট না করলে রোগ কিভাবে ধরব? ডাক্তাররা তো আর সর্বজান্তা নয়। চোখ বন্ধ করে মন্ত্র আওড়ে রোগ ধরে ফেলার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়নি’ কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল,

‘ টেস্টের রিপোর্টগুলো প্রয়োজন।’নুরুল সাহেব বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি আরফানের শান্ত দৃষ্টিকে ছিন্নভিন্ন করে শাসিয়ে উঠল, ‘ খবরদার আমার মেয়ের দিকে তাকাবে না। এইসব ডাক্তার ফাক্তারকে আমি মেয়ে জামাই হিসেবে মানি না। মানবও না।’ আরফান হতাশ নিঃশ্বাস ছেড়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

প্রেসক্রিপশনটা নুরুল সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ টেস্টগুলো করে নিবেন।’

নুরুল সাহেব উত্তর দিলেন না। প্রেসক্রিপশনের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

‘ এবার আমার মেয়েকে দেখুন। শী নিড আ বেটার প্রেসক্রিপশন ফ্রম ইউ।’

নুরুল সাহেবের ঠেসমারা কথায় কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেল আরফান। হালকা চালে নম্রতার দিকে তাকাল। একদম অপরিচিতদের মতো চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল,‘ কী হয়েছে আপনার মেয়ের?’

আরফানের কথার প্রত্যুত্তর করার আগেই নুরুল সাহেবের ফোন

বাজল। ফোন আর প্রেসক্রিপশনটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন,

‘ আজকাল আমার মেয়ের রাতে ঘুম টুম হচ্ছে না। মন খারাপ করে বসে থাকছে। ইনসমনিয়া হয়েছে বোধহয়। আপনি প্রেসক্রাইভটা নাহয় সেখান থেকেই শুরু করুন। আমি কলটা এটেন্ট করে ফিরছি।’

নুরুল সাহেব চেম্বার থেকে বেরিয়ে যেতেই হাপ ছেড়ে বাঁচল আরফান।

শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। চোখদুটো নম্রতার চোখে মেলে ধরে বলল,‘ আপনি অসুস্থ?’

নম্রতা ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,

‘ অনেক বেশি।’

‘ এমন ডেঞ্জারাস বাবার মেয়েরা আবার অসুস্থও হয়?’

নম্রতা টেবিলের উপর কনুই ঠেকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসল। নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল,

‘ যে শহরে রোগ বাড়ানো ডাক্তার থাকে সেই শহরে ডেঞ্জারাস বাবার মেয়েরা আরও বেশি বেশি অসুস্থ হয় ডক্টর।’

আরফান মৃদু হাসল। সোজা হয়ে বসে টেবিলের উপর খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল,

‘ আচ্ছা? তো আগে কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন? নাকি এটাই প্রথম?’নম্রতা ব্যস্ত হাতে ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। আরফানের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল,

‘ হয়েছিলাম তো। ডাক্তারবাবু ঔষধও দিয়েছে। খুবই রেয়ার ঔষধ। ঢাকা শহরের সব দোকান খুঁজেও পাওয়া যায়নি। আপনি কী

জানেন? কোথায় পাওয়া যাবে এই ঔষধ?'

আরফান কপাল কুঁচকে কাগজের টুকরোটা নিল। নীল রঙের কাগজে সিরিয়াল করে লেখা, ' নিষ্প্রভ, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রভ'। নিশপ্রভের পাশে এরো চিন্হ দিয়ে লেখা 1+1+1+1.... Infinity. আরফানকে কপাল কুঁচকে কাগজের দিকে চেয়ে থাকতে

দেখে ভারি অসহায় কণ্ঠে বলল নম্রতা,
‘ জানেন কোথায় পাব এই ঔষধ? ঔষধের অভাবে দিনদিন মারা যাচ্ছি। এই অধম প্যাশেন্টের মৃত্যু ঠেকাতে কিছু একটা তো করুন ডক্টর।’আরফান চোখ তুলে তাকাল। নম্রতা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ছোট্ট ছোট্ট মোলায়েম চুলগুলো গালের উপর এসে পড়ায় ভারি মিষ্টি

লাগছে দেখতে। আরফানের চোখদুটো যেন নেচে উঠল এবার। শ্যামবর্ণ মুখটিতে ঈষৎ দুষ্টুমি খেলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নম্রতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নম্রতার চেয়ারটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে, দুপাশের হাতলে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল নম্রতার মুখের ওপর। নম্রতার চঞ্চল, উচ্ছল চোখদুটোতে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ ঔষধটা তো নিজেই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত নম্রমিতা। রোগযুক্ত ঔষধ সেবন আপনার জন্য হানিকর হয়ে উঠবে না?’

আরফানের মৃদু স্বরে করা প্রশ্ন আর গরম নিঃশ্বাসে নম্রতার বুকের ভেতর টিপটিপ করে উঠল। নাকে ভেসে এলো সব সময়কার সেই অদ্ভুত সুগন্ধ। কয়েক সেকেন্ড আরফানের

চোখে নীরব চেয়ে থেকে কম্পিত হৃদয় নিয়ে বলল,

‘ আমার হানিকর ঔষধই বেশি পছন্দ ডক্টর। এই ঔষধে মৃত্যু হয় হোক। শরীরজুড়ে লাল-নীল ব্যথা আসুক তবুও আমি এই হানিকর ঔষধটাই চাই।’

আরফান ঘোর লাগা চোখে চেয়ে রইল। নম্রতাকে এতো কাছ থেকে দেখার সুযোগ আগে কখনও হয়নি

তার। নম্রতার মিষ্টি দুটো গাল। ফিনফিনে গোলাপের পাঁপড়ির মতো ঠোঁট। বড় বড় চোখের এক রাজ্য মায়া। আরফান ডানহাতটা উঠিয়ে নম্রতার গালের উপর রাখল। মাথাটা আরেকটু নিচু করতেই ফট করে বলে ফেলল নম্রতা,

‘ আপনার ভিজিটটা একটু বেশি বলে মনে হয় না ডক্টর?’এমন একটা পরিস্থিতিতে, এমন অবান্তর

কথায় খানিকটা বিরক্ত হলো আরফান। নম্রতা থেকে সরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ ছোট ছোট করে বুকে হাত গুজে নিয়ে বলল,

‘ আপনি সবসময় আমার ভিজিট নিয়ে ফোঁড়ন কাটেন কেন নম্রতা?’

নম্রতা কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো সরাতে সরাতে বলল,

‘ ফোঁড়ন কাটিনি। সত্য বললাম। আমি ব্যারেস্টারের মেয়ে, মিথ্যা কথা বলি না।’

আরফান টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। ভ্রু বাঁকিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা?’‘ অবশ্যই। পরিচিত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও বার বার ফুল প্যামেন্ট করে ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে। রোগ-টোগও সারছে না। ডাক্তারবাবু বড়

নির্দয় পুরুষ। এত টাকা দিয়ে করবেন কি?’

‘ বউ কিনব।’

কথাটা বলে ঠোঁট টিপে হাসল আরফান। নম্রতা চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ কি?’

আরফান হাসি চেপে কপাল কুঁচকাল। আবারও নম্রতার মুখের উপর ঝুঁকে এসে বলল,

‘ তবে আপনি চাইলে আপনাকেও কিনতে পারি। আমি হৃদয়বান মানুষ। ভালোবাসার বাজারে খুব পুরাতন ক্রেতা। সুন্দরীদের পার্সোনাল ডাক্তার হতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই।’নম্রতা চোখ গরম করে তাকাল। আরফানের রাগ ভাঙাতে এসে নিজেই ক্ষেপে যাচ্ছে সে। সুন্দরীদের মানে কী? কত শত সুন্দরীর পার্সোনাল ডাক্তার হতে চায়

সে? আরফানের পেটে শক্ত একটা আঘাত করে ফুঁসে উঠল নম্রতা,

‘ কতজন সুন্দরীর পার্সোনাল ডাক্তার হয়েছেন আপনি? পার্সোনাল ডাক্তার হওয়ার খুব শখ?’

নম্রতার নরম হাতের আঘাতে শক্ত সমর্থ আরফান এক চুলও নড়ল না। হেসে বলল,‘ হ্যাঁ, খুব। এখনও কারো পার্সোনাল হইনি যদিও। তবে আপনাকে দিয়ে শুরু করলে মন্দ হয়

না। অভিষেকটা নাহয় আপনিই করুন। পরিবর্তীতে বাকি সুন্দরীদের কথা ভেবে দেখা যাবে। করবেন নাকি অভিষেক?’

কথাটা বলে চোখ টিপল আরফান। নম্রতা অবাক চোখে চেয়ে রইল। এই ডাক্তার তো তার থেকেও দুই ডিগ্রি উপরে। এই লোকের সাথে কিভাবে ফ্লার্টিং করবে নম্রতা? নম্রতা থমথমে মুখে বসে রইল। নম্রতা

গাল ফুলিয়ে বসে থাকতে দেখে হেসে গাল টেনে দিল আরফান। কিছু একটা বলার প্রস্তুতি নিতেই দরজা ঠেলে ভেতরে এলো নুরুল সাহেব। আরফান স্প্রিংয়ের মতো সরে গিয়ে তিন-চার হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। নুরুল সাহেব অতসব খেয়াল করেননি। তবুও অস্বস্তি আর লজ্জায় কাটা হয়ে রইল আরফান। চট করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে

মুখ আড়ালের চেষ্টা করল। নুরুল সাহেব খুব স্বাভাবিক বিস্ময় নিয়ে বললেন,‘ ডাক্তার এদিকে তুই ওদিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসে আছিস কেন মা?’

নম্রতা চেয়ার ঘুরিয়ে মিষ্টি করে হাসল, জবাব দিল না। নুরুল সাহেব জবাবের অপেক্ষা না করে বলল,

‘ কেমন দেখলেন?’

আরফান থতমত খেয়ে মাথা তুলে তাকাল। ডানহাতে শার্টের কলার ঠিক করতে করতে বলল,

‘ ভালো। আই মিন, আপনার মেয়ে ভালো আছে। রক্তচাপটা একটু হাই। বাকিসব ঠিকঠাক। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হলেই ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।’নুরুল সাহেব সন্দিহান চোখে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টি বলছে, আরফানকে ডাক্তার

হিসেবেও পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। আরফান যেন অকূল পাথারে পড়ল। বুকে বেয়ে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসটা বড় আফসোস নিয়ে বলল, ‘ বিয়ের ল্যাঠাটা তোর কপাল থেকে এবার পুরোপুরিই চুকে গেল রে নিষ্প্রভ। চিরকুমারের চিরবস্ত্র পরিধান করে সন্যাসী হওয়া ছাড়া তোর আর কোনো গতি রইল না বাছা।’ নুরুল সাহেবরা চেম্বার থেকে বেরিয়ে

যাওয়ার আগমুহূর্তে এক অভাবনীয় কাজ করে বসল নম্রতা। দরজা পর্যন্ত গিয়ে পেছনে তাকিয়ে হুট করেই একটা দুমড়ানো মোচড়ানো কাগজের টুকরো ছুঁড়ে মারল আরফানের টেবিলে। আরফান তাকাতেই ঠোঁট গোল করে চুমু দেখিয়ে বাম চোখ টিপে হেসে ফেলল। সম্পূর্ণ কাজটা ঘটল নুরুল সাহেবের অগোচরে। আরফান প্রচন্ড

বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থেকে নিজের মনে হেসে দিল। কাগজটা তুলে নিতে নিতে বলল, পাগল!টেবিল ভর্তি খাবারের কোনটিই পছন্দ হচ্ছে না ছোঁয়ার। সেই কখন থেকে প্লেটে চামচের টুংটাং শব্দ তুলে খাবার নাড়াচাড়া করে চলেছে, মুখে দিচ্ছে না। সবকিছু বিস্বাদ লাগছে। প্রতিদিন মাছ-মাংস আর তথা কথিত সুস্বাদু খাবার খেতে খেতে বিরক্ত

ছোঁয়া। ছোঁয়ার হঠাৎ করেই সেদিন দুপুরের কথা মনে পড়ে গেল। খোলা আকাশের নিচে ঘাসের উপর বসে শত পদের ভর্তা দিয়ে খাবার খেয়েছে তারা। ছোঁয়ার যদিও অস্বস্তি হয়েছে। এভাবে বসে খেতে ঘেন্না লেগেছে তবুও কোথাও একটা তৃপ্তি এসেছিল তার। খাওয়া শেষে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গিয়ে তার মনে হয়েছে, পৃথিবীটা বড় সুন্দর। বেঁচে

থাকাটা বড় মিষ্টি। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই পরিষ্কার, ঝকঝকে খাবার টেবিলে বসেও বেঁচে থাকাটাকে তার একঘেয়ে আর বিরক্তিকর লাগছে। ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে অল্প একটু খাবার মুখে তুলল। সিঁথি হক পাশ থেকে আরও কিছুটা খাবার তুলে দিয়ে বলল,‘ বেশি করে খাও। তোমাকে আজকাল খুব উইক দেখাচ্ছে। ইউ নিড পার্ফেক্ট

মেডিটেশন। সকাল উঠে মেডিটেশন করছ তো?’

ছোঁয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ করছি মাম্মা।’

‘ লাস্ট উইক কিছু বই দিয়েছিলাম, পড়ে শেষ করেছ ওগুলো?’

ছোঁয়া অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল,

‘ মনোযোগ দিতে পারছি না। তবে জলদি শেষ করে ফেলব মাম্মা।’

সিঁথি হক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,‘ মনোযোগ আসছে না কেন? ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া না করলে মনোযোগ আসবে কিভাবে? রহিমা বলছিল, কিছুদিন যাবৎ তুমি ঘুমানোর আগে দুধ এবোয়েড করছ? রহিমাকে দুধ নিয়ে ঝুড়িতে ফেলে দিতে বলেছ। এসব কেন?’

‘ রোজ রোজ দুধ খেতে আমার ভালো লাগে না মাম্মা। আই এম নট আ চাইল্ড নাউ।’

সিঁথি হক চোখ লাল করে তাকালেন। থমথমে কণ্ঠে বললেন,

‘ ভালো না লাগার কিছু নেই। পড়াশোনায় কনসেনট্রেট করার জন্য দুধ খুব উপকারী।তোমার নিউট্রোশনিস্ট তোমাকে দুধ খেতে সাজেস্ট করেছে তুমি খাবে, ব্যস।’

ছোঁয়া বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল। আরেক চামচ খাবার মুখে তুলে নিয়ে মুখ কুঁচকাল। চশমাটা নাকের উপর ঠেলে দিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল,‘ খাব মাম্মা।’

সিঁথি বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎই প্রশ্ন করলেন,

‘ ডু ইউ হ্যাভ এনি বয়ফ্রেন্ড। কাউকে পছন্দ করো?’

ছোঁয়া উত্তর দিল না। প্রশ্নটা তার মাথার ভেতর ঘুরতে লাগল। কপালে সূক্ষ্ম এক ভাঁজ পড়ল। সিঁথি হক খাবারের গ্রাস মুখে দিয়ে বললেন,

‘ আই থিংক তোমার এখন একজন পার্ফেক্ট কোম্পানি প্রয়োজন। তোমার ফ্রেন্ডদের মতো থার্ড ক্লাস ছেলেদের সাথে মেশা বন্ধ করে পার্ফেক্ট কারো সাথে টাইম স্পেন্ড করা প্রয়োজন। আমি আর তোমার বাবা তোমার

জন্য পার্ফেক্ট কাউকেই খুঁজছি। খুব জলদি পেয়েও যাব। তুমি...'সিঁথি হকের বাকি কথাগুলো ছোঁয়ার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছাল না। মাথার ভেতর ঘুরে বেড়াত লাগল অগোছালো কিছু প্রশ্ন। মায়ের বলা 'পার্ফেক্ট' শব্দটা মস্তিষ্কে ফুটবলের মতো ঢপ খেতে লাগল। ছোঁয়ার জীবনে সবকিছুই অত্যন্ত গোছাল ও পার্ফেক্ট। ঘরের রঙ থেকে শুরু করে

ছোঁয়ার জুতোটা পর্যন্ত পার্ফেক্ট। পার্ফেক্ট তার ক্যারিয়ার। ঘষামাজা সৌন্দর্য। ছোঁয়া জানে তার ভবিষ্যৎ পুরুষও হবে পার্ফেক্ট হাজবেন্ডের বেস্ট উদাহরণ। কিন্তু তবুও কেন গোটা জীবনটাই ইমপার্ফেক্ট তার? মাম্মা তাকে পার্ফেক্ট সব খুঁজে দিলেও পার্ফেক্ট জীবন কেন খুঁজে দিচ্ছে না? এই নিয়মতান্ত্রিক জীবনে কেন নিয়মহীন, বেপরোয়া কিছু

ঘটছে না? মাম্মা তার ঢেউহীন জীবনটাকে কেন তরঙ্গে তরঙ্গে সাজিয়ে দিচ্ছে না? নাদিম বলে ছোঁয়া একটা বলদ। হাই লেভেলের জড়বস্তু। এই সকল জড়বস্তুকে লাথি দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ছোঁয়ারও আজকাল তাই মনে হয়। এই জড়বস্তুর মতো জীবনটাকে কিক দিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সব

ইচ্ছেয় পূরণ করার জন্য হয় না। অথবা ইচ্ছে পূরণের সাহস বা স্বাধীনতাটাই হয়ত তাকে দেওয়া হয়নি। ছোঁয়া খাঁচায় বন্ধী সাজানো গোছানো টিয়া পাখির মতোই পার্ফেক্ট। যে মুখস্থ বুলি আওড়ে সবাইকে চমকে দিতে জানে। কিন্তু উড়তে জানে না। তাকে বাবা-মা উড়তে শিখায়নি। কিন্তু কেন শেখায়নি?দূর আকাশে তারার মেলা।

হেমন্তের আগমনী বার্তা বাতাসে। টিএসসির চা স্টলের বেঞ্চিতে বসে আছে অন্তু, ছোঁয়া, নাদিম, নম্রতা। ঘড়িতে আটটা কি নয়টা বাজে। নাদিম হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বলল,

‘ তোরা সব ঝিম মাইরা বইসা আছিস কেন বা*? তোগো ভাবসাব দেইখ্যা মনে হইতাছে আড্ডায় নয়

শোকসভায় বইসা বইসা নিরবতা পালন করতেছি।’

নম্রতা খুব ধীরে চায়ের কাপে চুমুক দিল। উদাস কণ্ঠে বলল,‘ রঞ্জন আর নীরুকে মিস করছি। একসাথে থাকার সময়গুলো কেমন ধুম করে কেটে গেল, তাই না? ভার্সিটির প্রথম দিন কেমন বাচ্চা বাচ্চা ছিলাম সবাই। ক্লাস বাঙ্ক, হৈচৈ, পানিশমেন্ট সবকিছুতে ছিল কৈশোরের ছোঁয়া।

আজ মনে হচ্ছে হুট করেই বড় হয়ে গেলাম সব। বড় হলে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলতে হয়, তাই না?’

কেউ উত্তর দিল না। সবাই নীরব বসে চায়ের কাপে চুমুক দিল। পাশেই কোনো উচ্ছ্বসিত বন্ধুমহল থেকে ভেসে এলো গিটারের সুর। চার বন্ধুর মনে খুব সন্তর্পণে ধাক্কা দিয়ে গেল সেই বিরহী পঙক্তি মালা। আজ থেকে কয়েক বছর আগে

তারাও এমন উচ্ছ্বাসিত গানের পসরা সাজাত। গলা ফাটিয়ে গান গাইতো। মাঝ রাস্তায় লাফালাফি, এক রিক্সায় ছয়জন উঠে হৈ-হুল্লোড়। দিনগুলো কী তবে সত্যিই ফুরিয়ে গেল? খুব বেশিই বড় হয়ে গেল তারা? হাজারও দায়িত্বের বেড়াজালে কৈশোরটা তবে ছাপিয়েই গেল? এইতো আর মাত্র ছয় মাস বাকি। ভার্সিটি প্রাঙ্গন ছেড়ে অজানায়

ছড়িয়ে পড়বে সবাই। হারিয়ে যাবে সময়ের স্রোতে। চারজনের মনই ভার হয়ে আসে অজান্তে। বেশ কিছুক্ষণ পর গিটারের সুর বদলায়। বদলায় গানের কথা। সেই গভীর নীরবতায় ফাঁটল ধরিয়ে নাদিমই কথা বলল প্রথম। হাই তুলতে তুলতে বলল,‘ নমু দি ফিলোসোফিশড। দর্শনের বইয়ে প্রেম ঝাড়তে ঝাড়তে শেষমেস

দার্শনিক হইয়া গেলি নাকি মামা? অন্তু বড় হইয়া আস্ত একটা বউ পাইয়া গেল আর তুই এখনও বড় হওয়া ইকুয়াল টু হারানোর ফিলোসোফি নিয়া গাঞ্জা টানতেছিস?’ নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোঁয়া অবাক হয়ে বলল,

‘ গাঞ্জা টানছে মানে? গাঞ্জা টানে কিভাবে? ওটা তো একটা খাওয়ার জিনিস, তাই না?’

নাদিম মুখ কুঁচকে ছোঁয়ার দিকে তাকাল। ধমক দিয়ে বলল,

‘ হ। গাঞ্জা অতি সুস্বাদু ফাস্টফুড। এক নম্বরের বড়লোকী খাবার। তোর মতো ধনবান বলদদের জন্য একদম খাপে খাপ। তোর বড়লোক ম্যা ম্যা কে বল, তোকে যেন গাঞ্জার মধ্যে ডুবাইয়া মাইরা ফেলে। আজাইরা।’

ছোঁয়া গরম চোখে তাকাল। শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ খবরদার মাম্মামকে ম্যা ম্যা বলবি না। ট্রাই টু বি আ স্মার্ট গাই। খ্যাত একটা।’

নাদিম ফুঁসে উঠল। ছোঁয়াকে নকল করে বলল,‘ ট্রাই টু বি আ স্মার্ট গাই! ট্রাই টু বি তোর মাথা। ওই হারামি, তোরে না কইছি? আমার কথার মধ্যে বামহাত ঢুকাবি না?

শালা ইংরেজের বংশদূত। ফুট এইখান থেকে। তোর ম্যা ম্যা এর আঁচল ধরে স্মার্টনেস শিখগা যা। ম্যা ম্যা ম্যা...’

ছোঁয়াকে ভেঙাতে ভেঙাতেই বিশ্রী এক গালি দিল নাদিম। ছোঁয়া মুখ কুঁচকে ফেলল ঘৃণায়।

‘ ছিঃ, কি অশ্লীল ভাষা!’

নাদিমের মধ্যে কোনো ভাবাবেগ দেখা গেল না । বেঞ্চের উপর রাখা গিটারটা কোলে টেনে নিয়ে বলল,
‘ অশ্লীলের দেখেছিসটা কি? আমি তো কিছুই না। অন্তুর কাছে অশ্লীলকথন আছে। বিবাহিত মানুষের এই সম্পর্কে বরাবরই জ্ঞান বেশি। শুনতে চাস?’

অন্তু-ছোঁয়া দু’জনেই দাঁত কটমট করে তাকাল। নম্রতা হেসে ফেলে বলল,

‘ অন্তুর বউ অন্তুকে পেয়ে সারা দুনিয়া ভুলে গিয়েছে। দিনে দশবার ফোন দিলেও তাকে পাওয়া যায় না। মাইয়া করে কি সারাদিন? অশ্লীলকথন দিয়েই ভুলিয়েছিস নাকি তাকে?’

নাদিম গিটারে টুন টান শব্দ তুলতে তুলতে বলল,‘ কানারে জিগাইতেছিস রংধনুর ঠিকানা। ও বাসায় থাকে নাকি আজকাল? সপ্তাহে তিনদিন তো আমার সাথে হলেই পড়ে থাকে। বউয়ের খবর রাখে নাকি ও....’

বাক্যটা সম্পূর্ণ শেষ না করেই থেমে গেল নাদিম। গিটার থেকে হাত

সরিয়ে অন্তুর দিকে তাকাল। ভ্রু কুঁচকে বলল,
‘ অন্তু? নীরুর সাথে তোর সব ঠিকঠাক আছে তো না? তুই বাড়িতে বউ রেখে আমার সাথে পড়ে থাকিস, ব্যাপার কি?তুই কি নীরুকে এবোয়েড করছিস?’
শেষ কথাটাতে চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল নাদিমের। নম্রতা, ছোঁয়াও ভ্রু কুঁচকে উত্তরের অপেক্ষা করতে

লাগল। অন্তু বুক ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে বলল,

‘ তাকে এবোয়েড করার সাহস আছে নাকি আমার? তোদের নীরু যে আমায় কোনোদিনই সহ্য করতে পারে না সে তো জানা কথা। বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে। আমিও অনেকটা বাধ্য হয়েই করেছি। তার এই বাধ্যবাধকতার চাপ কমাতেই

খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলি। তেমন কিছু না।’

কেউ উত্তর দিল না। তিন জোড়া চোখ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল খানিক। অন্তু অস্বস্তি নিয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল। বিরক্ত হয়ে বলল,‘ কি সমস্যা?’

নম্রতা হতাশ হয়ে বলল,

‘ পুরোটাই সমস্যা। তোরা দুইজন যে চুপিচুপি বাংলা সিনেমা করছিস

তা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি দোস্ত। বিয়ের প্রায় একমাস হতে চলল, এখনও তোদের ইগোর লড়াই চলছে? মাই গড!’

অন্তু প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ একটা টিউশনি দিয়ে বউ চালানো যাচ্ছে না। আব্বা বাড়িতে কোল্ড ওয়ার জারি করেছে। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমার বউয়ের খাওয়া-পরার জন্য এক পাই

খরচ তিনি করবেন না। ইভেন আমার জন্যও না। অল ফান্ড ইজ ক্লোজ।’

নাদিম হেসে বলল,‘ তোর বাপ তো হেব্বি মাল দোস্ত। এখনও ক্ষেপে আছে?’

কথাটা বলে অন্তুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে আবারও বলল,

‘ এগ্লা রাগ থাকে নাকি? দুই দিনেই রাগ পড়ে যাবে। চাপ নিস না।’

অন্তু মুখভঙ্গি গম্ভীর করে বলল, ‘ আব্বার রাগ পড়া নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার মাথাব্যথা আমার যোগ্যতা প্রমাণ করা নিয়ে। পরের মাস থেকে সংসারের কিছুটা খরচ আমার কাঁধে না নিলে চলছেই না। আব্বাকে দেখাতে হবে, আমার বউ তাঁর ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না।’

অন্তুর কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে একে অপরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল নম্রতা-নাদিম। ফুঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে অন্তুর পিঠ চাপড়ে উদ্বেগহীন কন্ঠে আশ্বাস দিল নাদিম,

‘ ধুরু! এইডা টেনশনের কিছু হইল নাকি? চাপ নিস না। হইয়া যাইব। আমরা আছি না?’

অন্তু হতাশ চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক

সেকেন্ড চুপ করে থেকে হঠাৎই প্রশ্ন করল,
‘ তুই না কিছুদিন আগে গাজীপুর গিয়েছিলি? গাজীপুর তোর কোনো আত্মীয়স্বজন আছে বলে তো জানতাম না। কে থাকে ওখানে?’নাদিমের মুখভঙ্গি গম্ভীর হয়ে এলো। পরমুহূর্তেই ঠাট্টার কণ্ঠে বলল,
‘ তোর বউ।’

অন্তু বিরক্ত চোখে তাকাতেই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ ধূর! তেমন কিছুই না। এইসব ছাইড়া বাড়িতে যাইয়া বউ সামলা। আজ আমার সাথে থাকার কথা চিন্তাও করবি না।’

সাড়ে নয়টার দিকে আড্ডা ভেঙে যার যার বাড়ির দিকে রওনা দিল তারা। নাদিম হাজারটা গালি আর দুই চারটা কিল-ঘুষি দিয়ে এক

রকম জোর করেই অন্তুকে বাড়ির পথে ফেরত পাঠাল। তিন বন্ধু তিন রাস্তায় আলাদা হতেই নাদিম হঠাৎ উপলব্ধি করল, তাদের শক্তপোক্ত বন্ধুমহল থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণ। প্রথমে রঞ্জন। তারপর নীরা। তারপর কে? অন্তু, নম্রতা, ছোঁয়া নাকি নাদিম নিজে? নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শহরটা বড় বিষাক্ত লাগে আজকাল।শহরজুড়ে নিশুতি

রাতের ঝাঁপ মেলতেই আকাশে ক্ষুদ্র মেঘের আনাগোনা দেখা গেল। বাতাসে ভর করল শীতল স্পর্শ। গাছের পাতায় পাতায় তীব্র আন্দোলন শুরু হতেই রান্নাঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিল নীরা। উদ্বিগ্ন চোখে আকাশটা একবার দেখে নিয়ে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে ব্যস্ত হল। জাহানারা চা বানাচ্ছিলেন। চুলোর আঁচটা খানিক কমিয়ে দিয়ে

নীরার দিকে তাকালেন। কপাল কুঁচকে বললেন,

‘ ঝড় আসবে নাকি?’

নীরা মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ মনে হয়। ঠান্ডা হওয়া হচ্ছে।’

‘ অন্তু কখন ফিরবে? কথা হয়েছে ওর সাথে?’

নীরা মুহূর্তেই মাথা নিচু করে ফেলল। কড়াইয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ততা দেখিয়ে ছোট্ট করে বলল,

‘ জি না, মা।’

জাহানারা বিরক্ত চোখে তাকালেন। তেঁতো মুখে বললেন,‘ না কেন? নিজের বরের প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই তোমার? অন্তু যে রাতে বেশির ভাগই বাসায় ফেরে না, তা কিন্তু আমার চোখ এড়ায় না। কেমন বউ তুমি যে বরকে বাড়িতে আটকে রাখতে পারো না? আমার ছেলে তো আগে এমন ছিল না। বিয়ের পর

পরই এমন পরিবর্তন কেন? নিশ্চয় তোমার সাথেই কিছু হয়েছে? কি হয়েছে, কি হয়নি তা আমি জানতে চাই না। আমার ছেলেকে বাড়িতে আটকানোর দায়িত্ব তোমার। এরপর এমন কিছু দেখলে কিন্তু আমি ছেড়ে কথা বলব না।’নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোনোরূপ জবাব না দিয়ে চুলোর আঁচ কমাল। বারান্দা থেকে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ আসতেই ছাঁদের

কাপড়ের কথা মনে পড়ল নীরার। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছাঁদের দিকে দৌঁড়াল সে। ততক্ষণে শুকনো কাপড়গুলো ভিজে একাকার। সবগুলো কাপড় তুলে নিয়ে নামতে নামতে নিজেও খানিকটা ভিজে গেল নীরা। দরজার কাছাকাছি আসতেই মুখোমুখি এসে দাঁড়াল প্রিয় একটি মুখ। শ্যামলা মুখটি বৃষ্টির জলে ভেজা। কপাল পড়ে থাকা চুলগুলো

থেকে টুপটুপ করে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। ভাজ করা কপালটির ঠিক নিচে ল্যাপ্টে আছে জোড়া ভ্রু। বিস্মিত চোখদুটো নীরার মুখে স্থির। অন্তর চাহনীতে ভেতরটা ধুক করে উঠল নীরার। অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আবেশিত হল মন। কয়েক সেকেন্ড নীরার দিকে চেয়ে থেকে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল অন্তু।

নীরাও ঢুকল তার পিছু পিছু। শুকনো কাপড় ভিজিয়ে ফেলার দায়ে শাশুড়ীর কাছে বেশ খানিকটা বকাও শুনল সে। তবুও নীরার মন ফুরফুরে। শাশুড়ীর বকাঝকাও যেন মিষ্টি লাগছে আজ।নীরাকে ভার্সিটি দিয়ে আসার দায়িত্বটা খুব নিষ্ঠার সাথে পালন করলেও রাতের বেলা তার দেখা মিলাটা হয়ে উঠেছে অমাবস্যার চাঁদের মতোই অসম্ভব।

সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিনের বেশি তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। আর যে ক'দিন থাকে সে কয়েকদিনও গভীর রাত পর্যন্ত বই নিয়ে বসে থাকে অন্তু। বিছানায় আদৌ গা এলায় কি-না সন্দেহ। নীরা এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ফিরল। অন্তু ততক্ষণে বিছানায় গা এলিয়েছে। কপালের উপর ডানহাতটা তুলে দিয়ে লম্বালম্বিভাবে

শুয়ে আছে। শার্ট পাল্টে গায়ে টি-শার্ট জড়িয়েছে। পরনে কালো টাউজার। নীরা চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রেখে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তুকে ডাকবে কি ডাকবে না তা নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। আর ডাকতেই যদি হয় তাহলেই কি বলে ডাকবে? তুমি নাকি তুই?নীরা অসহায় চোখে চেয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ জল্পনা

কল্পনা করার পর ঠান্ডা হাতটা অন্তুর কপালের একাংশে ছোঁয়াল নীরা। অন্তু তো এ-সময়ে ঘুমোয় না। জ্বর হল না তো আবার? নীরার ছোঁয়া পেয়েই যন্ত্রের মতো দু'চোখ মেলে তাকাল অন্তু। কপালে হালকা ভাঁজ। ঘুমু ঘুমু চোখদুটোতে একঝাঁক প্রশ্ন। নীরা সাথে সাথেই হাত সরিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হৃদপিণ্ডের ভয়ানক আন্দোলনে

হঠাৎই উপলব্ধি করল, অন্তুকে সে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে বিয়ের প্রথম দিন থেকেই। কিন্তু কেন? অন্তু তো কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। চোখ রাঙায়নি। তবে ভয় কেন? স্বামী বলে? তার জীবনটা এখন এই মানুষটিকে ঘিরে আবর্তিত বলে? অন্তুকে স্থির চেয়ে থাকতে দেখে ঢোক গিলল নীরা। অস্বস্তি নিয়ে বলল,‘ চা এনেছিলাম।’

অন্তু চোখ ফিরিয়ে পাশের টেবিলে তাকাল। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল,

‘ এখন চা খাব না। বাইরে খেয়েছি।’

কথাটুকু বলেই চোখ বন্ধ করল অন্তু। নীরা আগের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তুর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি বলা যেতে পারে বুঝতে পারছে না। বেশ

কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর চোখ বন্ধ রেখেই বলে উঠল অন্তু, ‘ ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কি?’

অন্তুর কথার পিঠে কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল নীরা। বুকের ভেতর তরল অনুভূতির প্রলেপ নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেল। বুকের ভেতর টলটলে খুশি যেন ডানা মেলেছে আজ, আহ! অন্তু তবে

একটু হলেও তাকে খেয়াল করেছে!‘আপনি আসবেন কি আসবেন না?’

মাঝরাতে নম্রতার এমন অদ্ভুত বায়না শুনে হতভম্ব হয়ে গেল আরফান। বাইরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাঁদের আলোটা জ্বালিয়ে রাখায় বৃষ্টির পানিতে চকচক করছে বেলীফুলের গা। ছাঁদে ঘিরে থাকা বেলীফুলের ডালপালাগুলো অল্প অল্প

দুলছে। ছাঁদের পাটাতনে নৃত্যরত ঝপঝপে বৃষ্টির শব্দে তালা লেগে যাচ্ছে কান। বারান্দার এক কোণায় বন্ধী খাঁচায় 'শ্যামা' 'শ্যামা' করে ডাক পাড়ছে হৃষ্টপুষ্ট এক টিয়া। দেশে ফিরে শ্যামালতাকে না পেয়ে যখন পাগলপ্রায় অবস্থা ঠিক তখনই এই টিয়াকে কিনে এনেছিল আরফান। অনেক বছর আগে, কোনো এক আবেগময় চিঠিতে

নম্রতা লিখেছিল তার ইচ্ছের কথা। বহু বায়নার পসরা সাজিয়ে পাঠিয়েছিল তার প্রিয়র নামে। তারই মধ্যে একটি বায়না ছিল, ‘পোষা একটা টিয়া থাকবে। আমাদের ছোট্ট ঘরে তারও ছোট্ট ঘর থাকবে।’ ব্যস! আর কী চাই? এরপরও টিয়া পাখি না কিনে পারে নাকি আরফান? টিয়া পাখিটির খুব সুন্দর নামও রেখেছে আরফান। আরফানের ভাবনার মাঝে

আবারও একই প্রশ্ন করল নম্রতা। আরফান বারান্দা থেকে সরে এসে বলল,‘ আপনি বড় জ্বালাচ্ছেন আজকাল।’

‘ জ্বালাচ্ছি? আচ্ছা বেশ। এখন থেকে আর জ্বালাব না। দুইদিন বাদে বিয়েশাদী করে যখন আপনারই হসপিটালে সিজারিয়ান সেকশনে ভর্তি হয়ে যাব তখন বুঝবেন। আমার বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে

আপনাকে মামা বলে পরিচয় করে দিব। নো চাপ। আপনি হবেন জাতীয় মামা।’

নম্রতার কথায় হেসে ফেলল আরফান। আরফানের হাসি যেন আগুনে ঘিয়ের কাজ করল। নম্রতা আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠে বলল, ‘ হাসবেন না। আমি হাসার মতো কিছু বলিনি। আই অ্যাম সিরিয়াস।’

আরফান এবার শব্দ করে হাসল। হাসি থামানোর চেষ্টা করতে করতে বলল,

‘ আচ্ছা।’

‘ আচ্ছা? কিসের আচ্ছা?’

‘ আপনার কি ধারণা? বিয়ে করা এতো সহজ? আপনাকে যে বিয়ে করতে আসবে তাকে বিনা জঞ্ঝাটে আইসিইউতে ভর্তি করে দেব। আমার জিনিসে আমার

অধিকার।’আরফানের উত্তরে কিছুটা খুশি হলেও প্রকাশ করল না নম্রতা। ফুঁসে উঠে বলল,

‘ জিনিস? আমি মোটেও কারো জিনিস নই। আমি অবশ্যই বিয়ে করব এবং ডেলিভারীর জন্য অতি শীঘ্রই আপনার হসপিটালে সিজারিয়ান সেকশনে ভর্তি হব। ডিসিশন ফাইনাল। যে ভদ্রলোক আমার বাবার সাথে দেখা করতে

আসা নিয়ে টালবাহনা করে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত জিনিস হওয়ার প্রশ্নই আসে না। নো, নেভার।'

আরফান হাসল। ঘড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে লাইট অফ করে বিছানায় গা এলাল। দুষ্টুমি করে বলল,

' আমি কখন বললাম আপনি বিয়ে করবেন না নম্রমিতা? আপনি অবশ্যই বিয়ে করবেন, আমার

হসপিটালে সিজারিয়ান সেকশনে ভর্তিও হবেন এবং এই সকল কিছুর পেছনে এক এবং মূলীভূত কারণ থাকবে আরফান আলম নিষ্প্রভ। আপনার ডেলিভারির দায়িত্বও তার। হসপিটালের ফি ভরার দায়িত্বও তাই। আপনার বাচ্চাকে পিতৃ পরিচয় দেওয়ার দায়িত্বও তার। ও হ্যাঁ, আপনার বাবাকে নানা বানানোর দায়িত্বও তার। বাচ্চার নানার সাথে

দেখাটা নাহয় তখনই হবে। চিন্তা কি? নো চাপ।’

শেষ কথাটা নম্রতার মতো করে বলল আরফান। নম্রতা চেঁচিয়ে উঠে বলল,‘ আপনাকে আমি খুন করে ফেলব, ডক্টর।’

আরফান ঠোঁট টিপে বলল,

‘ আহ! সে তো অনেক আগেই করেছেন। চিঠির ছুঁড়িতে খুন। এবার আপনার শাস্তির পালা। যাবজ্জীবন

কারাদণ্ডে দন্ডিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন মিস. নিম পাতা।’

নম্রতা কিছুক্ষণ ফুসফাস করে মিইয়ে এলো একসময়। হতাশ কণ্ঠে বলল, ‘ বাবা আপনাকে আসতে বলেছে নিষ্প্রভ। আপনার সাথে পরিচিত হতে চায়।’‘ আপনার বাবার সাথে আমার পরিচয়ের কিছু বাকি আছে নাকি নম্রমিতা? শুরু থেকে ধরা খাচ্ছি আর পরিচিত হচ্ছি। প্রথমবার

ফোনে। দ্বিতীয়বার আপনার বাড়ির সামনে। তৃতীয়বার আমারই চেম্বারে। আমার চেম্বারে এসে আমাকেই ভেলকি দেখিয়ে গেলেন। এরপরও পরিচয়ের কিছু বাকি আছে? সেদিন ফোন ধরেই যদি চুমু টুমু দিয়ে দিতাম তখন কি হতো? প্রেমিকার চুমু ডিরেক্ট শশুরের গালে। মাই গড!’

আরফানের কথার ধরনে হাসি পেয়ে গেল নম্রতার। মুখ টিপে হেসে বলল,‘ আজ আপনি খুব বেসামাল কথা বলছেন ডক্টর।’

‘ না বলে যাব কোথায়? এমনিতেই মাঝরাত। বাইরে তুমুল বর্ষন। বাতাসে বেলীফুলের তীব্র সুগন্ধ। ফোনের ওপাশে আপনি। অনুভূতির জ্বালাপোড়নে ডাক্তার নিজেই রোগী হয়ে যাচ্ছে আজ। বেসামাল না হয়ে

তো উপায় নেই। শ্যামলতা চিকিৎসা না করলে এই ডাক্তারের নির্ঘাত মৃত্যু।’

নম্রতা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। আরফান একটু থেমে খুব অন্যরকম কণ্ঠে বলল,

‘ নম্রতা? একটা গান শুনাবেন প্লিজ?’

নম্রতা আবারও চুপ। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ নিঃশ্বাস বিনিময়ের পর বৃষ্টির শব্দ

ছাপিয়ে কিন্নর কন্ঠে গেয়ে উঠল
নম্রতা,‘ এই মেঘলা দিনে একলা
ঘরে থাকেনাতো মন
কাছে যাবো কবে পাবো
ওগো তোমার নিমন্ত্রণ?
যুঁথি বলে ওই হাওয়া
করে শুধু আসা যাওয়া
হায় হায়রে দিন যায়রে
ভরে আঁধারে ভুবন
কাছে যাবো কবে পাবো

ওগো তোমার নিমন্ত্রণ?'বিছানার এক কোণায় পাশ ফিরে শুয়ে আছে নীরা। সময়টা প্রায় মধ্যরাত। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। জানালার পর্দা উড়িয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে স্তব্ধ, নিশ্চুপ ঘরে। ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। নীরার পাশেই লম্বালম্বিভাবে শুয়ে আছে অন্তু। কপালের উপর ডানহাতটা তুলে দিয়ে মাঝে মাঝেই ভীষণ উশখুশ

করছে সে। নীরা জানে অন্তু ঘুমোয়নি। আলোতে তার ঘুম হয় না, সে-ও নীরার জানা। তবুও আগের মতোই শক্ত হয়ে শুয়ে রইল নীরা। নিজ মুখে না বললে কিছুতেই আলো নেভাবে না সে। মুখে কুলুপ এঁটে পত্নী সেবা পাওয়ার ইচ্ছে থাকলে, আজ সেই আশার গুড়ে বালি দেবে নীরা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর হঠাৎই

ঘাড়ের উপর গরম নিঃশ্বাস টের পেল নীরা।নিঃশ্বাসের স্পর্শ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতেই চমকে উঠল নীরা। দমবন্ধ হয়ে এলো। উত্তেজনায় হাত-পায়ে কাঁপন ধরল। অন্তু তার এতো কাছে? নীরা কম্পিত বুক নিয়ে সোজা হয়ে শুল। সাথে সাথেই নিজের মুখের ঠিক উপরেই আবিষ্কার করল প্রিয় একটি মুখ। ঝলমলে আলোয় কাঙ্ক্ষিত

মানুষটির শক্ত চোয়াল, প্রশস্ত কাঁধে নজর আটকে গেল নীরার। একদৃষ্টে চেয়ে রইল অন্তর মুখে। অন্ত নীরার দিকে এক পলক চেয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নীরার পাশে থাকা সুইচবোর্ড হাতড়ে আলো নেভাল। সবুজ রঙা ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে সরে আসতে নিতেই চট করে টি-শার্টের কলার খামচে ধরল নীরা। নীরার আচমকা

আক্রমণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল অন্ত। নীরার উপর পড়ে যেতে নিয়েও কোনোরকমে সামলে নিল সে। নীরার মাথার পাশে বামহাতের ঠেস দিয়ে বিস্ময় নিয়ে তাকাল। নীরার বামহাতের মুঠোতে থাকা কলারের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাল। নীরার মুখের দিকে চেয়ে হতভম্ব কণ্ঠে প্রশ্ন করল,‘ কী?’

নীরার হাতের মুঠো আরও খানিকটা শক্ত হল। অন্তু বাধ্য হয়েই আরও একটু ঝুঁকে এলো কাছে।

‘ রাতে বাড়ি না ফেরার কারণ কী?’

অন্তু উত্তর না দিয়ে কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করল। নীরা হাতের মুঠো শক্ত করে ধরে রেখে অন্তুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্তু কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতেই দু-একবার নীরার দিকে তাকাল। নীরার মধ্যে

ছেড়ে দেওয়ার কোনো লক্ষ্মণ না দেখে মুখ ফুলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের পরাজয় মেনে নিয়ে হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ কী চাই?’

নীরা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,‘ আইডিয়া চাই।’

অন্তর কপাল কুঁচকে গেল। ভ্রু বাঁকিয়ে নীরার দিকে চেয়ে থেকে আবারও কলার ছাড়ানোর চেষ্টা

করল। নীরা মুঠো শক্ত রেখেই বলল,

‘ আইডিয়া না দিলে ছাড়ব না।’

অন্তু বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কিসের আইডিয়া?’

‘ শাশুড়ী মা বলেছে, নিজের বরকে ঘরে আটকে রাখার দায়িত্ব আমার। সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করানোর পরও যদি ছেলে রাত-বিরেতে বন্ধুর বাসায় পড়ে থাকে তাহলে চলবে কেন?

শাশুড়ী মায়ের কথায় পয়েন্ট আছে। কিন্তু বরকে কিভাবে আটকাব বুঝে উঠতে পারছি না। ছেলেদের সম্পর্কে ছেলেদের ধারণা থাকে সবচেয়ে বেশি। তাই আইডিয়া চাচ্ছি, কিভাবে আটকাব আমার বরকে?’কথাটা বলে সরল চোখে চাইল নীরা। অন্তর হতভম্ব দৃষ্টি লক্ষ্য করে কৈফিয়ত দেওয়ার মত করে বলল,

‘ বেস্টফ্রেন্ড হিসেবে আইডিয়া চাইছি। বাকিরা তো নেই কাছে। থাকলে নিশ্চয় চুপ করে থাকত না।’ অন্তু বিস্মিত চোখে চেয়ে রইল। নীরা যে এমন কিছু বলতে পারে ধারণায় ছিল না তার। নীরার কথার পিঠে কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল অন্তু। ভ্রু,কপাল কুঁচকে কিছু একটা ভাবতে লাগল। অন্তুর নিশ্চলতার সুযোগে আরও

একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল নীরা। আচমকায় কাছে টেনে চুমু খেল অন্তর গলায়। অন্তর সারা শরীর ক্ষণিকের জন্য কেঁপে কেঁপে উঠল। চকিতে নীরার দিকে তাকাল। মেয়েটা কী পাগল হয়ে গিয়েছে আজ? নীরা আবারও একই কাজ করল। তৃতীয়বারের পাগলামো যেন অসহনীয় ঠেকল অন্তর। গলার এক পাশে গাঢ় দাগ বসিয়েই সম্বিৎ ফিরে

পেল নীরা। চমকে উঠে অন্তুকে ছেড়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল। কাঁথায় চোখ-মুখ ঢেকে নিজের লজ্জা আর অস্বস্তি ঢাকার বৃথা চেষ্টা করল। এতোক্ষণ পর ছাড়া পেয়ে নীরার পাশেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল অন্তু। গলার জ্বালা ধরা জায়গাটুকু হাত দিয়ে আলতো স্পর্শ করে আড়চোখে নীরার দিকে তাকাল। আশ্চর্য! কি চায় এই মেয়ে?পার্কের বেঞ্চিতে

চুপচাপ বসে আছে নাদিম। দুই আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাথায় এক দঙ্গল চুল। চোখে-মুখে নিষ্পৃহ ভাব। কোলের উপর রাখা গিটারটায় সুর তোলার প্রচেষ্টা নেই। নাদিম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মুখ কুঁচকাল। বিস্বাদ। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে পকেট থেকে ফোন বের করে ভ্রু বাঁকাল। নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছু একটা ভাবল। তারপর ধীর

হাতে ডায়াল করল পরিচিত এক নাম্বারে। কল ঢোকার সাথে সাথেই ঝট করে রিসিভ করে ফেলল অপর পাশের ব্যক্তি। নাদিম গম্ভীর কণ্ঠে বলল,' হ্যালো?'

ওপাশ থেকে জবাব পেল না নাদিম। কারো ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ এসে ধাক্কা খেতে লাগল ফোনের স্পিকারে। সেই সাথে অল্প একটু নাক টানার শব্দ। নাদিম বিরক্ত হল।

বন্ধুর খাতিরে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে বিরক্তি দমন করল সে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ হ্যালো, মৌশি? ক্যান ইউ হেয়ার মি?’

ওপাশ থেকে মৃদু জবাব,

‘ হ্যালো স্যার।’

‘ কেমন আছ মৌশি?’

মৌশি কান্না আটকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি কেমন আছেন স্যার?’

নাদিম হতাশ নিঃশ্বাস ফেলল। এই বয়সের মেয়েদের অল্পতে কেঁদে কেটে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেলার স্বভাবটা বড় বিরক্তিকর।‘ আমি ভালো আছি।’

কথাটুকু বলে থামল নাদিম। ছোট্ট একটা শ্বাস টেনে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘ তোমার কী এখন কোনো টিউটর প্রয়োজন মৌশি? প্রয়োজন হলে

আমায় জানিও। আমি একটা ভালো টিউশনি খুঁজছি।’

নাদিমের কথায় অবাক হল মৌশি। নাদিম তার কাছে হেল্প চাইছে? সত্যিই চাইছে? কথাটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না মৌশির। মৌশি অবাক হয়ে বলল,

‘ আপনার প্রয়োজন স্যার?’

নাদিম উত্তর দিল না। মৌশি খুশি হয়ে বলল,‘ আপনি আমাকে

যেকোনো সাবজেক্ট পড়াতে পারেন স্যার। কখন আসবেন বলুন। সকাল, দুপুর, রাত এনিটাইম।'

' টিউশনিটা আমার জন্য নয় মৌশি, আমার বন্ধুর জন্য। দারুণ ট্যালেন্টেড একটা ছেলে। অসাধারণ পড়ায়। যদি তোমার টিচারের প্রয়োজন থাকে তবেই হ্যাঁ বলো। অন্যথায় নয়।'

মৌশির মন খারাপ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড?’

নাদিম ভ্রু কুঁচকাল,

‘ হ্যাঁ। কেন?’

মৌশি উত্তর না দিয়ে বলল,

‘ আমি উনার কাছে পড়ব।’

নাদিম মৃদু হাসল। মৌশি যে চট করেই রাজি হয়ে যাবে এমনটাই ধারণা করেছিল নাদিম। অন্তর

মাধ্যমে নাদিমের সাথে কানেক্টেড থাকার শেষ চেষ্টাটা যে মৌশি কিছুতেই হাতছাড়া করবে না তা-ও নাদিমের জানা। নাদিম ফোন কেটে গিটারে সুর তুলল। চেহারায় বাবার তেমন ছাপ না থাকলেও নাদিমের ব্যক্তিত্ব আর চাল-চলনে বাবার প্রকাশ স্পষ্ট। বাবার মতোই ছন্নছাড়া জীবনবোধ। নারীমহলে দীর্ঘশ্বাসের কারণ। কথাবার্তায় স্পষ্ট, ভয়হীন

তেজ। নাদিমের মনে হঠাৎই প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা? চরিত্রের দিক দিয়েও কি তারা একই? একই কি তাদের পরিণতিও?সুন্দর, ঝকঝকে সকাল। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় বাতাসে মৃদু ঠান্ডা আমেজ। এখানে সেখানে জমে আছে কর্দমাক্ত পানি। আরফান দ্রুত পায়ে হাসপাতালের ফটকে এসে দাঁড়াল। গেইট থেকে কিছুটা দূরে, ফোন কানে দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা। এক

হাতে ছোট্ট একটি হ্যালমেট। গায়ে সাদা-কালো শাড়ি। আরফান কিছুটা এগিয়ে এসে নম্রতার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বলল,

‘ বাহ! নিউ লুক।’

নম্রতা শিশুসুলভ হেসে বলল,

‘ আপনি ফ্রী?’

নম্রতার ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির আভাস পেয়ে ভ্রু বাঁকাল আরফান। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ আপনার মাথায় একজেক্টলি কি চলছে নম্রমিতা?’

‘ ফুসকা ঘুরছে। আপনি ফ্রী থাকলে দু’জন মিলে রবীন্দ্র সরোবরে যাব। আপনি বেলীফুলের মালা কিনে দিবেন। সেই মালা হাতে ফুসকা হাউজ যাব। পেট পুরে ফুসকা খাব।

আপনি চাইলে আইসক্রিমও খাওয়াতে পারেন। আই ওন্ট মাইন্ড।'নম্রতার হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে হাসল আরফান। ডানহাতের কব্জিতে থাকা ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বলল,

' মাত্রই ক্লাস শেষ করে বেরুলাম। আগামী দুই ঘন্টা ফ্রী। আমার ডিউটি দুই ঘন্টা পর থেকে। এই দুই ঘন্টায় যতটুকু সম্ভব ঘুরে বেড়ানো যায়।'

আরফানের কথায় খুশি হয়ে গেল নম্রতা। গোলাপী রঙের হ্যালমেটটা খুব দ্রুত মাথায় চাপিয়ে বলল,
‘ গ্রেট। তাহলে চলুন!’
নম্রতাকে স্কুটিতে উঠতে দেখে ভ্রু কুঁচকাল আরফান,‘ চলুন মানে? আপনি কী স্কুটিতে যাবেন নাকি?’
নম্রতা অমায়িক হাসি দিয়ে বলল,
‘ শুধু আমি নই। আপনিও যাচ্ছেন।’
আরফান আঁতকে উঠে বলল,

‘ আমি আর স্কুটিতে? ইম্পসিবল!’
নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বলল,
‘ কেন! আপনার ধারণা আমি স্কুটি চালাতে পারি না?’
‘ তা নয়। আমার রিকশায় যেতে ভালো লাগে। আমরা বরং রিকশায় যাই?’
নম্রতা শক্ত কণ্ঠে বলল,
‘ না। আমরা স্কুটিতেই যাব। জলদি উঠুন।’

আরফান হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ মেয়েদের স্কুটিতে উঠে রবীন্দ্র সরোবর যাব? ব্যাপারটা ভীষণ উইয়ার্ড লাগছে নম্রতা।’

‘ লাগলে লাগুক।’

‘ আপনি আমার ন্যাচার জানেন নম্রমিতা। এসব স্কুটি ফুটিতে উঠা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। প্লিজ রিকশায় চলুন।’

নম্রতা সামনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উত্তর দিল,‘ না।’

‘ আপনি বাচ্চাদের মত জেদ করছেন।’

নম্রতা ফিরে তাকাল। ঝট করে স্কুটি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল,

‘ করলে করছি। আপনিও তো বাচ্চাদের মতোই ভয় পাচ্ছেন। আর ভয় পাচ্ছেন বলেই বাবার সাথে

দেখা করতে চাইছেন না। এটা আপনার পানিশমেন্ট।’

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ এখানেও বাবা?’

নম্রতা তেড়ে এসে বলল,

‘ তো?’

‘ আপনি এখনও সেই আগের মতোই আছেন। সব কিছুতেই আগের মতোই ভয়ানক জেদ।’

নম্রতা হ্যালমেটটা খুলতে খুলতে বলল,
‘ তো? আপনি কি আমার পরিবর্তন চাইছিলেন? আপনি চান আমি পাল্টে যাই?’
আরফান হেসে বলল,‘ একদমই না। আমিতো আরও এই ভেবে খুশি হচ্ছি যে, এতোদিন পরই হোক আর যায়হোক শেষমেষ পুরাতন শ্যামলতার সাথে দেখা তো মিলছে।’

নম্রতা সন্তুষ্টির হাসি হাসল। পরমুহূর্তেই চোখ-মুখ শক্ত করে বলল,

‘ একদম গলানোর চেষ্টা করবেন না। স্কুটিতে উঠার প্ল্যান আমি ক্যান্সেল করব না। কিছুতেই না।’

‘ যদি আপনার বাবার সাথে দেখা করতে রাজি হই তবে?’

নম্রতা চকিতে তাকাল। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,

‘ সত্যি?’

‘একদম।’

‘ চুক্তিপত্র জমা দিন। আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।’আরফান হেসে একটা রিকশা ডাকল। নম্রতাকে রিকশায় উঠতে ইশারা দিয়ে একটা ফোন এটেন্ড করল। ফোন কিছুক্ষণ কথা বলার পর মুখটা কালো হয়ে গেল আরফানের। নম্রতার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে কিছু একটা

বলবে তার আগেই হাসল নম্রতা। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘ হঠাৎ কাজ পড়ে গিয়েছে? আচ্ছা, মন খারাপ করবেন না। আজ নাহয় আমি একাই ফুসকা খাই। এরপরের বার আপনি খাওয়াবেন। সাথে আইসক্রিম ফ্রী। মনে থাকবে?’

কথাটা বলে মিষ্টি হাসল নম্রতা। আরফান হাসল না। নম্রতার স্নিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সে। চাপা মন খারাপ নিয়ে বলল,

‘ মনে থাকবে।’

নম্রতা আবারও হাসল। আরফানের মুখে হাসি নেই। অতি সন্তপর্ণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপচাপ চেয়ে রইল প্রিয়তমার প্রিয় দুটো চোখে। নাদিমের যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে বারোটা কি একটা বাজে। হলের চেরচানা ঘরটাতে আলো-

আঁধারির খেলা। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বোজে পড়ে থাকার পর বিছানা হাতড়ে মুঠো ফোনটা উদ্ধার করল নাদিম। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে থাকা তারিখটা দেখেই ফট করে মনে পড়ে গেল, আজ তার মায়ের মৃত্যু দিন। ঠিক এই দিনটাতেই চোখের সামনে পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছিলেন মা। স্বেচ্ছা মৃত্যু অর্থাৎ আত্মহত্যা। গত নয় বছর ধরে ব্যাপারটা নিছক

আত্মহত্যা মনে হলেও আজ এই স্নিগ্ধ দুপুরে ব্যাপারটাকে নিছক আত্মহত্যা বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না।প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে হলেও বাবাকে এই মৃত্যুর পেছনে দায়ী করে মনটাকে বিষিয়ে দিতে ভালো লাগছে। নাদিমের বাবা আদিব ছিলেন ছন্নছাড়া ধাঁচের মানুষ। জীবনের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে বেঁচে থাকার স্বাদ আচ্ছাদনই ছিল

তার মূলমন্ত্র। নাদিম ভেবে পায় না, এমন একটা মানুষকে কি করে ভালোবাসার জালে আটকে ফেলল মা? সংসার নামক ভয়ানক জালে আটকে ফেলে, কিভাবে সেই মুক্ত ডানা কাটল? নাদিম উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল। জানালার পাল্লাটা খুলে দিয়ে বুক ভরে শ্বাস নিল। গাঢ় নীল আকাশের দিকে চেয়ে হুট করেই তার মনে হল, মা

আসলে পাখা কাটতে পারেনি। বাবার মুক্ত পাখা কেটে ফেলার ক্ষমতা হয়ত মায়ের ছিল না। আর ছিল না বলেই এমন ভয়াবহ পরিণতি হলো তাদের ভালোবাসার। নাদিমের মস্তিষ্কে 'ভালোবাসা' নামক শব্দটা বলের মত ঢপ খেতে লাগল। ঢিপ ঢিপ শব্দ তুলে আওড়াতে লাগল, ' ভালোবাসা', 'ভালোবাসা'। সত্যিই কী ছিল ভালোবাসা?ঘরের

ছোট্ট ড্রেসিং টেবিলটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে অন্তু। শার্টের কলারটা বিভিন্নভাবে টেনেও গলার দাগ ঢাকা যাচ্ছে না। শ্যামলা গায়ে গোল হয়ে ফুলে আছে টকটকে লাল দাগ। অন্তু বিরক্ত চোখে চেয়ে রইল। দাগ ঢাকার মতো কোনো সরঞ্জাম খুঁজে না পেয়ে নিজের উপরই চটে যাচ্ছে সে। সকাল সকাল এমন অপ্রত্যাশিত ফ্যাসাদ একদমই ভালো

লাগছে না। আয়নায় নিজের গলাটা খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে কিছু একটা ভাবল অন্তু। আলমারি থেকে শীতের চাদর বের করে গলায় পেঁচাল।অসন্তুষ্ট চোখে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়েই ঘরের বাইরে পা রাখল। খাওয়ার টেবিলে বসেই নীরার উপস্থিতি টের পেল অন্তু। খাওয়ার সময় অসচেতনভাবে দুই-একবার

চোখাচোখিও হল তাদের। প্রতিবারই অপরাধীর মতো চোখ আড়াল করল নীরা। খাবার সার্ভ করতে করতেই গালদুটো লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার। ভীষণ অস্বস্তিতে হাসফাস করে উঠল মন। ইশ! কি দরকার ছিল রাতে ওমন একটা কান্ড করার? অন্ত কি ভাবছে? অন্তর শীতল চাহনি দেখে গলা শুকিয়ে আসে নীরার। নিজের গালে ডজন

খানিক চড় বসানোর অদম্য ইচ্ছে দমন করে নিজের কাজে মন দেয়। শঙ্কিত মনের অশনি সতর্কবার্তায় বারবারই আঁতকে উঠে বলে, অন্তু যদি রেগে গিয়ে বাড়িতে আসা একেবারেই বন্ধ করে দেয়?গোধূলীর শেষ সময়টায় বারান্দায় বসে বই পড়ছিল নম্রতা। পাশের টেবিলে ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপ। নম্রতার একনিষ্ঠ মনোযোগের মাঝেই পাশে

এসে বসলেন নুরুল সাহেব। নম্রতা বই থেকে চোখ না তুলেই মৃদু আসল। মোলায়েম কণ্ঠে বলল,

‘ গুড আফটারনুন বাবা।’

‘ আফটারনুন মা। কি পড়ছিস?’

নম্রতা এবার চোখ তুলে তাকাল। বইটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। মৃদু হেসে বলল,

‘ তেমন কিছু নয় বাবা।’

‘ মন খারাপ?’নম্রতা হেসে মাথা নাড়ল। জবাবে মিষ্টি হাসি উপহার দিলেন নুরুল সাহেব। পকেট থেকে নীল রঙা খাম বের করে চায়ের কাপের পাশে রাখতে রাখতে বললেন,

‘ মন খারাপ না থাকাটা সুসংবাদ। মন খারাপ থাকাটা অতিশয় সুসংবাদ। একটু পর যে মন খারাপ

থাকবে না তা হবে অত্যধিক সুসংবাদ।'

নম্রতা বুঝতে না পেরে কপাল কুঁচকে তাকাল। টেবিলের উপর থাকা খামটির দিকে তাকিয়ে বলল, ' মানে? এটা কি বাবা?'নুরুল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। চশমাটা খুলে গ্লাস মুছতে মুছতে রহস্য করে বললেন, ' ডাক্তারকে বলে দিস সব বাসায় আমার মতো বাবা থাকে না। কিছু

কিছু বাসায় তোর মার মতো অত্যাচারী মহিলাও থাকেন। কবুতরটা আদৌ মালিকের কাছে পড়বে নাকি শিকারীর, কে জানে?’কথাটা বলে সকালের পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে বারান্দা ছাড়লেন নুরুল সাহেব। নম্রতা বাবার যাওয়ার পথে বোকার মতো চেয়ে থেকে খামটা তুলে নিল হাতে। খামটা উল্টেপাল্টে দেখতেই খামের

অপর পৃষ্ঠায় গুটি গুটি অক্ষরে 'আরফান আলম নিষ্প্রভ' নামটা দেখেই চমকে উঠল সে। কিছুক্ষণ হতভম্ব চোখে চেয়ে থাকার পর নিজের হাতেই চিমটি দিল নম্রতা। ' আরফান চিঠি পাঠিয়েছে' —- এই ছোট্ট বাক্যটা মস্তিষ্কে পৌঁছাতেই সারা গায়ে আনন্দের ঝড় উঠে গেল। প্রচন্ড উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল শরীর। বুকে ভর

করল প্রথমবার চিঠি পাওয়ার অনুভূতি। আহ্ কি সুখ!আকাশে ঝকঝকে রোদ। টিএসসির পরিচিত চায়ের দোকানে বসে আছে নাদিম। গায়ে ঘর্মাক্ত টিশার্ট। পিঠে গিটার। ডানহাতে ধোঁয়া উঠা গরম চায়ের কাপ। এক ঝাঁক উত্তপ্ত রোদ এসে পড়ছে পায়ের খুব কাছে। কপালে চটচটে ঘামের আভাস। এমন অস্বস্তিকর পরিবেশে, খুব আয়েশ

করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে নাদিম। কুঁচকে থাকা ভ্রু জোড়াতে বিরক্তি নেই। নেই কোনো আড়ষ্টতা। মুখোমুখি সামনের বেঞ্চিটিতে বসে আছেন ধবধবে সাদা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিহিতা এক ভদ্রলোক। মুখের গড়ন শক্তপোক্ত। ঠোঁটদুটো পানের রসে লাল। টকটকে ফর্সা কপালটা কুঁচকানো। চোখ দুটোতে বিরক্ত আর দ্বিধার দ্বৈত টানাপোড়েন।

মকবুল সাহেব চায়ের কাপটা পাশে রাখলেন। তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বললেন,

‘ আমি মকবুল নিজে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।এর পেছনের কারণ কী তুমি অনুমান করতে পারো?’

নাদিম চোখ তুলে তাকাল। কুঁচকানো ভ্রু জোড়া শিথিল হলো। হালকা কণ্ঠে বলল,

‘ জি না।’মকবুল সাহেব হাসলেন। পানের রসে লাল হয়ে থাকা এক পাটি দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠল মুহূর্তেই। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চাকর শ্রেণীর লোকটি পানের খিলি এগিয়ে দিতেই নতুন খিলি মুখে পুরলেন। হাসি হাসি মুখে পান চিবুলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব হেসে, মুখ ভর্তি পানের রস নিয়েই কথা বললেন,

‘ মিথ্যা। মকবুলের সাথে মিথ্যা বলে লাভ নেই। মানুষ দেখেই নাড়ি-নক্ষত্র বুঝে ফেলার ক্ষমতা আমার আছে। আর মানুষ দেখে মনের কথা আঁচ করে ফেলার ক্ষমতা বোধহয় তোমারও খানিক আছে। আছে না?’

নাদিম উত্তর দিল না। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল। মকবুল সাহেব এক দলা থুতু ফেলে রুমালে মুখ মুছলেন। পানের রসে

লাল হয়ে যাওয়া ধবধবে সাদা রুমালটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে হাসলেন।‘ তুমি খুব ভালো করে জানো, আমি কেন এসেছি? জানো না?’

নাদিম তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। হেসে বলল,

‘ হয়ত জানি। খানিকটা অনুমানও করতে পারছি। কিন্তু আপনার

মেয়ের সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ আমার নেই।’

মকবুল সাহেব অবাক হলেন। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে থেকে নিজের মনে আওড়ালেন,

‘ আমার মেয়ে!’

‘ কেন? মিষ্টি কি আপনার মেয়ে নয়? মিষ্টির উপর অধিকার আইনত আপনারই বেশি। আমি বা আমরা কেউ নই। কেউ না।’

মকবুল সাহেব জবাব দিলেন না। নাদিমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শক্ত কণ্ঠে বললেন,‘ তুমি কি আমায় ওভারটেক করার চেষ্টা করছ? এসব খেলায় পুরাতন খেলোয়াড় আমি। আমার সাথে খেলতে আসবে না। মিষ্টিকে লেলিয়ে দিয়ে আমার সামনে ভালো সাজার চেষ্টা চালাচ্ছ!’

নাদিম হেসে ফেলল। বিচিত্র ভঙ্গিতে সিগারেটের অবশিষ্ট ছাই টুকু ফেলে নিয়ে বলল,

‘ মিষ্টি আমার কাছে আসতে চায়। আমার সাথে থাকতে চায়। কিন্তু আমি নই। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। আমাদের পারিবারিক হিস্ট্রি সম্পর্কে খোঁজ না নিয়ে বসে থাকার কথা নয়। মিষ্টির প্রতি আমার শূন্য অনুভূতির খোঁজটাও আপনার জানা।

তবুও আপনার মনে হয়, আমি মিষ্টিকে লেলিয়ে দিচ্ছি? আশ্চর্য!’

‘ মিষ্টির প্রতি শূন্য নয়, তোমার সুপ্ত অনুভূতির কথাও আমার জানা। মিষ্টিকে তুমি আগলে রাখতে চাও। আর আগলে রাখার জন্যই তাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও। মনে রেখো, মকবুল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়।’

নাদিমের চোখ-মুখে গম্ভীরতার ছাপ পড়ল। ভীষণ গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ আপনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত খারাপ একজন ব্যক্তি মকবুল সাহেব। মিষ্টির ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন ছিল বলেই হয়ত তারওপর কন্যাস্নেহ কাজ করেছে আপনার। নয়ত, এতোদিনে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বিলাসবহুল বিছানাগুলোতে শোভা পেত সে।

কিন্তু তা হয়নি। হয়েছে তার উল্টো। কিন্তু এমনটা কেন হলো?’

মকবুল সাহেব উত্তর দিলেন না। তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে রইলেন। নাদিম নতুন একটা সিগারেট ধরাল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,‘ আমার ভাবনা ঠিক হলে, আপনি ব্যক্তিগত জীবনে খুব একা মকবুল সাহেব। সমাজের নিকৃষ্ট মানুষগুলো যেমন একা হয়, ঠিক তেমনই। মিষ্টি

জন্ম দুঃখী মেয়ে। আর খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, আপনার জন্মের ইতিহাসটাও খুব একটা সুখকর নয়। মিষ্টি আর আপনার জীবনের সূচনাটা একই। মিষ্টির প্রতি আপনার আলাদা মায়া জাগার খুব বড় একটি কারণ হলো, তার জন্ম ইতিহাস। দ্বিতীয় কারণটি হয়ত তার নিষ্পাপ মুখশ্রী। আপনি এই মধ্যবয়সে এসে হঠাৎ উপলব্ধি

করছেন, এই পৃথিবীতে আপনি একা। ভালোবাসার মতো, ভরসা করার মতো নিজের কেউ নেই বলেই মিষ্টিকে আপনার চায়। মিষ্টিও আপনার মতোই একা। ভালোবাসার ক্ষমতাও তার প্রচন্ড। এ সকল কারণেই মিষ্টির প্রতি পিতৃস্নেহ কাজ করে আপনার। তারওপর সম্পত্তির যথার্থ উত্তরাধিকারীও প্রয়োজন। আমি কী ঠিক বললাম মকবুল

সাহেব?’এটুকু বলে থামল নাদিম। মকবুল সাহেবের দিকে পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। মকবুল সাহেবের মুখ থমথমে। মনের সুপ্ত গহ্বরে লুকিয়ে রাখা সত্যগুলো অবলীলায় প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় তিনি বিরক্ত এবং শঙ্কিত। কী করে প্রকাশ পেল এই অপ্রকাশিত সত্য? কী করে জানল নাদিম? ছেলেটা কী সর্বজান্তা? নাকি কোনো মাইন্ড

রিডার? মনের ভয় আর গোপনীতাগুলো চট করে ধরে ফেলার গুণটা কী তার ঈশ্বর প্রদত্ত? নাদিম মৃদু হেসে বলল,‘ আপনি মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট হলেও বাবা হিসেবে দূর্দান্ত মকবুল সাহেব। আমার বাবার থেকে তো ঢের ভালো। প্রত্যেকটা মানুষের মাঝেই কিছু নেগেটিভিটি আছে। আপনি মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট। আর আমার

বাবা মানুষ হিসেবে আদর্শ হলেও বাবা হিসেবে ছিলেন নিকৃষ্ট। তিনি বাবা হওয়ার অসাধারণ অনুভূতিটাকে কখনোই অসাধারণ কিছু মনে করতে পারেননি। তার ধারণা ছিল, আমার সন্তান বলে কোনো ব্যাপার এই পৃথিবীতে নেই। পুরো জন্ম পদ্ধতিটাতে নর-নারীর উপস্থিতিটা একটি মাধ্যম ব্যতীত অন্যকিছু নয়।’

এটুকু বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাদিম। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,' আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব সম্পর্ক টম্পর্কগুলোতে বিশ্বাস রাখি না মকবুল সাহেব। ভাই হিসেবেও খুব একটা প্রসংশার দাবীদার নই। বোনের জন্য আকুলি-বিকুলি অনুভূতিও নেই। আপনাকে এই

মুহূর্তে ভীষণ ফাদার ম্যাটারিয়াল পার্সোন বলে মনে হচ্ছে মকবুল সাহেব। সত্যিকারের বাবার মতোই অসহায়। আপনার চোখ বলছে, মিষ্টি ভালো থাকবে। এতটুকুই এনাফ। কোন দুনিয়ায় থাকছে। কার সাথে থাকছে তা নিয়ে ভাবার সময় আমার নেই। তার সাথে দ্বিতীয়বার দেখা করার ইচ্ছেও আমার নেই। আপনি চাইলেই সত্যটা প্রকাশ করতে

পারেন। ভাইয়ের নামে মিথ্যে কিছু ঘটনাও রটাতে পারেন। মিষ্টির মনটা ভাইয়ের প্রতি বিষিয়েও দিতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

নাদিমের ভাবলেশহীন কথায় হতভম্ব চোখে চেয়ে রইলেন মকবুল সাহেব। নাদিমকে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে না পেরে হতবিহ্বল ভঙ্গিতে বসে রইলেন। বিস্ময় নিয়ে বললেন,' তুমি

মিষ্টিকে সত্যিটা জানাতে চাও? যদি জানাতেই চাও তবে সেদিন কেন বলোনি?'

নাদিম স্নিগ্ধ চোখে তাকাল। মনের কোথাও একটা হুহু করে উঠে বলল, ' রক্তের টান বড় শক্ত টান মকবুল সাহেব। এই টান ছিঁড়ার সাহস সবার নেই। বোনের ছলছলে দাবীর মুখে তিক্ততা ঢালার সাহস হয়ত পৃথিবীর কোনো ভাইয়ের বুকেই হয়

না। কখনও না।' নাদিম থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বিরবির করে বলে উঠলেন মকবুল সাহেব, ' মিষ্টিকে বুঝানো সহজ হবে না। তুমি বুঝতে পারছ না, আল্লাহর পর ভাইকে ছাড়া আর কাউকেই বোধহয় সে এতটা বিশ্বাস করে না। কাছাকাছি না থেকেও কিভাবে তৈরি হলো এই টান!'

নাদিম হতাশ নিঃশ্বাস ফেলল। চোখের সামনে ভেসে উঠল, ছোট্টবেলার এক গ্রীষ্মকাল। রৌদ্রতপ্ত উঠোনের কোণে ভাই নেউটা মিষ্টির বিস্মিত দুটো চোখ। ভাইয়ের কথা অকাতরে বিশ্বাস করে নেওয়া সরল একটি মন।'যাও পাখি বলো হওয়া ছল ছল

অবছায়া জানালার কাচ

আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাঁকে

রূপকথা আনাচ-কানাচ।’নন্দিতার গুনগুন কণ্ঠ হাওয়ার তালে ভাসছে। রাতের ঝিমঝিম শব্দের সাথে চাপা গুঞ্জনের মতোই আঘাত হানছে পর্দায়। নম্রতা জানালার গায়ে ঠেস দিয়ে কান পাতল। মেয়েটির গলা ভারি মিষ্টি। হুটহাট গুনগুনিয়ে গাওয়া গানগুলো শোনায় চমৎকার। নন্দিতা বারান্দা ধরে পায়চারি করছে। বইটা মুখের সামনে ধরে

মনের সুখে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। নম্রতা জানে এই গানের আয়ু সীমিত। কিছুক্ষণের মাঝেই মায়ের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘেটে যাবে এই সুর। থমথমে পরিবেশটা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। নন্দিতার ফ্যাচফ্যাচে কান্নার আওয়াজে ভরে উঠবে বাতাস। নাক টেনে টেনে দুই-তিন লাইন পড়ার শব্দ আসবে। তারপর আবারও গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠবে নন্দিতা, যাও

পাখি বল হাওয়া ছল ছল।' অন্য কোনো গানও গাইতে পারে। একই গান বারবার রিপিট করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। নন্দিতা পরবর্তীতে কি গান গাইবে ভাবতে চেষ্টা করল নম্রতা। ভাবনা ঠিকঠাক হলো না। টেবিলের উপর নীল খামে মোড়ানো চিঠিটা মন-মস্তিষ্ককে চুম্বকের মতো টানছে। ভাবনাসমূহে মনোযোগ দেওয়া যাচ্ছে

না। টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তেও ইচ্ছে করছে না। চিঠির জন্য চাপা উত্তেজনা, তীব্র অপেক্ষাটা ভীষণ মিষ্টি ঠেকছে। চিঠিতে কি লেখা থাকতে পারে তা নিয়ে নানান ভাবনা ভাবতেও ভালো লাগছে। চিঠির সেই পুরাতন 'সে' কে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছে। কম্পিত হৃদপিণ্ডে প্রেমানুভূতিটা তরতর করে বাড়তেই অদ্ভুত এক ঘোর আষ্টেপৃষ্ঠে

ধরছে শরীর। নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ধীর হাতে তুলে নিল নীলাভ খাম। কম্পিত হাতে চিঠিটা খুলতেই চোখে ভাসল চির পরিচিত গুটিগুটি অক্ষর,' ভালোবাসা! আজকাল ভালোবাসা শব্দটা বড় বেশি জ্বালাচ্ছে শ্যামলতা। বুকের ভেতর ধুকপুক করতে থাকা হৃদপিণ্ডটা বারবার জানান দিচ্ছে, আমি তাকে ভালোবাসি। আমার ব্যস্ত দিন, ব্যস্ত

রাত, তার ব্যস্ত অভিমানে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ একা হয়ে উঠছি। সেই একা, নিঃসঙ্গ জগতে স্বপ্নময়ী হয়ে ধরা দিচ্ছ তুমি। তোমাকে পাওয়ার ব্যস্ততায় দিনকে দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। হাজারও ব্যস্ততার মাঝেও হঠাৎ ভীষণ কৃপণের মতো বুকে চাপা দিতে চাচ্ছি আমার সম্পদ। অন্যমনস্ক মন কাজ-কর্ম ফেলে শিশুসুলভ অভিমানে

বিদ্রোহ করছে। অন্যের প্রতি তোমার হালকা সজাগ দৃষ্টিতেই ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছি। তোমাকে দুমড়ে-মুচড়ে বুকের নিষিদ্ধ কোনো প্রকোষ্ঠে বন্ধী করার তীব্র ইচ্ছে বহন করছি প্রতিটি রক্তকণায়। ইশ! এত হিংসুটে কবে হলাম আমি?... 'নম্রতা চিঠিটা ভাজ করে খামে পুরল। বাকিটা সে পড়বে না। আরফানের অনুভূতির পাগলামো শুনে গলে

গেলে তো চলবে না। এতোদিনের জমানো অভিমান ভাসিয়ে দিলেও চলবে না। সে শক্ত থাকবে। আরফান যদি তার ব্যস্ততা নিয়েই ভালো থাকে তবে নম্রতাও ব্যস্ত থাকবে। আরফান তাকে অবহেলা করলে সে-ও করবে। কি এত দায় তার? কেন বারবার তাকেই এত এগুতে হবে? সব অপেক্ষা শুধু তারই কেন? করবে না সে অপেক্ষা।

চিঠিও পড়বে না। সপ্তাহে দু'দিন যার ফোন করার সময় হয় না তার আবার ভালোবাসা কিসের? নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বসে রইল। হাতে থাকা চিঠিটা গভীর আবেগে চেপে ধরল বুকে। মনের সুপ্ত কোনো প্রকোষ্ঠ দড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, 'তার প্রতি অভিমান নিয়ে বাঁচা যে বড় কষ্ট শ্যামলতা। বড় কষ্ট!'ঘড়ির কাটা দশটা পাঁচে গড়াতেই ঘড়ি

থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল আরফান। স্টিয়ারিং হুইলে ডানহাত রেখে বামহাতে দরজা খুলল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ পুরোপুরি পয়ত্রিশ মিনিট লেইট। তুমি বলেছিলে, তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছ। বাড়ি ফেরার চিন্তায় অলমোস্ট মারা যাচ্ছ। একসাথে এতগুলো মিথ্যা!’

নিদ্রা মিষ্টি হাসল। শপিং ব্যাগগুলো পেছনের সিটে ছড়িয়ে রেখে সীটবেল্ট বাঁধল। আরফানের দিকে চেয়ে অমায়িক কণ্ঠে বলল,

‘ দেট ওয়াজ আ পানিশমেন্ট। তুমি ছোড়াছুড়িকে লাঞ্চের দাওয়াতে আনবে বলেছিলে, আনোনি। মা আর আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিলে, দাওনি। মোস্ট ইম্পোর্টেন্ট

টপিক, তুমি বলেছিলে ফটাফট বিয়ে করে ফেলবে, করোনি।'

আরফান হাসল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,' এতো রাতে একা শপিং-এ আসাটা বোধহয় তোমার উচিত হয়নি নিদু।'

' ঠিক বলেছ, উচিত হয়নি। কিন্তু হিউম্যান সাইকোলজি কি বলে জানো? হিউম্যান সাইকোলজি বলে, মানুষ তার জীবনে উচিতের থেকে

অনুচিত কাজগুলোই করে বেশি। তারা যে কাজগুলো না-জেনে করে এমনটা নয়। তারা জানে, বুঝে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে অনুচিত কাজটা বেছে নেয়। যেমনটা তুমি করছ।'

আরফান প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল। নিদ্রা হতাশ কণ্ঠে বলল,' তোমার উচিত ফটাফট বিয়ে করে ফেলা। কিন্তু তুমি তা করছ না। বিয়ে না করে ডেটিং ফেটিং-এ যাচ্ছ।

ছোড়াছুড়িকে চুমু টুমু খেয়ে ফেলছ। কাজটা অনুচিত। আমি আর মা হতাশ।’

আরফান যেন বিষম খেলো। আকাশসম বিস্ময় নিয়ে নিদ্রার দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বলল,

‘ কি বলছ!’নিদ্রা গম্ভীর মুখে বসে রইল। আরফান অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ গিভ মি আ গ্রেট প্ল্যান। সে আমার ফোন রিসিভ করছে না। তার নাকি ভীষণ ব্যস্ততা। আমার সাথে কথা টথা বলার সময় নেই। আমি চাইলে তার বাবার সাথে কথা বলতে পারি। কি আশ্চর্য! প্রেম কি আমি তার বাবার সাথে করি নাকি?’

নিদ্রা ভাইয়ের দিকে তাকাল। হুহা করে হেসে উঠে বলল,

‘ শ্বশুরের সাথে প্রেম! কোয়াইট ইন্টারেস্টিং!’

আরফান হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আচ্ছা? এই জ্বালাময় মেয়েটিকে কি কিডন্যাপ করা যায় না?নীরা আজ শাড়ি পরেছে। হালকা নীল রঙের উপর সাদা সুতোর কাজ করা সুতি একটি শাড়ি। মুখে কোনো সাজগোজ নেই। প্রসাধনীহীন স্বচ্ছ মুখটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।

টেবিলে খাবার দেওয়ার সময় অয়ন চমকে উঠে বলেছে, ‘নীরাপু? তোমাকে তো একদম পরীদের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে।’ নীরা শুধু এক টুকরো হাসি ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। মনটা ভালো ছিল না তার। অন্তু বাড়ি ফিরবে-কি-ফিরবে না তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির ছিল সে। ঠিকমতো খাওয়াও হয়নি। অন্তু যদি সত্যিই না ফেরে? কিন্তু অন্তু ফিরল। ঘড়িতে

এগারোটা বাজার আগেই বাড়িতে দেখা গেল তাকে। নীরাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রাতের খাবার খেল। নীরা ঘরে ফেরার আগেই বইয়ে মুখ গুজে বসে রইল।নীরা নামক প্রাণী আদৌ এই ঘরটিতে আছে কি-না তা যেন বেমালুম ভুলে গেল সে। নীরা বিছানায় গিয়ে বসল। শাড়ির আঁচলে মুখের ঘামটা মুছে নিতেই অদ্ভুত কষ্টে বুক ভার হয়ে এলো তার।

ভার্সিটির কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি পরলেই হা করে চেয়ে থাকত অন্তু। নাদিম-রঞ্জন এতো মজা নিত তবুও দৃষ্টি সরতো না তার। নীরার হাজার গালি শুনেও মোহাচ্ছন্ন হাসি দিয়ে বলত, ‘ কি লাগছিস মাইরি!’ তাহলে আজ কেন চোখ তুলে তাকাল না অন্তু? সেই মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি কোথায় হারাল? সেই সকল বেপরোয়া, বেসামাল কথার মানুষটি কিভাবে

এত গম্ভীর হলো? তবে কি নীরা আর আগের মতো নেই? অন্তুকে আকর্ষণ করার শক্তি কি তার নিঃশেষ? নীরার হঠাৎই মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। এক ছুটে মায়ের কোলে মাথা রাখতে মন চাইল। জীবনের সব দুঃখগুলো বিছিয়ে বিছিয়ে বলতে মন চাইল। কে শুনবে তার দুঃখমালার কথা? কথাগুলো ভাবতেই স্থান-কাল ভুলে ফুপিয়ে

উঠল নীরা। অন্তু ঘাড় ফিরিয়ে অবাক চোখে তাকাল। ভ্রু-কপাল কুঁচকে নীরাকে পর্যবেক্ষণ করল। নীরবতা ভেঙে গম্ভীর কন্ঠে বলল,' কি সমস্যা? কান্নাকাটির কি হলো?' হঠাৎ অন্তুর কন্ঠে চমকে উঠল নীরা। কান্না বন্ধ হয়ে গেল। ভেজা চোখে অন্তুর কুঞ্চিত কপালের দিকে তাকাল। অন্তু কি বিরক্ত হলো? পরমুহূর্তেই অন্তুর চোখ দুটোতে

চোখ পড়ল নীরার। সাথে সাথেই কান্নার বেগ বেড়ে গেল তার। কেন নেই ওই চোখে মুগ্ধতা? কেন থাকবে না? নীরার হঠাৎ কান্নায় হতভম্ব হয়ে পড়ল অন্ত। বিস্মিত চোখে চেয়ে থেকে বলল,

‘ সমস্যাটা কি?’‘ সমস্যাটা কি?’

অন্তর প্রশ্নে মাথা নিচু করল নীরা। বাঁধ ভাঙা কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠে বলল,

‘ মাকে মনে পড়ছে।’

নীরার উত্তরে হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল অন্তু। এতো বড় মেয়ে মায়ের জন্য কাঁদছে? আশ্চর্য! নীরাকে কখনোই মা নেউটা বলে মনে হয়নি অন্তুর। সব সময় হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করেছে সে। মাসের পর মাস বাড়িমুখো হতেও দেখা যায়নি তাকে। অন্তু শান্ত দৃষ্টিতে নীরার কান্না দেখল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎই প্রশ্ন করল,

‘ কেউ কিছু বলেছে?’

নীরা চোখ তুলে তাকাল। ভেজা চোখদুটোতে একঝাঁক প্রশ্ন নিয়ে বলল,‘ হু?’

অন্ত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। বইটা বন্ধ করে নীরার দিকে ফিরে বসল। নরম কণ্ঠে বলল,

‘ আব্বা-আম্মা কিছু বলেছে? বকাঝকা করেছে?’

অন্তুর প্রশ্রয় মাখা কণ্ঠে কান্নার বেগ যেন বেড়ে গেল নীরার। ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকিয়ে মাথা নুইয়ে অসম্মতি জানাল। ছোট্ট করে বলল,

‘ না।’

‘ তাহলে হঠাৎ কান্নাকাটি কেন?’

নীরা জবাব দিল না। অন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ এতো রাতে রূপগঞ্জ যাওয়া সম্ভব নয়। সবচেয়ে সম্ভবপর কাজ হলো ঘুমিয়ে পড়া। আলো জ্বালিয়ে ঘুমের অসুবিধা করব না। আমি বাইরে যাচ্ছি।’

কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াতেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল নীরা,‘ বাইরে কোথায়?’

অন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অন্তুকে কপাল কুঁচকে চেয়ে থাকতে দেখেই

থতমত খেয়ে গেল নীরা। ডানহাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে মাথা নোয়াল। ভারি অসহায় কণ্ঠে বলল,

‘ আমার একা থাকতে ভয় লাগছে।’

অন্তু জবাব দিল না। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ চেয়ে থেকে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বিছানায় এসে বসল। শার্ট পাল্টে টি-শার্ট পরল। টেবিলের উপর থেকে পানির গ্লাসটা তুলে

নিয়ে গলা ভেজাল। তারপর বিছানা ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা খানিক ভেজিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল। নীরা বেশ কিছুক্ষণ ভেজানো দরজার দিকে চেয়ে থেকে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পড়ল খাটে। অন্তুর মতো একহাত কপালে রেখে অন্যহাতে শাড়ির আঁচল খামচে ধরে চোখ বন্ধ করল। সাথে সাথেই চোখের কোণ বেয়ে

গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। এই প্রেমপিপাসু, জন্ম দুঃখিনী রমণী জানতেই পারল না গভীর রাতে জানালার ওপাশ থেকে এক জোড়া মুগ্ধ চোখ ঘুরাফেরা করছিল তারই অঙ্গজুড়ে। শাড়ির ভাজে ভাজে থাকা প্রতিটি কার্ভের গভীরতা মাপতে মাপতেই ছাড়ছিল রাশি রাশি ধোঁয়ার বহর।রাত একটা। শব্দহীন এয়ারকন্ডিশনে হিমশীতল ঘরের

পরিবেশ। দেয়ালে টাঙানো বিশাল টেলিভিশনের স্ক্রিনে বন্ধুদের ছবি ভাসছে। একের পর এক অগোছালো ছবি। পাশের সাউন্ডবক্স থেকে বাজছে মাইক শিনোদার গাওয়া প্রিয় একটি গান। মেঝেতে মাথা রেখে বিছানার উপর পা তুলে দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল ছোঁয়া। মাথার পাশেই ধোঁয়া উঠা গরম কফির কাপ। চারপাশে ম্যাগাজিন আর

বইয়ের ছড়াছড়ি। ঘরের আলো নেভানো। টেলিভিশনের মৃদু আলো এসে পড়ছে ছোঁয়ার মোমের মতো সাদা গায়ে। ছোঁয়া পা নাচাতে নাচাতে গানের সাথে ঠোঁট মেলানোর চেষ্টা চালাল,‘ Looking for, trying to open doors.

Ringing bells, sending them to hell.

Or sitting by my side, expecting no surprise.
When it's about love, nothing will work....'
ছোঁয়া হঠাৎ উঠে বসল। রিমোটের বোতাম টিপে গান বন্ধ করল। জীবনে প্রথমবারের মতো প্রিয় গানটাকে বিরক্তিকর, অর্থহীন বলে বোধ হলো তার। কি ভেবে, ইংরেজি গান পাল্টে বাংলা গান চালাল।

নিস্তব্ধ রাতে এই প্রথমবারের মতো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হল ছোঁয়া। গানের কথাগুলো আনমনেই গুনগুন করতে লাগল মনে,' চঞ্চল মন আনমনা হয় যে তার ছোয়া লাগে
ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখি যেন.......... '
ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। জানালার ভারী পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে তারা ভরা

আকাশের দিকে তাকাল। আচ্ছা? অস্ট্রেলিয়ার আকাশেও কি এমনই তারা হয়? তার দেশের মতোই এতোটা আপন আর নিজস্ব লাগে সব? উত্তরহীন মন নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ছোঁয়া। পর্দাটা আবারও টেনে দিয়ে চোখ ফিরিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় তাকায়। মাম্মার কথামতো, আজ ছোঁয়ার মনটা দূর্দান্ত ভালো থাকার কথা। কিন্তু ছোঁয়ার

মনটা ভালো থাকছে না। মন ভালো থাকার মতো আহামরি কিছু খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়ান মিষ্টার পার্ফেক্টের সাথে ঘন্টাময় কথা বলেও আলাদা কোনো অনুভূতি তার হয়নি। লোকটির সুন্দর মুখশ্রী, ভদ্র ব্যবহার, পার্ফেক্ট সেন্স অব হিউমার তাকে মুগ্ধ করেনি। এই লোকটিকে সে বিয়ে করতে চলেছে বলে আলাদা উত্তেজনাও তার হয়নি।

সবকিছু খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে। যতটা স্বাভাবিক নতুন কোনো ড্রেস পেলে হয় ঠিক ততটা স্বাভাবিক। বিশেষ কিছু নয়। ছোঁয়া টেলিভিশন বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। চোখ বন্ধ করে সাইম নামক ছেলেটিকে ভাবতে চেষ্টা করল। চেষ্টা সফল হলো না। সাইমের জায়গায় রিসেন্টলি পড়া বইটির ছবি ভেসে উঠল চোখে। ছোঁয়া আবারও চেষ্টা

করল এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, সাইমের চেহারাটা তার মনে পড়ছে না।কি আশ্চর্য! যার সাথে আজ বাদে কাল বিয়ে তার চেহারাটাই ভুলে গেল ছোঁয়া? বিরক্তিতে চোখ মেলে তাকাল ছোঁয়া। মাম্মা বলেছিল, সাইমকে নিয়ে ভাবলেই সফ্ট কর্ণার তৈরি হবে। সাইম দারুণ একটি ছেলে। ছোঁয়ার উচিত এই দারুণ ছেলেটির

প্রেমে পড়ে যাওয়া। বিয়ের আগেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্ট্রং করা। কিন্তু এমন কিছুই তো হচ্ছে না। ছোঁয়া চেষ্টা করেও প্রেমে পড়তে পারছে না। প্রেমে পড়ার মতো কঠিন কাজটা নমু আর নীরু কি করে করে ফেলল সেটাও বুঝতে পারছে না। ছোঁয়ার কি কিছু টিপস নেওয়া উচিত?দিনের শেষ ক্লাসটা শেষ করে বেরিয়ে এসেছে নম্রতা। পাশাপাশি

হাঁটছে ছোঁয়া আর নীরা। তিন জোড়া পা একই তালে এগিয়ে গেলেও চোখ-মুখে নিস্পৃহ ভাব। কোথাও একটা সুর কাটার ছাপ। ডিপার্টমেন্ট থেকে বটতলা পর্যন্ত একদম নীরব হেঁটে গেল তারা। কারো মুখে কথা নেই। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ভুবনে ব্যস্ত। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েই বিদায় নিল ছোঁয়া। ছোঁয়াকে বিদায় দিয়েই নীরবতা ভাঙার চেষ্টা

করল নম্রতা। হালকা হেসে বলল,‘ অন্তু কি জাদু করেছে বলো না? আমাদের ফোন তুমি কেন রিসিভ করো না?’

নীরা তাকাল। এক গাল হেসে বলল, ‘ ফোন রিসিভ করার জন্য তো ফোনটা হাতের কাছে থাকতে হবে নাকি? আমার ফোনেরই কোনো খোঁজখবর থাকে না।’

‘ থাকবে কিভাবে? দিন-রাত প্রেমিক স্বামীর চোখে ডুবে থাকলে ফোন কেন? দুনিয়ার খোঁজ-খবর না থাকাও আশ্চর্যের কিছু নয়।’

নীরা শুকনো হাসল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ তুই হঠাৎ হল ছেড়ে দিলি কেন? হলে সীট থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ধানমন্ডি টু শাহবাগ জার্নি করার মানে হয় কোনো?’

নম্রতা ঠোঁট উল্টে বলল,‘ তোকে ছাড়া হলে টলে থাকতে ভালো লাগে না দোস্ত। কেমন একা একা লাগে। তার থেকে ধানমন্ডি থাকাই ভালো। তুইও ধানমন্ডি, আমিও ধানমন্ডি। আর মজার ব্যাপার হলো, আমার ডাক্তারের বাড়িও ধানমন্ডি। আহা! খাপে খাপ।’

কথাটা বলে চোখ টিপল নম্রতা। নম্রতার কথার ধরনে হেসে ফেলল

নীরা। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। কনে দেখা হলদেটে আলোয় ভরে উঠেছে চারপাশ। নম্রতা অনুযোগের সুরে বলল,' বিয়ের পর তুই যেন কেমন হয়ে গিয়েছিস নীরু। আমি তোকে আমার দিকটা শেয়ার করলেও তুই তোর দিকটা শেয়ার করিস না। আগে তো করতিই না। এখন আরও

না। অন্তু আর তোর সম্পর্ক ঠিক যাচ্ছে তো?'

নম্রতার কণ্ঠে দুশ্চিন্তার আভাস পেয়ে হাসল নীরা। হাসি হাসি মুখে বলল,

' আরে ধূর! শেয়ার করার মতো কিছু থাকলে তো শেয়ার করব নাকি? তাছাড়া আমি যে একটু ইন্ট্রোভার্ট তা তো তুই জানিসই। ওসব ছাড়, আমি ভাবছি অন্য কথা।'

কথা বলতে বলতেই ক্যাফেটেরিয়াতে গিয়ে বসল ওরা। দুই প্লেট সিঙ্গাড়া আর চা অর্ডার দিয়ে ভ্রু কুঁচকাল নম্রতা। আগ্রহ নিয়ে বলল,‘ কি কথা?’

‘ হুট করে ছোঁয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়াটা কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার। মনটাও খারাপ লাগছে। বিয়ের পর নাকি অস্ট্রেলিয়াতেই স্যাটেল হবে ছোঁয়া? মিস করব খুব।

আংকেল-আন্টি এখনই বিয়ে দেওয়ার জন্য লাফালাফি করছে কেন বল তো? একটা মাত্র মেয়ে। আমাদের মতো হা-ভাতে অবস্থা তো ওদের নয়। তাহলে সমস্যাটা কি?’

নম্রতা সিঙ্গাড়ার প্লেটটা এগিয়ে নিতে নিতে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। টেবিলের উপর খানিকটা ঝুঁকে পড়ে ষড়যন্ত্রের মতো ফিসফিস করে বলল,

‘ সমস্যাটা হলো সিঁথি আন্টির মাথা। বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলে মস্তিষ্ক।’ নীরা বুঝতে না পেরে চোখ ছোট ছোট করে তাকাল। থতমত খেয়ে বলল,

‘ মানে?’

নম্রতা সোজা হয়ে বসল। সিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়ে বিজ্ঞদের মতো বলল,

‘ মানেটা পানির মতো পরিষ্কার। আমার ধারণা, এই মহিলার মাথা

নষ্ট। আই মিন, মস্তিষ্ক। তোর বিয়েতে একটা শাড়ি পরা নিয়ে হাজারটা কান্ড করেছে এই মহিলা। এখনও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। আমার কি মনে হয় জানিস?’

নীরা ভ্রু কুঁচকাল,‘ কি?’

নম্রতা ঘাড়টা খানিক নুইয়ে এনে টেবিলের উপর ঝুঁকল। ফিসফিস করে বলল,

‘ বিয়ের পর বেবি প্ল্যানিং-এর কাজটাও বোধহয় এই মহিলায় করবে। তুই ভেবে দেখ, সিঁথি আন্টির জন্য অসম্ভব কিছু নয়। কদাপি আশ্চর্যজনক নহে!’

কথাটা বলে হেসে ফেলল নম্রতা। নীরা কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল,

‘ ছিঃ! দিন দিন ভীষণ বেয়াদব হচ্ছিস নমু। ডাক্তার সাহেব এসবের ঔষধ দিচ্ছে নাকি আজকাল?’

নম্রতা দাঁত বের করে হাসল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চকচকে দৃষ্টিতে তাকাল। দুষ্টুমি করে বলল,

‘ আমাকে ঔষধ দেওয়া এই ডাক্তারের কর্ম নয় বস। বেচারা আজকাল নিম পাতার গুণাবলি দেখতে দেখতেই অস্থির।” ভীষণ জ্বালাচ্ছিস মনে হয়?’

‘ তা একটু জ্বালাচ্ছি। বেশ কিছুদিন যাবৎ ফোন টোন ধরা হচ্ছে না।

ঘোষণা করা হয়েছে, মিষ্টি মিষ্টি গল্প করতে হলে বাবার সাথে করুন, আমার ব্যস্ততা আপাতত কমছে না।'

নীরা খিলখিল করে হেসে উঠল। অনেকদিন বাদে নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকে গেল নীরা। নীরাকে হাসতে দেখে নিজেও হাসল নম্রতা। ঠোঁটে হাসি রেখেই বলল,

' ডাক্তাররা যে এমন গাধার মতো খাটে তা ডাক্তারের সাথে প্রেম না

হলে জানতেই পারতাম না। সারাদিন ব্যস্ততা আর ব্যস্ততা। আমার থাকা-না-থাকার কোনো গুরুত্ব আছে বলেই মনে হয় না। মাঝে মাঝে সপ্তাহেও খোঁজ খবর নেয় না। আর যখন নেয় তখন তার পাগলামো অস্থিরতা।'

নম্রতার নিরন্তর ছুটে চলা ঠোঁটের দিকে চেয়ে শুকনো হাসল নীরা। বুকের ভেতর জমে উঠা কষ্ট কষ্ট

ভাবটা আরও একটু ভারী হতেই বিরবির করল,‘ সুখ চামচটা মুখে নিয়ে জন্মেছিস তুই নম্রতা। সুখের চাদরে মোড়ে আছিস বলেই হয়ত জানিস না, প্রেমিকের সীমাহীন ভালোবাসা পেয়েও দুঃখ করা সাজে না। সবার কপালে এই সুখটুকুও জুটে না। এটা কে ঠিক অবহেলা বলা চলে না। অবহেলার মতো তীব্র

ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা সবার হয় না।’

নম্রতার ফোনে ঘন্টী বাজতেই ঘোর কাটল নীরার। টেবিলের উপর থাকা ফোনটির দিকে আপনা-আপনিই নজর আটকাল তার। স্ক্রিনে ‘ডক্টর’ শব্দটা ভেসে উঠতেই চোখ ফিরিয়ে নম্রতার দিকে তাকাল সে। একবার কেটে গিয়ে দ্বিতীয়বার বাজতেই ফোন উঠাল নম্রতা। নম্র কণ্ঠে সালাম

দিতেই ওপাশ থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠ ভেসে এলো,

‘ সমস্যাটা কী? কতবার ফোন দিয়েছি দেখেছেন? গত তিনদিনে মোট একশো বিশবার কল দিয়েছি। অথচ নো রিপ্লাই। সবকিছুর একটা লিমিট থাকা উচিত। পাঁচ মিনিটের মাঝে ভার্সিটি গেইটে এসে দাঁড়াবেন। আমি গেইটে অপেক্ষা করছি।’‘ আপনি চলে যান। আমি

ব্যস্ত আছি। গেইটে যেতে পারব না।'

আরফান রুষ্ট কণ্ঠে বলল,

' পারবেন না মানে? অবশ্যই পারবেন। পারতে হবে। পাঁচ মিনিটের মাঝে গেইটে আসবেন নয়তো খবর আছে। দরকার হলে হাত-পা বেঁধে তুলে নিয়ে আসব তবুও দেখা আপনাকে করতেই হবে। ইউর টাইম স্টার্টস্ নাও।'

কথাটা বলেই ফোন কাটল আরফান। নীরা মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বলল,

‘ বহুত হয়েছে। আর জ্বালাস না। আমাকেও উঠতে হবে। বিকেল হয়ে এসেছে। এখনই বাসায় না ফিরলে রান্না বসাতে দেরী হয়ে যাবে। আসছি রে।’নম্রতা থম ধরে বসে রইল। এতোক্ষণে উপলব্ধি করল,

কাজটা একদম ঠিক হয়নি তার। সাথে সাথে না ধরলেও পাঁচ বারে একবার ফোন ধরা উচিত ছিল। আরফান ক্ষেপে আছে। নম্রতা অসহায় মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনুচিত কাজ করে ফেলে হা-হুতাশ করাটাই বোধহয় মানুষগত স্বভাব। নম্রতার রাগ হল। এই মানুষগত, বেয়াদব স্বভাবটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দিতে

ইচ্ছে হলো। কিন্তু হায়! সব ইচ্ছেই যে পূরণ হওয়ার নয়।শাহবাগ থেকে হাতিরঝিলের রাস্তা ধরে হাঁটছে নাদিম- অন্তু। নাদিমের হাতে বাদামের ঠোঙা। একেকটা বাদাম উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে মুখের ভেতর লুফে নিচ্ছে সে। বাদামের টুকরোগুলো মুখে পড়তেই চিবোতে চিবোতে মিটমিট করে হাসছে। অন্তু

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ কি সমস্যা তোর? হাসছিস কেন? আমার দিকে চেয়ে হাসবি না। আমার বিরক্ত লাগছে।’

অন্তুর কথার জবাবে আবারও মিটমিট হাসি উপহার দিল নাদিম। অন্তু গরম চোখে তাকাল। নাদিমের হাসি এবার বিস্তৃত হলো সারা মুখে। পরপর বেশ কয়েকটা বাদাম মুখে

পুরে নিয়ে হঠাৎই এক অদ্ভুত কাজ করে বসল সে। আচমকা টানে অন্তুর গলায় লেগে থাকা ওয়ানটাইম ব্যান্ডেজটা খুলে আনল হাতে। নিঃশব্দে হেসে বলল,

‘ এসব ব্যান্ডেজ ফ্যান্ডেজে কাজ হবে না মামা। বিবাহিত পুরুষ গরমের দিন চাদর গায়ে বেরুলেই কাহিনি রফা-দফা। ব্যান্ডেজের আইডিয়াটা ভালো। কিন্তু শকুনের চোখ থেকে

গুপ্তধন রক্ষা করার চেষ্টা তোমার ব্যর্থ।’

অন্তু কলার টেনে গলার দিকটা ঢাকার চেষ্টা করে বলল,‘ ফালতু কথা বলবি না। পোকা কামড়েছিল। তেমন কিছু নয়।’

নাদিম শব্দ করে হেসে বলল,

‘ বুঝি ভাই বুঝি। বউপোকা নিয়ে ঘুমোতে গেলে দু-একটা কামড় আসলে খেতেই হয়। গরমের দিন

চাদর গায়ে ঘুরতে হয়। মাঝে মাঝে ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজও লাগাতে হয়। অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

অন্তু রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল। নাদিম টিপ্পনী কেটে বলল, ‘ এই সত্যি করে বল তো, সত্যিই বউ পোকা? নাকি কোনো বহিরাগত পোকা? আজকাল বহু সুন্দরীদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি শেখাচ্ছিস। কাহিনী কি মামা?’

কথাটা বলে ভ্রু নাচাল নাদিম। অন্তু সুন্দর করে হাসল। নাদিমের কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল,

‘ তুমি যার কথা বলছ, সে তো তোমার পোকা বন্ধু। মিনিটে মিনিটে তার নাদিম স্যারের কথা মনে পড়ে যায়।’

নাদিম সাবলীল কণ্ঠে বলল,‘ এখনও সেখানেই আটকে আছে? আমি

ভেবেছিলাম এতোদিনে তোর প্রেমে টেমে পড়ে গিয়েছে।'

নাদিমের কথায় বেশ বিরক্ত হলো অন্তু। নাদিমের পায়ে আকস্মিক লাথি দিয়ে বলল,

' অন্যের ফিলিংসকে এতো ছোট করে দেখিস কেন, শালা?'

আকস্মিক আঘাতে উল্টে পড়তে পড়তে সামলে নিল নাদিম। অন্তুকে

কিছু বিশ্রী গালি দিয়ে বুকে থুতু ছিটাল,

‘ আশ্চর্য! কথায় কথায় লাথ্থি মারোছ ক্যান বুঝলাম না। আর ছোট করলাম কোথায়? মানুষ সেকেন্ড টাইম প্রেমে পড়তে পারে না? যেখানে-সেখানে যার-তার প্রেমে পড়ে যাওয়ার অধিকার মৌশির আছে। ইট’স নরমাল।’

অন্তু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল,‘ একজনের প্রতি অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও অন্যজনের প্রেমে পড়ে যাওয়াটা কখনোই নরমাল হতে পারে না। বরং অন্যায়। এখন যদি আমি তোদের নীরাকে রেখে অন্যকারো প্রেমে পড়ে যাই, সেটা কী তোরা মেনে নিবি? নীরার প্রতি অন্যায় হয়েছে বলে মনে হবে না?’

নাদিম যুক্তি দিয়ে বলল,

‘ তোর আর নীরুর ব্যাপারটা ভিন্ন। তোদের মধ্যে একটা সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে। মৌশির ব্যাপারে সেটা নেই। এক পাক্ষিক ভালোবাসায় কমিটমেন্ট থাকে না। কাঙ্ক্ষিত মানুষের ভালোবাসা না পেয়ে অন্যকারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দোষের কিছু নয়। মৌশির উচিৎ নতুন করে প্রেমে পড়া।’

অন্তু হতাশ হয়ে বলল,‘ ভালোবাসা নামক অনুভূতিটা চাইলেই অন্যকারো উপর ট্রান্সফার করা যায় না দোস্ত। তুই যতটা সহজভাবে বলছিস, মৌশির জন্য অতটা সহজ হবে না। ভালোবাসা সহজ নয়। কাউকে ভালোবাসার মতো যন্ত্রণার কিছু হয় না।’

নাদিম হাসল। প্রত্যুত্তর করল না। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ এতো অবহেলা না করে, মেয়েটিকে একটু বুঝিয়ে বলিস দোস্ত। বাচ্চা মেয়ে তো, সফ্ট হার্ট।’

নাদিম প্রসঙ্গ পাল্টে বলল,

‘ ছোঁয়ার গরুটারে দেখছিস?’

হঠাৎ এমন কথায় অবাক হলো অন্তু,

‘ ছোঁয়ার গরু মানে? ছোঁয়া গরু কিনল কবে? গরু দিয়ে সে করবেই বা কী? আশ্চর্য!’

নাদিম হুহা করে হেসে উঠে বলল,

‘ ও কিনে নাই। ওর মা গিফ্ট করেছে। অস্ট্রেলিয়ান গরু। ইংরেজ বলদ ওয়েডস্ অস্ট্রেলিয়ান গরু, অতি সুন্দর পোস্টার। আমার তো বিয়েতে যাইতেই ভয় লাগছে দোস্ত। গুঁতো তুতো মারলে সর্বনাশ।’ভার্সিটি গেইট থেকে বেরিয়েই আরফানের উপর চোখ পড়ল নম্রতার। একটা লাল রঙা মার্সিডিজের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে থাকা লম্বাচওড়া

শ্যামবর্ণ মানুষটির গায়ে ছাই রঙা টি-শার্ট। গম্ভীর শান্ত চোখজোড়া কব্জিতে থাকা হাত ঘড়িতে আবদ্ধ। শেষ বিকেলের হলদেটে আলোয় প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে তার শ্যামবর্ণ মুখ। মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকায় গোছাল চুলের কিছুটা এসে পড়েছে কপালে। নম্রতা সন্দিহান চোখে তাকাল। পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়ানক রূপবতী মেয়েটিকে দেখে

আপনা আপনিই কুঁচকে গেল ভ্রু। গোল গোল চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে থেকেই নিজের দিকে চোখ ফেরাল নম্রতা। এই অতিরিক্ত সুন্দর মেয়েটির সামনে নিজেকে কেমন ঠুনকো মনে হলো তার। রাগে-দুঃখে ঈর্ষান্বিত মনটা ফুঁসে ফুঁসে উঠল। কোথায় ভেবেছিল আরফানের বিরহে কাতর মুখটি দেখে খানিকটা স্বস্তি কুড়বে কিন্তু কোথায় বিরহ?কোথায়

কি?এই লোক তো উল্টো তাকেই জ্বালিয়ে মারছে। কে এই মেয়ে? এতো সুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মানে কী? আরফান কী বুঝাতে চাইছে তার থেকেও ভালো ভালো অপশন তার কাছে আছে? অবুঝ মনের নানাবিদ দ্বিধায় কান্না পেয়ে যাচ্ছে নম্রতার। আরফান নামক মানুষটিকে এই মুহূর্তে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

বেয়াদব!ঘড়ি থেকে চোখ তুলে তাকাতেই নম্রতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল আরফান। রুষ্ট চোখজোড়া নম্রতার উপর নিবদ্ধ রেখে কোনোরূপ বনিতা ছাড়াই বলল,
‘ আবারও লেইট!’
নম্রতা উত্তর দিল না। মুখ ফুলিয়ে পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে তাকাল। চোখে-মুখে চাপা ক্রোধ নিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। নম্রতার

স্থিরতায় পাশে দাঁড়ানো মেয়েটির উপর কোনোরূপ প্রভাব পড়ল বলে মনে হলো না। সে স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,

‘ তুমি তো দেখতে ভীষণ মিষ্টি, মিস.ছোঁড়াছুড়ি! বাহ্! তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।’নিদ্রার সম্বোধনে ঈর্ষান্বিত মনটা ফুঁস করে জ্বলে উঠল এবার। ছোঁড়াছুড়ি? কিসের ছোঁড়াছুড়ি? এই মেয়ে তাকে

আরফানের জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলার কথা বলছে না তো? সুপ্ত ক্রোধ চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই গাড়ির কাঁচ নামিয়ে মাথা বের করলেন একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা। পরনে কালো পেড়ে সাদা শাড়ি। ঘাড়ের কাছে ঘন চুলের বিশাল খোপা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। টান টান ত্বকে রূপবতী মেয়েটির চেহারার ছাঁচ। নম্রতা পুরো ব্যাপারটা

বুঝতে না পেরে হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। আরফান ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে দুই পা এগিয়ে নম্রতার পাশে এসে দাঁড়াল। নম্রতা দ্বিধান্বিত চোখে একবার গাড়িতে থাকা ভদ্রমহিলা তো আরেকবার আরফানের দিকে তাকাল। আরফান হতাশ কণ্ঠে বলল,‘ আপনার যন্ত্রণায় আমার পুরো পরিবার রাস্তায় নেমে এসেছে নম্রমিতা। এই মুহূর্তে পাত্রী

দেখা পর্ব চলছে। ইউ আর দ্যা মেইন ক্যারেক্টার ইন দিস এপিসোড। অল দ্যা বেস্ট পত্রপ্রেমিকা!’

আরফান এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করে নম্রতার দিকে তাকাল। নম্রতা বোকা বোকা চোখে চেয়ে থেকে বলল,

‘ মানে?’

আরফান উত্তর দিল না। নম্রতা হতবিহ্বল চোখে আবারও গাড়িতে থাকা ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। ভদ্রমহিলা ধীরে-সুস্থে গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর উজ্জ্বল মুখশ্রীতে তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ববোধের ছটা দেখে কিছুটা ভরকে গেল নম্রতা। অসহায় চোখে আরফানের দিকে তাকাল। আরফানকে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবারও ভদ্রমহিলার দিকে

তাকাল। ভদ্রমহিলার গম্ভীর চেহারা দেখে মনে মনে শত তারা গুণতে লাগল নম্রতা। বুকের ভেতর থাকা হৃদপিন্ডটা খনিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল ভয়ে। মুহূর্তের মধ্যেই ভদ্রমহিলাটিকে ভীষণ রাগী বলে আখ্যায়িত করে ফেলল নম্রতা। পরমুহূর্তেই নম্রতার ভাবনাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন ভদ্রমহিলা। নম্রতার ডানগালে

আলতো হাত ছুঁইয়ে বললেন,‘ তুমিই তবে শ্যামলতা?’

নম্রতা মাথা নাড়ল। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন,

‘ কিন্তু এই মোমের মতো মেয়েটিকে তো শ্যামলতা নামে মানাচ্ছে না মা। এই মিষ্টি মেয়েটির নাম হওয়া উচিত ছিল, শুভ্রলতা। আমি তোমাকে শুভ্রলতা বলে ডাকলে কী তুমি রাগ করবে মা?’

ভদ্রমহিলার অসম্ভব সুন্দর কণ্ঠস্বরে মস্তিষ্কে শীতল হাওয়া বয়ে গেল যেন। নম্রতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হাসল। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল, এই ভদ্রমহিলাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। ভীষণ তৃপ্তি দিচ্ছে তার কথা বলার ভঙ্গিমা। নম্রতাকে চুপ থাকতে দেখে আবারও কথা বললেন ভদ্রমহিলা,

‘ তুমি নিশ্চয় আমায় চিনতে পারছ না? আমি হলাম নিষ্প্রভের মা।’

ভদ্রমহিলার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পেছন থেকেই বলে উঠল নিদ্রা,‘ আর আমি হলাম নিদ্রা। নিষ্প্রভ ভাইয়ার ছোট হলেও তোমার থেকে এক বছরের বড়। সুতরাং, বিয়ের পর আমি তোমাকে ভাবি বলে ডাকব না। নাম ধরে ডাকব। আমি

তোমাকে নাম ধরে ডাকলে কী তুমি রাগ করবে ছোড়াছুড়ি?’

নম্রতা যেন হোঁচট খেল এবার। ছোঁড়াছুড়ি? আবারও ছোঁড়াছুড়ি? এতো সুন্দর একটা মেয়ে বারবার এমন কুৎসিত নামে কেন ডাকছে তাকে? ভাই ডাকে নিম পাতা, মা ডাকে শুভ্রলতা। পাতা-লতা শেষ করে ফুল-পাখিও তো ডাকতে পারত নিদ্রা। নম্রতা একটুও রাগ করত না।

কিন্তু হুট করেই ছোঁড়াছুড়িতে চলে যাওয়ার লজিকটা কিছুতেই ধরতে পারছে না নম্রতা। নম্রতা অসহায় চোখে তাকাল। আরফানের মা নম্রতার ডানহাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল,

‘ তুমি নাকি রাগ করে কথা টথা বলছ না? বেশ করেছ। এই বদমাইশের সাথে কথা বলা উচিতও না। আজ ওর রাতের খাবার বন্ধ।

ওর রিপ্লেজমেন্টে খাবার টেবিলের দায়িত্ব হবে তোমার। কি? যাবে না? ‘

নম্রতা বিস্ময় নিয়ে আরফানের দিকে তাকাল। আরফান মৃদু হাসল। চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করল। নম্রতা বিস্ময়ভাব নিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকাল। ঘোর লাগা কণ্ঠে বলল,‘ রাতে বাইরে থাকাটা বাবা-মা এলাউ করবে না আন্টি।’

ভদ্রমহিলা কিছু একটা ভেবে বললেন,

‘ কোনো সমস্যা না থাকলে তুমি কি তোমার বাবার নাম্বারটা দিবে মা? আমি তোমাদের সপরিবারে নিমন্ত্রণ দিতে চাই। এই মিষ্টি মেয়ের বাবা-মার সাথে পরিচয়টা না হলেই নয়। নিস্প্রভ বলছিল, তোমরাও নাকি ধানমন্ডিতেই থাকো? রোড নাম্বার আলাদা হলেও এলাকা কিন্তু একই।

সে হিসেবে আমরা সবাই প্রতিবেশী হয়ে গেলাম না?’

নম্রতা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল ভদ্রমহিলার মুখে। কাউকে এতো দ্রুতও বুঝি আপন করে নেওয়া যায়? কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক, ছোট্ট বাক্যগুলিতে বুঝি এতোটাও মায়া ঢালা যায়?ভার্সিটি থেকে ফিরেই রান্না বসিয়েছে নীরা। সন্ধ্যার নাস্তা আর রাতের খাবার

তৈরি করতে করতে কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে খেয়ালই ছিল না তার। টেবিলে খাবার সাজিয়ে গুছিয়ে সিংকে হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার করছিল নীরা। খোঁপা ছেড়ে বেরিয়ে আসা এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কপালে। চেহারায় ক্লান্তি। নাকে-মুখে তৈলাক্ত ঘামের আভা। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালেন জাহানারা। অন্তর খাবারটা

আলাদা করে ঢেকে রাখতে রাখতে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। শাশুড়ীর দৃষ্টিকে খেয়াল করে ভেজা হাতের পিঠ দিয়ে চুল ঠিক করে ওড়নার আঁচল টানল নীরা। আমতা আমতা করে বলল,' কিছু বলবেন মা?'

জাহানারা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। নীরার প্রতি আজকাল একটু-আধটু সন্তুষ্ট সে। সেদিন নীরার করা সরল অভিযোগের পর বাইরে রাত

কাটানো বন্ধ হয়েছে অন্তর। সারাদিন যেখানেই থাকুক না কেন? রাত বারোটার আগে ঠিকঠাক বাড়ি ফিরছে সে। রাতের খাবারটা নিয়ম করে বাড়িতেই খাচ্ছে। ছেলের এতটুকু নিয়মমাফিক জীবন দেখেই এক টুকরো স্বস্তি পেয়েছে জাহানারা। ছেলের বউয়ের প্রতি প্রকাশ্য তিক্ততা খানিক কমে এসেছে। জাহানারা কৃত্রিম রাগ নিয়ে

বলল,‘ সব সময় এমন সালোয়ার কামিজ পরে থাকো কেন? এটা তোমার বাপের বাড়ি না। বাড়ির বউদের রঙ-বেরঙের শাড়িতেই ভালো মানায়। অন্তত বাসায় থাকলে এসব সালোয়ার কামিজ রেখে শাড়ি পরে থাকবে। ওর সামনে শাড়ি পরে ঘুরঘুর করবে। দাদী-নানীরা বলত, “কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাশ ট্যাশ।” এখন এতো

উড়তে দিলে অন্য পাখির খাঁচায় যেতে কতক্ষণ? নিজের সংসার ধরে রাখতে হলে এমন থম মেরে বসে থাকলে চলবে না। সময় থাকতে লাঘাম ধরো। প্রেমের বিয়ে বলে গা ভর্তি তেল নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। পুরুষ মানুষের মন আর গাছের পাকা আম কোনটারই বিশ্বাস নেই বউ। কখন, কোথায় ঝড়ে পড়বে তা তারা নিজেরাই জানে না।’কথাগুলো

বলেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল জাহানারা। নীরা সাবান মাখা হাতে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল। শাশুড়ী মা কী কোনোভাবে তার আর অন্তুর ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন? সত্যিই কি এবার লাঘাম ধরা উচিত নীরার? অন্তুর পক্ষে কি সত্যিই অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব? বুকের ভেতর থেকে বিরক্ত এক সত্তা ধমকে উঠে বলল, 'কেন সম্ভব

নয়? অন্তুকে দেখেছিস কখনও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে? বিয়ের পর একবারও অন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছে সে? তাকায়নি। তবে?’ নীরা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কাজে হাত দিল। সত্যিই যদি এমন কিছু হয় তবে কিভাবে লাঘাম টানবে নীরা? কী করবে সে?গভীর রাত। আকাশ ভর্তি তারার মেলা। হালকা ঝিরঝিরে বাতাসে উড়ছে পাতলা ওড়না,

কপালে পড়ে থাকা ছোট ছোট চুল। সামনের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে যানবাহনের মৃদু হর্ণ। ছাঁদের এক কোণায় থাকা দোলনায় বসে আছে নম্রতা। ডানহাতে ধোঁয়া উঠা কফি কাপ। বামহাতে কানে ধরে থাকা ফোন।

‘ আপনি এখন কোথায় আছেন? কি করছেন?’

ওপাশ থেকে ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল আরফান,

‘ আমি হসপিটালে আছি। এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ড ঘোরাফেরা করছি। আই এম অন ডিউটি ম্যাডাম। রাউন্ডে আছি।’

নম্রতা আঁতকে উঠে বলল,‘ এতো রাতেও ডিউটি? ঘুম টুম নেই আপনার?’

আরফান হাসল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কারো সাথে কয়েকটি কথা বলে নিয়ে বলল,

‘ ঘুম তো আপনার কাছে।’

‘ ফাজলামো করবেন না, আমি সিরিয়াস। এই মুহূর্তে ডাক্তারের ওয়াইফদের জন্য প্রচন্ড মায়া হচ্ছে আমার।বেচারীদের নিশ্চয় রাতে একা একা ঘুমোতে হয়? মাঝরাতে ভয় পেলে কাঁথা দিয়ে মুখ চেপে

মটকা মেরে শুয়ে থাকতে হয়? সাংঘাতিক! নাহ্, এসব ডাক্তার ফাক্তারকে বিয়ে করা যাবে না। প্ল্যান ক্যান্সেল।’

আরফান নিঃশব্দে হাসল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে হাতের কাজ শেষ করল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি এখনও ঘুমোননি কেন? অলমোস্ট একটা বাজে। এতোরাতে কি করছেন?’

‘ ছাঁদে বসে কফি খাচ্ছি আর আকাশ দেখছি। আজকের আকাশটা অনেক সুন্দর ডক্টর।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,‘ ছাঁদে? অনেক বছর আগে কেউ একজন আমায় বলেছিল, সে একা একা ছাঁদে যেতে ভয় পায়। তাই বরের

জন্য অপেক্ষা করছে। সাহসী বর তাকে ছাঁদে নিয়ে গিয়ে জ্যোৎস্না বিলাসে সঙ্গ দিবে। তো, তার কী বর জুটে গিয়েছে আজকাল?’

‘ বর না জুটলেও সাহসটা ঠিকই জুটে গিয়েছে তার। অনেক বছর আগের বাচ্চা মেয়ে এখন বিশাল বড়। ভূতে টূতে ভয় পায় না।“ তাই নাকি? তাহলে তো মায়ের গল্পটা আপনাকে বলাই যায়। মা বলতো,

আমাদের আশেপাশে নাকি সবসময়ই জ্বীন-পরীরা ঘোরাঘুরি করে। একসাথে, পাশাপাশি বসেও থাকে। আপনার পাশেও নিশ্চয় আছে? ফাঁকা ছাঁদে আপনি আর আলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কিছু জ্বীন, ব্যাপারটা দারুণ না?’

নম্রতা ভয়ে ভয়ে পাশে তাকাল। অদ্ভুত একটা ভয়ে কেঁপে উঠল তার বুক। কৃত্রিম রাগ নিয়ে বলল,

‘ দেখুন, একদম উল্টাপাল্টা গল্প ফাঁদবেন না। ডিউটিরত অবস্থায় ফোনে কথা বলছেন। তারওপর উল্টাপাল্টা গল্প বানিয়ে মাসুম যুবতীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আপনার নামে তো মামলা করা উচিত ডক্টর। আন্টির মতো....’পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। আকাশটা লালাভ রঙে ঢাকা। জানালার পাশ ঘেঁষে বসে থাকা

নম্রতার মনটা ভীষণ খারাপ। শেষ রাতের দিকে অনেকটা সময় নিয়ে ফোনালাপ হয়েছে আরফান-নম্রতার। মন খারাপের শুরুটা সেখান থেকেই। কথায় কথায় আরফানের পরিবার নিয়ে কথা তুলেছিল নম্রতা। সেই কথার প্রেক্ষিতেই নিজের ভাইকে নিয়ে গল্প করছিল আরফান। পরিবারের মধ্যে সব থেকে স্মার্ট দেখতে ছেলে ছিল

নেহাল। হৃষ্টপুষ্ট বিশাল শরীর। সর্বদা হাসিখুশি আর দূর্দান্ত বুদ্ধিমান। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে বটগাছের মতো আগলে রাখায় ছিল তার স্বভাব।আরফান-নিদ্রার কাছে সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান ছিল ভাই। চমৎকার গান করত নেহাল। তার ব্যবহৃত গিটারটি এখনও খুব প্রিয় স্নিগ্ধার। স্নিগ্ধা নামক মেয়েটিকে প্রচন্ড ভালোবাসত

নেহাল। ভার্সিটি থেকে বেস্ট জুটির খেতাপ পেয়ে আসা জুটিটির এনগেজমেন্ট পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা হয়ে উঠল না। স্বপ্নের সংসার সাজানোও হলো না। তার আগেই আকস্মিক ঝড়ে উলোটপালোট হলো সব। এতটুকু শুনেই ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছিল নম্রতা। আরফান চুপচাপ কিছুক্ষণ কান্না শুনে ফোন কেটেছে। গত দুই

ঘন্টা যাবৎ অযথায় কেঁদে কেটে পৃথিবী ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল নম্রতার। নেহালের জন্য প্রচন্ড খারাপ লাগছিল।নম্রতার মতো নেহালেরও নিশ্চয় অনেক অনেক স্বপ্ন ছিল? অনেক সুখ পাওয়া বাকি ছিল? এমন হাসিখুশি, দূর্দান্ত একজন মানুষকেই কেন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হল? যে মানুষটি এতোগুলি মানুষের হাসি আর

ভরসার কারণ ছিল সেই মানুষটিকেই কেন হারিয়ে যেতে হলো? তাছাড়া স্নিগ্ধা নামক মেয়েটিই বা কিভাবে সামলাল? নম্রতা পারত? কথাগুলো ভাবতেই দুনিয়া ভেঙে কান্না আসে নম্রতার। নেহালের জায়গায় আরফানের কথা চিন্তা করলেই ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে তার। জানালার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে সিঁদুর রাঙা আকাশ দেখে

নম্রতা। ধীরে ধীরে ফুটে উঠা প্রত্যুষ দেখতে দেখতেই জন্ম-মৃত্যু নিয়ে ভাবে নম্রতা। হঠাৎ মৃত্যুর কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠে রোম। বেশ কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল চিন্তা করে কাঁপা হাতে আরফানকে ফোন লাগায়। প্রথমবারের চেষ্টায় ফোন উঠায় আরফান। হাসি হাসি কন্ঠে বলে,‘ সুপ্রভাত মিস.নিম পাতা। কান্না থেমেছে?’

নম্রতা উত্তর দিল না। বেশ কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থেকে বলল,

‘ স্নিগ্ধা আপু এখন কোথায়?’

নম্রতার প্রশ্নে কিছুটা মিইয়ে গেল আরফান। বুক ভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল,

‘ এই টপিক আপাতত থাকুক নম্রতা। বাই এনি চান্স, আপনি কি এখনও কান্নাকাটি করছেন?’

নম্রতা উত্তর দিল না। হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আপনার ডিউটি এখনও শেষ হয়নি?’

‘ শেষ হয়েছে। আমি এখন রাস্তায়। বাড়ি ফিরছি।’

এটুকু বলে থামল আরফান। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎই বলল,‘ এই মুহূর্তে আপনার যে অনুভূতিটা হচ্ছে ঠিক এমন অনুভূতি বেশ

কিছুদিন আগে আমারও হয়েছিল নম্রতা। পার্থক্য হলো, আমি আপনার মতো কেঁদে-কেটে বুক ভাসাতে পারিনি।'

কথাটা বলে হালকা হাসল আরফান। কৌতুক করে বলল,

' হারিয়ে ফেলার ভয়েই যে মেয়ে কেঁদে-কেটে নাজেহাল। সেই দুর্বল হৃদয়ের মেয়ে হারিয়ে ফেলেও কি

করে এতো স্বাভাবিক থাকল? এতটা বছর?’

‘ স্বাভাবিক থাকলে নিশ্চয় আমাকে পাগল বলে মনে হতো না আপনার। প্রথম প্রথম তো পাগলই বলতেন।’

খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে হয়েছে এমন একটা ভাব নিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল আরফান,

‘ ও হ্যাঁ। লঞ্চে খুব উইয়ার্ড বিহেভ করেছিলেন সেদিন। অদ্ভুত সব

পাগলামো। সেসব পাগলামো এই অধমের জন্য ছিলো?’শেষ কথাটায় আরফানের কন্ঠে যেন বিস্ময় খেল। নম্রতা অভিমানী কন্ঠে বলল,

‘ শুরু থেকে শেষ, সম্পূর্ণ গল্পটিতে কালপ্রিট আপনি একা। প্রথমে না বলে হাওয়া হলেন। তারপর হুট করে উদয় হয়ে আমার ডায়েরি, আমার চিঠিগুলো জলে ফেলে

দিলেন। সেদিন যে আপনি খুন হয়ে যাননি সেই-ই আপনার ভাগ্য।’

নম্রতার কথায় হতভম্ব হয়ে গেল আরফান। বিব্রত কন্ঠে বলল,

‘ ডায়েরিতে আপনার চিঠি ছিল সে তো আমি জানতাম না নম্রতা। আর ইচ্ছে করেও ফেলিনি। আপনি তো আমার ল্যাপটপটাই ফেলে দিলেন। তবুও ইচ্ছেপূর্বক। দোষ আমার একার নয়। আপনিও দোষী। আমার

গল্পে কালপ্রিট কিন্তু আগাগোড়া আপনিই। এতো ঝামেলার মাঝে চিঠি লিখলাম। চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম অথচ আপনি খুঁজেই পেলেন না। আমাকে চার চারটা বছর তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখলেন। তারপর হুট করে উদয় হয়ে জীবনটা তামা তামা করে ছেড়ে দিলেন।'

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,‘ আমি আপনার জীবন তামা তামা করে ফেলেছি?’

আরফান নিঃসংকোচে বলল,

‘ তা করেছেন। প্রচন্ড বিরক্ত ছিলাম আমি আপনার ওপর। এমনিতেই প্রেয়শী হারিয়ে দেবদাস তারওপর আপনার কার্যকলাপগুলো অসহ্য লাগছিল। আপনিই সেই প্রেয়শী, এমনটা জানলে অবশ্য বিরক্ত হতাম

না বরং ইঞ্জয় করতাম। কিন্তু তখন আমি আপনাকে কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি।'

নম্রতা হেসে বলল,

' আমার জন্যও সাডেন শক ছিলেন আপনি। আমি তো নিষাদ ভাইয়াকে সন্দেহ করেছিলাম। তখন আমার ভাবনা ছিল, আপনি আর সে? ইয়াককক!'

আরফান হতভম্ব কণ্ঠে বলল,‘ ইয়াক! এমনটা কেন?’

নম্রতা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল,

‘ সরি টু ছে, তখন আপনাকে ইয়াক-ই লাগত আমার। একদম বিশ্রী। নাদিম তো আপনার বিশেষ একটা নামও দিয়েছিল। ওর নাম অনুযায়ী বন্ধুমহলে সবাই আপনাকে

‘ধাক্কা আরফান’ বলে সম্বোধন করত। এখন অবশ্য বলে না… ‘

নম্রতাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই হতবিহ্বল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আরফান,

‘ হোয়াট!’

নম্রতা আবারও খিলখিল করে হেসে উঠল।সকাল আটটা। চোখে চশমা চড়িয়ে খাবার টেবিলে এলো ছোঁয়া। চোখদুটো হালকা ফুলে থাকলেও,

মনটা বেশ ফুরফুরে তার। কাল সারারাত জেগে থেকে সূর্য উঠার পর ঘুমোতে গিয়েছে ছোঁয়া। ছাঁদে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছে। তিনদিন যাবৎ শেষ করতে না পারা বইটির ইতিও টেনেছে। ছোঁয়াকে চেয়ার টেনে বসতে দেখেই প্লেটে খাবার তুলে দিলেন সিঁথি হক। প্লেট ভর্তি পোলাও, মাংস দেখে ভ্রু কুঁচকাল

ছোঁয়া। সিঁথি হক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,
‘ বিয়ের কিছুদিন তোমার খাওয়া-দাওয়ায় নিয়ে কোনো রেস্ট্রিকশন থাকবে না মামুনি। তুমি ব্রেডের জায়গায় পোলাও, মাংস খেতে পারো।’ছোঁয়া বিরক্ত চোখে তাকাল। ছোট থেকে ব্রেকফাস্টে ব্রেড, ফ্রুটস খেয়েই অভ্যস্ত ছোঁয়া। সকালে ভারী খাবার মানেই আস্ত ঝামেলা। ছোঁয়া

বুঝতে পারে না, হুট করে খাবারের ম্যনু চেঞ্জ করার মানে কি? এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা? মাম্মা কী স্বাধীনতার সজ্ঞা জানে না? ছোঁয়ার ভাবনার মাঝেই আবারও কথা বলেন সিঁথি হক,

‘ সাইম আর তোমার বড় খালামনি প্রায় সব ধরনের কাগজপত্র রেডি করে ফেলেছেন। বিয়ের এক মাসের মাঝেই অস্ট্রেলিয়াতে শিফট হতে

পারবে তুমি। আর স্কলারশিপের ব্যাপারটাও ম্যানেজ করে নিয়েছে তোমার বাবা। বাদ বাকি সাইম তো আছেই। ওখানে গিয়ে পড়াশোনায় একদম ঢিলেমি করবে না মামুনি। তোমার লো-ক্লাস ফ্রেন্ডরা বাইরের দেশে গিয়ে পড়াশোনা করছে আর তুমি হাত গুটিয়ে বসে আছ? প্রুফ ইউরসেল্ফ মামুনি। ইউ হ্যাভ টু বি বেস্ট। ‘ছোঁয়া উত্তর দিল না। মাম্মার

কথা তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছাল বলেও মনে হলো না। মনে মনে বিয়ে নামক বিষয়টা নিয়ে ভাবছে ছোঁয়া। আর যায় হোক, বিয়ের মাধ্যমে এই একঘেয়ে জীবন থেকে তো ছাড়া পাবে ছোঁয়া। কারো কথা অনুযায়ী নয় নিজের বিবেচনা দিয়ে একটুখানি হাত-পা ছড়িয়ে শুবে। তার গায়ে থাকবে নিজের পছন্দের জামা। নিজের পছন্দের খাবারে ভরে

থাকবে খাবার টেবিল। বন্ধুদের সাথে ইচ্ছেমতো সময় কাটাবে। কথাগুলো ভাবতেই বুকের ভেতর অদ্ভুত এক আনন্দ হয় ছোঁয়ার। পরমুহূর্তেই বিভ্রান্তিকর এক প্রশ্ন বলের মতো ঢপ খেলতে থাকে তার মস্তিষ্কে, আদৌ কি নিজের কোনো পছন্দ গড়ে উঠেছে ছোঁয়ার? শক্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে তার? বিয়ের পর বন্ধুগুলোকে

আগের মতো করে আদৌ পাওয়া হবে তার? ছোঁয়ার হাত থেমে যায়। অনেক ভেবেও উত্তরের ঘরে ভেসে উঠে শুধুই শূন্য নামক অঙ্ক।মাথার উপর তপ্ত সূর্য। শহরজুড়ে তার দগদগে তেজ। ছাঁদের তপ্ত পাটাতনে পা রাখা ভার। ক্ষনিকেই যেন ত্বক ঝলসে যাওয়ার ভয়। ছাঁদঘরের টিনে ঢাকা চালে আর গাছের পাতায় দাউদাউ করে জ্বলছে তীব্র রোদের

আগুন। এমনই উত্তপ্ত দুপুরে ছাঁদের দড়িতে কাপড় মেলছে এক রমণী। পরনে তার আধভেজা পাতলা শাড়ি। হাতে মোটা স্বর্ণের বালা। রোদের তাপে লাল হয়ে উঠা ফর্সা নাকে জ্বলজ্বল করতে থাকা ছোট্ট নাকফুল। কপালে তার ঘামের নহর। বালতি ভর্তি কাপড়ের বেশ খানিকটা ফেলে রেখেই পায়ের দিকে তাকাল নীরা। উত্তপ্ত পাটাতনের

তপ্ততা থেকে বাঁচতে পা উঁচু করে বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। হাত দিয়ে আড়াল করল চোখ। পরমুহূর্তেই কিছুটা স্বস্তির জন্য ছাঁদের ডানপাশে থাকা বিশাল আমগাছের ছায়ায় দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সে।একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। কিন্তু চোখ তুলে তাকাতেই থমকে গেল নজর। আম গাছের ছাঁয়ায় উল্টোদিক ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা

মানুষটিকে চোখের পলকেই চিনে ফেলল নীরা। টি-শার্টের কলারটা পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ত। পরনে ছাইরঙা থ্রী কোয়াটার প্যান্ট আর চটি জুতো। একহাতে জ্বলন্ত সিগারেট আর অন্যহাতে ফোন। অন্তর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট দেখেই চটে গেল নীরা। কয়েক সেকেন্ড ভ্রু বাঁকিয়ে তাকিয়ে থেকে উল্টো ঘুরে কাপড় মেলায় মন

দিল। বালতিটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাখতে গিয়ে ইচ্ছে করেই অতিরিক্ত শব্দ করল। অন্তু ঘাড় ফিরিয়ে একপলক তাকিয়ে আবারও নিজের কাজে মন দিল। তপ্ত রোদের মতোই শাড়ি পরিহিতা উত্তপ্ত নীরাকে দেখেও যেন দেখল না সে। নীরার রাগটা যেন থিতিয়ে গেল।কাপড় মেলতে মেলতেই রাগ ভুলে ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গেল।

যে মানুষ রাগকেই পাত্তায় দেয় না তাকে রাগ দেখিয়ে কি লাভ? নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মস্তিষ্কে কড়া নাড়ল উত্তরহীন কিছু প্রশ্ন, অন্তু কেন এত সিগারেট খায় আজকাল? আগে তো খেতো না। নীরাকে কী সে একদমই মেনে নিতে পারছে না? নাকি শাশুড়ী মায়ের কথায় সত্যি? অন্তু কী বাইরে কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে? ভাবনাগুলো নিজের কাছেই কেমন

বিদঘুটে শোনায় নীরার। শেষ কাপড়টা মেলতে মেলতে নিজেকে শাসায়, ছিঃ! কি বিশ্রী চিন্তা! বালতি নিয়ে নিচে নামার সময় পেছন ফিরে একটিবার তাকাল নীরা। অথচ বুঝতেই পারল না, পাশের বিল্ডিংয়ের জানালার গ্লাসে অত্যন্ত মনোযোগী দর্শক হয়ে তাকেই দেখছিল অন্তু। পাতলা শাড়িতে স্পষ্ট হয়ে উঠা নারীসুলভ বাঁক। কাপড়

মেলতে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মেদহীন কোমর। ঘামে ভেজা মুখশ্রীতে আবেদনময়ী ঠোঁট!বেশ কিছুক্ষণ হলো ছাঁদ থেকে নেমে এসেছে অন্তু। মন-মেজাজ তিরিক্ষি। নীরার ‘শাড়ি, শাড়ি’ ঢঙটা একদম পছন্দ হচ্ছে না তার। বাসায় কি সালোয়ার-কামিজ নেই? সারাবাড়ি, সর্বক্ষণ শাড়ি পরে টই টই করে ঘুরতে হবে কেন? আর যদিও-বা

পরে তাতে ন্যূনতম সাবধানতার বালাই-ই-বা থাকবে না কেন? একটা মেয়ে কতটা কেয়ারলেস হলে আধভেজা পাতলা শাড়ি পরে ছাঁদে উঠে যেতে পারে, তাই ভেবে পাচ্ছে না অন্ত। আশেপাশে এতোগুলো বিল্ডিং। প্রত্যেকটাতেই থাই গ্লাসের ব্যবস্থা। নিজের ঘরে বসেও পাশের ছাঁদের রমণীকে দেখার সুবর্ণ সুযোগ। 'নীরাকে ওই অবস্থায়

অন্যকেউও হয়ত দেখেছে', কথাটা ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে অন্তর। নীরাকে ঠাটিয়ে দুটো চড় লাগাতে ইচ্ছে করছে। অন্ত হাতের ফোন কিছুটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে বালিশে ঠেস দিয়ে বসল। কপালে ডানহাত রেখে চোখ বন্ধ করল। ঠিক সেই সময়ই ওয়াশরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো নীরা। দরজার শব্দে হাত সরিয়ে চোখ খুলল অন্ত।

ওয়াশ রুমের দরজার দিকে তাকাতেই ভ্রু কুঁচকে এলো। বিগড়ে থাকা মেজাজটা এবার চূড়ান্ত বিগড়ে গেল। নীরার গায়ে আবারও পাতলা শাড়ি!গোসল সেড়ে বেরিয়েই অন্তর শীতল চাহনির খপ্পরে পড়ে কিছুটা ভরকে গেল নীরা। কিছু বুঝতে না পেরে ভীত চোখে চেয়ে রইল। অন্ত কিছু বলল না। আগের মতোই কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করল।

ভেজা কাপড়গুলো বারান্দায় মেলে দিয়ে ভেতরে আসতেই অয়নের নাম ধরে তারস্বরে ডেকে উঠল অন্ত। অন্তর হঠাৎ চিৎকারে চমকে উঠল নীরা। তটস্থ চোখে অন্তর দিকে তাকাল। দুই-তিনবার ডাকার পর অলস ভঙ্গিতে ভেতরে এলো অয়ন। গায়ে পাতলা টি-শার্ট। হাতে ফোন। অয়ন বিরস কণ্ঠে বলল,' ডাকছ কেন ভাইয়া? নীরাপু থুক্কু ভাবী তো

এখন ঘরেই আছে। কিছু বলতে হলে সরাসরি বলে ফেলো। আমাকে কেন দরকার?’

অন্তু সোজা হয়ে বসল। শীতল কণ্ঠে বলল,

‘ কাছে আয়।’

অয়ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেকেন্ড বিলম্ব না করেই ভাইয়ের গালে ভয়ানক এক চড় বসাল অন্তু। ঘটনার

আকস্মিকতায় চমকে দু-পা পিছিয়ে গেল নীরা। অন্তর এমন রূপে ভীত হয়ে উঠল মন। অন্ত রাগত কণ্ঠে বলল,‘ সারাদিন গেইম খেলিস পড়াশোনা নাই? এই পড়াশোনা দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিবি তুই? থাপ্পড় দিয়ে গাল লাল করে ফেলব, বেয়াদব।’

অয়ন গালে হাত দিয়ে অভিমানী চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল। অন্ত

হাতে থাকা ফোনের দিকে ইশারা করে ধমকে উঠল,

‘ এই তুই গেইম খেলার জন্য ফোন কোথায় পাস? আব্বা তো দেয় না। আমার ফোনও নিস নাই। তাহলে এই ফোন পেলি কোথায়?’

অয়ন মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দেয় না। অন্তু আবারও ধমকে উঠল,

‘ আমি জিজ্ঞেস করেছি, ফোনটা কার?’

অয়ন মিনমিন করে বলল,

‘ নীরাপুর।’অন্ত এবার নীরার দিকে তাকাল। অন্তর কুঞ্চিত ভ্রু আর শীতল চাহনী দেখেই আত্মা ধরফর করে উঠল নীরার। একবার অসহায় চোখে অয়নকে দেখে নিয়েই অন্তর দিকে তাকাল। অন্তকে কিছু বলার সাহস জোগাতে না পেরে আবারও

অয়নের দিকে তাকাল। অয়নের হাত থেকে ফোনটা নিয়েই দ্রুত পায়ে ঘর ত্যাগ করল। নীরার যাওয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ভাইকে কাছে টানল অন্তু। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,

‘ বেশি ব্যথা লেগেছে?’অয়ন অভিমানী চোখে তাকাল। মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। অন্তু হাসল।

অয়নের চুলে হাত চালাতে চালাতে বলল,
‘ আচ্ছা যা, সরি। এবার তোর ভাবিকে গিয়ে বল, সে যেন এই মুহূর্তে শাড়ি পাল্টে সালোয়ার-কামিজ পরে। শাড়িতে তাকে বিশ্রী লাগে। এমন বিশ্রী দৃশ্য চোখের সামনে সহ্য করা যাচ্ছে না।’
অয়ন অসহায় চোখে তাকাল। ক্ষোভ নিয়ে বলল,

‘ বারবার আমিই কেন? ভাবি তো ঘরেই ছিল। তখন কেন বললে না? তুমি ইচ্ছে করেই ভাবিকে বাইরে পাঠালে। সব আমাকে কাজ করানোর ধান্দা। আমি কিছু বলতে টলতে পারব না। নীরাপু তো আমার বউ নয়। আমার বউকে আমি বলব। তোমার বউকে তুমি বল, যাও।’

সাথে সাথেই আরেকটা চড় পড়ল পিঠে। অন্ত ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ যাবি? নাকি আরেকটা খাবি?’
অয়ন ক্ষুব্ধ চোখে তাকাল। ভাইয়ের থেকে সরে গিয়ে বলল,
‘ সব কাজ তো আমাকে দিয়েই করাও। বিয়েটাও করিয়ে দিতে। করে ফেলতাম বিয়ে।’সারারাত জেগে থাকায় ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বারোটা বেজে গেল নম্রতার। ঘুমু ঘুমু চোখ আর ভার মাথা নিয়ে বিছানা ছাড়তেই ছুটে এলো নন্দিতা।

কণ্ঠে একরাশ চঞ্চলতা আর কৌতূহল নিয়ে বলল,
‘ ডাক্তার ভাইয়ার বাড়ি থেকে ঘটক এসেছে আপু। সিভি আম্মুর ডিপার্টমেন্টে জমা হয়ে গিয়েছে। একবার যদি কনফার্ম হয়ে যায় তাহলেই ডিরেক্ট শ্বশুড়বাড়ি।’
কথাটা বলেই ঠোঁট গোল করে সিটি বাজাল নন্দিতা। হাতটাকে প্ল্যানের মতো উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিমা করে

চোখ টিপল। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল,‘ তোমার হবু শাশুড়ি বাবাকে ফোন দিয়ে লাঞ্চের দাওয়াতও দিয়ে ফেলেছেন। বলেছেন, উনারা মেয়ে দেখেছেন। মা-শা-আল্লাহ মেয়ে তাদের পছন্দ। মেয়ে পছন্দ বলেই মাধ্যম হিসেবে ঘটকের আয়োজন। এবার আমাদের দেখাদেখির পালা। আমাদের যদি ছেলে পছন্দ হয় তাহলেই

আলহামদুলিল্লাহ। আম্মু যদি ‘হ্যাঁ’ বলে তাহলেই চট করে দাওয়াতের ব্যাপারটা তুলবে বাবা। নয়তো সন্দেহ টন্দেহ করে বসতে পারে। আম্মুর তো বিশ্বাস নাই।’নম্রতা হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। এতো তাড়াতাড়ি এতো কিছু হয়ে গেল আর সে টেরই পেল না? নম্রতার ঘোলাটে ভাবনার মাঝেই নম্রতাকে

ঝাপটে ধরল নন্দিতা। উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে বলল,

‘ উফ! আমার যে কি মজা লাগছে আপু! আবার একটু মন খারাপও লাগছে। সিভিতে দেখলাম ডাক্তার ভাইয়ার নাকি ছোট ভাই টাই নাই? খুব দুঃখের সংবাদ। আমার প্রেমটা হতে হতেও হলো না। ‘দিদি তেরি দেবর দিওয়ানা’ গানটার উপর জবরদস্ত নাচ শেখাটাও কাজে লাগল

না। ওয়েস্ট, সব ওয়েস্ট!'রৌদ্রোজ্জ্বল সেই দুপুর বেলায়, অন্তু থেকে পালিয়ে এসেই ইরার মুখোমুখি হতে হলো নীরাকে। বিয়ের প্রায় তিনমাস পর ছোট বোনকে শ্বশুর বাড়িতে দেখে কিছুটা অবাক হলো সে। ইরা বসার ঘরে বসেছিল। কালো জমিনে সাদা ফুল তোলা জামা গায়ে। চোখে-মুখে নিদারুণ ক্লান্তি। নীরাকে দেখতে পেয়েই উঠে এসে একহাতে

জাপটে ধরল ইরা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,‘ উফ! আসব আসব বলে আসা হয়ে উঠছিল না। একটু শুকিয়েছ মনে হচ্ছে? কেমন আছ?’ নীরা ঠোঁট টেনে হাসার চেষ্টা করল। বোনকে একহাতে জড়িয়ে ধরে বলল,

‘ ভালো। তুই কেমন আছিস? আসবি, বলিসনি তো।’

‘ বললে তো সারপ্রাইজড হতে না, তাই বলিনি। মিড টার্ম শেষ হলো কাল। ছুটি পেয়েই সিদ্ধান্ত নিলাম তোমার কাছে আসব। ব্যস, চলে এলাম।’

নীরা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মেকি হেসে বলল,

‘ ভালো করেছিস।’ইরাকে জড়িয়ে রেখেই শাশুড়ী মায়ের দিকে তাকাল নীরা। চোখে-মুখে সূক্ষ্ম দুশ্চিন্তা। ইরা

মেয়েটা অন্যরকম। বুদ্ধিমতি, মুক্তিচেতা, প্রতিবাদী, তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নীরার মতো চুপ থাকা তার ধাতে নেই। মুখের উপর কঠিন কথা বলে ঝামেলা পাকানোই তার কাজ। সমাজের প্রতি তার তীব্র অসন্তোষ। শাশুড়ী মায়ের সূক্ষ্ম বাঁকা চাহনী চোখে পড়লেও নির্ঘাত ঝামেলা পাকাবে ইরা। জাহানারাও তো থেমে থাকার মানুষ নন।

স্বাভাবিক, ভালো কথাও মুখ গোমড়া করে বলা তাঁর অভ্যাস। নীরা যেন অকূল পাথারে পড়ল। বোনকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে রইল বুক।

‘ ইরার জন্য খাবার দাবারের ব্যবস্থা করো বউমা। তার আগে ঠান্ডা শরবত করে দাও। এই গরমে অতটুকু জার্নি করে এসেছে।’

জাহানারার এমন সুন্দর, স্বাভাবিক ব্যবহারে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ

দিল নীরা। মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ আচ্ছা মা।’

ইরা হেসে বলল,

‘ ওসব শরবত টরবত লাগবে না। তুমি বরং আমায় একটা ওয়াশরুম দেখিয়ে দাও। লম্বা একটা শাওয়ার নেব। ঘামে শরীর চটচট করছে।’

কথাটা বলে থামল ইরা। সোফা থেকে নিজের হ্যান্ড ব্যাগটা তুলে নিতে নিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ ভাইয়া আছে নাকি বাসায়? ভাইয়ার সাথে তো দেখা হলো না।’

নীরা অন্তুর নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও থেমে গেল। আড়চোখে শাশুড়ীর দিকে চেয়ে নিজেকে সংযত করল। শান্ত কণ্ঠে বলল,‘ তোর ভাইয়া রুমেই আছে। দেখা করবি, চল।’

জাহানারা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে যেতেই দৌঁড়ে এলো অয়ন।

একহাত গালে রেখে মুখ গোমড়া করে নীরার দিকে তাকাল। নীরা তার চুপসে যাওয়া মুখটির দিকে চেয়ে বলল,

‘ আরও খেয়েছিস?’

অয়ন দুঃখ ভরা মন নিয়ে সম্মতি জানাল। প্রচন্ড মন খারাপ নিয়ে বলল,

‘ তুমি শাড়ি পাল্টে সালোয়ার-কামিজ না পরলে আবারও মারবে। ভাইয়া

তোমাকে শাড়ি পরতে নিষেধ করেছে।’

অয়নের বলা কথাটা জাহানার কানে গিয়ে পৌঁছাতেই রান্নাঘর থেকে ধমকে উঠলেন তিনি,

‘ কেন? বউ কী পরবে সেটা ও ঠিক করে দেবে? বাড়ির বউ শাড়ি পরবে তাতে ওর সমস্যা কি?’

অয়ন দমে গেল। নীরার দিকে চেয়ে কাতর চোখে অনুরোধ করল,

‘ প্লিজ!’নীরা দ্বিতীয়বারের মত অকূল পাথারে পড়ল। স্বামী না শাশুড়ী কার কথা শুনবে তা নিয়েও বিরাট এক প্রশ্ন দেখা দিল মনে। পুরোটা সময় লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ইরা। অয়নকে রেখে শোবার ঘরের দরজার কাছে আসতেই অন্তর মুখোমুখি হলো তারা। অন্তু শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরুচ্ছিল। ইরাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে মৃদু

হাসল। খানিকটা বিস্ময় নিয়েই বলল,
‘ আরে ইরা নাকি! কেমন আছ আপু?’
ইরা ঠোঁট টেনে হাসল,
‘ আশেপাশের আবহাওয়া দেখে উত্তরটা নিয়ে খুব চিন্তায় পড়তে হচ্ছে জামাইবাবু।’
অন্ত কথাটা ধরতে না পেরে ভ্রু কুঁচকাল। অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল,

‘ মানে?’সাথে সাথেই ইরার হাত খামচে ধরল নীরা। ব্যস্ত হয়ে বলল,

‘ গরম। গরমের কথা বলছে ও।’

অন্তু নীরার দিকে এক নজর চেয়ে বলল,

‘ ওহ! আচ্ছা, থাকো তাহলে। আমি একটু বেরুচ্ছি। সন্ধ্যার পর দেখা হবে ইন-শা-আল্লাহ।’

‘ আমি বোধহয় বিকেলের দিকে চলে যাব ভাইয়া। দেখা হওয়ার সম্ভবনা কম।’

কথাটা বলে মৃদু হাসল ইরা। অন্তু অবাক হয়ে বলল,‘ এইমাত্র না এলে? এসেই যাওয়ার চিন্তা কেন? বিয়ের পর আজই বোধহয় প্রথম এলে বাসায়। দুই একদিন থাকো আমাদের সাথে। নীরা তোমায় খুব মিস করে। আগে ওর মন ভরুক

তারপর যাওয়ার চিন্তা তার আগে নয়।’

অন্তর কথায় চট করে অন্তর দিকে তাকাল নীরা। নিজের দুই অক্ষরের নামটা জীবনের প্রথম খুব সুন্দর শোনাল তার কানে। প্রায় তিনমাস পর অন্তর মুখে ‘নীরা’ নামটা শুনতে পেয়ে অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে ছেয়ে গেল মন-মস্তিষ্ক। ইরা জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল। এটুকু সময় ঠিকঠাকভাবে

কেটে যাওয়ায় বেশ স্বস্তি পেল নীরা। কিন্তু এই স্বস্তিটুকুও বেশিক্ষণ টিকল না। দুপুরের পর পাশের বাসার এক মহিলা এসে নিত্য দিনকার গল্প জুড়ল। নীরা-ইরা তখন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। মহিলাটি বেশ ফলাও করে জিজ্ঞেস করলেন,‘ বউয়ের বাড়ি থেকে কিছু দেয়নি ভাবি?’

জাহানারা স্বাভাবিক মুখভঙ্গি নিয়ে বললেন,

‘ কি দেবে? বউয়ের বাপের বাড়ির অবস্থা অত ভালো না। পাঁচ-ছয় বছর আগে বাপ মারা গেছে।’

মহিলা অবাক হয়ে বললেন,

‘ তাই বলে কিছুই দিবে না? আমাদের বাসায় কাজ করত চম্পা নামের মেয়েটা? এই মাসেই ওর বিয়ে হলো। ওর বিয়েতে আমাদের

বাবুর বাপই তো প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দিল। জামাইকে এক লক্ষ টাকা আর একটা মোটরসাইকেল দিয়েছে বিয়েতে। বিবেক বলেও তো একটা কথা আছে। এমনি কিভাবে পাঠিয়ে দেয় মেয়ে?'

এটুকু শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ইরার। নীরা চোখের ইশারায় বোনকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করল। ইরা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চুপ

করে রইল। জাহানারা বিরস মুখে বললেন,‘ ওদের বিবেকে বাঁধে নাই তাই দেয় নাই। অন্তু আর অন্তুর আব্বা কেউই এসব দেওয়া-নেওয়া পছন্দ করে না। আমার শ্বশুর আব্বাও পছন্দ করতেন না। হাদিসে যৌতুক হারাম।’

মহিলা এবার দমে গেলেন। মিনমিন করে বললেন,

‘ যৌতুক কই ভাবি? এগুলো তো সামাজিকতা।’

জাহানারা জবাব দিলেন না। ইরা বোনের প্রতি বিরক্ত হয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। কিছুটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল। কানে এলো মহিলার কিছু কুৎসিত ভাবনা,‘ ভাবি? শুনলাম বউ নাকি আপনার ছেলের থেকে বড়? কি একটা জামানা আসছে বলুন তো ভাবি।

এই বুইড়া বুইড়া মেয়েগুলো ভদ্র-নম্র ছেলেদের মাথাগুলো একদম চিবিয়ে খাচ্ছে। আমার ননাশের ননদের ছেলে সৈকতও এমন এক কান্ড করেছে জানেন? হুট করেই একদিন তার থেকে চার বছরের বড় এক মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে উঠাল। ছেলের কান্ড দেখে আপা কি করল জানেন? খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে বিছানা নিল। এই বউকে সে মানবে

না। এদিকে ছেলেও বউ ছাড়বে না। কাঁচা বয়স ছেলের, বাপ-মায়ের কথা শুনে? দুলাভাইও রাগারাগি। ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দিবে দিবে অবস্থা।আমরা অনেক বুঝানোর পর আপা-দুলাভাই মেনে নিল। কিন্তু আল্লাহর কি কাজ ভাবি, বিয়ের দুই বছরের মাথায় সৈকত বউরে তালাক দিয়ে দিল। বউরে নাকি এখন আর ভালো লাগে না। লাগব কেমনে?

জোয়ান পুরুষ মানুষ কচি মেয়ে বিয়ে করবে। বয়স্ক মেয়ে ক'দিন মনে ধরবে? আপনার ছেলেও না এমন করে ভাবি!'

মহিলার বলা প্রতিটি কথা যেন বিষের মতো ঠেকল নীরার কানে। ছলছলে চোখদুটো নিয়ে শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বোনের দিকে তাকাল। ইরার রক্তলাল চোখদুটোর দিকে চেয়ে চুপ

থাকতে অনুরোধ করল। ইরা কিছু বলল না। বোনের দিকে নীরব দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ঢুকে গেল। নীরা নিজেকে শান্ত করে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই জবাব দিল জাহানারা,‘ আমার ছেলে আপনাদের সৈকতের মতো নয় ভাবি। আর না ছেলের বউ অন্ত থেকে চার-পাঁচ বছরের বড়। মাত্র দুই মাসের পার্থক্য। এইটুকু পার্থক্য চোখে বাজে

না। সংসার টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা, ভরসা আর সততা লাগে। আমি তো শুনেছিলাম, সৈকত ছেলেটার নাকি চরিত্রগত সমস্যা আছে? ছেলের চরিত্র খারাপ থাকলে তো ভাবি কচি খুকির সাথে বিয়ে দিলেও বেশিদিন মনে ধরবে না।'ঘড়িতে তিনটা বাজে। দুপুরের তীব্র রোদে বিকেলের মোলায়েম আভা ফুটছে। ক্রমেই স্নিগ্ধ হয়ে উঠছে চারপাশ।

ভার্সিটির নির্দিষ্ট একটি হলের ছাঁদে পা ঝুলিয়ে বসে আছে এক যুবক। পরনে তার থ্রী কোয়াটার প্যান্ট আর টি-শার্ট। মাথা ভর্তি এলোমেলো ঘন চুল। চোখ বন্ধ। হাত ছুটছে গিটারের তারে। তার পাশেই রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে আছে অন্ত। হাতদুটো বুকের উপর স্থির।

‘ তোর আজাইরা টুংটাং শুনতে ভালো লাগছে না। টিএসসি চল।’

নাদিম থামল। রেলিঙ থেকে লাফিয়ে নেমে বলল,‘ অনুমতি নাই। রঞ্জন দুই মিনিটের মাথায় ফোন দিবে। তার নাকি তোর সাথে বিশেষ আলাপ আছে? আমার উপর কড়া হুকুম, রঞ্জন ফোন দেওয়ার আগ পর্যন্ত তোকে নিয়ে আঠার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া করা যাবে না। তুইও নড়াচড়া করিস না। আঠার মতো দাঁড়িয়ে থাক।’

অন্তু বিরক্ত চোখে তাকাল। আর প্রায় সাথে সাথেই নাদিমের ফোনে দেখা দিল সুদর্শন এক যুবক। লাল রঙা শর্টস আর ঢোলাঢালা হোয়াইট টি-শার্ট পরে বসে আছে সে। মাথাভর্তি হালকা বাদামি চুলগুলো কপালময় বিস্তৃত। গায়ের ফর্সা রঙে কেমন বিদেশি বিদেশি ভাব। চুলের ছাঁটটাও আগের থেকে ভিন্ন। অন্তু আর নাদিমকে দেখেই অমায়িক

হাসল রঞ্জন। নাদিম আর অন্তর মনে একই সাথে বেজে উঠল একটিই শব্দ, ‘মা-শা-আল্লাহ’। বন্ধুদের সাথে স্বাভাবিক কুশলাদি শেষ করেই ফট করে প্রশ্ন করল রঞ্জন,‘ তুই-নীরু, তোরা কেমন আছিস অন্ত?’

‘ কয়বার জিগ্যেস করবি? বললাম তো, সবাই ভালো।’

রঞ্জন মৃদু হেসে বলল,

‘ সবার কথা তো জিজ্ঞেস করিনি। তোর আর নীরার কথা আলাদা করেও জিজ্ঞেস করিনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোরা দুজন মিলে কেমন আছিস?’

অন্তু কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ ভালো আছি।’

রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শান্ত কণ্ঠে বলল,‘ তোরা কতটুকু ভালো আছিস

জানি না। কিন্তু চাইলেই প্রত্যাশা থেকেও বেশি ভালো থাকতে পারিস। বিয়েটা খুব স্বাভাবিকভাবে না হলেও কিন্তু হয়েছে দোস্ত। আর তাদের সাথেই হয়েছে যাদের তোরা মনেপ্রাণে চাইতি। কেউ প্রকাশ্যে বা কেউ গোপনে। পার্থক্যটা এখানেই। ভালোও দুজনেই বেসেছিস। দোষও দু'জনেই করেছিস। সাফারও দু'জনেই করেছিস। কেউ বেশি বা

কেউ কম। দেটস ইট। অতীতে কি হয়েছে সেটা নিয়ে বসে থাকা বোকামি। আর বসেই যদি থাকিস তাহলে কতদিন থাকবি? সারাজীবন? নীরাকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা তোর একসময় থাকলেও এখন নেই। ওকে ছাড়া তুই নিজেই থাকতে পারবি না। এটা মানতে তুই বাধ্য। ধরা যেহেতু দিতেই হবে তাহলে শুধু শুধু দূরত্ব বাড়িয়ে লাভ কী?

মেয়েটাকে কষ্ট দিস না দোস্ত। আমাদের নীরু কেমন চাপা স্বভাবের তা তো তুই জানিস। দোষ নাহয় করেছে। তুইও তো করেছিস, তাতে কি? ভালোবাসিস বলে নয়, বন্ধু হিসেবেই নাহয় সব ভুলে যা। হাতটা শক্ত করে ধরে একটু কাছে টেনে নে। নাদিমের থেকে যতটা শুনলাম তাতে মনে হলো, নীরা তোকে পজিটিভলিই চাইছে। সে

সম্পর্কটাকে এগুতে চায়। ওর মতো মেয়ের এক পা এগিয়ে আসা মানে অনেক কিছু।’এই পর্যায়ে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গেল অন্তু। কটমট চোখে নাদিমের দিকে তাকাল। নাদিম মাথা চুলকাতে চুলকাতে অন্যদিকে তাকাল। অন্তুর নজরের হেরফের হয়নি দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

‘ ওমনে তাকাস ক্যান বাল? কি কইছি আমি? আমি শুধু কইছি অন্তর নাহাল ব্যান্ডেজ লাগাইয়া ঘুরার জন্য হইলেও একটা বউপোকা দরকার। পোকায় কামড়ায় না বইলাই তো ফার্মেসীর সামনে দিয়া যাই অথচ ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ কিনতে পারি না। ফার্মেসীর মালিক গো লাইগা মায়া লাগে। ভাই তোর যেহেতু বউপোকা আছে, তুই তার সঠিক ব্যবহার কর।

ফার্মেসীর মালিকদের একটু উপকার কর। প্রয়োজনে আমি,নমু, রঞ্জন, ছোঁয়া মিইল্লা তোরে ব্যান্ডেজ কিনে দিমু। নিজেরা লাগাতে পারতেছি না তাতে কি? তুই লাগাবি। দরকার পড়লে সারা শরীরে লাগাবি।’

অন্তু নাদিমের দিকে তেড়ে গিয়ে বলল,

‘ শালা! এই তুই খাঁড়া! তোর মৃত্যু আজ অনিবার্য!’ইরা ঘরময় পায়চারী

করছে। রাগে শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে তার। নীরা বিছানার উপর বসেছিল। মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ এতো রেগে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি ইরু। দয়া করে এই নিয়ে ঝামেলা বাড়াস না।’

ইরা নীরার সামনে এসে দাঁড়াল। ফুঁসে উঠে বলল,

‘ আমি ঝামেলা বাড়াচ্ছি? আমি? তোমার কি বিন্দুমাত্র সেল্ফ রেসপেক্ট

নেই আপু? এতোকিছুর পরও মুখে কুলুপ মেরে বসে আছ। পড়াশোনা করেছ। শিক্ষিত একটি মেয়ের মাঝে সমাজের নিকৃষ্টদের মতো আচরণ কেন থাকবে? সেই মধ্যযুগের মতো স্বামীর পা ধরে বসে থাকা তোমায় শোভা পায় না আপু। তোমার উচিত এদের মুখে ডিভোর্স পেপার ছুঁড়ে ফেলে নিজের মূল্য বোঝানো। ঘরের বউ বলে যা ইচ্ছে তাই করবে? যা

ইচ্ছে তাই বলবে? বিয়ে করে কিনে নিয়েছে? কি পরবে, কি খাবে সেটা ওরা ঠিক করে দেওয়ার কে? ফাকিং দ্য সিস্টেম।" ইরু আস্তে।'

ইরা আরও চেতে উঠল এবার। বোনের দিকে চেয়ে গলা উঁচু করে বলল,

' আস্তে?কেন? আস্তে কেন বলব? মিথ্যা কিছু বলেছি? তোমার মতো সতী সাবিত্রীদের জন্যই মেয়েদের

আজ এই অবস্থা। সত্য কথা বলতে ভয় কিসের? কিসের এতো ভয় পাও তুমি? ওদের সাহস কি করে হয় তোমার বয়স নিয়ে কথা বলার? আমরা তাদের পায়ে ধরেছিলাম তোমাকে বিয়ে করার জন্য? তাদের ছেলে যে এতোসব কান্ড করল সেগুলো তাদের চোখে পড়ে না? তোমার জায়গায় আমি থাকলে এমন স্বামী সংসারকে লাথি দিয়ে

নিজেদের অবস্থান বুঝাতাম। এনিওয়ে, তুমি যে দিন-রাত এসব কথা শুনে শুনে পেট ভরাচ্ছ তা তোমার ফেরেস্তার মতো স্বামী জানে?নাকি এসব তার ইন্ধনেই চলছে?’ইরার কথায় কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করল না নীরা। শান্ত চোখে চেয়ে বলল,

‘ তোর ভাইয়া কিছু জানে না। এসব জানার প্রয়োজনও তার নেই। গলার

স্বর নিচু করে চুপচাপ বোস। উচ্চবাচ্য করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না ইরু।'

ইরা জবাব দিল না। চোখ-মুখ শক্ত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নীরা নরম কণ্ঠে বলল,

' তোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করলে, আমার সেল্ফ রেসপেক্ট নেই। আমার স্বামী-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বেরিয়ে যাব তো যাব

কোথায় সেটা তো বললি না। বিয়ে ভাঙার পর কম অপদস্থ হতে হয়নি আমায়। নিজের জন্মদাতা মায়ের কাছেও উঠতে বসতে জ্বালাধরা কথা শুনতে হয়েছে। মায়ের কথা সহ্য করতে পারলে শাশুড়ি মায়ের ঝাঁঝ কেন সহ্য করতে পারব না ইরু? উনি শাশুড়ি বলে? জামা-কাপড়ের প্রতি মায়ের দেওয়া রেস্ট্রিকশন মেনে চলতে পারলে শাশুড়ি মায়ের

রেস্ট্রিকশন মানতে দোষ কি? আচ্ছা ওসব বাদ দে। ধর, আমি তোর ভাইয়াকে ডিভোর্স দিলাম। কিন্তু তারপর? তোর উত্তর হবে, পড়াশোনা করেছি। নিজের খরচ চালানোর যোগ্যতা আমার আছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পড়াশোনা করলেই কি চাকরী পাওয়া সম্ভব? সব শিক্ষিতদের চাকরী দেওয়ার যোগ্যতা কি

সরকারের আছে? ধর, চাকুরীটাও পেয়ে গেলাম। কিন্তু আমার সেফটি? দিনশেষে কে হবে একটু ভরসা? আমার মা? ভাই? অথবা তুই? একবার বিয়ে ভাঙার পর পরই যারা সমাজের রোষানলে পড়ে প্রায় ছাড়তে চলেছিল আমায় তারা কী শেষ পর্যন্ত এই সো কল্ড ডিভোর্সী মেয়ের পাশে থাকবে বলে তোর ধারণা? থাকবে না ইরু। কেউ

থাকবে না। এমনকি তুইও না।’ইরা কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই তাকে থামিয়ে দিল নীরা। ভীষণ ধৈর্য নিয়ে ছোটবোনকে বোঝানোর চেষ্টা করল, ‘ সব জায়গায় প্রতিবাদ করতে নেই ইরু। সব প্রতিবাদ সুখ ঢেকে আনে না। মাঝে মাঝে সহ্য করে নিতে হয়। মানিয়ে নিতে হয়।’

ইরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,‘ সহ্য? এটা সহ্যের পর্যায়ে পড়ে বলে তোমার

ধারণা? উঠতে বসতে নিজের যোগ্যতা, পরিবার, ভূষণ-ভাষণ নিয়ে খোঁটা খেয়ে চলা তোমার কাছে মানিয়ে নেওয়া? সারাজীবন এভাবে মানিয়ে মানিয়েই কাটিয়ে দিবে তুমি? সারাদিন গাধার মতো খাটছ। তাদের তালে তালে নাচছ তবুও প্রাপ্য সম্মানটুকু নেই। এটা বাড়ির বউয়ের নমুনা? এমন হলে আমি কারো বাড়ির বউ হতে চাই না।

এমন নিকৃষ্ট জীবন থেকে একটা গৃহপালিত পশুর জীবনও বেশি প্রেফার করব আমি। তাদের অন্তত দুই লোকমা ভাতের বিনিময়ে উঠতে বসতে অপমান গিলতে হয় না। তোমাদের এই মানিয়ে নেওয়া তদবিরের জন্যই সমাজের এই অবস্থা। আজ তুমি মানিয়ে নিচ্ছ। কাল তোমার মেয়ের মাথাতেও এই একই বীজ ঢুকাবে। পরশু সেই-ও

মানিয়ে নিবে। এই মানিয়ে নেওয়ার ট্রেন্ডগুলো দিয়ে সমাজটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে তোমার মতোই কিছু সতীসাবিত্রী। নিজের জীবনটা নরক বানানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানের জীবনটাও নরক বানাচ্ছ। তোমার নিজের প্রতি ঘৃণা আসছে না আপু?'নীরা স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইল। ইরা নিজের রাগ ধরে রাখতে না পেরে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিল।

নীরার সামনে চেয়ার টেনে বসল। টেবিলের সামনে থেকে চেয়ার টেনে নিতেই প্রচন্ড শব্দ হলো মেঝেতে। ইরা ক্ষোভ নিয়ে বলল,

‘ তুমি এক সময় আমার আইডল ছিলে আপু। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে সংগ্রামটা তুমি করেছিলে, যে সাহসটা দেখিয়েছিলে সেই সাহসটা ছিল আমার অনুপ্রেরণা। আমার ভেতরটা বদলে

গিয়েছিল আপু। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম, তুমি অন্যরকম। সমাজের বিশ্রী নিয়মগুলোতে বাঁধা পড়ার মানুষ তুমি নও।কিন্তু আমি ভুল। তুমি পাল্টে গিয়েছ আপু। আজ এতোদিন পর তোমাকে আমার মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হচ্ছে। আত্মসম্মানহীন বলে মনে হচ্ছে। আর এমন একজন মানুষের জন্য মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছ যার কাছে

তোমার বিন্দুমাত্র সম্মানটুকু নেই। আমি বিস্মিত হয়ে দেখছি, একটা মানুষ কিভাবে তার ভাইকে নিজের স্ত্রীর ড্রেসআপের কথা বলতে পারে? নিজের স্ত্রীর পোশাক নিয়ে আলোচনা কি ভাইয়ের সাথে শোভা পায়? কতটা কাপুরুষ সেই ব্যক্তি। ছিঃ!'নীরার চোখদুটো টলমল করে উঠল। বুকের ভেতর কিছু একটা ভেঙে গুঁড়ো হলো। ইরার অনবরত

ছুঁটতে থাকা ঠোঁটদুটোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল নীরা। ভাষাহীন, অনুভূতিহীন চোখদুটোতে নামল ফোঁটা ফোঁটা সাদা বৃষ্টির নহর।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই মায়ের থমথমে মুখ দেখল অন্ত। দুই একটা প্রশ্ন করেও উত্তর না পেয়ে নিজের রুমের দিকে পা বাড়াল। দরজার কাছাকাছি আসতেই ব্যাগ হাতে

বেরিয়ে এলো ইরা। ইরার থমথমে, রাগান্বিত চোখ-মুখ দেখে কিছুটা থমকাল অন্ত। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ কি ব্যাপার? ব্যাগ হাতে কোথায় যাচ্ছ?’

‘ বাড়ি ফিরছি।”‘ বাড়ি ফিরছ মানে? এই সন্ধ্যাবেলা একা কিভাবে যাবে তুমি? যেতে যেতে কত রাত হবে ধারণা আছে? আজ রাতটা আপাতত

থাকো। আমি নাহয় কাল পৌঁছে দেব তোমায়।’

ইরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। তাচ্ছিল্য নিয়ে বলল,

‘ যাকে সঙ্গ দেওয়ার কথা তার খোঁজটাও তো নিতে পারেননি ভাইয়া। অযথা আমার প্রতি মায়া দেখিয়ে কি লাভ? কাপুরুষদের পুরুষসুলভ অভিনয় আমার একদমই পছন্দ নয়, ভাইয়া।’

ইরার অপ্রত্যাশিত উত্তরে হতবুদ্ধি হয়ে গেল অন্তু। ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীরা। চোখ-মুখ ঈষৎ লাল। শাড়ির আঁচল অবিন্যস্ত। নীরা কণ্ঠে কঠোরতা ঢেলে বলল,‘ ভদ্রভাবে কথা বল ইরু।’

ইরা প্রায় সাথে সাথেই উত্তর দিল, ‘ এটাই তো আমার সমস্যা আপু। আমি যার তার সাথে ভদ্রতা বজায় রাখতে পারি না।’

ইরার উগ্র ব্যবহারে অবাক হলো অন্ত। সবার চোখ-মুখের গম্ভীরতা দেখে কিছু একটা আঁচ করল সে। নীরার মুখের দিকে চেয়ে অকৃত্রিম উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ কি হয়েছে?’

নীরাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই অন্তকে পাশ কাটিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল ইরা। অন্তকে স্তম্ভিত করে দিয়ে, সকলের

নিষেধকে উপেক্ষা করে, ভরা সন্ধ্যায় রূপগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলো ইরা। অন্ত নিজের দোষ বুঝতে না পেরে অসহায় চোখে চেয়ে রইল শুধু!অফিস থেকে ফিরেই মেয়ের ঘরে উঁকি দিলেন নুরুল সাহেব। অন্ধকারে ডুবে থাকা ঘরটিতে ঝাপসা জ্যোৎস্নার আলো। ঘরজুড়ে হিম ধরা নিস্তব্ধতা। নুরুল সাহেব সাবধানে দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

খোলা জানালার মুখে, জ্যোৎস্নায় ডুবে থাকা রমণীকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসলেন। রমনীর বাঁধনছাড়া উন্মুক্ত চুলে তখন ঢেউ খেলানো জ্যোৎস্নার মেলা। নুরুল সাহেব ধীর পায়ে জানালার মুখোমুখি বিছানায় এসে বসলেন। আদুরে কণ্ঠে ডাকলেন,

‘ নমু মা?’

নম্রতা চমকে তাকাল। পরমুহূর্তেই বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে ঝলমল করে উঠল তার মুখ। জানালা থেকে সরে গিয়ে বাবার পাশে গিয়ে বসল। হাসিমুখে বলল,‘ শুভ সন্ধ্যা, বাবা।’

নুরুল সাহেব হাসলেন। নম্রতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ তোর সাথে কিছু কথা ছিল মা।’

নম্রতা আগ্রহ নিয়ে তাকাল। নুরুল সাহেব ছোট্ট একটা শ্বাস নিয়ে বলল,

‘ তুই কি এখন বিয়ের জন্য তৈরি মা? ডাক্তার আরফানের বাড়ি থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। আমরা কি এগোব।’

নম্রতা উত্তর দিল না। নুরুল সাহেব আবারও বললেন,‘ জীবনটা যেহেতু তোর। জীবন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হবে শুধু তোর। তোর যদি মনে হয়, তুই তৈরি আছিস তাহলে আমরা এগোব। আর যদি মনে হয় আরও

সময় প্রয়োজন তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট হলো তোর হ্যাপিনেস। তুই খুশি তো পৃথিবী খুশি। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই।'

নুরুল সাহেবের কথা শেষ হতেই চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে গেল ঘর। নম্রতা আর নুরুল সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন।

নম্রতার মা এক হাতে খাবারের ট্রে নিয়ে গটগট করে ভেতরে ঢুকলেন। তার পেছন পেছন এলো নন্দিতা। খাবারের ট্রে-টা টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মেহরুমা,‘ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই। আমি এসব ডাক্তার-ফাক্তারের কাছে মেয়ে বিয়ে দেব না। আজ ঢাকা আছে কাল যদি কোনো পাড়াগাঁয়ে পোস্টিং হয়

তখন? বড় আপার ছেলের পোস্টিং কোথায় হয়েছিল দেখোনি? ঠিকঠাক যোগাযোগ সুবিধা পর্যন্ত নেই। ওখানে আমার মেয়ে কেমন থাকবে কে জানে?মেয়েকে আমি ঢাকার বাইরে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব? মেয়ের উপর যদি ওরা অত্যাচার টত্যাচার করে?’

মেহরুমার কথায় তিন জোড়া চোখ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। তিনজন

একে অপরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে আবারও মেহরুমার দিকে তাকাল। নুরুল সাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন,

‘ তোমার দূরদর্শী চিন্তায় মুগ্ধ আমি মেহরুমা। ইউ আর আ গ্রেট উইমেন। কি আশ্চর্য! এই দূর্দান্ত যুক্তিগুলো আমার মাথায় কেন এলো না মেহরুমা?’নন্দিতা মুখ টিপে

হাসল। মেহরুমা ক্ষেপে উঠে বললেন,
‘ এই তুমি আমার সাথে ফাজলামো করছ?’
নুরুল সাহেব সরল গলায় বললেন,
‘ হ্যাঁ, করছি। তোমার কথাবার্তা ফাজলামো করার মতোই বলে মনে হচ্ছে। গ্রো আপ মেহরুমা।’
মেহরুমা জ্বলে উঠে বললেন,

‘ কেন? কি এমন বলেছি আমি? আমার মেয়েকে নিয়ে আমার চিন্তা থাকবে না? আমার ভোলাভালা মেয়ে, সংসারের জুত ঝামেলা বুঝে কিছু? আমি এমন জায়গায় মেয়ে দেব যেখানে তার এক গ্লাস পানি পর্যন্ত ঢেলে খেতে হবে না।’

নুরুল সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। চশমা পরিষ্কার করতে করতে বিরবির করলেন,

‘ নির্বোধ মহিলা।’

মেহরুমা রাগান্বিত চোখে তাকালেন। বাবা-মার ঝগড়ার প্রথম পর্যায় দেখে মৃদু হাসল নম্রতা। নুরুল সাহেব শান্ত কণ্ঠে বললেন,‘ আরফান নামক ছেলেটিকে আমি দেখেছি। দূর্দান্ত ছেলে, জেন্টেলম্যান। অত্যাচার তো দূর, তোমার মেয়েকে মাথায় তুলে রাখবে। এরপরও যদি সেটিসফেকশন না আসে তাহলে

তুমি নিজেই ওদের সাথে দেখা করো। কথা বলো। উনারা আমাদের নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। তাদের দেখে-শুনে যদি মনে হয়, সেখানে তোমার মেয়ের এতটুকু অযত্ন হবে তাহলে বিয়ে ক্যান্সেল।'

মেহরুমা স্বামীর কথার পিঠে কিছু বলবে তার আগেই উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল নম্রতা। মায়ের গালে আলতো চুমু খেয়ে ভীষণ আদুরে

কণ্ঠে বলল,‘ আই লাভ ইউ আম্মু। তুমি পৃথিবীর সব থেকে ভালো আম্মু। আমি তোমাকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসি।’

নম্রতার এটুকু কথাতেই চোখদুটো ছলছল করে উঠল মেহরুমার। বোনের দেখাদেখি ছুটে এলো নন্দিতা। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল গালে। মেয়েদের হাতের

উপর হাত রেখে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মেহরুমা,

‘ তুমি ওদের মানা করে দাও তো। আমি আমার মেয়েদের বিয়ে-শাদি দেব না।’

নম্রতা হাসল। নন্দিতা তীব্র প্রতিবাদ করে বলল,

‘ আমি বিয়ে না করলে আমার হবু বর চিরকুমার থেকে যাবে না? বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে আম্মু।

আমি তো আমার বরকে কষ্ট দিতে পারি না।’নন্দিতার কথায় হেসে ফেললেন নুরুল সাহেব। মেহরুমা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন,

‘ এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব বেয়াদব মেয়ে। সারাদিন ‘বিয়ে বিয়ে’ করবে না। বাবার থেকে এসব বেলেহাজ কথা শিখেছ দুজনে। খবরদার আমার মেয়েদেরকে এমন

বেলেহাজ কথা বলতে শেখাবে না, নমুর বাবা।'

নুরুল সাহেব হাসলেন। হাত বাড়িয়ে মেয়েদের কাছে ডেকে বললেন,

' বন্ধুদের সাথে যে কথাগুলো অনায়াসে বলা যায় সেই কথাগুলো বাবা-মাকে কেন বলা যাবে না মেহরুমা? ”বাবা-মা সন্তানের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু” এই কথাটা তো শুধু মুখে মুখে আওড়ালে হবে

না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জাস্ট বিহেভ লাইক আ ফ্রেন্ড। আমার মেয়েরা আমার কাছে উন্মুক্ত। লজ্জা ধরে রেখে চুপ থাকতে শেখালে তো ওদের সমস্যা, দুর্বলতা, প্রশ্নগুলো আমার পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ওদের বলতে দাও। লাভিং ডটারস্? ইউ ক্যান ছে এনিথিং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট।'খাবার টেবিলে থমথমে নিস্তব্ধতা। জাহানারার মুখশ্রী গম্ভীর।

খাবার টেবিলের ছোটখাট কাজগুলোতে প্রকাশ পাচ্ছে তেজ। নীরা শুকনো মুখে ভাতের গামলাটা হাতে নিতেই একরকম ছিনিয়ে নিলেন জাহানারা। আনিসুল সাহেবের পাতে ভাত বেড়ে দিয়ে বাকি কাজটুকুও করলেন নিজ হাতে। অন্তু ব্যাপারটা নিঃশব্দে খেয়াল করল। নীরা মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ আপনিও বসে পড়েন মা। খাবারগুলো আমি এগিয়ে দিচ্ছি।’ জাহানারা ক্ষোভ নিয়ে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। সন্ধ্যা থেকেই নীরাকে চোখে লাগার মতো এড়িয়ে চলছেন তিনি। কোন কথা বলছেন না। কোনো কাজে হাত লাগাতেও দিচ্ছেন না। নীরা মিনমিন করে আবারও একই কথা বলতেই ধমকে উঠলেন জাহানারা,‘ কেন?

তুমি এগিয়ে দেবে কেন? যাতে বাপের বাড়ি গিয়ে বলতে পারো, শ্বশুর বাড়িতে শাশুড়ী তোমায় খাঁটিয়ে মেরেছে? তোমার জীবন নাশ নাশ করে দিয়েছে?'

নীরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ত বিরক্ত হয়ে বলল,

' এভাবে কথা বলছ কেন আম্মা?'

অন্তর কথায় যেন জ্বলে উঠলেন জাহানারা। সন্ধ্যায় নীরার কথাগুলো

কানে না এলেও ইরার কথাগুলো কান এড়ায়নি তার। সেই ক্ষোভ আর রাগ নিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,

‘ ও খুব খারাপভাবে বলে ফেলেছি? তোর বউয়ের পা ধরে মাফ চাইতে হবে এবার?’

অন্তু আহত কণ্ঠে বলল,

‘ আম্মা!’

জাহানারা বেগম টলমলে চোখে তাকালেন,‘ আম্মা? কিসের আম্মা?

আম্মা মানিস আমারে তুই? বিয়ের দুইদিনের মাথায় বউয়ের আঁচল ধরতে শিখে গিয়েছিস। তোর বউ পটের রাণী। তার জন্য এই বয়সে এসে, জোয়ান ছেলের সামনে চড় খেতে পেরেছি আর সামান্য পা ধরতে পারব না? তোর বউকে তো সমঝেই চলতে হবে এখন। কত লায়েক হয়ে গিয়েছিস তুই। আজ স্বামীর হাতে চড় খেয়েছি কাল

ছেলের হাতে চড় খাব। সমস্যা কই?’

নীরার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তু হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ ছোট্ট একটা কথা ধরে কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছ আম্মা?“ আমারে আম্মা ডাকবি না। আমি কারো আম্মা নই। তোর বউকে নাকি গাধার মতো খাটিয়ে মারি আমি? বিরাট অপরাধ হয়েছে

আমার। আজ থেকে তার কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। স্বামী-ছেলের ঘাড়ে বসে খাচ্ছি। জন্মমূর্খ মানুষ। বউকে কথায় কথায় অপদস্ত করি। ছেলে ক্ষেপে গিয়ে দুই চারটা চড় মারতেই পারে। মাফ করে দে। কাল থেকে সব কাজ আমি করব। কাজ করে দু'মুঠো ভাত জুটলে খাব নয়তো নয়।'

ভাতের শেষ লোকমাটা গলা দিয়ে নামল না অন্তুর। মায়ের মুখের দিকে আহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আনিসুর সাহেব ধমকে উঠে বললেন,' দুমুঠো জুটলে খাবে মানে কি? তোমার ছেলের পয়সায় খাও তুমি? এই বাড়ি তোমার ছেলের? এতো লায়েক... '

নীরার নতশ্রী শুকনো মুখটাতে খেলে গেল অচেনা এক উদ্বেগ। ইরার সেই

অবুঝ তেজ যে গুছিয়ে আসা সংসারটাকে আবারও নরক করে দিয়ে গেল তা কি করে সামলাবে নীরা? বোনের ভালো করতে গিয়ে কি ভয়ানক সর্বনাশটাই না করে গেল মেয়েটা!ঘড়িতে কয়টা বাজে জানা নেই নীরার। বারান্দায় আজ জ্যোৎস্নাদের মেলা। ঝিরঝিরে বাতাসে মৃদুমন্দ ঠান্ডাভাব। বারান্দার এক কোণায় টুলের উপর বসে আছে

নীরা। উদাসী দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা ভর্তি আকাশে। শাড়ির আঁচলটা গড়িয়ে আছে মেঝেতে। হাত খোপা করা চুলগুলো আজ উন্মুক্ত। গালের উপর শুষ্ক জলের ধারা। বেশ কিছুক্ষণ অনুভূতিশূন্যভাবে বসে থেকে দুই হাতে মুখ ঢাকল নীরা। বুক বেয়ে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। নিজের জীবনটাকে আরও একবার বোঝা বলে বোধ হলো তার। বেঁচে

থাকাটা বড়ই নিষ্প্রয়োজন, অযথা বলে মনে হতে লাগল।প্রিয়দের জীবনে নিজের জন্য বিন্দুমাত্র মিষ্টতা খুঁজতে খুঁজতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঠিক তখনই অন্যকারো উপস্থিতি টের পেল নীরা। মুখ থেকে দুহাত সরাতেই বারান্দার দরজায় অন্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। নীরাকে অবাক করে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো অন্ত। মেঝেতে হাঁটু

গেড়ে নীরার মুখোমুখি বসল। নীরার হাতদুটো আলতো করে নিজের হাতে তুলে নিয়ে চোখে চোখ রাখল। নীরার বিস্মিত, স্তম্ভিত চোখদুটো থেকে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা টসটসে জল। অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নীরার ডানহাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু খেল তার হাতে। নরম কণ্ঠে বলল,' আম্মা এত রেগে আছেন কেন? কি হয়েছিল সন্ধ্যায়?'

স্তম্ভিত নীরা জবাব দিতে পারল না। স্থির চেয়ে রইল অন্তর চোখে-মুখে। পুরো ব্যাপারটা নীরার কাছে অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে। অন্ত একটা হাত নীরার গালের উপর রাখল।

‘ নিশ্চয় কিছু ঘটেছিল। না বললে জানব কি করে? ইরার সাথে কিছু হয়েছে?’

এবারও জবাব দিল না নীরা। তার শরীর কাঁপছে। এই স্বপ্নটা সত্যিই যদি স্বপ্ন হয় সেই ভয়ে শরীর কাঁপিয়ে কান্না পাচ্ছে। অন্ত আগের মতোই নরম স্বরে ডাকল,

‘ নীরু?’অন্তর এই ছোট্ট ডাকেই ডুকরে কেঁদে উঠল নীরা। চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে বসে ভয়ে ভয়ে মাথা রাখল অন্তর বুকে। অন্ত বাঁধা দিল না। মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত

করার চেষ্টা করল। এই এতোবছর পর নিজের খোলস ভেঙে বেরিয়ে এলো নীরা। অন্তর একটু আদর, একটু প্রশ্রয় পেয়ে বুকের সব কষ্টগুলো এই প্রথমবারের মতো প্রকাশ করল সে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,' আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এই সংসার, এই জীবন আর ভালো লাগছে না। যতই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি ততই সমস্যায়

জড়িয়ে পড়ছি। নিজেকে এতো উটকো কেন লাগছে আমার? কারো জীবনে বিন্দুমাত্র মিষ্টতা নেই আমার জন্য। সারাদিন চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করি, কখন অন্ত ফিরবে। কখন আমার সাথে একটু হেসে কথা বলবে। কিন্তু অন্ত তো কখনও আমার কাছে ফিরে না। আমি এই অন্তকে প্রচন্ড ভয় পাই। তার দিকে

তাকাতে ভয় পাই। তাকে ছুঁতে ভয় পাই।’

এটুকু বলে থামল নীরা। ক্লান্ত কন্ঠে বলল,‘ আমি ক্লান্ত অন্তু। আমার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। একটুও না।’

অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নীরার চুলে আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,

‘ সরি। প্রেমিক হিসেবে সরি। হাজবেন্ড হিসেবে সরি। বন্ধু হিসেবে আই এম এক্সট্রিমলি সরি দোস্ত।’

নীরা মাথা তুলে তাকাল। চোখ ভর্তি বিস্ময় নিয়ে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল। অন্তু নীরার আঁচলটা ঠিক করে দিতে দিতে বলল,‘ কি হয়েছিল সন্ধ্যায়?’

নীরাকে স্থির তাকিয়ে থাকতে দেখে চোখের ইশারায় বলতে বলল অন্তু।

বহুদিন বাদে অন্তুর চোখদুটো যেন চির পরিচিত হয়ে উঠল নীরার চোখে। ইরা আসার পর একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে বলে ফেলল নীরা। অন্তুর কপালে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে কিছু একটা ভাবল। নীরাকে ভীত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসার চেষ্টা করল অন্তু। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস

নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নীরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,‘ ইট’স ওকে। আমি আম্মাকে সামলে নিব। আম্মা উপরে শক্ত হলেও ভেতরে খুব নরম। ইরার ওভাবে কথাগুলো বলা উচিত হয়নি। আম্মা কষ্ট পেয়েছেন। আম্মাকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি নীরা। অতটা ভালো এখনও কাউকে বেসে উঠতে পারিনি।’

এটুকু বলে থামল অন্তু। মুখ কাঁচুমাচু করে অন্যদিকে তাকাল। তারপর ফট করেই বলে ফেলল,

‘ তাই বলে বউকে যে খুব কম ভালোবাসি তেমনটাও নয়।’

কথা শেষ করেই বারান্দা থেকে ভেতরের ঘরে গেল অন্তু। নীরা স্তব্ধ চোখে দেখল, নতুন অন্তুর নতুন সূর্যোদয়।পার্পেল রঙের গাউন গায়ে স্থির বসে আছে ছোঁয়া। কাজের

মেয়েটি চুল বাঁধছে। সিঁথি হক তীক্ষ্ণ চোখে লিপস্টিক পর্যবেক্ষণ করছেন। পার্পেল রঙের জামার সাথে লাল, খয়েরী নাকি পার্পেল রঙের লিপস্টিক লাগানো যেতে পারে তা নিয়ে মারাত্মক দু'টোনায় পড়েছেন। ছোঁয়া মনে মনে নিজেকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। উত্তেজিত হওয়ার বদলে ক্রমেই ঝিম ধরে

আসছে মন। এক সপ্তাহ পরই বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন বাবা-মা। সাইম ব্যস্ত মানুষ অতো ছুটি সে পাবে না। তাছাড়া, বিয়ের পর হানিমুন বলেও একটা ব্যাপার আছে। সাইমের পছন্দ অনুযায়ী দূর্দান্ত কিছু হানিমুন সুইটসও ঠিক করে ফেলেছেন বড় খালামণি আর সিঁথি হক। ছোঁয়াকেও পছন্দের কথা জিগ্যেস করেছিল সাইম। কিন্তু

সিদ্ধান্ত না নিতে নিতে অনভ্যস্ত ছোঁয়া তার পছন্দের কথা জানাতে পারেনি। কোনো পছন্দের জায়গা সে ভেবেই পায়নি। অবশেষে, সবটা মায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থেকেছে সে। আজ আবারও সাইমের সাথে দেখা হবে ছোঁয়ার। এর আগেও বার দুয়েক দেখা হয়েছিল তাদের। সাইম সুদর্শন, ওয়েল মেইনটেনেন্ট ছেলে। ভার্সিটি

প্রফেসর হওয়ায় কথাবার্তায় সবসময়ই প্রফেসর প্রফেসর ভাব। তাদের যেদিন প্রথম দেখা হলো সেদিন সাইমের প্রথম প্রশ্ন ছিল,‘ টাইম ট্রাভেল সম্পর্কে একজেক্ট ধারণা কী আপনার?’

ছোঁয়া কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল এমন প্রশ্নে। কেউ যে হবু বউয়ের সাথে দেখা করতে এসে এমন উদ্ভট প্রশ্ন করতে পারে তা

যেন ধারণাতেই ছিল না ছোঁয়ার। ছোঁয়াকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মৃদু হেসে কফি কাপে চুমুক দিয়েছিল সাইম। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল,

‘ আপনার বড় খালামণি বলেছিলেন, আপনি নাকি প্রচন্ড পড়াকু মেয়ে? বড় খালামণির কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হচ্ছে না।’তারপরের সময়টুকু দক্ষ শিক্ষকের মতো টাইম

ট্রাভেল সম্পর্কে বুঝিয়েছে সাইম। ছোঁয়া বুঝেছে। রেস্টুরেন্ট থেকে বাড়ি ফিরে আপাদমস্তক ক্লাস শেষ করে ফিরে আসার মতো অনুভূতি হয়েছে ছোঁয়ার। অথচ সে ভেবেছিল, ডেইট নামক বিষয়টা ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ হয়!

সিঁথি হক রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই ফোন হাতে নিল ছোঁয়া। নম্রতা-নীরাকে ফোনে না পেয়ে নাদিমকে

ফোন লাগাল। তিনবারের মাথায় ফোন উঠাল নাদিম। প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে বিসমিল্লাহতেই দুই-তিনটা বিশ্রী গালি উপহার দিয়ে বসল সে। ছোঁয়া সেসব তোয়াক্কা না করে বলল,‘ তুই কখনও ডেইটে গিয়েছিস?’

ছোঁয়ার প্রশ্নে যেন আকাশ থেকে পড়ল নাদিম। কয়েক সেকেন্ড চোখ বড় বড় করে চেয়ে থেকে ধমকে উঠে বলল,

‘ ক্যান? ডেইট ফেইটে গেলেও তোরে কইতে হইব ক্যান? বাই এনি চান্স, তুই কি ডেইটের ক্লাসিফিকেশন শোনার লাইগা ফোন দিছিস আমারে? শোন ছোঁয়াইয়া, তুই হইলি ইংরেজ বলদ। বলদদের ডেইটে কোনো ক্লাসিফিকেশন নাই। এদের একমাত্র ডেইট হলো গলা মিলিয়ে হাম্বা হাম্বা করা। তুই তোর অস্ট্রেলিয়ান গরুকে নিয়ে হাম্বা হাম্বা

শুরু করে দে। হাম্বা হাম্বা করতে করতে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙে ফেল। তোদের এই হাম্বা প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করব আমি। পুরস্কারের নাম হবে, 'হাম্বা ডেটিং পুরস্কার' নামটা সুন্দর না?'বেলা নয়টা। রমনায় নিজস্ব অফিসে বসে আছেন নুরুল সাহেব। টেবিলের উপর ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপ আর খুলে রাখা অমীমাংসিত ফাইল।

নাকের ডগায় চশমা রেখে ফাইলের প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি। এমন সময় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বেয়ারা। ছড়ানো ছিটানো ফাইলগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বিনীত কণ্ঠে বলল,

‘ আপনার সাথে একজন দেখা করতে এসেছে, স্যার।’

নুরুল সাহেব ভ্রু কুঁচকালেন। চশমার উপর দিয়ে কুটিল চোখে তাকালেন। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন,

‘ এতো সকালে? এপয়েন্টমেন্ট ছিল নাকি? নাম কি?’

বেয়ারা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল,‘ এপয়েন্টমেন্ট বোধহয় ছিল না স্যার। এই কার্ডটা আপনাকে দিতে

বলেছে। ভেতরে আসতে বলব স্যার?’

নুরুল সাহেব কার্ডটা নিলেন। গোয়েন্দাদের মতো খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেয়ারার দিকে তাকালেন। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললেন,

‘ আসতে বলো।’

বেয়ারা নির্দেশ পেয়ে মাথা হেলিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরই দরজায় মৃদু শব্দ হলো। কেউ একজন ভরাট অথচ বিনয়ী কণ্ঠে অনুমতি চাইল,

‘ মে আই কাম ইন, স্যার?’

নুরুল সাহেব তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড দরজার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়লেন। ঠোঁট নেড়ে বললেন,‘ বসুন।’

আরফান ভেতরে এসে, সালাম দিয়ে, চেয়ার টেনে বসল। আরফানের কার্ডটা এখনও নুরুল সাহেবের হাতে। নুরুল সাহেব কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে বললেন,

‘ ডক্টর আরফান আলম। লেকচারার অব ঢাকা মেডিকেল কলেজ, রাইট?’

‘ জি স্যার।’

‘ স্যার স্যার বলছেন কেন? আমি কি আপনার কলেজের প্রফেসর?’

নুরুল সাহেবের প্রশ্নে কিছুটা অপ্রস্তুত হলো আরফান। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ আপনি একজন সিনিয়র এডভোকেট। অভিজ্ঞ একজন মানুষ। স্যার ডাকাটাই বোধহয় যথাযথ।’

‘ আপনি কোনো কেইসের কাজে এসেছেন নাকি পার্সোনাল?’

আরফান জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল,‘ পার্সোনাল।’

‘ তাহলে স্যার শব্দটা এবোয়েড করুন।’

আরফান কিছুটা বিপাকে পড়ল। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ডান চোখের ভ্রু চুলকিয়ে বলল,

‘ আসলে আঙ্কেল... ‘

আরফানকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন নুরুল সাহেব। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

‘ ইংরেজদের আংকেল ডাকটা আমার পছন্দ নয়।’

আরফান হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ তাহলে চাচা বলে সম্বোধন করতে পারি?’

নুরুল সাহেব বিরক্ত কণ্ঠে আওড়ালেন,‘ চাচা!’

আরফান এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। নুরুল সাহেব ইচ্ছে করেই তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে সুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মুহূর্তেই মুখভঙ্গি পাল্টে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল,

‘ আমাকে মেয়ে জামাই বানালে আমি আপনাকে অনায়াসে বাবা

ডাকতে পারি, স্যার। এটাই হয়তো পৃথিবীর শুদ্ধতম ডাক।'

নুরুল সাহেব ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। আরফানের এমন অপ্রত্যাশিত উত্তরে কিছুটা হোঁচট খেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললেন,' আপনি... '

' আপনি আপনি বলছেন কেন? আমি তো আপনার মক্কেল নই।'

কথার মাঝে বাঁধা পাওয়ায় থমকালেন তিনি। কুঞ্চিত ভ্রু জোড়া

আরও খানিকটা কুঁচকে আরফানের দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বললেন,

‘ আমার কথায় আমায় ফিরিয়ে দিলে? গুড, ভেরি গুড। তবে, আমি তোমার উত্তরগুলো অন্যরকম আশা করেছিলাম।’

আরফান মৃদু হেসে বলল,

‘ বেয়াদবির জন্য সরি, স্যার।’

নুরুল সাহেব অমায়িক হাসলেন। বেয়ারাকে দু কাপ চা দিতে বলে কথা এগুলেন,‘ তোমার মা আমাদের বাসায় সিভি পাঠিয়েছেন জানো?’

‘ জি জানি।’

‘ তাহলে হঠাৎ আমার সাথে দেখা করার কারণ? নম্রতার জেদ?’

আরফান হাসল। নুরুল সাহেব আরফানকে চা নিতে ইশারা করে বললেন,

‘ আমার স্ত্রী বলে, আমি আমার মেয়েদের বিগড়ে ফেলেছি। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। আমার মেয়েগুলো খুব স্বাধীনচেতা, একরোখা, জেদী। আমি কখনও তাদের ডানা কাটিনি বরং উড়তে দিয়েছি। উড়তে শিখিয়েছি। আমার এই বিগড়ে যাওয়া মেয়ের জন্য পাঞ্চুয়াল, ম্যাচিউর এবং রেসপন্সেবল একজন লাইফ পার্টনার

প্রয়োজন। যে আমার মতো তাকে বুঝবে। ডানা কেটে ঘরে না বসিয়ে, উড়তে দিবে। কি মনে হয়? আমার বিগড়ানো মেয়েটাকে সামলাতে পারবে?’আরফান ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে রেখে বলল,

‘ নম্রতার সাথে আমার পরিচয়টাই হয়েছিল তার চূড়ান্ত অবাধ্যতার বয়সে। কলেজ পড়ুয়া জেদী, অগোছালো কিশোরী ছিল তখন।

আমি তাকে ওভাবে ভেবেই অভ্যস্ত। তাকে কখনো শান্ত, চুপচাপ, মানিয়ে নেওয়া ধরনের মেয়ে হিসেবে কল্পনাই করিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তাকে যতটা ভালো রাখতে পারব, অন্য কেউ পারবে না।'

নুরুল সাহেব জবাব না দিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলেন। আরফানের আত্মবিশ্বাসী কথাবার্তা, ব্যক্তিত্ব তীক্ষ্ম

দৃষ্টিতে খেয়াল করলেন। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন,

‘ ডাক্তার হিসেবে তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। গত মাস থেকে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। আজকাল চোখেও দেখছি ঠিকঠাক। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ হাই, হ্যালো করলে স্পষ্ট দেখতে খুব একটা সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।’

আরফান হেসে ফেলল। প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে বলল,‘ মা এসেছেন আমার সাথে। বাইরে অপেক্ষা করছেন। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান।’

নুরুল সাহেব অবাক হলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন,

‘ সে কি? কোথায়? বাইরে বসিয়ে রেখেছ কেন? ডাকো তাঁকে?’

এটুকু বলে নিজেই বেয়ারা ডেকে বাইরে থাকা ভদ্রমহিলাকে ভেতরে আসতে বললেন। কিছুক্ষণের মাঝেই কালো ডোরাকাটা সাদা শাড়ি পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। নুরুল সাহেব উঠে দাড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেই অমায়িক হাসলেন ভদ্রমহিলা। দরজা থেকে হেঁটে ভেতর পর্যন্ত আসতেই প্রকাশ পেলো তার তীক্ষ্ণ

ব্যক্তিত্ববোধ। নুরুল সাহেবের দিকে চেয়ে অমায়িক হেসে বললেন,‘ অসময়ে বিরক্ত করার জন্য মাফ করবেন ভাইসাহেব। কী করি বলুন তো? আপনাদের মেয়ে নিতে চাই। যাদের বুক থেকে জান্নাতের নূর নিতে চলেছি তাদের কী ঘটকের হাতে নিমন্ত্রণ পাঠালে চলে?’

ভদ্রমহিলার আন্তরিক, মিষ্টি কণ্ঠে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন নুরুল

সাহেব। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, নম্রতার বিয়েটা তিনি দিবেন। নম্রতা রাজি না থাকলেও দিবেন। এমন একটা ছায়া। এমন একটা মায়ের লোভ আদৌ হাতছাড়া করা যায়? না, কখনো না।দুপুর গড়াতেই ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে এলো নম্রতার বন্ধুরা। অন্তু নীরাকে নিয়ে বাইকে উঠতেই টিএসসির দিকে হাঁটা দিল নাদিম, নম্রতা আর

ছোঁয়া। অন্তু আর নীরা চোখের আড়াল হতেই দৌঁড়ে এসে নাদিমের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল নম্রতা। নাদিমের বাহুতে জোরেসোরে একটা চড় বসিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলল,

‘ আমি তোকে বলেছিলাম না? একমাত্র রঞ্জনই পারবে অন্তুর মাথায় সুবুদ্ধি ঢুকাতে? দেখেছিস? মিলে গেল তো?’

নাদিমের অপর পাশে পাশাপাশি হাঁটছিল ছোঁয়া। নম্রতার কথা শুনে বেশ কৌতূহল নিয়েই পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল সে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল,‘ কেন? অন্তুর মাথায় কি হয়েছিল আবার? ওয়াজ হি সিক?’

নম্রতা বেশ উৎসাহ নিয়ে বিষয়টা বুঝাতে নিতেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল নাদিম। ভীষণ চোটপাট দেখিয়ে বলল,

‘ এই ইংরেজের বাচ্চা চুপ। শইল্যের উপরে পইড়া ভর্তা বানাইয়া জিগাইতাছিস, ওয়াজ হি সিক? এই তোরা দূরে যাইয়া খাড়া। দুইপাশ থাইকা চাইপা চুইপা স্যান্ডউইচ বানায় ফেলতাছিস আমারে। সর!’

ছোঁয়া চশমা ঠিক করে একটু সরে দাঁড়াল। কপাল কুঁচকে বলল,

‘ শইল? হোয়াট ইজ শইল নমু?’

নম্রতা কণ্ঠে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করে বলল,

‘ শইল অর্থ দেহ। যাহাকে অঙ্গ বলে তাহাই হইল শইল। বুঝেছ?’

ছোঁয়া কি বুঝল বুঝা গেল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,

‘ পরশু আমার বিয়ে, তোরা আসবি না?’

নাদিম চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে বলল,‘ তোগো ছাতার

বিয়েত যাই না। দুই বলদে মিলে হাম্বা হাম্বা করবি ওইনে আমাগো মতো মানুষের কি কাম?’

ছোঁয়া চোখ রাঙিয়ে তাকাল। রাগ নিয়ে বলল,

‘ এসব থার্ডক্লাস ওয়ার্ড আমার সামনে বলবি না। তোর এই থার্ডক্লাস পার্সোনালিটির জন্যই মাম্মা তোকে একদম সহ্য করতে পারে না। ট্রাই টু গিভ আদার রেসপেক্ট।’

ছোঁয়ার কথায় তেড়ে আসতে নিতেই থামিয়ে দিল নম্রতা। মামাকে তিন কাপ চা দিতে বলে নাদিমের পাশে বেঞ্চে গিয়ে বসল। কপাল কুঁচকে বলল,‘ দুই সপ্তাহ পর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। তাও আবার লাস্ট সেমিস্টার। বিয়েটা দুই তিন মাস পরে করলেও তো পারিস। তোর মা এতো তাড়াহুড়ো কেন করছে

বুঝলাম না। বর তো আর ভেগে যাচ্ছে না।’

‘ আরে অস্ট্রেলিয়ান মাল তো। টোটাল হাইব্রিড গরু। কখন উষ্টা খাইয়া মইরা যায়, গেরেন্টি নাই। হের লাইগা এতো তাড়াহুড়া। ঠিক কইছি না ছোঁয়াইয়া?’

কথাটা বলেই ছোঁয়ার মাথায় চাটি মারল নাদিম। ছোঁয়া নাদিমের বাহুতে দুইটা থাপ্পড় দিয়ে সরে

বসল। তারপর বাধ্য মেয়ের মতো বলল,‘ পরীক্ষার জন্যই বিয়েতে এতো তাড়াহুড়ো। বিয়েটা হয়ে গেলে সাইম অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাবে। আমার পরীক্ষা শেষ হতে হতে ওখানের বাদ বাকি ফর্মালিটিসগুলোও কমপ্লিট হয়ে যাবে। নয়তো ওখানের ভার্সিটিতে তো ঠিক টাইমে জয়েন হতে পারব না।’

নম্রতা জবাব না দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। যে মেয়ের কাছে বিয়ের আগের দিনও ভার্সিটি আর পড়াশোনার চিন্তায় বড়। সেই মেয়েকে কিছু বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।টেবিলের উপর থাকা ফোনটা পঞ্চম বারের মতো বেজে উঠতেই বিরক্তি নিয়ে তাকাল আরফান। ফোনটা সাইলেন্ট করে রোগীর কথায় মনোযোগ দেওয়ার

চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুরেফিরে ফোনের ব্যাপারটাই মস্তিষ্কে ছন্দপতন করতে লাগল বারবার। সকাল থেকে একই নাম্বার থেকে কমপক্ষে ছয়- সাতবার কল করেছে একটি মেয়ে। ফোন দিয়ে কথাবার্তা না বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কি আশ্চর্য! কে এই মেয়ে? আরফান আড়চোখে ফোনের দিকে তাকাল। এইতো, আবারও কল করেছে মেয়েটা। আরফান

দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার থেকে কী চাই এই মেয়ে?ঘড়ির কাটা দশটা পেরিয়েছে। রান্নাঘরের দরজায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে নীরা। আজ বিকেল থেকে মাথা ঘোরানোর ব্যামোটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে জাহানারার। কিছুক্ষণ পর পরই চোখের সামনে সব অন্ধকার দেখছেন তিনি। দুই তিনবার মুখ ভরে বমিও করেছেন। তবুও নিজের জেদ বজায় রেখে

একা হাতে যাবতীয় কাজ সামলাচ্ছেন সেই সন্ধ্যে থেকে। নীরার পেছনে অসহায়মুখে দাঁড়িয়ে আছে অয়ন। কিছুক্ষণ পরই টেলিভিশনে দূর্দান্ত ক্রিয়েট ম্যাচ টেলিকাস্ট হবে। মাকে এই অবস্থায় রেখে টেলিভিশন অন করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না অয়ন। নীরা মিনমিন করে বলল,‘ আপনার

শরীর খারাপ মা। আপনি ছাড়ুন, আমি করছি।’

জাহানারা জবাব দিল না। ফ্যাকাশে চোখমুখ নিয়েই পানির কল খুলে হাঁড়ি-পাতিল ধোঁয়ায় মনোযোগ দিল। জাহানারার গম্ভীর মুখভঙ্গি দেখে আরও একবার অনুরোধ করার সাহস পেল না নীরা। বেশ কিছুক্ষণ পর ধৈর্যহারা হয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আনিসুল সাহেব।

তাঁকে রান্নাঘরের দরজার কাছে আসতে দেখেই নিজেকে আরও একটু গুটিয়ে নিল নীরা। শশব্যস্তভাবে মাথায় আঁচল টেনে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল এক কোণায়। আনিসুল সাহেব রাগত কণ্ঠে ধমকে উঠে বললেন,‘ রাখো তুমি এসব। ছেলেদের জন্য বহু খেটেছ আর দরকার নেই। কামাই করে, রেঁধে বেড়ে খেতে পারলে খাবে নয়তো

খাবে না। তুমি কেন কাজ করবা সারাদিন? আমি রোজগার করি না? ছেলে ছেলে করে মরে যাও। কোথায় এখন তোমার ছেলে? মাঝরাতেও বাড়ি ফেরার নাম নেই। বিয়ে করে বহু সেয়ানা হয়ে গিয়েছে আজকাল।’

আনিসুল সাহেবের ধমকা-ধমকির মাঝেই বাড়ি ফিরল অন্তু। ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসছে তার। রাত

নয়টা পর্যন্ত ভার্সিটি লাইব্রেরিতে পড়াশোনা সেড়ে, নাদিমের সাথে দুই কাপ চা আর সিগারেট ধরিয়েছিল অন্তু। বন্ধুর সাথে পারিপার্শ্বিক আলাপচারিতায় চোখের পলকে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ এক ঘন্টা। দশটার দিকে রওনা হয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বাজল এগারোটা। সারাদিনের অভুক্ত শরীরে সিগারেট খাওয়ায় পাক দিয়ে ধরছে

পাকস্থলীর নিম্ন ভাগ। মাথায় ঘুরছে পরীক্ষা, চাকরী, সংসার নিয়ে হাজারও চিন্তা। বাইকে তেল শেষ অথচ হাতে টাকা নেই। ছোঁয়ার বিয়ের জন্য উপহার আরও কত খরচা। অথচ আয়ের উৎসে পকেট খালি। এমন একটা মানসিক চাপের মাঝে বাড়ির এই হৈ-চৈ ভীষণ তিক্ত লাগল অন্তর। ক্লান্ত শরীরে দাঁড়িয়ে থেকে আনিসুল সাহেবের তিক্ত

খোঁটাগুলো হজম করল। কোনোরূপ প্রত্যুত্তর করার চেষ্টা না করে রান্নাঘরে ঢুকল সে। জাহানারার হাত থেকে হাঁড়ি পাতিল সরিয়ে নিয়ে আচমকাই মাকে পাঁজা কোলে করে বেরিয়ে এলো। জাহানারা চমকে উঠলেন। বিস্মিত হলেন। অন্তু মাকে বসার ঘরের সোফায় বসিয়ে দিয়ে ফ্লোরে বসল। জাহানারার একহাত ধরে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,‘ কি করতে

হবে বলো, আমি করে দিচ্ছি। আমার বউ ছুঁলে সমস্যা। আমি ছুঁলে তো সমস্যা নাই আম্মা।’

জাহানারা জবাব না দিয়ে হাত টেনে নিলেন। অন্তু হাতটা আবারও নিজের হাতে নিয়ে বলল,

‘ সারাদিন খাই নাই আম্মা। তুমি তো জানোই তোমার ছেলে ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না। বাড়ি ফিরে যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখি তাহলে

কী আর খেতে ইচ্ছে করে বলো? ইরার ওভাবে কথা বলা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ইরা অন্যের বাড়ির মেয়ে আম্মা। সে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার তো আমার নাই। কাজটা যদি ইরার জায়গায় নীরা করত তাহলে ভিন্ন কথা। আমার বউ আমার মাকে অপমান করলে আমি চুপ করে থাকব না। আমি বলছি না নীরা

নির্দোষ। নীরার উচিত ছিল ইরার ভুল শুধরে দেওয়া। ও বুঝে উঠতে পারে নাই। এবারের মতো ওকে মাফ করে দাও।'শেষ কথাটা বলে নীরার দিকে তাকাল অন্ত। অন্তর চোখের ভাষা বুঝতে পেরে দুই কদম এগিয়ে এলো নীরা। মৃদু বিনয়ী কণ্ঠে বলল,

' ইরার বেয়াদবির জন্য আমি সরি মা। আমি ইরাকে বকাবকি করেছি।

ওকে এ বাড়িতে আসতেও নিষেধ করেছি। ও আর এখানে আসবে না। আপনি এবারের মতো মাফ করে দিন। আর কখনও এমনটা হবে না।’

জাহানারা উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। অন্তু বায়না ধরা কণ্ঠে বলল,‘ আমি জানি তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ। নীরার মাফ চাওয়াতে সেই কষ্ট কমে যাবে না। তবুও বলছি

রাগ করে থেকো না আম্মা। আমি রাগের মাথায় কত কি করে বসি। তুমি কষ্ট পাও আবার মাফও করে দাও। নীরা তো আমারই বউ। তোমার ছেলের বউ তো তোমার মেয়েই হলো। এবারের মতো মাফ করে দাও। ও আর কখনও তোমায় অসম্মান করে কথা বলবে না।
নীরা?খবরদার আম্মাকে অসম্মান করে কোনো কথা যেন না বলা হয়।

আমার আম্মা কষ্ট পেলে কিন্তু আমি কাউকে ক্ষমা করব না। মনে থাকবে?’

নীরা মাথা হেলিয়ে সায় জানাল। জাহানারার চোখ টলমল করে উঠল। চোখের জল ঢাকতে ধমক দিয়ে বললেন,

‘ হয়েছে। এখন এতো ঢং না করে তোর বউকে বল খাবার দিতে।

খেয়েদেয়ে ঘুমা। আম্মার জন্য এতো দরদ দেখাতে হবে না।'

অন্তু হেসে ফেলল। নীরাকে খাবার দিতে ইশারা করে জাহানারার হাত ধরে রেখেই বলল,

' তোমার সঙ্গে খাব। নীরা বলল তুমি নাকি ভাত, ঔষধ কিচ্ছু খাও নাই।'টেবিলে খাবার দিতে দিতে মা-ছেলের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল নীরা। জাহানারা যেমন শাশুড়ীই

হোক, মা তো মা-ই হয়। মাঝেমাঝে এই মায়েরা বড় অভিমানী হয়। এক আকাশ অভিমান জমিয়ে রাখে সন্তানের একটু পরোয়া, একটু আদর পাওয়ার আশায়। সন্তানের একটু হাসিতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয় সেই অভিমানের পাহাড়। চোখ টলমল করে। টলমল করে মা সত্ত্বাও। ইরা এখানে উপস্থিত থাকলে আবারও অশান্তি করত।

নীরাকে মাফ চাইতে দেখে রাগারাগি করত। কিন্তু নীরার আনন্দ হয়। ইরার মতো প্রতিবাদী চিন্তা তার আসে না। এতটুকু মাথা নোয়ানোর ফলে যদি সংসার শান্ত হয় তবে তাতেই তার আনন্দ। এতটুকু মাথা নোয়ানোর ফলে যদি কোনো মা একটু তৃপ্ত হয় তবে এই মাথা নোয়ানোই তার শ্রেয়। পৃথিবীর সবার কি ইরা, নম্রতার মতো

প্রতিবাদী হওয়া সাজে?খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘরে যেতেই নীরার উপর চোখ পড়ল অন্তর। নীরা শাড়ির আঁচল একপাশে তুলে দিয়ে বিছানা ঝাড়ছিল। অন্তর অবাধ্য চোখ প্রথমেই গিয়ে থামল নিষিদ্ধ কোনো জায়গায়। অন্ত কেশে উঠল। তাড়াহুড়ো করে চোখ সরিয়ে নিতেই চোখ ফিরিয়ে তাকাল নীরা। অন্ত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ঘাড় চুলকাল।

শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বিছানায় গিয়ে বসল। কণ্ঠে গাম্ভীর্যতা এনে বলল,

‘ শাড়ি পরার কি দরকার?’

নীরা বিছানা তৈরি করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চুলগুলো হাত খোঁপা করতে হাত উঁচু করতেই ফিনফিনে শাড়ি সরে গিয়ে দৃশ্যমান হলো ফর্সা উদর। অন্তু কপাল কুঁচকে আয়নার দিকে চেয়ে রইল।

আয়নার ভেতর দিয়েই চোখে চোখ পড়ল। নীরা অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল,‘ মা বলেছে।’

অন্তু চোখ সরিয়ে নিল। শার্ট পাল্টে বিছানায় আসতেই ডাকল নীরা। অন্তু চোখে-মুখে জিজ্ঞেসা নিয়ে বলল,

‘ হুম?’

নীরা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে অসহায় চোখে তাকাল। অন্তু টি-শার্টের

উপরের বোতাম খুলে কলারটা একটু ঠেলে দিয়ে আনমনে বলল,

‘ কি হলো?’

নীরার চোখ আটকাল অন্তুর বুকে। পেটানো শরীরে লোমশ বুক আর শ্যামবর্ণ গলদেশের দিকে চেয়ে আচমকায় বলে উঠল,‘ ভালোবাসি।’ জীবনে প্রথমবার, এতো কসরত, এত আকাঙ্খা, এত অপেক্ষার পর নীরার বলা কথাটা ঠিক বিশ্বাস হলো

না অন্তর। অমনোযোগী অন্ত চট করে মনোযোগী হয়ে উঠল। চোখ তুলে নীরার দিকে চেয়ে চোখ ছোট ছোট করে প্রশ্ন করল,

‘ কী?’

নীরার চোখ টলমল করছে। টলমলে চোখে তার আবেদনময়ী চাহনী। সেই সর্বনাশা চাহনির দিকে চেয়ে বুক শুকিয়ে এলো অন্তর। অবাধ্য চোখদুটো জোরপূর্বক নেমে এলো

অর্ধাঙ্গীর লতানো দেহে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিয়ে লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পড়ল অন্তু। ধরফর করা বুক নিয়ে কপাল কুঁচকাল। কপালে ডানহাত রেখে চোখ বন্ধ করল। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল,

' কাল কথা বলি। প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে, ঘুমাব। আলোটা নিভিয়ে দিলে ভালো হয়।'রাত প্রায় দুটো। রাতের নিজস্ব ঝিমঝিম শব্দে ভরে

উঠেছে চারপাশ। খাবার ঘরে গ্লাসে পানি ঢালল কেউ। বাবার রুমের ক্যাটক্যাটে ফ্যানটা বিশ্রী শব্দ দিচ্ছে। এই সবটাই অন্ধকারে ডুবে থাকা ঘরটিতে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনল নম্রতা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কিছুক্ষণ ভূতগ্রস্তের মতো বসে রইল। তারপর ফোনটা নিয়ে এলার্ম বন্ধ করল। আরফানের ডিউটি শেষ হওয়ার কথা একটায়। সেই

অনুযায়ীই দুটোই এলার্ম দিয়ে রেখেছিল নম্রতা। ঘুমটা খানিক কেটে যেতেই আরফানের নাম্বারে ডায়াল করল নম্রতা। প্রথম দফায় বিজি দেখিয়ে দ্বিতীয় দফায় ওয়েটিং দেখাল লাইন। নম্রতার কপাল কুঁচকে এলো। এতোরাতে কার এতো দরকার পড়ল আরফানকে? নম্রতা অপেক্ষা করল। দুই মিনিট পর ডায়াল করতেই আবারও

ওয়েটিং দেখাল ফোন। নম্রতার মাথায় আসা খারাপ চিন্তাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নম্রতা। তৃতীয় বারে ফোন রিসিভ করল আরফান। নম্রতা মন খারাপ ভাবটা উড়িয়ে দিয়ে উচ্ছল কণ্ঠে বলল,‘ কি করছিলেন ডক্টর সাহেব?’

আরফান ছোট্ট করে উত্তর দিল,

‘ কিছু না। আপনি?’

নম্রতার মনটা একটু চুপসে গেল। হাসার চেষ্টা করে বলল,

‘ আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম। আপনার সাথে কথা বলব বলে দুটোয় এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম জানেন?’

আরফান হাসল।

‘ এত কষ্ট না করে সকালে কল দিলেই হতো।’

‘ সকালে কল দিলে হবে কেন? আমার কত কথা জমা আছে

জানেন? এগুলো আজ না বললে পেটের ভাতই হজম হবে না আমার।" আচ্ছা, বলুন।'

আরফানের আগ্রহহীন কণ্ঠে ভেতরটা মোচড়ে উঠল নম্রতার। সে এতো আগ্রহ নিয়ে বসে ছিল অথচ আরফানের কোনো আগ্রহ নেই? আরফান কি খুব বেশি ক্লান্ত? আরফান ক্লান্ত ভেবে নিজেকে সামলে নিল নম্রতা। মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ আপনি মাত্র ফিরলেন। খুব ক্লান্ত বোধহয়। আপনি এখন রেস্ট নিন। আমি কথাগুলো কালই বলব।’

আরফান সাথে সাথেই বলল,

‘ আচ্ছা।’নম্রতার হঠাৎই দুনিয়া ভেঙে কান্না পেয়ে গেল। আরফান হাজার ক্লান্ত থাকলেও এভাবে কথা বলে না। এতো অবহেলা ভরে তো কখনও না। ভয়ানক রেগে থাকলেও না। তবে আজ কেন? নম্রতা মন

খারাপ করে ফোন রেখে দিল। বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেও চোখে ঘুম ধরা না দেওয়ায় আবারও আরফানের নাম্বারে কল করল নম্রতা। কি আশ্চর্য! আবারও ওয়েটিং! নম্রতা শুয়া থেকে উঠে বসল। অনুভূতিশূন্য চোখে চেয়ে রইল তারাহীন অন্ধকার আকাশে। বেশকিছুক্ষণ পর আবারও কল করল নম্রতা। এবার সীম বন্ধ।

নম্রতার মস্তিষ্কে হঠাৎই একটি অদ্ভূত প্রশ্ন জাগল, আরফান কী তার কলে বিরক্ত হয়েই ফোন বন্ধ করল?নম্রতা কী খুব বিরক্ত করে তাকে? কই! আরফান তো কখনও বলেনি। নম্রতা ফোনটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে বিছানায় গা এলাল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তেই আবারও এক বিষাক্ত ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল মাথায়, এতোরাতে কার সাথে কথা বলছিল

আরফান? নম্রতা মনেপ্রাণে ভাবতে লাগল, নিশ্চয় কোনো ফ্রেন্ড অথবা হসপিটালের কোনো কলে ছিল আরফান। ফোনে ওয়েটিং থাকা কোনো বড় ব্যাপার না। প্রয়োজন তো থাকতেই পারে। পরমুহূর্তেই কুটিল মস্তিষ্ক প্রশ্ন ছুঁড়ল, এত রাতে আরফানের ফোনে ফ্রেন্ডের কি কাজ? কি এত কথা যে এতোবার কল দিতে হয়? নম্রতার মাথা

ঘোরাতে লাগল। নিজের চিন্তাকে যথাসম্ভব ইতিবাচক করার চেষ্টা চালাল সে। ইশ! একটা ঘুমের ঔষধ হলে বেশ হতো!পূর্বাকাশ যখন সিঁদুর রঙে রাঙা হল, ভোরের বাতাস আলোড়িত করে বেজে উঠল প্রার্থনায় নিমজ্জিত হওয়ার আহ্বান। ঠিক তখনই দুই চোখ বোজল নম্রতা। ঘুমগুলো এসে ধরা দিল ধীর পায়ে। অশ্রুসিক্ত ফোলা চোখদুটো

দু'দন্ড শান্তি কুড়ালো এবার। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল সকল বিষাদ।

চওড়া বারান্দায় চেয়ার বিছিয়ে বসে আছেন নুরুল সাহেব। চোখের সামনে মেলে রাখা খবরের কাগজ। চোখ-মুখ গম্ভীর। পাশের ক্যাসেটে বাজছে স্মৃতিবিজরিত গান।'একটাই কথা আছে বাংলাতে

মুখ আর বুক বলে একসাথে

সে হল বন্ধু, বন্ধু আমার
বন্ধু আমার, বন্ধু আমার।
কে গরীব, কে আমীর সে মানে না
জাতের বিচার করা সে জানে না
সে হল বন্ধু.বন্ধু আমার
বন্ধু আমার।'বাপ্পী লাহিড়ী ও মুন্না আজিজের কণ্ঠে গাওয়া মাস্টারপিস। তরুন বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বসে এই গানটাই বেতারে শোনা হয়েছে অসংখ্যবার। আসাদ, মাসুদ,

ইব্রাহিম আরও কতজন ছিল তখন। এখন নেই। কে, কোথায় আছে সে খবর নেওয়ার সময়, সুযোগটাও নেই। নুরুল সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে খবর কাগজের পাতা উল্টালেন। ততক্ষণে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নম্রতা। এলোমেলো চুলে হাত খোপা। গায়ে রাতের টি-শার্ট আর টাউজার। নম্রতা বিধ্বস্ত মুখেই

মৃদু হাসল। টলমলে পায়ে চেয়ারের কাছে এসে বলল,

‘ শুভ সকাল বাবা।’

নুরুল সাহেব গানের সাউন্ড কমিয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে পাশে রাখতে রাখতে বললেন,‘ শুভ সকাল, মা।’

নম্রতা চেয়ারে বসে হাসল,

‘ হাও ইজ দ্য মর্নিং? রিমেম্বারিং দ্য ওল্ড ডেইজ?’

নুরুল সাহেব হাসলেন। চোখ থেকে চশমা খুলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ভীষণ আনমনা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টটির গায়ে।

‘ বন্ধু পাওয়া প্রাপ্তি, বন্ধু হারিয়ে ফেলা ব্যর্থতা। জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের ব্যর্থতাগুলো গুণার চেষ্টা করছিলাম।’

নুরুল সাহেব আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঠোঁটে হাসি টেনে মেয়ের দিকে তাকাতেই কপাল কুঁচকালেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন,‘ কিন্তু তোর এই অবস্থা কেন? চোখ-মুখ ফোলা লাগছে। ঠিক আছিস মা?’

নম্রতা হাসার চেষ্টা করল। চেষ্টা সফল হল না। নিজের চেয়ারটা বাবার পাশাপাশি রেখে বলল,

‘ তোমায় একটু জড়িয়ে ধরব বাবা? আমার ঘুম হচ্ছে না।’

নুরুল সাহেবের উদ্বেগ বাড়ল। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে আলতো হাত বুলিয়ে দিলেন মাথায়। মেয়েকে এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলেন না। চুলে বিলি কাটতে কাটতে শুধু বললেন,

‘ বাবা তোকে খুব ভালোবাসে মা। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে বাবা তোকে ভালোবাসবে।’

নম্রতা চোখ বন্ধ করে বুক ভরে শ্বাস নিল। বাবাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে বিড়বিড় করে বলল,

‘ ইউ আর দ্য বেস্ট ফাদার ইন দ্য ইউনিভার্স। লাভ ইউ মোর। মোর এন্ড মোর।’সকাল এগারোটা। সিএনজি-তে বসে একদৃষ্টে ফোনের

দিকে চেয়ে আছে নম্রতা। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে দেখছে, আরফানের ফোন বন্ধ। আরফান তাকে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করেনি। রাতে ওভাবে ফোন কাটার পর একটা বারও তার নম্রতার কথা মনে পড়েনি? একবারও নয়? নম্রতা নিজে থেকেই ফোন দিল, ফোন বন্ধ। নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিএনজির সিটে গা এলিয়ে দেয়। এই বিদঘুটে, বিষন্ন

দুপুরটার প্রতি জন্মায় রাজ্যের ক্ষোভ। ভার্সিটির গেইটের কাছে সিএনজি থামতেই ছোঁয়াকে দেখতে পায় নম্রতা। গোলাপি কুর্তি আর সাদা সালোয়ার গায়ে গাড়ি থেকে নামছে ছোঁয়া। নম্রতা তাকে দেখেই বিরক্ত চোখে তাকাল। অযথা রাগ দেখিয়ে বলল,‘ তোর না কাল বিয়ে? বিয়ে রেখে ভার্সিটিতে এসেছিস কোন দুঃখে?’

ছোঁয়া নম্রতার রাগটা ধরতে পারল না। নম্রতার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সরল কণ্ঠে বলল,

‘ বিয়ে তো কাল। আজ তো কোনো কাজ নেই আমার। শুধু শুধু বাড়ি বসে থাকব কেন?’

নম্রতা দাঁড়িয়ে গেল। চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ ঠিক বলেছিস। তোর তো কোনো কাজ নেই। আমার ধারণামতে,

বিয়ের দিনও তোর কোনো কাজটাজ থাকবে না। দুই মিনিটের কবুল বলা ছাড়া বউদের তেমন কাজ থাকেও না। বাসর রাতেও কোনো কাজ নেই তোর। বর বাসর করবে, সেখানে অযথা তোর কী কাজ? আমরা কাল গ্রুপ স্টাডির প্ল্যান করছি। ফ্রী-ই যেহেতু আছিস, ওয়ান্না জয়েন আস?’

ছোঁয়া চিন্তিত কণ্ঠে বলল,‘ জয়েন করতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু মাম্মা বোধহয় এলাউ করবে না।’

নম্রতা রাগ নিয়ে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ নাদিমের বলা ইউনিভার্সাল ট্রুথ কি জানিস?’

ছোঁয়া জিজ্ঞেসা নিয়ে তাকাল। নম্রতা আকাশসম বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ তুই আসলেই একটা বলদ।’

নম্রতা-ছোঁয়ার কথার মাঝেই রিকশা থেকে ডেকে উঠল একটি মেয়ে। নম্রতা প্রথম দফায় চিনতে না পারলেও সম্বোধন শুনে চট করে চিনে ফেলল। ঠোঁটে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল,

‘ আপনি এখানে?কেমন আছেন আপু?’

নিদ্রা হেসে বলল,‘ আমি এই ভার্সিটিরই প্রাক্তন ছাত্রী। কিছু

কাগজপত্র তুলতে এসেছিলাম। টিচার্স নিয়োগে এপ্লাই করব এবার। কিন্তু তোমার এই অবস্থা কেন? আর ইউ ওকে? ভীষণ সিক দেখাচ্ছে তোমায়।'

নম্রতা হেসে বলল,

' তেমন কিছু না। রাতে ঘুম হয়নি তো তাই এমন দেখাচ্ছে।'

' ঘুম হবে না কেন? ভাইয়া ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তার প্রিয়তমার এই

অবস্থা! মানা যাচ্ছে না। তাকে বলোনি?’

নম্রতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ নিষ্প্রভের ফোন অফ। তাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।’

নিদ্রা কপাল কুঁচকে তাকাল। তার সুন্দর ঠোঁট জোড়া বাচ্চাদের মতো উল্টে ফেলে বলল,

‘ ভাইয়ার তো দুটো নাম্বার। তুমি সেকেন্ডটাতে ট্রাই করো। ভাইয়া তো

একসাথে দুটো নাম্বারই বন্ধ রাখে না।’

নম্রতা অবাক হলো। বিস্ময় নিয়ে বলল,‘ নিষ্প্রভের সেকেন্ড কোনো নাম্বার তো আমার কাছে নেই।’

নিদ্রা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। নম্রতাকে তৎক্ষনাৎ আরফানের নাম্বার দিয়ে বিদায় নিল। নম্রতা অনুভূতিশূন্য চোখে ছোঁয়ার দিকে

তাকাল। ছোঁয়া ভীষণ অবাক হয়ে বলল,

‘ মেয়েটা কি ম্যান্টালি সিক? তোকে ছোঁড়াছুড়ি বলে ডাকছিল কেন? এটা কেন নাম হলো? আশ্চর্য!’নম্রতা উত্তর দিল না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো। মনে মনে শুধু একটা প্রার্থনায় করতে লাগল, আরফানের এই নাম্বারটাও যেন বন্ধ থাকে। আরফানের এই নাম্বারটা খোলা

থাকলে, নম্রতার অবুঝ মনটা তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের সাথে পেরে উঠবে না। মস্তিষ্কের হাজারও যৌক্তিক প্রশ্নের জবাবে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা থাকবে না। ভীষণ অস্থিরতা নিয়ে গোটা একটা ক্লাস করল নম্রতা। আরফানের নাম্বারে ফোন দেওয়ার মানসিক শক্তি জুগাতে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল শরীর। যদি

ফোনটা লেগে যায়? হাজারও দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান ঘটিয়ে কল করল নম্রতা। তার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়ে, সকল প্রার্থনা মিথ্যে করে দিয়ে প্রথমবারেই ফোন রিসিভ করল আরফান। নম্রতা বোবা হয়ে বসে রইল। তবে কি নম্রতার জন্যই সীম অফ রেখেছিল আরফান? যদি তা না হয় তাহলে এই নাম্বারটা কেন দেয়নি তাকে? সকালে

একটাবারও কেন মনে পড়েনি তাকে?‘ নম্রতা? আপনাকে একটু পর ফোন দিই? আমি এখন পেশেন্টের সামনে। ব্যস্ত আছি।’

হঠাৎ আরফানের কণ্ঠে ভাবনায় ছেদ ঘটল নম্রতার। চমকে উঠে বলল,

‘ হু?’

‘ আমি আপনাকে একটু পর ফোন দিচ্ছি নম্রতা।’

নম্রতা নিজেকে খুব দ্রুত ধাতস্থ করে নিয়ে বলল,
‘ সকালে একটা বার আমাকে কল দেওয়ার প্রয়োজন কি আপনার ছিল না?’
আরফান মৃদু কণ্ঠে বলল,
‘ সরি! খেয়াল ছিল না।’
নম্রতা যার পর নাই অবাক হলো। মেজাজ বিগড়ে গেল। তবুও নিজেকে শান্ত রেখে বলল,‘ খেয়াল

ছিল না? আমার এক্সজিসটেন্স কী তবে খেয়াল হওয়া পর্যন্ত ডক্টর?'

' ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে কেন ঝামেলা করছেন নম্রতা? আমি আপনাকে পরে কল দিই?'

' ঝামেলা? ঝামেলা কোথায় করলাম? আই ওয়াজ জাস্ট আস্কিং। ফোন বন্ধ কেন আপনার?'

' ফোন বন্ধ থাকলে কল এলো কিভাবে?'

‘ সীমটা বন্ধ রেখেছেন।’

‘ ওহ! কাল রাতে অফ করেছিলাম। অন করতে মনে নেই। আমি পরে ফোন দিচ্ছি।’

‘ কাল রাতে কোনো ইম্পোর্টেন্ট কল এটেন্ট করেছেন?’

আরফান বিরক্ত হয়ে বলল,‘ আমার সামনে পেশেন্ট বসা নম্রতা। আমি ব্যস্ত আছি।’

নম্রতা জবাব দিল না। ডানচোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গালে। বিড়বিড় কণ্ঠে বলল,

‘ আপনার জীবনে আমার অস্তিত্ব ব্যস্ততা আর খেয়াল হওয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ ডক্টর। আমি এতোটা ঠুনকো কখনও বুঝতেই পারিনি!’

আরফান বুঝতে না পেরে বলল,

‘ কি বললেন বুঝতে পারিনি। এখন রাখি, প্লিজ?’

নম্রতা রেখে দিল। দুই চোখে ভর করল রাজ্যের বৃষ্টি। বুকের বাম পাশে থাকা ছোট্ট মনটা ব্যথা করে উঠল নিষ্ঠুরভাবে। চার বছরের দীর্ঘ অপেক্ষা। প্রতিটি রাতের একাকিত্ব যন্ত্রণা, কান্নাগুলো যেন আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখে। যার খেয়ালে সে মগ্ন থেকেছে এতটা কাল। এতটা বছর। এতোগুলো রাত-দিন! সেই তার কাছে নম্রতার অস্তিত্ব

আজ খেয়ালের উপর টিকে আছে। ভালোবাসার মানুষের কথাও বুঝি খেয়াল থাকে না? খেয়াল করে নিতে হয়? কি আশ্চর্য! তবে কি নম্রতা ভালোবাসতে পারেনি? তার কেন খেয়াল করতে হয় না?সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতেই ছটফট করতে লাগল নীরা। বার বার উদগ্রীব চোখে তাকাতে লাগল দরজায়। শাশুড়ী মাকে রান্নায় সাহায্য করতে গিয়েও

বাঁধাল গন্ডগোল। পিঁয়াজ কাটতে গিয়ে হাত কেটে বলি করল। জাহানারা মেজাজ খারাপ করে তাকালেন। ধমকে উঠে বললেন, ‘ একটা কাজ ঠিকঠাক করতে পারো না? কাজ করার সময় মন থাকে কই? বরকে দেখাতে চাও, তোমার শাশুড়ী তোমাকে অত্যাচার কে মেরে ফেলছে? হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? পানি ঢালো হাতে। অয়ন?

এই হারামজাদা। সারাদিন টিভিতে কি দেখিস তুই? তোরে আর তোর টিভি দুইটাকেই এক কোপে দুই ভাগ করে ফেলব হারামির বাচ্চা। ভাবির হাত কেটেছে, স্যাভলন আন। কাজ করতে এসে যত অকাম। জীবনটা শ্যাষ করে ফেলল আমার। এখনও দাঁড়ায় আছ কেন তুমি?যেতে বলি নাই?'জাহানারার ধমকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে

নীরা। অয়ন হাতে পট্টি বেঁধে দেওয়ার পর রান্নার কোনো কাজে হাত দিতে দেননি জাহানারা। সন্ধ্যা থেকে রাত অব্দি ধমকা-ধমকি করেই পাড় করেছেন সময়। নীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকা শুনেছে আর শাশুড়ী মায়ের ছেলের জন্য অপেক্ষা করেছে। কাল রাতের পর অন্তুকে ধারেকাছে পায়নি নীরা। ছেলেটা সারাদিন বাইরে বাইরে কী করে কে

জানে? নীরার এই চঞ্চলা অপেক্ষার অবসান ঘটল রাত এগারোটায়। অন্তু বাড়ি ফিরেই খেতে বসল। অয়ন আর নীরা ব্যতীত সবাই তখন যার যার ঘরে। অন্তু খেতে বসেই প্রথম নীরার দিকে তাকাল। ভ্রু নাচিয়ে বলল,‘ খাওয়া হয়েছে ম্যাডাম?’

নীরা মৃদু হেসে বলল,

‘ পরে খাব।’

অয়ন সোফায় শুয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিল। ভাই-ভাবীর কথার এক পর্যায়ে গলা উঁচিয়ে বলল,

‘ নীরাপু থুক্কু ভাবী আজ হাত কেটে ফেলেছে ভাইয়া।’

অন্তু কপাল কুঁচকে তাকাল। মাথা হেলিয়ে উঁকি দিয়ে বলল,

‘ কোন হাত? দেখি?’

নীরা ডানহাতটা একটু উঁচু করে নিজের চোখের সামনে ধরল। তারপর বলল,

‘ অত কাটেনি। একটু।’

অন্তু কিছু বলল না। নীরা অয়নের দিকে চেয়ে বলল,

‘ এই তুই এখনও ঘুমোতে যাস না কেন? বাবা যদি দেখে এখনও টিভি চলছে, খুন করে ফেলবে একদম। যা ঘুমোতে যা।’

অয়ন আগের মতোই লম্বালম্বিভাবে শুয়ে পড়ে বলল,‘ ম্যাচ শেষ না হলে ঘুম আসবে না। ভাইয়া? আজকের ম্যাচটা কিন্তু জটিল হচ্ছে।’

নীরা অন্তর পাতে খাবার দিয়ে নিজের ঘরে গেল। ছাদে শুকোতে দেওয়া জামা-কাপড়গুলো অগোছালোভাবে পড়ে আছে বিছানায়। নীরা বিছানায় বসে এক এক করে কাপড়গুলো গুছাতে

নিতেই ঘরে এলো অন্তু। মুখভর্তি হাসি নিয়ে ফোনে কথা বলছে সে। এক হাতে তার খাবারের প্লেট। অন্যহাতে ফোন। অন্তু ফোনে কথা বলতে বলতেই বিছানায় এসে বসল। কথার ধরন দেখে বুঝা গেল নাদিমের সাথে কথা বলছে সে। অন্তুর হাসি বিস্তৃত হলো। বিচিত্র ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁট কামড়ে বলল,' ওই মেয়ে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টেই

পড়ে। তেজ ব্যাপক। তোর দ্বারা সম্ভব হবে না।’

কথা বলতে বলতেই খাবার মেখে নীরার সামনে ধরল অন্ত। নীরার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবার বিস্ময়ে রূপ নিল। অন্ত তখন নাদিমের বিপক্ষে কথার ঝুলি সাজাতে ব্যস্ত। নীরার বিস্মিত চাহনি তার চোখে পড়ল না। নীরা মুখ বাড়িয়ে খাবার মুখে নিল। যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব

নিয়েই একের পর এক লোকমা এগিয়ে দিল অন্তু। নাদিমের সাথে হাস্যোজ্জল আলাপন করতে করতে নীরার চোখের বিস্ময়, মোহ ঠাহর করতে পারল না সে। হঠাৎই শব্দ করে হাসল অন্তু। ফোনের ওপাশে বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘ চাপা মারিস না। আমি অবশ্যই পারতাম। কিন্তু তারে দিয়ে আমি করুমটা কি? ওই মেয়ের জায়গায়

তোর বোন হলে নাহয় একটা কথা ছিল। আহা! আমাদের প্রেমকাহিনীটা তুই পুরো হতে দিলি না।'

নাদিম অশ্লীল কিছু গালি দিয়ে বলল,' তুই তো শালা বিরাট চরিত্রহীন। ঘরে বউ রাইখা বাইরে নজর দেস।'

অন্তু হাসে। নীরার দিকে শেষ লোকমা এগিয়ে দিয়ে বলল,

‘ বউ রাইখা নজর দিলাম কই? নজর তো আমার আগে থেকেই ছিল। এক বউ দিয়ে আসলে চলছে না। তোর বোনকে মাস্ট দরকার।’নীরা মুগ্ধ চোখে অন্তর হাসি দেখছে। এই ছেলের এই হাসির জন্যই শেষমেশ প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিল নীরা। এত এত গালি শোনার পরও অন্তু নির্বিকার হেসে বলত, আর কত বকবি দোস্ত? রেস্ট

নে। সামনের মাসে প্রপোজ করলে বাকি গালি দিস। এখন গালি শোনার মুড নাই। নীরা তখনও মুগ্ধ চোখে দেখত। সেই চোরা দৃষ্টি এখন প্রকাশ্য। সেই নিষিদ্ধ মোহ এখন বাধাহীন, পবিত্র। অন্তর সুন্দর, স্বচ্ছ হাসির দিকে চেয়ে থেকেই হঠাৎ ভীষণ অগোছালো হয়ে পড়ল নীরা। হঠাৎই উঠে গিয়ে অন্তর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।তারপরই বর্ণনাতীত

এক কাজ করে বসল সে। ডানহাতটা অন্তুর কাঁধে রেখে অন্তুর মোহাচ্ছন্ন ঠোঁট জোড়াতে ঠোঁট রাখল পরম আবেশে। অন্তু হঠাৎই কিছু বুঝে উঠতে পারল না। পুরো ব্যাপারটা বোধগম্য হতেই হতভম্ব হয়ে গেল সে। নীরার অকল্পনীয় কাজে কাঠ হয়ে বসে রইল। হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল ভাতের প্লেট, ফোন। প্লেট পড়ার শব্দ হতেই

ছিটকে সরে দাঁড়াল নীরা। কাঁপা হাতে প্লেটটা তুলে নিয়েই দ্রুত পায়ে ঘর ত্যাগ করল। একটাবারও অন্তর চোখে চাওয়ার সাহস করে উঠতে পারল না। অন্ত হতভম্ব চোখে নীরার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। ঠিক এই মুহূর্তে কি ঘটে গেল, কিভাবে ঘটে গেল কিচ্ছু বুঝতে পারছে না অন্ত। ফোনের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল নাদিম,

‘ তুই কি মইরা গেছিস দোস্ত? টিকেট কাইট্টা গেছে তোর? কথা কস না ক্যারে?’

অন্তু কাঁপা হাতে ফোনটা তুলে নিয়েই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। বিরবির করে বলল,

‘ আমার বোধহয় আট্যাক ফ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে দোস্ত। শরীর কাঁপছে। কি হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।’রাত বাড়ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে

অভ্যস্ত জীবনের আয়ু। বই হাতে দুই তলার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছোঁয়া। পুরো দু'তলা জুড়ে পিনপতন নীরবতা। আত্মীয়-স্বজনদের কেউই দু-তলার সিঁড়ি মারাচ্ছেন না। সিঁথি হকের কড়া নির্দেশ, ছোঁয়াকে কিছুতেই বিরক্ত করা যাবে না। ছোঁয়া ছোঁয়ার মতো খাবে, ঘুমাবে। বিয়ের আগের দিন হৈ-চৈ এ ঘুম না হলে চোখের নিচে কালী পড়বে।

সুন্দর দেখাবে না। কিন্তু ছোঁয়ার ঘুম হচ্ছে না। কিছু একটা, কোথাও একটা তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। চারপাশের এতো আয়োজন, এতো আলো, এতো হৈ-চৈ এর কোথাও সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। সবকিছু তাকে ঘিরে হলেও যেন এসবে সে নেই।তার অস্তিত্বটুকু ভীষণ দূরের কোনো ঘুমন্তপুরীতে আবদ্ধ। একের পর এক ঘটে যাওয়া

ঘটনাগুলো বড় নিঃস্পৃহ, রসহীন, সাধারণ। ছোঁয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। বাবার আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে উপন্যাসের পাতা উল্টাল। খুব পানসে এই ঘটনাপ্রবাহ। অপ্রয়োজনীয়, বিরক্তিকর। ছোঁয়ার হঠাৎই মনে হলো, এই অধ্যায় আর তার জীবন একই উপন্যাসে গাঁথা। একই তার ধারাবাহিকতা। একই

তার ঘটনাপ্রবহতা। একই রকম নিষ্প্রয়োজন। অত্যাধুনিক ফোনের নিদারুণ চিৎকারে গুরুগম্ভীর ভাবনা থেকে খানিক ছিটকে পড়ল ছোঁয়া। ঘড়িতে তখন দুটো বাজে। এতোরাতে ফোন দেওয়ার মানুষ তো ছোঁয়ার নেই। তবে?ছোঁয়া কৌতূহল নিয়ে ফোন উঠাল। ওপাশ থেকে রাশভারী কণ্ঠে প্রশ্ন এলো,‘ হঠাৎ যদি সূদুর অতীত থেকে উঠে আসা

কোনো দৈত্য আপনাকে জিগ্যেস করে, হোয়াট ইজ ইউর উইশেস? তাহলে আপনার উত্তর কী হবে?’

হঠাৎ এমন প্রশ্নে ভরকে গেল ছোঁয়া। ভয়ানক বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। বোকা বোকা কণ্ঠে বলল,

‘ অতীত তো অতীতই। অতীত থেকে দৈত্য কি করে আসবে?’

‘ দৈত্যের নিজস্ব টাইম মেশিন থাকতে পারে। সে আলোর বেগে

ছুটে আপনার কাছে চলে আসতেই পারে। দৈত্যদের অনেক ক্ষমতা জানেন না?’

ছোঁয়া বেশ ভাবনায় পড়ল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল,

‘ কিন্তু তাত্ত্বিকভাবেও তো অতীতে আসা সম্ভব নয়। প্রকৃতি তা মেনে নিবে না।’

‘ বাহ! এই বিষয়ে পড়েছেন তাহলে? কিন্তু দৈত্য তো অতীতে যাচ্ছে না।

সে আসছে ভবিষ্যতে। তার জন্য আপনি তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য। আলোর গতিতে ছুটতে পারলে ভবিষ্যতে আসা তো অসম্ভব কিছু নয়। তাই না?'

ছোঁয়া ফোনের এপাশেই মাথা নাড়ল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ভীষণ বুদ্ধিমতির মতো বলল,

' ভবিষ্যতে যাওয়া সম্ভব হলেও দৈত্যের আসার সম্ভবনা নেই।

প্রথমত, অতীতের পৃথিবী প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। সেখানে কোনো টাইম মেশিন নেই। দ্বিতীয়ত, দৈত্য বলে কোনো বস্তু পৃথিবীতেই নেই।" কে বলল নেই?' ছোঁয়া অবাক হয়ে বলল,

' আছে নাকি?'

' থাকতেই পারে। পৃথিবী হলো একটা রহস্য পিন্ড। যার অনেক রহস্যই অমীমাংসিত হয়ে বসে আছে

নাকের ডগায়। যেমন ধরুন বাল্ট্রা দ্বীপ। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডরের কাছাকাছি গ্যালাপাগোস নামে একটি দ্বীপপুঞ্জ আছে। নাম শুনেছেন কখনও?'

ছোঁয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল,

' উঁহু।'

' না শুনলেও সমস্যা নেই। এখন শুনুন। সেই গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপের নাম হলো বাল্ট্রা।

বাল্ট্রা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল হওয়ায় এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন?’

ছোঁয়া কৌতূহল নিয়ে বলল,

‘ কি?’‘ এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও বৃষ্টির একটি ফোঁটাও বাল্ট্রা দ্বীপে পড়ে না।’

ছোঁয়া অবাক হয়ে বলল,

‘ মাই গড! ইজ ইট পসিবল?’

‘ অবশ্যই। সম্ভব না হলে তো এমনটা ঘটতো না। শুধু তাই নয় এই দ্বীপে থাকার সময় কম্পাস অস্বাভাবিকভাবে স্থির হয়ে থাকে অথবা ভুল দিক প্রদর্শন করে। এই দ্বীপ অতিক্রমকালে প্লেনেও ঠিক একই সমস্যা দেখা দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, এই দ্বীপে পা রাখার সাথে সাথেই কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এখানে

গাছ কিংবা পশুপাখি নেই। উড়ন্ত পাখিরা উড়ে বাল্ট্রার কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যায়। যেন কোন অদৃশ্য দেয়ালে বাঁধা পড়ে। অনেকে মনে করেন এই দ্বীপে অস্বাভাবিক কোন শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। হু নোস? এটা কোনো দৈত্যদের রাজ্য। অদৃশ্য দৈত্য।'

ছোঁয়া আকাশসম বিস্ময় নিয়ে বলল,' এমন দ্বীপ সত্যি আছে?'

‘ অবশ্যই। আমি নিশ্চয় আপনার সাথে মজা করছি না। এবার উত্তরটা দিন। দৈত্যের প্রশ্নের উত্তরে কি জবাব দিবেন আপনি? কি চাইবেন?’

ছোঁয়া অনেকটা সহজ হয়ে এলো এবার। পানসে ভাবটা মিলিয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল,

‘ ইচ্ছেগুলো ঠিক বলতে পারছি না। আমি কোনো ইচ্ছে খুঁজেই পাই না। তবে একটা উইশ অবশ্যই করব।’

‘ কি উইশ?’

‘ আমাকে যেন কক্ষনো এদেশ ছেড়ে যেতে না হয়। কিন্তু হচ্ছে। আমার তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।’

‘ বাহ! আপনি তো বেশ দেশপ্রেমিক টাইপের নারী।’

ছোঁয়া উত্তর দিল না। সাইমকে বলতে ইচ্ছে করল না, দেশ ছেড়ে না যাওয়ার ইচ্ছেটা তার দেশকে ভেবে নেওয়া নয়। অন্যকিছুর টানেই

তার এই ঐচ্ছিক প্রকাশ।‘ বাল্ট্রায় যাওয়া সম্ভব হলে আমি আপনাকে হানিমুনে বাল্ট্রা নিয়ে যেতাম ছোঁয়া। আপনি অবাক হয়ে দেখতেন, আকাশে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে অথচ সেই বৃষ্টি আপনাকে ছুঁতে পারছে না।’

সাইমের কথা বলার ভঙ্গি চমৎকার। প্রতিটি উচ্চারণ ছাড়া ছাড়া, সুন্দর। সেই সুন্দর উচ্চারণে বলা কথাগুলো ছোঁয়ার অনুভূতিশূণ্য মনে অনুভূতির

সৃষ্টি করল। বন্ধুদের বাইরেও অন্যকারো কথায় প্রভাবিত হলো সে। আবদ্ধ মনে নতুন একটা ইচ্ছের সঞ্চার হলো, সত্যি যদি বাল্ট্রা যেতে পারত! সাইম কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল,‘ ছোঁয়া? আপনি কি জানেন? আপনি ম্যানিক ডিপ্রেসনে ভুগছেন। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বাইপোলার ডিসওর্ডার। আপনি নিজেই সাইকোলজি স্টুডেন্ট। ইউ

নো, হোয়াট ইজ বাইপোলার ডিসওর্ডার। দেখুন ছোঁয়া, কাল আমাদের বিয়ে অথচ আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমার পুরো নাম জানেন কি-না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি কোন ভার্সিটিতে কর্মরত, কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করছি, আমার পরিবারে কে কে আছে। কিচ্ছু জানেন না। কিন্তু কেন জানেন না? আপনার

জীবন সঙ্গী হিসেবে এই ব্যাপারটা যেকারো জন্যই হতাশার। কিন্তু আমি হতাশ হইনি। গোটা একমাস আমি আপনাকে লক্ষ্য করেছি। আর তাতে যতটুকু বুঝেছি , আপনার আচরণ ইচ্ছেকৃত নয়। আপনি যে শুধু আমার প্রতিই উদাসীন তেমনও নয়। আপনি আপনার গোটা জীবনের প্রতিই উদাসীন। হয়তো আপনাকে ধীরে ধীরে উদাসীন করে দেওয়া

হয়েছে। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন ছোঁয়া?’ছোঁয়া খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এই প্রথম নিজের আচরণে অস্বাভাবিকতা আছে কি-না বুঝতে চেষ্টা করছিল। সাইমের প্রশ্নে সাড়া দিতেই আবারও বলতে শুরু করল সাইম,

‘ এভাবে জীবন চলে না ছোঁয়া। ইউ হ্যাভ টু গেট রিড ফ্রম হেয়ার। আপনি সব সময় কনফিউজড

থাকেন। কালার কনফিউশান, ডিসিশন নিয়ে কনফিউশান এভ্রিথিং। এর মূল কারণ হলো, আপনার নার্সিং। আমাদের বিয়ের পর এই কনফিউশান, উদাসীনতা, বিষন্নতাগুলো আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। আমার সাথে কথা বলতে শিখতে হবে। যেমনটা আজ বললেন। তার আগে নিজের জন্য কথা বলতে শিখতে হবে। বিয়ের

পর আপনার মায়ের কোনো ডিসিশন আমি এলাউ করব না। আপনার ব্যাপারে ডিসিশন হতে হবে আপনার। ভুল হোক বা সঠিক, ডিসিশন হবে আপনার। আপনি আপনার মাকে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলবেন, তিনি যেন আপনার সাংসারিক সিদ্ধান্তগুলো আপনার উপর ছেড়ে দেয়। আই অ্যাম উইথ

ইউ ছোঁয়া।’ছোঁয়া উত্তর দিল না। সাইম খুব সাবধানে বলল,

‘ আপনার বন্ধুরা কিন্তু আমায় আশ্বাস দিয়েছিল যে, ইউ আর এবল টু গেট রিড ফ্রম হেয়ার।’

ছোঁয়া ভাবনাতীত বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ বন্ধুরা?’

সাইম হেসে বলল,

‘ নাদিম, রঞ্জন, নম্রতা! তবে কি তারা মিথ্যে বলেছিল? আপনি

কথাগুলো মাকে বলতে পারবেন না?’

ছোঁয়ার ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। এই প্রথমবারের মতো ভাবনা-চিন্তা না করেই বলে ফেলল,

‘ পারব।’

কথাটা বলে ফেলে উপলব্ধি করল ভীষণ শান্তি লাগছে তার। চারপাশের বিষন্নতা কেটে যাচ্ছে। জীবনের নিঃস্পৃহ ভাব কেটে গিয়ে টলমল

জলে তরঙ্গ দিচ্ছে ঢেউ।বন্ধুদের অদৃশ্য মমতায় কেটে যাচ্ছে ভয়! অচেনা নাম্বার থেকে কলটা আসতেই মেজাজ চটে গেল আরফানের। প্রথমবার কেটে দিতেই দ্বিতীয়বার বেজে উঠল ফোন। আরফান যার পর নাই বিরক্ত হয়ে ফোন তুলল। ভেতরটা রাগে রি রি করলেও ভদ্র কণ্ঠে বলল,

‘ কান্নাকাটি বন্ধ করে সত্যি করে বলুন, আপনি কে? কি চান?’

ওপাশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে স্পষ্ট উত্তর,

‘ বললাম তো শ্যামলতা। শ্যামলতা কি চাইতে পারে জানো না? আর আপনি আপনি বলছ কেন? চিঠিতে তো আপনি করে বলতে না।’

আরফান নিজেকে সংযত করল। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে ঠান্ডা কন্ঠে বলল,

‘ আচ্ছা। মানলাম আপনি শ্যামলতা। কিন্তু প্রমাণ কী?’

ওপাশের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় খেলে গেল,‘ প্রমাণ? এখন আমায় প্রমাণ দিতে হবে? চিঠিতে তো খুব বলতে, তোমার নাকি আমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেও চিনে ফেলার ক্ষমতা আছে। অথচ আজ প্রমাণ চাইছ? আচ্ছা! বিয়ে টিয়ে করে ফেলেছ নাকি?

সুন্দরী বউ পেয়ে আমার আবেগ কেটে গিয়েছে? স্বার্থপর!’

আরফানের বিরক্তি এবার আকাশ ছুঁলো। এক চড়ে মেয়েটার গাল ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ শ্যামলতা আপনার মতো বেহায়া নয়। শ্যামলতা আমার সাথেই আছে।’

‘ ভালোবাসলে সবাই বেহায়া হয়। তুমি ভালোবাসোনি বলে বেহায়া হতে পারোনি। তোমার সাথে যে আছে সেই তোমার শ্যামলতা তার কি প্রমাণ আছে?’আরফান উত্তর দিল না। ফোনটা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখল। মাথায় হাজারও চিন্তা নিয়ে গা এলিয়ে দিল চেয়ারে। অনেকগুলো ছেঁড়া সুতো জুড়ো লাগানোর চেষ্টা চালাল একের পর

এক। নার্সের ডাকে ভাবনা কাটলেও চিন্তা গেল না। কপাল কুঁচকে বিরক্ত চোখে চেয়ে রইল নার্সের মুখে। রাউন্ড, ক্লাস কোনো কিছুতেই ঠিকঠাক মনোযোগ দেওয়া গেল না। অল্পতেই মেজাজ খারাপ হতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণেই শিরশির করে উঠল হাত। এই মেজাজ খারাপ নিয়ে নম্রতাকে অযথা কল করে মেয়েটার মন খারাপ করিয়ে

দেওয়ার ইচ্ছে আরফানের হলো না। তাই অবসর পেয়েও কল করা হয়ে উঠল না। পুরোটা দুপুর কাটল বিষন্নতা আর উদ্বিগ্নতায়।ধানমন্ডির হোয়াইট হল কমিউনিটি সেন্টারের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে নাদিম। গায়ে নীল পাঞ্জাবি। পিঠে ঝুলানো গিটার। মাথাভর্তি চুলগুলো স্বভাববতই এলোমেলো, অগোছালো। স্টেজে বর-কনের ফটোসেশান

চলছে। অন্তু,নীরা, নম্রতা কিছু দূরেই বসে আড্ডা দিচ্ছে। পরিবেশটা উত্তেজিত করে তুলতে কাছেই কোথাও হাই বিটের ইংরেজি গান বাজছে,

‘ It’s a beautiful night, we’re looking for something dumb to do...

Hey baby, I think I wanna marry you

Is it the look in your eyes or is it this dancing juice? Who cares, baby, I think I wanna marry you.... 'নাদিম বিরস ভঙ্গিতে ওয়াশরুম খুঁজতে লাগল। খাওয়া বেশী হয়ে গিয়েছে। পেটে কেমন গুরগুর শব্দ করছে। বিরাট আপদ! এই সিঁথি বেগম শত্রুতা করে খাবারে উনিশ-বিশ মিশিয়ে দিয়েছে কি-না তা নিয়েও

বিরাট সন্দেহ হচ্ছে। ইংরেজি গানের শব্দটাও বড্ড কানে লাগছে। নাদিম হাঁটতে হাঁটতেই বিশ্রী একটা গালি দিয়ে ফেলল। বিয়েতে যদি ইংরেজি গানই বাজাতে হয় তো ব্রিটেনে গিয়ে বাজা, এখানে কি? শালা, রাজাকারের বংশধর! নাদিমের বিগড়ে যাওয়া মেজাজের মাঝেই ফোন দিল আরফান। আরফানের ফোন পেয়ে অতিরিক্ত বিস্ময়ে বোবা

বনে গেল নাদিম। ফোন নিয়ে গান-বাজনা থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াতেই আরফান বলল,

‘ এই অসময়ে তোমাকে ডিস্টার্ব করার জন্য সরি, নাদিম।’

নাদিম হেসে বলল,‘ না ভাই। বেকার মানুষের আবার ডিস্টার্ভেন্স কি? হঠাৎ ফোন ক্যান ভাই? কোনো সমস্যা?’

আরফান কিছুটা ইতস্তত করে বলল,

‘ নম্রতাকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। অনেকবার ফোন দিলাম, ফোন তুলল না। ডেইট খেয়াল হতেই মনে পড়ল, আজ ছোঁয়ার বিয়ে। নম্রতা কি তোমাদের সাথেই আছে?’

‘ হ। আমাগো সঙ্গেই আছে। ও তো ফোন বাসায় রাইখা আসছে বলল। ওরে ফোন দিতাম ভাই?’

‘ না না। ঠিক আছে। ইঞ্জয় করুক। নিদ্রার কাছে শুনলাম, ও নাকি অসুস্থ ছিল। একটু খেয়াল রেখো।’

নাদিম ভ্রু কুঁচকাল। ডানদিকে ঝুঁকে নম্রতাকে দেখার চেষ্টা করল। নম্রতাকে কোনোভাবেই অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। বেশ তো খিলখিল করে হাসছে। নাদিম বিরবির করে বলল, শালার মাইয়া! পোলাডারে সাদাসিদা পাইয়া একদম ভাজা ভাজা করে

ফেলল। আরফান সতর্ক কণ্ঠে বলল,‘ কিছু বললে?’

নাদিম অপ্রস্তুত হেসে বলল,

‘ না ভাই। আপনি চিন্তা কইরেন না। আমরা আছি, সমস্যা নাই। আপনার প্রিয়তমা একদম ফিট থাকবে। ফাডা ফাডির কোনো চান্স নাই। আমরা এমনিতেও তাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব।’

নাদিমের কথার ধরনে হেসে ফেলল আরফান। ওয়াশরুম থেকে ফিরে বন্ধুদের পাশে বসতেই নীরা অন্তর ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল তার। নাদিম মৃদু হাসল। নাদিমের হাসি খেয়াল করেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অন্ত। ফিসফিস করে বলল,‘ হাসছিস কেন?’

নাদিমের হাসি বিস্তৃত হলো। অন্তর দিকে চেয়ে ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ বন্ধু!’
অন্তু কেশে উঠে বলল,
‘ তোর এমন হাসি দেখলে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। উল্টাপাল্টা কিছু বলবি তো খবর আছে। তোর এই বাজে স্বভাবটা পরিবর্তন কর।’
নাদিম শব্দ করে হাসল। গিটারে সুর তুলে দুষ্ট কণ্ঠে গাইল,
‘ আমার এই বাজে স্বভাব কোনোদিন যাবে না,

আমার এই বাজে স্বভাব কোনোদিন যাবে না।'

দুই লাইন গেয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল। গিটারের সুর তীক্ষ্ণ করে ফিচেল হেসে বলল,

' সিঁথি আপাকে শান্তিতে থাকতে দিতে ইচ্ছে করছে না।'

নীরা-নম্রতা দাঁত বের করে হাসল। নাদিম গলা ছেড়ে গান ধরল। অন্তু টেবিলে সুর তুলল। নাদিম কিছুদূর

গাইতেই গেয়ে উঠল আরও তিনটি কণ্ঠস্বর। চারটি কণ্ঠেই ফুটে উঠল রাজ্যের উচ্ছ্বাস। আশেপাশের গান বাজনা থেমে গেল। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ নিভে গেল। হঠাৎ এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল এই অর্ধ পরিচিত চারজন,‘কথা হবে দেখা হবে, প্রেমে প্রেমে মেলা হবে

কাছে আসা আসি আর হবে না।

চোখে চোখে কথা হবে, ঠোঁটে ঠোঁটে নাড়া দেবে
ভালবাসা-বাসি আর হবে না।
শত রাত জাগা হবে, থালে ভাত জমা রবে
খাওয়া দাওয়া কিছু মজা হবে না।
হুট করে ফিরে এসে, লুট করে নিয়ে যাবে
এই মন ভেঙে যাবে জানো না।

আমার এই বাজে স্বভাব, কোনোদিন যাবেনা

আমার এই বাজে স্বভাব, কোনোদিন যাবেনা। '

গান গাওয়ার মাঝেই পাশের টেবিলে বসে থাকা সুন্দরী ললনাকে চোখ টিপে দিল নাদিম। মেয়েটির ড্যাবড্যাব চাহনী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সিঁথি হক প্রচন্ড বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করলেন। তার মেয়ে স্টেজে

ফটোসেশান ছেড়ে বন্ধুদের সাথে নাচছে। গলা মিলিয়ে গান গাইছে!

ভুলভাল ভালবাসি,
কান্নায় কাছে আসি
ঘৃণা হয়ে চলে যাই থাকি না
কথা বলি একা একা,
সেধে এসে খেয়ে ছ্যাঁকা
কেনো গাল দাও আবার বুঝি না.....রাত দশটা কি সাড়ে দশটা বাজে। অন্ধকারে ঝলমল করছে

বিভিন্ন রঙা আলো। কমিউনিটি সেন্টারের গেইটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরা। বিয়েতে এমন একটা স্ক্যান্ডেল করার পর সিঁথি হকের রাগের প্রতিরূপ কেমন হয়েছিল তা নিয়েই চলছে একের পর এক আলোচনা। এমন সময় ভীষণ অপ্রত্যাশিতভাবে সামনে এসে দাঁড়াল ছোঁয়া। নাদিম সবার সামনে থাকায় কি-না জানা নেই ছোঁয়া

ছিঁটকে এসে পড়ল নাদিমের বুকে। নাদিম বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাড়িয়ে রইল। ছোঁয়া ভীষণ বোকা বোকা কন্ঠে বলল,‘ আমার খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মন খারাপ লাগছে। আই মিস ইউ অল।’

নাদিম অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ মিস করবি ভালা কথা। দূরে গিয়ে মিস কর। তোর অস্ট্রেলিয়ান গরু

দেখলে আমারে তুলে আছাড় মারব। বউ ভাগিয়ে নেওয়ার অপবাদে হাজতে দিয়া দিব। ধরার হলে অন্তরে গিয়ে ধর। আমারে ছাড় ইংরেজ।'

নম্রতা নাদিমের বাহুতে চড় বসিয়ে বলল,

' তোর সবসময় ফাজলামো। ছোঁয়া কাঁদছে।'

‘ আইচ্ছা যা ফাইজলামি করলাম না। ওরে এমনে ল্যাপ্টায় খাড়াই থাকতে দেখে ওর ম্যাঁ ম্যাঁ অর্থাৎ আমাগো সিঁথি আপায় আমারে চাবাইয়া খাইয়া ফেললে সব দোষ তোর।’পরমুহূর্তেই ডানহাতটা ছোঁয়ার মাথায় রেখে আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে ভীষণ নরম কণ্ঠে বলল,

‘ কান্দিস না। দোয়া করে দিলাম, খুব জলদি বলদ থেকে গরু হয়ে

যা। ইংরেজ বলদ থেকে ডিরেক্ট অস্ট্রেলিয়ান গরু। আমিন।’

নাদিম সিরিয়াস কিছু বলবে সেই আশায় চেয়ে থাকা বন্ধুরা এবার হেসে ফেলল। হেসে ফেলল বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ছোঁয়াও। নিজের মন বুঝতে ব্যর্থ এই মেয়েটা বিষণ্নতা নিয়েই পাড়ি জমাল অন্যের ঘরে। চোখগুলো টলমল করল। মন পুড়ল। বারবার পেছন ফিরে

তাকাল। কোথায় একটা ফাঁকা থেকে গেল। কিছু একটা পাওয়া হলো না। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। কানের পাশে শো শো বাতাস। জায়গাটা কোনো ব্রিজের কাছে। নিচে টলমলে কালো জল। আকাশে ভীষণ মেঘ। অন্ধকার আকাশে আঁধার করে আসা বিষণ্নতা। থেকে থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি। নম্রতার গা ছমছম করছে। কানদুটো তালা লেগে যাচ্ছে

নিশাচরদের ঝিমঝিম শব্দে। নম্রতা ভয়ে ভয়ে চারপাশটা দেখল, কেউ নেই। এমন একটা নিস্তব্ধ জায়গায় কেন নিয়ে এলো নিষ্প্রভ? নিষ্প্রভ কী জানে না, নম্রতা অন্ধকার ভয় পায়? নম্রতা থেকে বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে আরফান। গায়ে তার ধূসর রঙের শার্ট। অন্ধকারে চেহারা অস্পষ্ট। এই অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়েও নম্রতা বুঝে ফেলল,

আরফানের মনটা ভীষণ খারাপ। চোখ-মুখ শুকনো। নম্রতা উদ্বিগ্ন কন্ঠে প্রশ্ন করল,‘ আমরা কোথায় আছি ডক্টর? জায়গাটা আমি চিনতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় লাগছে। ফিরে চলুন।’

আরফান নিস্পৃহ কন্ঠে বলল,

‘ এখান থেকে ফেরার উপায় নেই নম্রতা।’

নম্রতা চমকে উঠল। শরীর বেয়ে বয়ে গেল শীতল রক্তস্রোত। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল,

‘ উপায় নেই! কেন? এখানে এতো অন্ধকার কেন? এতো অন্ধকার আমার সহ্য হচ্ছে না ডক্টর। আমি আপনাকে দেখতে পারছি না। কাছে আসুন।’

আরফান ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে বলল,

‘ সম্ভব নয়।’

নম্রতা উন্মাদের মতো বলতে লাগল,‘ আমি অন্ধকার সহ্য করে পারছি না। আমি অন্ধকার সহ্য করতে পারছি না। এখানে খুব অন্ধকার। আলো জ্বালুন।’

‘ আমার কাছে আলো নেই নম্রতা।’

‘ এটা কোথায়? জায়গাটা আমি চিনতে পারছি না কেন?’

‘ আপনি চিনতে পারছেন। খেয়াল করে দেখুন। এটা আপনার আর আমার খুব পরিচিত জায়গা। খুব।’

আরফানের শেষ কথাটা কেমন ফিসফিসের মতো শোনাল নম্রতার কানে। হালকা বাতাসে ধাক্কা দিয়ে উড়ে গেল অনেক দূরে। নম্রতা চোখ মেলে দেখতে চেষ্টা করল। বিস্ময় নিয়ে খেয়াল করল, জায়গাটা তার পরিচিত। এইতো চির পরিচিত সেই

সিঁড়ি। শাহবাগ গ্রন্থাগার। নম্রতা আশেপাশে কোনো ব্রিজ বা নদী দেখতে পেল না। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে বলল,‘ আমরা এখানে কেন এসেছি ডক্টর?’

‘ বিদায় জানাতে।’

‘ বিদায়?’

‘ হ্যাঁ, বিদায় নম্রতা। এখান থেকে শুরু হওয়া গল্পটির বিদায় ঘন্টি বেজে গিয়েছে নম্রতা। এখানে তৈরি

হওয়া শ্যামলতা এখানেই নিঃশেষ। আপনার আর আমার পথ ভিন্ন। আমাদের আর এগোনোর পথ নেই।' নম্রতার ভেতরটা ভয়াবহ শঙ্কায় কেঁপে উঠল। ছলছল চোখে চেয়ে বলল,

' কি বলছেন?'' আপনাকে আমি চাই না নম্রতা। আমি যাকে চাই সে আপনি নন। আপনাকে হারিয়ে যেতে হবে নম্রতা। সময়ের কাল

গর্ভে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া শ্যামলতার মতোই হারিয়ে যেতে হবে আপনাকে। তবেই না আমি এগোতে পারব।'

নম্রতার চারপাশটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বুকের ভেতর তীক্ষ্ণ হাহাকার। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির মুখ অস্পষ্ট হয়ে উঠে আরও। তবুও নম্রতা দেখতে পায়, মানুষটির চোখে তীব্র বিরক্তি,

ভয়াবহ বিতৃষ্ণা। তীক্ষ্ণ হয়ে বাজে একটাই কণ্ঠ,

‘ আপনি হারিয়ে যান নম্রতা। আপনি হারিয়ে যান। আপনাকে আমি চাই না। হারিয়ে যান।’নম্রতা ডুকরে কেঁদে উঠল। চিৎকার করে উঠল তার কণ্ঠনালী। বুকের ভেতরটা দ্বগ্ধ হল। নিঃশ্বাস আটকে এলো। নম্রতার হঠাৎ মনে হলো, সে বাঁচতে পারছে না। নিঃশ্বাস নিতে পারছে

না। অসাড় শরীর নেড়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। নম্রতা মারা যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎই বহুদূর থেকে ভেসে এলো অসংখ্য কণ্ঠস্বর। ওগুলো কে? নাদিম, রঞ্জন? না। ওরা নয়। বাবা। হ্যাঁ, নম্রতার প্রিয় বাবা। নম্রতা বাবার কাছে ছুটতে চেষ্টা করল। ভীষণ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, বাবা! আমার বাবা। বাবা শুনেছে। কেউ না

শুনলেও তার ডাক শুনেছে বাবা। উন্মাদের মতো ছুটে আসছে। নম্রতাকে বুকে আগলে নিতে ছুটে আসছে।‘ মা? নমু মা? কি হয়েছে আম্মু? এইতো বাবা। এমন ছটফট করছিস কেন মা?’

নম্রতা বড় বড় নিঃশ্বাস টেনে চোখ মেলে তাকাল। নন্দিতা রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল,

‘ আপু?এই আপু? কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? বাবা? কি হচ্ছে আপুর?’

নম্রতার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ভীষণ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মেহরুমা গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে বললেন,

‘ আম্মু? কি হয়েছে আম্মু? নমুর বাবা? আমার মেয়ে এমন করছে কেন? আমার কলিজা, আম্মু? নমু

মা? খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস সোনা? কোথায় কষ্ট হচ্ছে মা?’

নুরুল সাহেব ধমকে উঠে বললেন,‘ আহ! এখন চিৎকার চেঁচামেচি করার সময় নয় মেহরুমা। মেয়েটাকে ইজি হতে দাও। দৌঁড়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো। এভাবে চিৎকার করে তাকে ভরকে দিও না।’

মেহরুমা থামলেন না। গুনগুনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলেন পানি

আনতে। নন্দিতা দৌঁড়ে গিয়ে বসল বোনের পাশে। ভয়ে চোখ-মুখ শুকিয়ে গেছে তার। বোনের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ক্রমাগত মালিশ করে চলেছে। নুরুল সাহেব নম্রতার গালে হাত দিয়ে আলতো কণ্ঠে ডাকলেন,

‘ নমু মা? বাবা পাশে আছে। ভয় কী? ভয় নেই। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? কী হয়েছে? বাবাকে বল।

এই দেখ বাবা পাশে। ভয় নেই তো মা।’নম্রতার শ্বাসকষ্ট ধীরে ধীরে কমে এলো। চোখ ঘুরিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করল নিজের প্রাত্যহিক বিছানায়। পাশেই বসা বাবা আর বোন। নম্রতার শরীরটা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ওটা স্বপ্ন ছিল? এতো বাস্তব স্বপ্ন! ঘামে জবজবে শরীর নিয়ে চট করে উঠে বসল নম্রতা। ঘরে তীক্ষ্ণ কোনো আলো নেই, ঢিম

লাইট জ্বলছে। খোলা জানালার পাশে গাঢ় অন্ধকার। নম্রতার শ্বাস আটকে এলো। বাবাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল। উম্মাদের মতে চিৎকার করতে লাগল হঠাৎ,

‘ অন্ধকার কেন? আমার অন্ধকার সহ্য হচ্ছে না। আলো জ্বালাও। আলো জ্বালাও। বাবা! বাবা! বাবা আলো জ্বালাও। আমি অন্ধকার সহ্য

করতে পারছি না।’নুরুল সাহেব মেয়েকে ঝাপটে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। নন্দিতা ছুটে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইল। নম্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হলো। নুরুল সাহেব এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলেন না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইলেন। দোয়া পড়ে মেয়ের গায়ে বার কয়েক ফু দিয়ে মেয়েকে পানি

খাওয়ালেন। তারপর আবারও আগের মতোই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন চুপচাপ। সেই রাতে ছোট্ট নন্দিতা পর্যন্ত ঘুমোতে গেল না। বোনের একহাত ধরে চুপ করে বসে রইল। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ধুম করে জ্বর হলো নম্রতার। মেয়ের ভয়ানক জ্বরে দিশেহারা হয়ে পড়লেন মেহরুমা। মেয়েকে বাবার কাছে রেখে ওযু করে জায়নামাজে

বসলেন। কলিজার মেয়েটার জন্য ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে তার। বেশ তো বন্ধুর বিয়ে থেকে এলো। হঠাৎ কি হলো মেয়েটার? রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়ায়, খারাপ কিছুর নজর পড়েনি তো আবার?তখন মধ্যরাত। বারোটা কি একটা বাজে। ছোঁয়ার বিয়ে থেকে ফিরে ঘুমোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছে নীরা। বিছানার এক কোণায় বসে তার দিকেই অপলক চেয়ে আছে

অন্তু। ভীষণ অস্বস্তিতে কাটা হয়ে আছে নীরা। কাল রাতের ওমন ঘটনার পর লজ্জায় মাথা তুলে তাকানো যাচ্ছে না। অথচ অন্তুর চোখে যেন আজ রাজ্যের অবসর। নীরা আড়চোখে তাকাল। সাথে সাথেই চোখে চোখ পড়ল দুজনের। নীরা দ্রুত চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্তুর দিকে পিঠ করে বিছানায় বসল। চুলগুলো হাত খোপা করে গুটিশুটি

হয়ে শুয়ে পড়ল এক কোণায়। কাঁথা দিয়ে টুপ করে মুখ ঢেকে নিয়ে চোখদুটো খিঁচে বন্ধ করে ফেলল লজ্জায়। পুরো ব্যাপারটা সূক্ষ্ম চোখে নিরক্ষণ করে বেশ মজা পেয়ে গেল অন্তু। নীরার দিকে কিছুটা সরে বসে নীরার মাথার কাছাকাছি ঝুঁকে এসে হুট করেই টেনে সরিয়ে দিল কাঁথা। নীরা বিস্ময় নিয়ে তাকাতেই হাসল অন্তু। চোখ টিপে বলল,‘ হ্যালো।’

নীরা ভরকে গেল। কাঁথা নিয়ে আবার মুখ ঢাকল। অন্ত আবারও একই কাজ করতেই দুই হাতে মুখ ঢেকে অসহায় কণ্ঠে বলল নীরা,

‘ উফ! আমি লজ্জা পাচ্ছি।’

নীরার কথায় হুহা করে হেসে উঠল অন্ত। জোরজবরদস্তি করে নীরার হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে, নীরাকে অনুকরণ করে বলল,

‘ উফ! এত লজ্জা কেন পাচ্ছেন?’

নীরা হেসে ফেলল। অন্তু টুপ করে চুমু খেয়ে নিল নীরার কপালে। সেই প্রথমদিনের মতোই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাল অন্তু। নীরার উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আলো নেভাল। কিন্তু সরে গেল না। জহরি চোখে চেয়ে রইল নীরার চোখে, ঠোঁটে, লতানো দেহে। নীরার গায়ে আজও পাতলা শাড়ি। মৃদু সবুজ আলোতে মোমের মতো জ্বলজ্বল করছে ফর্সা

উদর। নারী দেহের আকর্ষণীয় বাঁক। অন্তর চোখের সুপ্ত মুগ্ধতা এবার জ্বলজ্বল করে উঠল চোখে। মাথা নুইয়ে ঠোঁট রাখল ঠিক সেখানেই যেখানে একবার আকস্মিক কাঁপন ধরিয়েছিল নীরা। গলদেশের পাশটায় আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের গাঢ় ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল নীরা। ছোঁয়ার প্রখরতা বেড়ে ঠোঁটের কাছে পৌঁছেতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল

এক অভাবনীয় আনন্দ বার্তা। প্রতীক্ষার সম্ভাব্য অবসান!আকাশের কোণে প্রত্যুষের দেখা মিলতেই জ্বর নেমে এলো নম্রতার। দুর্বল হয়ে পড়ল শরীর। ঠিক আজই, বাদ জোহরে আরফানের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার দিন। অন্য কোনো দাওয়াত হলে চোখ বন্ধ করে নাকজ করতেন নুরুল সাহেব। কিন্তু এবার তা করলেন না। মেয়ের এই নাজুক

অবস্থায় আরফানের সাথে দেখা হলে ভালো লাগবে ভেবে দাওয়াত রক্ষার প্রস্তুতি নিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে গিয়েই ঘটল আরেক দূর্ঘটনা। আরফানদের বাড়িতে চাপা উচ্ছ্বাস। চারদিকে নতুন অতিথি আপ্যায়নের ব্যস্ততা। হাসি-আড্ডায় মাতোয়ারা হয়ে আছে চারপাশ। এমন একটা আনন্দঘন পরিবেশে চুপচাপ বসে আছে নম্রতা। চোখ-মুখ ফ্যাকাসে।

দৃষ্টি অস্থির। মস্তিষ্কে চলছে ভয়ানক দ্বন্দ্ব, আরফান কেন বাড়ি নেই আজ? নিদ্রা বলেছিল, দুপুরের খাবারটা আজ বাড়িতেই খাবে আরফান। ফিরবে জলদি। কিন্তু ফিরল না তো। নম্রতা অস্থির চোখে ঘড়ির দিকে তাকাল। এক সময় ঘড়ির কাটা এসে ঠেকল দুটোয়। তারপর তিনটা। আরফান ফিরল না। নম্রতার হঠাৎ করেই মনে হল,

নম্রতার উপস্থিতি, একমাত্র নম্রতার উপস্থিতিই আরফানের না ফেরার কারণ। নম্রতা আছে বলেই কি বাড়ি ফিরল না আরফান?নম্রতাকে এড়িয়ে চলার জন্য, নম্রতার মুখোমুখি হওয়ার ভয়েই কী আরফানের এই আত্মগোপন? নম্রতার গলা শুকিয়ে এল। অচেনা এক ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। গায়ের জ্বরটা আবারও তরতর করে বেড়ে গেল। শরীরটা দুর্বলতায়

অসাড়। ঘড়ির কাঁটা তিনটায় গড়াতেই খাবারের জন্য তাড়া দিলেন আরফানের মা। আরফান কোনো কাজে আটকে গিয়েছে ভেবে অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী না করে খাবার টেবিলে বসল সবাই। কিন্তু নম্রতার মস্তিষ্ক ঘটনাটা সহজভাবে নিতে পারল না। বারবার মনে হতে লাগল, কোনো কাজ নয়, বাড়ি না ফেরাটা আরফানের ইচ্ছেকৃত। নম্রতার

উপস্থিতিই তার না ফেরার কারণ। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, শারিরীক দুর্বলতা আর জ্বরের প্রখরতায় দুই লোকমা খাবারও মুখে তুলতে পারল না নম্রতা। সবই কেমন বিস্বাদ, তেঁতো। তার থেকেও বড় কথা খাবারটা যে গলা দিয়ে নামছে না! নম্রতা পানি দিয়ে খাবারটুকু গিলে নিতেই নম্রতার মুখোমুখি চেয়ারটিতে এসে বসল নিদ্রা। খাবারের প্লেট

তুলে নিতে নিতে বলল,‘ নিষ্প্রভ ভাইয়া তো হসপিটালে নেই মা। হসপিটাল থেকে জানাল, ভাইয়া প্রায় তিন চার ঘন্টা আগে বেরিয়ে গিয়েছে।’

আরফানের মা ভ্রু কুঁচকালেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন,

‘ হসপিটালে নেই? তবে গিয়েছে কোথায়? ওকে ফোন দাও।’

নিদ্রা ঠোঁট উল্টে বলল,‘ ভাইয়ার ফোন একবার সুইচড অফ। একবার নেটওয়ার্ক বিজি। ভাইয়াকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।’

নম্রতা চমকে উঠল। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল রাতে দেখা স্বপ্নের কথা। আরফানের বলা বিষাক্ত সেই বাক্য, ‘আপনি হারিয়ে যান নম্রতা। হারিয়ে যান।’ তবে কী আরফানই হারিয়ে যাচ্ছে দূরে? নম্রতা থেকে

বহুদূরে? নম্রতা তপ্ত শ্বাস ফেলল। আশপাশটা ঝাপসা লাগছে। সেই স্বপ্নের মতোই অস্পষ্ট লাগছে সব। নম্রতা হাত বাড়িয়ে পানির গ্লাস নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে ছলকে উঠল গ্লাসভর্তি জল। দুই ঢোক পানি গলায় ঢালতেই মুখ ভর্তি বমিতে ভাসিয়ে দিল শরীর। নিস্তেজ শরীরে দ্বিতীয় বার বমি করে, তৃতীয়বারে জ্ঞান হারাল নম্রতা। নম্রতার হঠাৎ

এই অবস্থায় ভরকে গেল সবাই। আতঙ্কিত হয়ে উঠল। খাবার-দাবার সব সেভাবেই পড়ে রইল, কারো পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছাল না। নুরুল সাহেব মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে চাইলেও বাঁধা দিলেন আরফানের মা। নম্রতাকে খোলামেলা একটি ঘরে শুইয়ে দিয়ে পরিচিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলেন। নম্রতার কাপড় পাল্টে নিদ্রার কাপড়

পরানো হলো। হাতে-পায়ে তেল মালিশ করতে করতে অপরাধী কণ্ঠে বললেন,‘ মেয়েটা আমাদের বাড়িতে এসে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভীষণ লজ্জিতবোধ করছি ভাইসাহেব। মেয়েটাকে অসুস্থ অবস্থায় যেতে দিতে বিবেকে বাঁধছে। আমাদের বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়েছে, আমাদের সেবায় সুস্থ হোক। নিজ পায়ে হেঁটে এসেছে,

নিজ পায়ে হেঁটে ফেরার সামর্থ্য হোক। এটুকু সুযোগ আমাদের দিন। নয়তো নিজের বিবেকের কাছেই বড্ড খচখচ করবে।’

নুরুল সাহেব ভদ্রমহিলার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। আরফানেরই এক ডাক্তার বন্ধু বাড়ি বয়ে এসে নম্রতাকে দেখে গেলেন। কিছু এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইভ করলেন। স্ট্রেস কমানোর ঔষধ আর পরপর

দুটো স্যালাইন পুশ করলেন। নুরুল সাহেবকে বলে গেলেন,‘ রাতে আবারও বমি হলে বা শরীর খুব দূর্বল মনে হলে আরও একটা স্যালাইন দিতে হতে পারে। আপনারা আরেকটা স্যালাইন ম্যানেজ করে রাখবেন। আর উনাকে স্ট্রেজ থেকে দূরে রাখুন আপাতত। দুই একদিন যাবৎ হয়ত কোনো

কারণে খুব দুশ্চিতা করছেন। প্রেশারের অবস্থা ভয়াবহ।’

নম্রতার জ্ঞান ফিরল প্রায় দুই তিনঘন্টা পর। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। জানালার কার্ণিশে এসে বসেছে ক্লান্ত শালিক। নম্রতার জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন ডাক্তার। জ্ঞান ফিরতেই দ্রুত একটা ইনজেকশন পুশ করলেন। নম্রতা ঝাপসা চোখে বাবা-বোনের মুখের

দিকে তাকাল। ঘোলা মস্তিষ্কে বার দুয়েক কি আরফানকে খুঁজল? হয়তো খুঁজল, হয়তো নয়। মিনিট পাঁচেকের মাঝেই ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল অতল অন্ধকার ঘুমের রাজ্যে। ঘুমিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে খুব মৃদু কিছু শব্দ ভেসে এলো কানে। নম্রতার মনে হলো, এ যেন অন্য কোনো পৃথিবীর শব্দ। বহুদূরের পথ অতিক্রম করে শব্দরা বুঝি ক্লান্ত।

অবিশ্রান্ত। নম্রতার মতোই নিদ্রাগত।'

'ভাবীকে তো বেশ কয়েকবার হসপিটালে দেখেছি। খুব মিশুক আর হাসিখুশিই মনে হয়েছিল তখন। হঠাৎ এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে? আরফান কোথায় আন্টি?'

আরফানের মা ভারী নিঃশ্বাস ফেললেন। কপাল কুঁচকে এলো। দুশ্চিন্তায় থমথমে হয়ে গেল তাঁর সুন্দর মুখ। এক ছেলেকে হারানোর

পর ছেলেকে নিয়ে বড় ভয়। ঠিক এই বয়সে এসেই হারিয়ে গেল বড় ছেলেটা। বাড়িতে সেদিনও আত্মীয়-স্বজনের মেলা। স্নিগ্ধার বাড়ি থেকে আত্মীয় এসেছে বিয়ের তারিখ ঠিক করার উদ্দেশ্যে। এমন সময় আইসক্রিমের জন্য বায়না ধরল নিদ্রা। সেই সাথে বিশাল এক টেডিবিয়ার। বোনকে শান্ত করতে হাসিমুখেই বেরিয়ে গেল নেহাল।

সেই যে গেল আর ফিরল না। সেই হাসিমুখটা আর হাসল না। ভদ্রমহিলার ভেতরটা হু হু করে উঠল। ভয়ার্ত চোখে নম্রতার ঘুমন্ত মুখটির দিকে তাকালেন। সেদিনও ঠিক এভাবেই, এই বিছানাতেই অচেতন হয়ে পড়ে ছিল স্নিগ্ধা। একই দৃশ্য। একই উৎকণ্ঠা। ছেলে তার ঘরে ফিরছে না। ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলার ভেতরটা

থরথর করে কাঁপতে লাগল। পুরাতন স্মৃতি, পুরাতন ইতিহাসগুলো ভেসে উঠল একের পর এক। রক্তাক্ত হলো বুক। দলা পাকাল এক সমুদ্র কান্না!সূর্যের আলো যখন নরম হয়ে এলো। গোধূলি হানা দিল দরজায়। কনে দেখা আলোয় উচ্ছ্বসিত হল চারপাশ ঠিক তখনই সিরাজগঞ্জ গিয়ে পৌঁছাল আরফান। ঘড়িতে তখন সাড়ে তিন কী চারটা

বাজে। আরফান ক্লান্ত চোখে চারপাশটা দেখল। বাসস্ট্যান্ডের পাশের এক চায়ের স্টল থেকে এক চা খেয়ে আবারও রাস্তায় নামল। বাসস্ট্যান্ডের এক লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করল,

‘ ভাই এখান থেকে কামারখন্দ কতদূর?’

লোকটি আরফানকে আগাগোড়া দেখে নিয়ে বলল,

‘ কামারখন্দ কই যাইবেন?’

‘ কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাব। এখান থেকে যাওয়ার উপায় কী?’

লোকটি বোধহয় বাসের কন্ট্রাক্টর। আরফানের সাথে কথা বলতে বলতেই একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে বলল,

‘ এইখান থাইকা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট লাগব কামারখন্দ যাইতে।

সিএনজি বা অটো ধইরা চইলা যান। মোড়েই সিএনজি পাইবেন।’আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মোড়ে গিয়ে সিএনজি ধরে, সিএনজিতে উঠে বসতেই পেটে মোচড় দিয়ে উঠল ক্ষুধা। হুট করেই মনে পড়ে গেল, সারাদিন খাওয়া হয়নি তার। হাসপাতাল থেকে এগারোটার দিকে বেরিয়ে শাহাবাগ গ্রন্থাগারে গিয়েছিল আরফান। দুই ঘন্টা সময় নিয়ে, দুই

তলার সেই পরিচিত তাকের প্রতিটি বইই নিঁখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়েই সিরাজগঞ্জের বাস ধরেছে আরফান। এই দীর্ঘ দিনটিতে খাওয়ার কথা একবারও মনে পড়েনি তার। আরফান সিএনজির সিটে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করল। মাথাটা ধপধপ করছে। চোখ ব্যথা করছে।

এই মুহূর্তে চশমাটা খুব প্রয়োজন। আরফানের মনে পড়ল, চশমাটা চেম্বারেই ফেলে এসেছে সে। সেই সাথে ফেলে এসেছে মোবাইল ফোন। প্রায় চল্লিশ মিনিটের মাথায় কামারখন্দ গিয়ে পৌঁছাল আরফান। সেখান থেকে অটোরিকশায় কামারখন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। আরফান যখন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয়ে

হয়ে এসেছে প্রায়। চারদিকে শেষ বিকেলের বিষণ্ন আলো। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় সুন্দর মতোন এই ছেলেটা ডাক্তার মুহিব নামে একজনের খোঁজ করতেই কৌতূহল নিয়ে তাকাল সবাই। গায়ে-গতরে পুরোদস্তুর শহুরে মানবটিকে পরখ করে নিতেই যেন এগিয়ে এলো একজন। সন্দিহান কণ্ঠে বলল,‘

ডাক্তার মুহিবকে দিয়ে কী কাজ? ডাক্তার দেখাবেন।'

আরফান গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

' না। মুহিব আমার পরিচিত। ওকে গিয়ে বলুন ডক্টর আরফান দেখা করতে এসেছে। আমাকে চিনবে।'

লোকটির দৃষ্টি এবার সরু হলো। আরফান যে সাধারণ কেউ নই বুঝতে পেরে তাকে বসতে দিয়ে মুহিবকে ডাকতে পাঠাল।

আরফানের নাম শুনে ঠিক চিনতে না পারলেও আরফানকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল মুহিব। ভীষণ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল গোলাকার মুখ। হতভম্ব ভাব কেটে যেতেই দৌঁড়ে গিয়ে জাপটে ধরল তাকে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,' আরফান ভাই! আপনি এখানে? দেশে ফিরেছেন কবে?'

আরফান উঠে দাঁড়াল। শুকনো হেসে বলল,

‘ সে অনেকদিন। প্রায় এক বছর হয়ে যাচ্ছে। রাদিনের কাছে শুনলাম তুই এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছিস।’

মুহিব হন্তদন্ত করে চা বিস্কুটের ব্যবস্থা করল। আরফানকে নিজের কেবিনে নিয়ে গিয়ে বলল,

‘ হ ভাই। কিন্তু আয় রোজগার তেমন নাই। সরকার ডাক্তারদের জীবনটা একদম খেয়ে দিল। কষ্ট করে বিসিএস পাশ করেই বা কী

লাভ হইল? এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পোস্টিং দিল যে জীবন শ্যাষ। কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে কী মনে করে?’ আরফান চেয়ার টেনে বসল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সরাসরি প্রসঙ্গ টেনে বলল,‘ তোর সাথেই দেখা করতে এসেছি। বিষয়টা সেনসেটিভ। ভেবে জবাব দিবি।’

মুহিব খানিক ভরকে গেল এবার। ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর বুঝতে পেরে সোজা হয়ে বসল। ভীত কণ্ঠে শুধাল,

‘ কোনো সমস্যা ভাই?’

‘ হ্যাঁ। সমস্যা। ইউএস যাওয়ার আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম তোকে। চিঠিটা গ্রন্থাগারে নির্দিষ্ট একটি বইয়ের মলাটের তলায় রাখতে বলেছিলাম, মনে আছে?’

মুহিব থতমত খেয়ে গেল। এই সামান্য একটা বিষয় জানতে আরফান এতোটা ছুটে এসেছে ভাবতেই অবাক হলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ জি ভাই। মনে আছে।’

আরফান এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে মুহিবের দিকে খানিক ঝুঁকে এসে বলল,

‘ চিঠিটা যার জন্য ছিল সে পায়নি। চিঠিটা বইয়েও নেই। পুরো তাকের কোনো বইয়েই নেই। তারমানে চিঠির জায়গা অদলবদল করা হয়নি। কিন্তু হাত আদলবদল হয়েছে। কোনোভাবে সেটা অন্য কারো হাতে পৌঁছেছে। পাবলিক লাইব্রেরিতে কাকতালীয়ভাবে চিঠিটা অন্যকারো হাতে পড়ে যেতে পারে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক

বিষয়টা হলো, এতো খোঁজাখুঁজির পরও না পাওয়া চিঠিটা প্রায় পাঁচ বছর পর হঠাৎই একজনের হাতে পড়ে গেল। যে নিজেকে সেই চিঠির মালিক বলে দাবী করতে লাগল। আমি যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নিই যে সে-ই চিঠির মালিক তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, সে এতোদিন পর আত্মপ্রকাশ ঘটাল কেন? আর যদি সে চিঠির মালিক

না হয়, তাহলে তার কাছে চিঠিটা পৌঁছাল কীভাবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর হিসেবে সে আমায় বলেছে, সে নাকি ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছিল তাই তাৎক্ষনাৎ যোগাযোগ করতে পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে মিথ্যা বলছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যদি বলি,কাকতালীভাবে চিঠিটা কারো হাতে লেগে গিয়েছে তবুও খুব লেইম একটা যুক্তি হবে।

কাকতালীয়ভাবে চিঠিটা কারো হাতে লাগার পর কেউ নিশ্চয় চিঠিটা সযত্নে রেখে দেবে না। কনফিউশান ক্রিয়েটের চেষ্টা করতে চাইলে তখনই করতে পারত, পাঁচবছর যাবৎ অপেক্ষা করে বসে থাকত না। তারমানে স্পষ্ট, চিঠিটা পাঁচবছর আগে কেউ পায়নি। পেয়েছে আজকালের মধ্যে। কিন্তু কিভাবে সম্ভব?'মুহিব অবাক চোখে চেয়ে

রইল। উত্তর দিল না। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ তুই বোধহয় আমাকে সাহায্য করতে পারিস মুহিব। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো, চিঠিটা কী সত্যিই সঠিক বইটাতে রাখা হয়েছিল? সত্যিই?’

মুহিব থতমত খেয়ে গেল। অসহায় চোখে চেয়ে রইল আরফানের চোখে।কাকের কর্কশ ডাকে ঘুম

ভেঙে গেল নম্রতার। দক্ষিণের জানালায় বসে থাকা কাকটা কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে। ঘরভর্তি প্রথম ভোরের আলো। নম্রতা চোখ মেলে চারপাশটা দেখল, অপরিচিত ঘর, অপরিচিত বিছানা। সদ্য ভোরের ঝাপসা আলোয় অপরিচিত ঘরটা আরও বেশি অপরিচিত ঠেকল নম্রতার। শরীরটা দূর্বল লাগছে। হাতে-পায়ে বল

পাওয়া যাচ্ছে না। নম্রতা ধীরেসুস্থে বিছানা থেকে নামল। গায়ে তার নিদ্রার টি-শার্ট আর টাওজার। গায়ের পোশাকের দিকে কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থেকে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। মিনিট খানেক ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎই গুটি গুটি পায়ে ঘর ছাড়ল নম্রতা। আশপাশটা দেখতে দেখতে উঠে গেল ছাদে। চাল-চলনে তার অস্বাভাবিকতার

ছোঁয়া। যেন ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি কোনো রাজ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। ছাদের দরজায় পৌঁছেই স্তম্ভিত হয়ে গেল নম্রতা। ছাদটাকে হঠাৎ করেই রূপকথার রাজ্য বলে বোধ হলো। বিশাল ছাদটা ভোরের ফ্যাকাশে আলো আর কুয়াশায় ঝাপসা দেখাচ্ছে চোখে। সেই ঝাপসা আলোতেই টানা বারান্দা দেওয়া ছনের ঘরটা চোখে

পড়ল নম্রতার। বারান্দার বাঁশগুলো বাহারি লতা-পাতায় ঢাকা। ঘরের পাশে, মাঝারি আকারের শিউলি গাছে, ফুটন্ত কিছু শিউলি। কুয়াশায় ডুবে থাকা ঘরটা যেন দরদী শিল্পীর ভীষণ দরদ দিয়ে আঁকা প্রকৃতির গল্প। ফুল গাছে ভরে থাকা চারপাশটা কী স্নিগ্ধ। এ যেন এক রূপকথার বেলীফুলের রাজ্য!নম্রতা বিস্ময় নিয়ে সামনে এগলো। ঘরের

সামনের দুই তিন হাতের রাস্তাটা শিউলির চাদরে ঢাকা। নম্রতা কৌতূহল নিয়ে বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বারান্দার এক কোণায় ছোট্ট একটা দোলনা। দরজার পাশের দেয়ালটিতে ঝুলছে ভীষণ পুরোনো এক হারিকেন। পশ্চিমের দেয়ালটিতে নকশা করা বেতের বাক্স। তাতে গুটি গুটি অক্ষরে লেখা 'ডাকপিয়ন'। নম্রতার ঠোঁটে হাসি

ফুটল। চোখে ফুটল রাজ্যের বিস্ময়। ঢাকা শহরে এমন একটা ঘর? অবিশ্বাস্য! নম্রতা ডাকপিয়নের দিকে পা বাড়াতেই অদ্ভুত তীক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কেউ,

‘ শ্যামলতা! শ্যামলতা! চিঠি! চিঠি! আমার নাম ডাকপাখি। আমার নাম ডাকপাখি।’

নম্রতা চমকে দুই পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ভীষণ ভীত চোখে

আশেপাশে তাকাল। কই?কেউ তো নেই। নম্রতার ভাবনার মাঝেই আবারও চেঁচিয়ে উঠল সেই কণ্ঠ,” শ্যামলতা! শ্যামলতা! চিঠি! চিঠি!’ নম্রতা এবার ভয়ে ভয়ে বারান্দার দিকে তাকাল। বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করল, বারান্দার এক কোণায় ঝুলছে খাঁচায় বন্দী হৃষ্টপুষ্ট টিয়া পাখি। নম্রতা বোকা বোকা চোখে চেয়ে রইল। টিয়া পাখিটা তার নামই তো

ডাকছে। কি আশ্চর্য! পাখিটা তাকে চেনে? নম্রতার ভাবনার মাঝেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো দীর্ঘকায় এক মানব। নম্রতা চোখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। মানুষটির গায়ে অফ হোয়াইট টি-শার্ট। মাথা ভর্তি ভেজা চুল। চোখদুটোতে এক রাজ্য বিস্ময়। নম্রতা কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল। ফিরে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিতেই হেসে এগিয়ে এলো

মানুষটি।‘ এতো সকালে উঠে পড়েছেন যে?’

পরমুহূর্তেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল,

‘ জ্বর কমেছে? দেখি।’

নম্রতা দুই পা পিছিয়ে গিয়ে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। উত্তর দিল না। আরফান বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলল,

‘ কী হলো?’

নম্রতা চোখ ছোট ছোট করে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। আরফান কপাল কুঁচকে তাকাল। নম্রতাকে আগাগোড়া নিরক্ষণ করে বলল,

‘ জ্বর নিয়ে এই পাতলা কাপড়ে ছাদে আসার কী প্রয়োজন ছিল? কমন সেন্স নেই? কত ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে দেখেছেন?’

এটুকু বলেই ঘরে ঢুকে গেল আরফান। কয়েক মিনিটের মাঝেই

চাদর হাতে বেরিয়ে এলো আবার। চাদরটা নিয়ে নম্রতার দিকে এগিয়ে আসতেই ছিটকে সরে গেল নম্রতা। ধমক দিয়ে বলল,‘ খবরদার আমার দাঁড়ে কাছে আসবেন না। বেয়াদব পুরুষ মানুষ। আপনার মনের খবর আমি খুব ভালো করেই জানি।’

আরফান থমকে দাঁড়াল। অবাক চোখে চেয়ে রইল। নিজেকে ধাতস্থ করে মৃদু হাসল,

‘ আচ্ছা? তো কী জানেন?’

‘ আপনি যে আমায় পটিয়ে ফটিয়ে নিজের জীবন থেকে আউট করতে চান তা খুব ভালো করে জানি আমি। দেখুন ডক্টর? এতো নাটক ফাটকের দরকার নেই। আমার প্রতি এতো মায়া দেখানোরও প্রয়োজন নেই। আমি এমনিতেও আপনাকে বিয়ে করব না। আপনার যাকে ইচ্ছে আপনি বিয়ে করতে পারেন, আমার

কোনো আপত্তি নেই। আমি বাবাকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিব। আপনি চাইলে আপনার মাকেও জানিয়ে দিতে পারি। নাও চয়েজ ইজ ইউরস।’

নম্রতার কথায় যেন আকাশ থেকে পড়ল আরফান। আকাশসম বিস্ময় নিয়ে বলল,‘ কী বলছেন? কেন বলছেন?দুপুরে আসিনি বলে এত রাগ?’

নম্রতা চোখ রাঙিয়ে তাকাল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল,

‘ আপনি দুপুরে আসুন বা বিকেলে আসুন বা মধ্যরাতে কারো সাথে ফোনালাপে ব্যস্ত থাকুন কোনো কিছুতেই আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। আমি আপনাকে বিয়ে করব না, মানে করব না।’

আরফান হাসল। নম্রতাকে জোর করে টেনে নিল কাছে। নম্রতা হাত

ছাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেও লাভ বিশেষ হলো না। আরফান নম্রতাকে শক্ত করে চেপে ধরে চাদর জড়াল গায়ে। নম্রতাকে ধাক্কাধাক্কি করতে দেখে হাতের বাঁধন শক্ত করে বলল,‘ আহ! লাফাচ্ছেন কেন? বিয়ে করবেন না বললেন, শুনেছি তো। বিয়ে না করলে জড়িয়ে ধরা যাবে না? আপনার যদি বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয় তাহলে করব না। জোরাজুরি

করেছে কে? বিয়ে তো সবাই করে। আমরা বরং লিভ ইন রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করব। বাইরের দেশগুলোতে এসব কমন। ব্যাপার না।’

নম্রতা ধাক্কাধাক্কি থামিয়ে অবাক চোখে তাকাল। পরমুহূর্তেই রাগে ফুঁসে উঠল। আরফান থেকে দূরে সরার চেষ্টা করে বলল,‘ আপনি খুবই জঘন্য একটা মানুষ। কী মনে

করেন আমাকে? খুব সস্তা? মাঝরাতে অন্যের ফোনালাপে ব্যস্ত থাকবেন অথচ আমার বেলায় ব্যস্ততা। আমি বেঁচে আছি না মরে গিয়েছি তাতে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আপনার। নিজ থেকে ফোনটা পর্যন্ত দেন না। আর আমি ফোন দিলে বিরক্তিতে ফোন বন্ধ। এতোই যদি বিরক্তি তাহলে এতো নাটকের প্রয়োজন কী? আপনার জীবনে

আমার অস্তিত্ব ব্যস্ততা আর খেয়াল হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নিষ্প্রভ। আমি বোধহয় অতটাও সস্তা নয়। এতোটা অবহেলা আমি ডিজার্ভ করি না। আর আপনি ডিজার্ভ করেন না আমাকে। কখনও ডিজার্ভ করেন না। ছাড়ুন!'

কথাগুলো বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল নম্রতা। আরফান আহত চোখে তাকাল। রাগারাগি না করে

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। মৃদু কণ্ঠে বলল,‘ আপনাকে অবহেলা করা আমার পক্ষে সম্ভব বলে আপনার বিশ্বাস হয় নম্রতা?’

নম্রতা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অন্য দিকে চেয়ে রইল। উত্তর দিল না। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আমি যে এমনই তা তো আপনি জানতেন নম্রতা। বার বার ফোনে কথা বলার চেয়ে আপনাকে অনুভব

করতেই বেশি পছন্দ করি আমি। যখন আমাদের মাঝে চিঠি দেওয়া নেওয়া হতো তখনও কী আমি এমনই ছিলাম না?’

নম্রতা কিছুক্ষণ চুপ থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,‘ তাই বলে কখনও অবহেলা করতেন না। এক সপ্তাহ পরও যখন চিঠি লিখতেন, আমার মনে হতো আপনার সবটা জুড়ে শুধু আমিই আছি। কিন্তু এখন তেমনটা হচ্ছে

না। আমার বারবার মনে হচ্ছে আপনি অন্যকারো মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন ডক্টর। এমন যদি হয় তবে আমায় সরাসরি বলুন। আমি আপনার পথে বাঁধা হব না।'

আরফানের মেজাজ বিগড়ে গেল। নম্রতাকে ছেড়ে দিয়ে বারান্দার দরজায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে চোখ তোলে তাকাল। নম্রতার হাতটা জোরপূর্বক

টেনে নিয়ে পাশে বসাল। নম্রতার হাতের আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে করতে বলল,‘ কেন আমায় অবিশ্বাস করছেন নম্রতা? আমি কী এমন কিছু করেছি যা আপনার পছন্দ হয়নি? আমি মাঝরাতে কারো সাথে কথা বলি, এটা আপনার ভুল ধারণা। আপনার আমাকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল যেমনটা আমি আপনাকে করি। কিছুদিন যাবৎ একটা মেয়ে ভীষণ

বিরক্ত করছিল আমায়। ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন দিয়ে কান্নাকাটি করছিল। তারপর হঠাৎ একদিন নিজেকে শ্যামলতা বলে দাবী করে বসল।'

নম্রতা অবাক চোখে তাকাল। আরফান অসহায় কণ্ঠে বলল,

' আপনি চাইলে আমার কল লিস্ট চেইক করতে পারেন। আমি কখনও ফোন দিইনি তাকে। সে নিজে

আমাকে ফোন দিয়েছে প্রতিবার। সে যখন নিজেকে শ্যামলতা বলে দাবী করল তখন ভীষণ ডিস্টার্বড হয়ে পড়েছিলাম আমি।’

নম্রতা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল,‘ মেয়েটার কথায় আমাকে অবিশ্বাস করেছিলেন আপনি? এজন্যই এবোয়েড করছিলেন আমায়?’

আরফান হেসে ফেলল। নম্রতাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে আলতো চুমু

খেল কপালে। ভীষণ তৃপ্তি নিয়ে বলল,

‘ এক সেকেন্ডের জন্যও নয়।’

‘ তাহলে ম্যান্টালি ডিস্টার্বড হয়ে পড়েছিলেন কেন? মেয়েটার ফোন নাম্বারটা ব্লক করে দিলেই হতো।’

আরফান নম্রতাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল,‘ আপনি নিজেও জানেন না শ্যামলতা নামক মানুষটা আমার অনুভূতির

কতটা জুড়ে আছে নম্রতা। এই অনুভূতিটা কতটা তীক্ষ্ণ, কতটা জোড়াল। আমার জীবনের সবচেয়ে সেনসেটিভ দিকগুলোর একটি আপনি নিজে শ্যামলতা। মেয়েটা যখন ফোন দিয়ে নিজেকে শ্যামলতা বলে দাবী করছিল। তখন আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার এই অনুভূতিটাকে অপমান করছে। আপনাকে অপমান করছে। আমাদের

এই অনুভূতি নিয়ে বিশ্রী একটা খেলা খেলছে। হাসাহাসি করছে। বিষয়টা আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। দ্বিতীয়ত, মেয়েটা কে হতে পারে, তার উদ্দেশ্য কী এসবও মাথায় ঘুরছিল খুব। তারওপর হসপিটালে কাজের চাপ। সব মিলিয়ে পরিস্থিতিটা অসহ্য লাগছিল খুব। আপনার ধারণা তার নাম্বার আমি ব্লক করিনি? এই নিয়ে দশটা

নাম্বার ব্লক করেছি কিন্তু কোনো লাভ নেই। শেষমেশ বিরক্ত হয়ে ফোন রিসিভ করে ফেলে রাখতাম। যখন দেখলাম তাতেও কাজ হচ্ছে না তখন ফোনই বন্ধ করে রাখতে লাগলাম। সেদিন রাতেও এমন কিছুই ঘটেছিল। ফোন রিসিভ করে ফেলে রেখেছিলাম বলেই আপনার কলের হদিশ পাইনি। আপনার সাথে কথা বলার সময়টুকুতেও চার থেকে

পাঁচবার কল দিয়েছে সেই মেয়ে। এতো বিরক্ত লাগছিল। ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে আমি খুন করে ফেলি।'নম্রতা স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইল। আরফান একটু থেমে আবার বলতে লাগল,

' রাতে মেজাজ খারাপ থাকায় ঘুম ভালো হয়নি। ডিউটিতেও ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারিনি। হসপিটালেও সেদিন ঝামেলা

চলছিল। রোগীর চাপও ছিল বেশি। এতো কিছুর মধ্যে সীম অন করার ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। আপনাকে ফোন করার সুযোগও হয়নি। আপনি বলার পর মনে হয়েছে। আমার খেয়াল রাখার উচিত ছিল। আমি সরি নম্রা।'

নম্রতা অভিমান নিয়ে বলল,

' আমি তো ভেবেছিলাম, আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে ফোন বন্ধ

রেখেছেন আপনি। আপনার অন্য নাম্বারটাও দেননি আমায়। আমি ফোন দেওয়ার পরও রুড বিহেভ করেছেন, আমি কষ্ট পেয়েছি।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,‘ ওই ফোন নাম্বারটা যে আপনার কাছে নেই তাই-ই তো খেয়াল ছিল না আমার। আর তখন সামনে সত্যিই প্যাশেন্ট ছিল। বৃদ্ধা ভদ্রলোক ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে চেয়ে

আছে, বিষয়টা অস্বস্তির না? আপনি বুঝতেই চাইছিলেন না। প্যাশেন্টের সামনে কী করে বুঝায় বলুন? আর রাগ তো আমারও করার কথা ছিল। আমি কী রাগ করেছি? নিদ্রার থেকে আপনার অসুস্থতার খবর শুনে কত অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম জানেন? হাজারবার কল দিয়েছি, রিসিভ করলেন না। শেষমেশ লজ্জার মাথা

খেয়ে আপনার বন্ধু নাদিমকে ফোন করতে হয়েছে আমায়।'

নম্রতা চোখ বড় বড় করে তাকাল। অবিশ্বাস নিয়ে বলল,

' নাদিমকে ফোন করেছিলেন আপনি? ও বলেনি তো।" বলার প্রয়োজন মনে করেনি বলেই হয়ত বলেনি। তাছাড়া সেদিন রাত একটা পর্যন্ত ফোন ট্রাই করেছি আমি। বারোটা পর্যন্ত ফোনই রিসিভ

করলেন না। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। সকালে হসপিটালে যাওয়ার আগে এবং হসপিটালে গিয়েও কল করেছিলাম সেই-ই যে ফোন বন্ধ আর খুললেনই না। কতটা অস্থির লাগছিল জানেন?'

নম্রতার হঠাৎ করেই মনে পড়ল, আরফানের সাথে রাগ করে ফোনটা সাইলেন্ট করে আলমারিতে তুলে রেখেছিল নম্রতা। ছোঁয়ার বিয়ে বাড়ি

থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হওয়ায় আর বের করা হয়নি। নম্রতা অপরাধী চোখে তাকাল। পরমুহূর্তেই তেজ নিয়ে বলল,‘ তা নাহয় বুঝলাম কিন্তু কাল দুপুরে কোথায় হাওয়া হয়েছিলেন আপনি? এতোই যদি খারাপ লাগত তাহলে আমি আসব জেনেও হাওয়া হতেন না নিশ্চয়।’

কথাটা বলে ভ্রু নাচাল নম্রতা। আরফান ভেজা চুলগুলো গোছাতে গোছাতে বলল,

‘ হসপিটালে যাওয়ার দুই তিন ঘন্টা পর আবারও সেই মেয়ের ফোন পেয়েছিলাম আমি। মেয়েটি কথা শুরু করার আগে পাশে কোথাও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মেয়েটির কথার মাঝেও পাশে থেকে সূক্ষ্ম হাসির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। মনে

হচ্ছিল কয়েকজন মিলে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। তৎক্ষনাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। ওরা যে দলবেঁধে ব্যাপারটা নিয়ে ফাজলামো করছে তা তখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঠিক ওই মুহূর্তে আসল কালপ্রিটকে না ধরতে পেরে। তাকে দুটো থাপ্পড় না মেরে শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাই রহস্য উদঘাটনে বেরিয়েছিলাম। মেজাজ খারাপ ছিল

বলে বোকামো করে ফোন ফেলে গিয়েছিলাম চেম্বারে। তাই আর কল করে ইনফর্ম করতে পারিনি।’নম্রতা বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ আপনি মেয়েটিকে সত্যিই থাপ্পড় মেরেছেন?’

‘ না। মারিনি। তখন হাতের কাছে পেলে হয়ত মারতাম। যদিও মেয়েদের গায়ে হাত তোলার অভ্যাস আমার নেই। নিদ্রাকেও কখনও

মারিনি। বকিওনি। রেগে গেলেও না। আমি না মারলেও আপনি কিন্তু মারতেই পারেন। লঞ্চে আমাকে যেভাবে খামচে ধরেছিলেন, সেভাবে। নিজেকে আপনার বরের বউ হিসেবে দাবী করছিল। আপনার তো ভয়ানক রেগে যাওয়া উচিত।'

শেষের কথাগুলো দুষ্টুমি করে বলল আরফান। নম্রতা সেসব খেয়াল না করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল,

‘ মেয়েটা কে? খুঁজে পেয়েছেন তাকে?’

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,‘ পাইনি তবে শীঘ্রই পাব। কাল সিরাজগঞ্জ গিয়েছিলাম আমি। রাতে ফিরেছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল চিঠিটা সঠিক জায়গায় রাখা হয়নি। এখনও অবশ্য তাই মনে হচ্ছে। মুহিবের ভাষ্যমতে, চিঠিটা সে গ্রন্থাগারে না রেখে তার এক বন্ধুকে

রাখতে দিয়েছিল। আর পড়াশোনার চাপে চিঠিটা সঠিক জায়গায় রাখা হয়েছিল কী-না তার খোঁজ নিতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। আমি আপনার ফোন না পেয়ে প্রায় তিনদিন পর মুহিবের সাথে যোগাযোগ করি। মুহিব যোগাযোগ করে তার বন্ধুর সাথে। তার বন্ধু তাকে জানায় চিঠিটা সঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে। মুহিবও আমায়

সেরকমটাই বলে। আপনি যখন দুই সপ্তাহের মাথাতেও কল করলেন না। তখন মুহিবকে গ্রন্থাগারে গিয়ে চিঠি আছে কী নেই তা সিওর হয়ে জানাতে বলি। সেদিনই মুহিব গ্রন্থাগারে গিয়ে বইয়ের ছবি তুলে পাঠায়। চিঠি নেই। তারমানে চিঠিটা আপনি পেয়েছেন। এমনটা ধারণা করেই অপেক্ষা করতে লাগি। এখন প্রশ্ন হলো, তার বন্ধু কী চিঠিটা

সত্যিই রেখেছিল বইয়ে?’নম্রতা স্তম্ভিত চোখে চেয়ে থেকে আর্তনাদ করে বলল,

‘ ইয়া মাবুদ! এই একটা চিঠি নিয়ে এত কাহিনী? আমার মাথা ঘুরছে। মুহিব ভাইয়ের বন্ধু আবার আরেকজনকে রাখতে দিলেই হলো। চিঠি এভাবে সার্কেলের মতো ঘুরতেই থাকবে। রহস্যও ঘুরতেই থাকবে ভন ভন ভন। ভয়াবহ।’

আরফান হাসল না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ মুহিব আমার সাথে ঢাকা এসেছে। আজ বিকেলে তার সেই বন্ধুকে একটা কফিশপে দেখা করতে বলা হয়েছে। আমার মনে হয় এবার উত্তর মিলবে।’

নম্রতা আরফানের কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বলল,

‘ এতো কাহিনী! আমি তো শুনতে শুনতেই টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি ভাই।’

আরফান হেসে বলল,‘ এতো অল্পতেই ক্লান্ত? তাহলে চারবছর ধরে অপেক্ষা করলেন কীভাবে? ক্লান্ত হয়ে পড়েননি? আমাকে খুঁজে পাওয়াটাও মুশকিল ছিল।’

নম্রতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ তখন আপনি পাশে ছিলেন না বলে পেরেছি। এখন আছেন, এখন আমার বিশ্রাম।’

আরফান হেসে নম্রতাকে সামনে টেনে নিয়ে বলল,

‘ রাগ-অভিমান কমলে কাছে আসুন তো, জ্বর কমেছে কিনা দেখি। কাল এসেই আপনার অসুস্থতার কথা শুনে কত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম জানেন? মা আমাকে দুই দুটো

থাপ্পড় মেরেছে গালে। আপনি বসুন, আমি আমার ব্যাগ নিয়ে আসি। প্রেশার মাপতে হবে।’

আরফান উঠতে নিতেই বিরক্ত চোখে তাকাল নম্রতা,

‘ এসব ডাক্তারি ফাক্তারি বন্ধ করুন তো। আমি এখন একদম সুস্থ। প্রেশার ট্রেশার মাফতে হবে না। তার থেকে পাশে বসুন, সকাল দেখি।’আরফান আগের জায়গাতেই

বসে পড়ল। নম্রতার হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল,

‘ আচ্ছা। এবার বলুন, মহারাণী কী তার বেলীফুলের রাজ্য দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে? এই রাজ্যে শুধু শ্যামলতার অধিকার।’

নম্রতা এবার আশেপাশে তাকাল। ভীষণ উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল,

‘ ভীষণ সন্তুষ্ট। ঢাকা শহরে ছনের ঘর। ভাবতেই পারছি না। ডেকরেশনটাও কী মারাত্মক!’

আরফান হুহা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল,

‘ এটা ছনের মতো দেখতে হলেও ছনের ঘর নয় নম্রতা। ইটের দেয়ালে ছনের মতো পেইন্ট করা হয়েছে।’

নম্রতা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বোকা বোকা চোখে চেয়ে বলল,

‘ এটা ইটের দেয়াল! একদম বোঝা যায় না। সত্যি বলছি...তাহলে এই বাঁশগুলোও কী?’

বিস্মিত চোখে চাইল নম্রতা। আরফান হেসে বলল,‘ স্পেশাল পেইন্টার এপয়েন্ট করেছিলাম পেইন্ট করার জন্য। যেন আপনি যেমন চান ঠিক তেমই হয়। আর

এগুলোও বাঁশ নয়। স্বাভাবিক লোহার গ্রিল। বাঁশের মতো রং করা হয়েছে।’

নম্রতা অবিশ্বাস নিয়ে বাঁশের উপর হাত রাখল। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কপাল কুঁচকাল। বাঁশটা টিপে টিপে পরীক্ষা করার চেষ্টা করল। নম্রতার পাগলামোতে শব্দ করে হেসে ফেলল আরফান।

‘ এখন তো অনেক সকাল, কুয়াশাও পড়েছে তাই একদম বুঝতে পারেননি। কুয়াশা কেটে গেলে খেয়াল করলেই বুঝা যাবে। আমি তো ভেবেছিলাম একদম বিয়ের রাতে সারপ্রাইজ দিব আপনাকে। কিন্তু আপনি তো সব প্ল্যানই মাটি করে দিলেন।’নম্রতা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠোঁট ভর্তি অকৃত্রিম হাসি নিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বলল,

‘ বিয়ের পর আমরা এখানে থাকব?’
‘ অবশ্যই। আপনিই না বলেছিলেন? আমরা ছোট্ট একটা ঘর বাঁধব। ছনের ছাওয়া চাল থাকবে। ফাঁক গলে জ্যোৎস্না আসবে। একটা পোষা টিয়া থাকবে। দেখুন তো সব ঠিকঠাক আছে না? আপনি বারান্দার দোলনাটাতে বসলেই এক ঝাঁক জ্যোৎস্না এসে ঘিরে ধরবে। পোষা টিয়া আপনার সাথে কথাও বলবে।

ওকে আমি কথা শেখাচ্ছি আজকাল। এতো গাছ পেয়ে ঝিঁঝি পোকাদেরও দেখা মিলে মাঝে মাঝে। রাতে যখন আমি ফিরব তখন সারা ছাদের আলো নিভিয়ে হারিকেন জ্বালাব। জ্যোৎস্নার আর হারিকেনের আলো মিলেমিশে স্বর্গীয় এক আলো ছড়াবে। সেই আলোয় বসে একের পর এক গল্প করবেন। আমি মুগ্ধ

হয়ে শুনব। চারপাশে থাকবে বেলী ফুলের তীব্র সুবাস।’

আরফানের কথাগুলো শুনেই আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়ল নম্রতা। সুন্দর একটা রাতের ছবি ভেসে উঠল চোখের পর্দায়। বুকের ভেতর চিনচিন করে উঠল দুঃখ দুঃখ সুখ। নম্রতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ডাকপিয়ন বাক্সটির কাছে

গিয়ে কৌতূহল নিয়ে বলল,‘ এটা কী?’

আরফান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,

‘ এটা চিঠি বাক্স। আপনার খুব ইচ্ছে ছিল না? বিয়ের পরও আমরা চিঠি প্রেম করব? সেজন্যই এই ব্যবস্থা। আমাদের সাংসারিক জীবনে নানা বাঁধা সৃষ্টি হবে, রাগ হবে, অভিমান হবে, ভুল বোঝাবুঝিও

হবে। সেই রাগ,অভিমান, অভিযোগ সবকিছু এই বাক্সটিতেই চালান করব আমরা। যখনই মন খারাপ হবে তখনই চিঠি লিখতে বসে যাবেন আপনার প্রেমিকের ঠিকানায়। ডাকবক্সের বাইরে আমাদের সম্পর্কটা আপনিময় হলেও। ডাকবক্সের ভেতরের জীবনটা হবে তুমিময়। চিঠিতে আপনার স্বামী নয় প্রেমিক থাকবে। চির

প্রেমিক।'আরফানের দিকে চেয়ে, তার কথা শুনতে শুনতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল নম্রতার। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, আমার এত সুখ কেন? আমার মানুষটা এমন পাগল কেন? এমন ভয়াবহ প্রেমিক কেন? নম্রতাকে কাঁদতে দেখে হাসল আরফান। ধীর পায়ে নম্রতার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। নম্রতাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে

কাঁধে থুতনি রাখল। কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল,

‘ এখনই কাঁদছেন? আপনাকে আরও অনেক অনেক কাঁদানো বাকি শ্যামলতা। আমি আপনাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়েই ভালোবাসব। এবার ডাকপিয়নটা খুলুন। কিছু আছে নিশ্চয়।’

আনন্দ, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল নম্রতা। কাঁপা হাতে

চিঠি বাক্সের দিকে হাত বাড়াতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ডাকপাখি,‘ শ্যামলতা! শ্যামলতা! চিঠি! চিঠি!’

আরফান হেসে ফেলে বলল,

‘ ওর নাম ডাকপাখি। আপনাকে চিঠির কথা মনে করে দেওয়ার দায়িত্ব ওর।’

নম্রতার চোখ থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে। নম্রতা নাক টেনে টেনে চিঠি বাক্স থেকে নীল খামে

মোড়ানো এক চিঠি উদ্ধার করল। চিঠিটা মেলে ধরতেই দুইহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে খোলা কাঁধে মুখ ডুবাল আরফান। নম্রতা কেঁপে উঠল। ধুরু ধুরু বুক নিয়ে দেখল দীর্ঘ এক চিঠি। গুটি গুটি অক্ষরে লেখা,

” এইযে,

শ্যামলতা! আমার প্রিয়তমা! আমার মিষ্টি কিছু অনুভূতি। আমার শূন্য

ঘরের যতি!কোনো এক কাক ডাকা ভোরে হঠাৎ উপলব্ধি করেছিলাম, তার প্রতি আমার জীবন মরণ ব্যধি। তাকে ছাড়া শ্বাসকষ্ট। তাকে নিয়ে শ্বাসকষ্ট। তার প্রতিটি ভাবনায় আমার ভয়ানক শ্বাসকষ্ট। তখন ছোট্ট একটা মেয়ে ছিল সে। বুলবুলির বাচ্চাটির মত চঞ্চল, আদুরে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত যুক্তি তার! কত অদ্ভূত তার স্বপ্ন! আমি তখন টগবগে

যুবক। ভীষণ পড়াকু ছাত্র। হাসপাতালের ইন্টার্নি ডাক্তার। ক্যারেয়ারের প্রতি ভীষণ ফোকাসড্। প্রেম- ভালোবাসা দু-চোখের বিষ। এমন একটা ধরা-বাঁধা, নিয়মমাফিক জীবনে কেমন দুষ্টুমি করেই ঢুকে পড়ল সে। আমি তাকে আটকাতে গেলাম, সে খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি তাকে অবহেলা করতে গেলাম, সে টলমল অভিমানী চোখে

চাইল। ব্যস! আমার আজন্ম শ্বাসকষ্ট হয়ে গেল।আমি হেরে গেলাম। আমার এই ধরা বাঁধা জীবনটা সেই ছোট্ট মেয়েটার তরে মেলে ধরলাম। একটু স্বস্তি, একটু আরামের আশায়। কিন্তু সে-ই চঞ্চলা আমায় স্বস্তি দিল না। ছোট্ট শ্যামলতার চিঠির ভাঁজে, কথার তোড়ে স্বস্তি নামক পাখিটা শ্বাসরোধ হয়ে মরেই গেল শেষ পর্যন্ত। আহা, কী অকাল মৃত্যু তার!

ডাক্তারের ডাক্তারী উবে গেল। প্রেসক্রিপশনের পাতায় ঔষধের নাম মিলিয়ে গিয়ে গুটি গুটি অক্ষরে ভেসে উঠতে লাগল আবেগময় চিঠি, তার টানা টানা অভিমানী চোখ। আমি এলোমেলো হয়ে গেলাম। মরে গেলাম। বিশ্বাস করো, সে-ই ছিল আমার প্রথম মৃত্যু। শ্যামলতার বিষে আকণ্ঠ ডুবে বিস্ময়কর সেচ্ছা মৃত্যু। তারপর একদিন হঠাৎ হারিয়ে

ফেললাম তাকে। আমার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেল। পাগল হয়ে উঠলাম। ছটফট করে উঠল বুক। তারপর যেদিন ফিরে পেলাম। তার টলমল অভিমানী চাহনীতে স্তম্ভিত হলাম। ক্লান্ত হলাম। আমার শ্বাসকষ্টের মাত্রা সেদিন সহ্য ছাড়াল। আমি ভেসে গেলাম। তাকে কাছে পেলে বুক শুকিয়ে আসতে লাগল। দূরে গেলে শুরু হতে লাগল তীক্ষ্ণ বুক ব্যথা।

তাকে আমি কী করে বুঝাই, এই ক্ষণিকের বুক ব্যথায় কত সুখ, বেদনাময় স্বস্তি! দিনের পর দিন দূরত্ব রেখে হঠাৎ তাকে কাছে পাওয়া, তার অভিমানী চোখ নেড়ে নেড়ে এক আকাশ অভিমান ঝাড়া যে আমার কত প্রিয়!আজ বলতে দ্বিধা নেই, আমি তার পাগল প্রেমিক। তবে তার রূপ নয়, তার অভিমানী চোখ দুটোরই ভয়ানক

প্রেমিক। আমি তার শরীরের মসৃন বাঁক নয় তার বাম পায়ের স্বর্গীয় তিলের প্রেমিক। তার ঠোঁটের রঙ হওয়ার থেকে কপালের টিপ হতে পারাটাই আমার প্রিয়। তাকে খুব কাছে টানার চেয়ে বুকের ভেতর স্থাপন করে, প্রতিটি মুহূর্তে পাওয়া চিনচিনে সুখটাই আমার প্রিয়। তার নেশা ধরা যৌবন থেকে তার নেশা ধরা হাসিই আমার বেশি প্রিয়।তাকে

প্রকাশ্যে শতবার ভালোবাসি বলার চেয়ে চুপিচুপি নিরন্তর, নিরবিচ্ছিন্ন, বিশ্রামহীন ভালোবেসে যাওয়াটাই আমার প্রিয়। শুনো মেয়ে? সেই সর্বগ্রাসীকে বলে দিও, তার কাজল রাঙা চোখদুটোতে আমার মৃত্যুও প্রিয়।

শুনো, শুনছ শ্যামলতা? আমার তোমাকে নয়, তোমার অভিমানী চোখদুটো খুব প্রিয়। তোমাকে এক

সমুদ্র কাঁদিয়ে, এক পাহাড় অপেক্ষা করিয়ে, এক আকাশ সুখ দেওয়াটাই আমার ভীষণ প্রিয়।'

ইতি

তোমার সে ''নম্রতা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। আরফান আগের মতোই কাঁধে মুখ গুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না। নম্রতা এবার ঘুরে দাঁড়াল। চিঠিটা এক হাতের মুঠোয় রেখে

দুইহাতে আরফানের গলা জড়িয়ে ধরলো। ততক্ষণে কুয়াশা কেটে গিয়েছে। কয়েক ফালি রোদ এসে পড়ছে নম্রতার অগোছালো চুলে, মেটে রঙের টাইলসে মোড়ানো মেঝেতে। টাইলসগুলো রোদের কিরণে চকচক করছে। ডাকপাখি তারস্বরে ‘চিঠি সংবাদ’ ঘোষণা করছে। আরফান নম্রতার থেকে থেকে কেঁপে উঠা শরীরটা নিজ

বাহুতে আবদ্ধ করল। কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব অসহায় কণ্ঠে বলল,‘ এভাবে কান্নাকাটি করলে আপনার ব্যারেস্টার বাবা আমার নামে মামলা ঠুকে দিবে না, নম্রতা? তিনি নিশ্চয় ভাববে, আমি আপনাকে ভয়াবহ অত্যাচার করছি। কান্নাকাটি বন্ধ করুন। আপনার ভয়ঙ্কর পিতামহাশয় এখনও আমার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

যেকোনো সময় তাঁর আগমন ঘটে যেতে পারে।’

নম্রতা কান্নারত অবস্থাতেই গরম চোখে তাকাল। নাক টেনে টেনে বলল,

‘ কী বললেন?’

আরফান হাসল। নম্রতাকে টেনে সোজা দাঁড় করিয়ে ভ্রু কুঁচকে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সেকেন্ড কয়েক পর গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ বাহ!

কেঁদে কেটে চোখ ফুলিয়ে ফেললেও আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগছে। ভয়ানক সুন্দর। কেউ এতো সুন্দর করে কাঁদতে পারে জানা ছিল না। এখন থেকে আপনাকে আরও বেশি বেশি কাঁদাতে হবে। সেজন্য দুঃখিত নম্রতা।’

‘ ধুর! ওসব কিছু নয়। সব মেয়েদেরই কান্নারত অবস্থায় সুন্দর লাগে। উপন্যাসে পড়েননি?’

‘ উপন্যাসে পড়েছি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এখন তো আরও না। মেয়েদের কান্নারত অবস্থায় সুন্দর লাগে, কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়।’

নম্রতা অসন্তোষ চোখে চাইল। চোখ মুছতে মুছতে বলল,

‘ তবে সত্য কী?’‘ সত্যটা হলো, আমরা আমাদের প্রিয় মানুষকে যেকোনো অবস্থায় সুন্দর দেখি। তাকে ঘিরে আমরা মুগ্ধ হতে পছন্দ

করি বলেই সুন্দর দেখি। আপনাকে কান্নারত অবস্থায় আজ প্রথম দেখছি তেমন কিন্তু না। আমাদের সাক্ষাতের প্রথম দিনও আপনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন। কিন্তু সেদিন আপনাকে বিন্দুমাত্রও সুন্দর বলে মনে হয়নি। মুগ্ধতা কাজ করেনি। বাংলাদেশের বাকিসব মেয়েদের মতোই লেগেছে, এভারেজ। মনে মনে অভদ্র, আনকালচারড বলে বিরক্তও হয়েছি।

কিন্তু দেখুন, সেই আপনাকেই এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী বলতে দ্বিধা হচ্ছে না। এর থেকে সুন্দর কেউ হতে পারে, আমার মন বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করতে চাইও না। সব মেয়েদেরই কান্নারত অবস্থায় সুন্দর লাগলে নিশ্চয় সেদিনও আপনাকে ভুবনমোহিনী রূপবতী লাগত? লাগেনি তো। সব আসলে দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভর

করছে। এছাড়া কিছু না।’নম্রতার কান্না থেমে গেল। সে সব কথাগুলো সাইডে রেখে দুটো শব্দকে কেন্দ্র করেই আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠল,

‘ আপনি আমাকে অভদ্র, আনকালচারড ভেবেছিলেন? আমি অভদ্র?’

আরফান কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করল। পরক্ষণেই হেসে ক্ষ্যাপাটে

নম্রতাকে কাছে টেনে, দুই বাহুর চাপে বুকের সাথে পিষ্ট করে বলল, ‘ সেই অভদ্র মেয়েটা ভবিষ্যতে এসে আপনি হবেন, সেটা তো জানতাম না নম্রতা। তেমনটা জানলে কখনোই অভদ্র ভাবতাম না। পৃথিবীর সবচেয়ে ভদ্র মেয়ে ভেবে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতাম। ওমন ভয়ানক খামচিগুলো আরও দশ-বারোটা খেয়ে নিতাম অবলীলায়।’

কথাগুলো বলে কৌতুক হাসল আরফান। নম্রতা ফুঁসে উঠে বলল,'
আপনি ফাজলামো করছেন?'
আরফান নিঃশব্দে হাসল। নম্রতার কপালে টুপ করে একটি চুমু খেয়ে নিয়ে বলল,
' আচ্ছা আর ফাজলামো করব না। এবার আদর করব। কোনো এক বিদ্বান ব্যক্তি বলেছিলেন, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই টুপ করে চুমু খেয়ে

ফেলতে হয়। এই মুহূর্তে আপনিই সবচেয়ে রূপবতী নারী। আমার উচিত আপনাকে টুপ করে চুমু খেয়ে ফেলা। আসুন, চুমু খাব।’

নম্রতা হতভম্ব চোখে চাইল। আরফানের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। নম্রতাকে আরেক দফা বিস্মিত করে দিয়ে বাস্তবিকই ঠোঁটের কোণে গভীর এক চুমু বসিয়ে দিল আরফান।‘ ভীষণ

ব্যক্তিগত সময়ে চলে আসায় আমি একদমই দুঃখিত বোধ করছি না।’ এমন এক আকস্মিক কণ্ঠে ঘনিষ্ঠতায় ভাঁটা দিয়ে পাশ ফিরে তাকাল তারা। নিদ্রা বাইরে রাখা টেবিলে ঠেস দিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে উচ্ছল চঞ্চলতা। হাতদুটো খেলা করছে খোলা চুলে। প্রতিমার মতো সুন্দর মুখটিতে নরম রোদের আলো। এমন ব্যক্তিগত

মুহূর্তে নিদ্রার উপস্থিতিতে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল নম্রতা। লজ্জায় ছটফট করে উঠল চোখের দৃষ্টি। আরফানের মাঝে কোনোরকম অপ্রস্তুতভাব দেখা গেল না। সে খুব স্বাভাবিকভাবেই নম্রতাকে ছেঁড়ে দাঁড়াল। হেসে বলল,‘ কিন্তু তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল, নিদু।’

নিদ্রা ভ্রু উঁচিয়ে বলল,

‘ তা কেন হবে? দুঃখিত তো উল্টো তোমাদের হাওয়া উচিত। শুধুমাত্র তোমাদের জন্য সকাল সকাল খুবই লজ্জাজনক এক দৃশ্য দেখে ফেলেছি আমি। আমার এখন ভীষণ লজ্জা লজ্জা লাগছে।’

নিদ্রার চোখে-মুখে লজ্জার লেশমাত্র খুঁজে পেল না নম্রতা। মোমের মতো ফর্সা মুখে ঠোঁট ভর্তি হাসি নিয়ে নিরন্তর বলে চলল নিদ্রা,

‘ আমি তো ছুড়োছুড়িকে খুঁজতে এসেছিলাম। আমরা ভেবেছি সে হারিয়ে গিয়েছে। যেমনটা স্নিগ্ধা আপুর ক্ষেত্রে হয়েছিল। হঠাৎ, হাওয়া!’আরফান জবাব দেওয়ার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে মৃদু হাসল। এই বোনটির সাথে কথায় পেরে উঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে আজকাল। নাস্তার টেবিলে বসে

নম্রতাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন আরফানের মা,

‘ তোমার আর নিষ্প্রভের বিয়ের কথা চলছে শুভ্রলতা। তোমার কী আমার ছেলেকে পছন্দ হয়?’

নম্রতা চোখ তুলে তাকাল। ফট করেই বলে ফেলল,

‘ ভীষণ পছন্দ হয়।’

মেয়ের নির্লজ্জতায় হতবাক হয়ে গেলেন মেহরুমা। স্বামীর দিকে

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। যার অর্থ, ‘দেখেছ? মেয়েদের মাথায় তুলে কী রকম নির্লজ্জ বানিয়েছ, দেখেছ?’ নুরুল সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খাওয়ায় মনোযোগ দিলেন। আরফানের ঠোঁটে তখন লজ্জামাখা মৃদু হাসি। মা আরফানের দিকে চেয়ে কৌতুক কণ্ঠে বললেন,

‘ কী রে? মেয়েটাকে পছন্দ হয়? আমার আর নিদ্রার তো খুব পছন্দ। বিয়ে করবি তাকে?’

আরফান মাথা নিচু করে হেসে ফেলল। জবাব দিল না। মেহরুমা মনে মনে হায় হায় করে উঠলেন, ‘ পুরুষ মানুষ হয়েও ছেলেটা কী লাজুক, ভদ্র! আর তার মেয়েটা? ইয়া মাবুদ, কী হবে এই মেয়ের!’ধানমন্ডির ছোট্ট একটা কফি

শপে, গম্ভীর মুখে কফি কাপে চুমুক দিচ্ছে আরফান। চারদিকে পড়ন্ত বিকেলের হলদে আলো। আরফান বিরক্ত চোখে ঘড়ি দেখল, পাঁচটা চব্বিশ। ছেলেটা এখনও আসছে না। মুহিব সামনের চেয়ারটাতেই মন খারাপ করে বসে আছে। কফি ঠান্ডা হচ্ছে, চুমুক দিতে ইচ্ছে করছে না। সেই ছোট্ট একটা কাহিনিকে কেন্দ্র করে এতো বছর পর তার খুব মন

খারাপ লাগছে। ছাত্র জীবনে আরফানের পেছনে ছায়ার মতোই লেগে থেকেছে সে। বিপদে আপদে ছোট ভাইয়ের মতো সাহায্য পেয়েছে ।সেই বড় ভাইয়ের বিশ্বাসটা ধরে রাখতে না পেরে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো, আরফান তার সাথে রাগারাগি করেনি। চোখ গরম করে তাকায়নি। তার চাহনীতে ছিল তীব্র

বিতৃষ্ণা। সময়টা ঘুরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি থাকলে অবশ্যই ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিত মুহিব। অতীতে গিয়ে চট করে নিজের ভুলটা শুধরে নেওয়া যেত। মুহিবের ভাবনার মাঝেই ভেতরে এলো সাতাশ আটাশ বছরের বেঁটে খাটো এক যুবক। চারকোনা মুখটিতে স্বাভাবিকের তুলনায় বড় দুটো চোখ। মুহিব তাকে ইশারা করতেই কাছাকাছি

এসে চেয়ার টেনে বসল। আরফানকে দেখে খানিক চমকাল কী?‘ আরে আরফান ভাই? আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন?’

আরফান শীতল চোখে তাকাল। কফি কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, ‘ ওয়া আলাইকুম আসসালাম। তোমার নাম সাব্বির না?’

সাব্বির খানিক অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে বলল,

‘ জি ভাই।’

মুহিব অধৈর্য কণ্ঠে বলল,

‘ দ্যাখ সাব্বির! ডিরেক্ট কথায় আসি। প্রায় পাঁচ বছর আগে তোরে একটা চিঠি দিছিলাম লাইব্রেরিতে রাখার জন্য। চিঠিটা গেল কই?’

সাব্বিরের মুখটা খানিক ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মৃদু কেশে হাসার চেষ্টা

করে বলল,‘ চিঠি! আরে, অতোদিন আগের কথা আজ হঠাৎ? আমি তো...’

আরফান তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ভীষণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, ‘ দেখো সাব্বির, আমরা কিন্তু জানি তুমি চিঠিটা বইয়ে রাখোনি। রাখোনি এই ব্যাপারে সিওর হয়েই তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, তোমার মুখ

থেকে সরাসরি সবটা শোনার জন্য। বলো সাব্বির, কাজটা কেন করলে?’ পুরো কথাটা আন্দাজে বললেও সাব্বিরের চেহারার রং উড়ে গেল যেন। আরফান বুঝে ফেলল, ছুঁড়ি একদম সঠিক জায়গায় লেগেছে। সাব্বির জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে কিছু একটা বলার প্রস্তুতি নিল। পরমুহূর্তেই আরফানের শান্ত দৃষ্টিতে এলোমেলো হয়ে গেল সব। ছোট্ট

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ সরি ভাই। আমি আসলে ইচ্ছে করে কিছু করিনি। মুহিব যেদিন চিঠিটা দিল সেদিন গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম আমি। তবে বই পড়ার জন্য নয়, গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করার জন্য। আমাদের মনোমালিন্য চলছিল প্রায় সপ্তাহখানিক। আমাদের ব্রেকাপটা সেদিনই হয়ে গেল। মন-মেজাজ খারাপ থাকায় চিঠির কথা বেমালুম

ভুলে গেলাম। এক চোটে মনে পড়ল মুহিবের ফোন পাওয়ার পর। তখন অলরেডি তিনদিন কেটে গিয়েছে। চিঠিটা কোথায় রেখেছি তারও কোনো হদিশ নেই। বেশ খুঁজে টুজে বের করে পরেরদিন যখন গ্রন্থাগারে গেলাম তখন দেখি গ্রন্থাগার বন্ধ। মুহিবকে আগের দিনই বলে দিয়েছিলাম, চিঠিটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে। তাই আর ব্যাপারটাকে

তত গুরুত্ব দিইনি। বাসায় ফিরে চিঠিটা ফেলে রেখেছিলাম ড্রয়ারের এক কোণায়। এতগুলো বছরে একবারও চিঠিটার কথা মনে পড়েনি আমার। মনে পড়ার মতো কিছু ছিলও না।’আরফান শান্ত কণ্ঠে বলল,

‘ চিঠির কথা তুমি ভুলে গেলে তোমার ড্রয়ার থেকে চিঠিটা সেই মেয়ের কাছে পৌঁছাল কীভাবে? তুমি

নিজেই দিয়েছ নিশ্চয়। কাজটা ঠিক করোনি।'

সাব্বির চমকে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বলল,

' না ভাই। আমি নিজে দিই নাই, বিশ্বাস করেন। আপনাকে যে ফোন দিয়েছিল ওর নাম পুতি। আমার খালাতো বোন। আমার বোন আর পুতি হঠাৎ কিভাবে যেন চিঠিটা হাতে পেয়ে যায়। চিঠিটা এখনও

ড্রয়ারে আছে তাই তো মনে ছিল না আমার। ওরা যে আপনার সাথে ফোনে ফাজলামো করছে সেটাও জানতে পেরেছিলাম দুই তিনদিন পর। ছোট মানুষ। ফ্যান্টাসী বেশি। আর আপনার গলার আওয়াজও সুন্দর, তাই....'

কথাটা বলে মাথা নিচু করে ফেলল সাব্বির। মিনমিন করে বলল,' সরি ভাই।'

মুহিব রাগান্বিত কণ্ঠে বলল,
‘ ছোট মানে কী? ফিডার খায়? কোন ক্লাসে পড়ে তোর বোন?’
‘ এবার টেনে উঠল দুজনই।’
আরফান হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। দশম শ্রেণীর বাচ্চা মেয়ে তার সাথে ফাজলামো করেছে? কী আশ্চর্য! এই মেয়েগুলো তো তার থেকে জন্ম-কর্মেরও ছোট। আরফান কোনো কথা খুঁজে পেল না। বোবা দৃষ্টিতে

চেয়ে রইল সাব্বিরের মুখে। লাস্ট দুদিন বেশকিছু আপত্তিকর কথা বলেছিল মেয়েটি। এসব বাচ্চা মেয়ের মুখে এসব কথাও সম্ভব? মুহিব একাধারে গালিগালাজ করে চলেছে। আরফানের মাথায় দপদপ করছে রাগ। আরফান শক্ত কন্ঠে বলল,

‘ তোমার বোনটা সামনে থাকলে গাল বরাবর একটা চড় বসাতাম

সাব্বির। বোনকে শালীনতা শেখাও। কারো অনুভূতিকে অপমান করার মতো বিশ্রী অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।’রাতে অন্তু বাড়ি ফিরেই গলা উঁচিয়ে ডাকল,

‘ নীরা? এক কাপ চা।’

নীরা রান্নাঘরে ছিল। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। শাশুড়ী মা রান্নাঘর গোছানোর দায়িত্বটা নীরার কাছে গছিয়ে দিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছেন মাত্র।

নীরা চুপচাপ চুলোয় চা বসাল। জাহানারা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিস্ময় নিয়ে নিজের ঘরের দিকে তাকাল নীরা। এই সময়ে চা? রাতের খাবারের আগে চা খায় কেউ? নীরা বিস্ময়াভাব নিয়েই ঘরে গেল। চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতেই ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো অন্তু। তোয়ালেতে চোখ-মুখ মুছে নীরার সামনে দাঁড়াতেই নীরার

মনে হলো, অন্তুর স্বাস্থ্য কিছু বেড়েছে। চোখে-মুখে সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্মণটা দৃঢ় হয়েছে। নীরা শুনেছিল, বিয়ের পর মেয়েদের স্বাস্থ্য হয়। রূপবতী হয়। তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন হলো কেন? অন্তু টেবিলের ওপর থেকে একটা নোট খাতা এনে নীরার হাতে দিল। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল,‘ পড়াশোনা একেবারে বাদ

দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে নাকি মাথায়? পড়াশোনা করতে তো দেখি না। ফাইনালে লাড্ডু পেলে নমু আর নাদিম আমারে গালি দিতে দিতেই মেরে ফেলবে। ওদের বধ্যমূল ধারণা, আমি তোকে ভয়াবহ অত্যাচার করি। গিয়ে ফ্রেশ হ, তারপর নোট নিয়ে পড়তে বস। পরীক্ষার হলে হাসবেন্ড হিসেবে কোনো বেনিফিট আশা করিস না।

আমি তোকে কিচ্ছু দেখাব না। লাস্ট পরীক্ষায় তুই আমার সাথে যে বাটপারি করছিস, আমি কিন্তু ভুলি নাই। রিভেঞ্জ।'

নীরা হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। পরীক্ষায় সে নিজে লিখে শেষ করতে না পারলে নীরার কী দোষ? নীরা তো দেখিয়েছিলই। দেখাতে পাঁচ মিনিট দেরী হয়েছিল এই যা! পাঁচ মিনিটে কী এমন হয়? নীরা

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,‘ খাবার দিই আগে। রাতের খাবার?’

অন্তু বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ আমার খাবার আমি নিয়ে খেতে পারব। আম্মা জেগে না থাকলেই হলো। তুই খেয়েছিস?’

নীরা চোখ তুলে তাকাল। অন্তু বুঝে ফেলল, নীরা খায়নি। এই মহিলার বরের প্রতি প্রচুর প্রেম। একা একা খেতে বসলে তার গলায় আটকায়,

পাকস্থলীতে আটকায়, হজমেও আটকায়। অন্তু নীরাকে ধমকে ফ্রেশ হতে পাঠিয়ে নিজেই গেল রান্নাঘরে। যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে বলল,

‘ খবরদার ফ্রেশ হয়ে শাড়ি টাড়ি পরবি না। আমার মাইন্ড ডিস্ট্রেক্ট হয়ে গেলে কিন্তু এই জীবনে আর পড়া টড়া তোর হবে না।’নীরা স্তব্ধ চোখে চেয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। জীবনে পানি ঢেলে না খাওয়া

ছেলে নিজেই আজ প্লেট পরিষ্কার করল। রান্নাঘরের জিনিসপত্র যতটুকু পারা যায় গুছানোর চেষ্টা করে খাবার নিয়ে রওনা দিল ঘরে। নীরা ততক্ষণে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়েছে। গায়ে তার গোলাপী রঙের পাতলা শাড়ি। অন্তু কপাল কুঁচকে চেয়ে রইল। এই মেয়ের সমস্যা কী? ইচ্ছে করে এমন ব্যবহার করে নাকি তার সাথে? যা নিষেধ করবে তাই পরে

পরে সামনে এসে যাবে বারবার, বেয়াদব। অন্তু খাবার নিয়ে বিছানায় বসল। নীরাকে বসতে ইশারা করে বলল,

‘ এখানে বোস এবং মাঝারি আওয়াজে পড়। আমার কান পর্যন্ত যাওয়া জরুরি। পড়ে মনে থাকছে না। শুনলে মনে থাকবে। স্পষ্ট, সুন্দর করে পড়বি। এখন হা কর।’নীরা ‘হ’ করল। খাবার কিছুটা

চিবিয়ে নিয়ে মোটামুটি জোরে পড়ার চেষ্টা করল। অন্তু নিজেও খেল এবং মনোযোগ দিয়ে শুনল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল অন্তু। তারপর ফিরে এসে সটান নীরার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে। নীরা বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়ছিল। অন্তুর এহেন কাজে কিছুটা চমকে তাকাল।

নীরার হাতের নোটটা ছিনিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ছুঁড়ে মেরে বলল,
‘ বহু পড়ছিস। আর পড়া লাগবে না। শাড়ি পরতে মানা করেছিলাম, পরেছিস। মনকে বলেছিলাম ডিস্ট্রেক্ট হোস না, হয়ে গিয়েছে। কেউ কথা শুনেনি। কেউ কথা রাখেনি। এখন কিচ্ছু করার নেই।’
নীরা হেসে ফেলল। অবচেতন মনেই ডানহাতটা রাখল অন্তুর চুলে। নীরার

শাড়ির আঁচল হাতে পেঁচাতে পেঁচাতে হঠাৎই বলল অন্তু,‘ এই নীরু? শিপনকে চিনিস?ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ছেলেটা। দূর্দান্ত বিতর্ক করত যে? মনে আছে?’

নীরা একটু ভেবে বলল,

‘ হ্যাঁ। হ্যাংলা-পাতলা ফর্সা মতোন না? আমাদের এক জুনিয়রের সাথে বোধহয় প্রেম ছিল ওর। নমু বলেছিল একবার।’

‘ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটাই। প্রেম ছিল কী? বিয়ে করে ফেলেছে ওরা। পালিয়ে বিয়ে। আমাদের বিয়ের চার পাঁচ মাস আগেই বিয়ে করেছে। শপিনের সাথে দেখা হয়েছিল আজ। এতো ভালো একটা স্টুডেন্ট। অলওয়েজ টপ করতো। অনার্স, মাস্টার্সটা কমপ্লিট করলেই লেকচারার হয়ে যেতে পারত। মাত্র দুটো বছরের অপেক্ষা। এর মধ্যেই একটা

স্ক্যান্ডেল করল। বিয়ে তো করেছেই, বউ নাকি প্রেগন্যান্ট। ছয় মাস চলে। টিউশনিও নাই। খরচ জোগাতে হিমশিম খেয়ে গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছে এবার। পরীক্ষাও খারাপ করেছে। দুটোতে ব্যাক লক। ক্যারিয়ারটা একদম শ্যাষ। ব্যাপারটা শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল।’

নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,‘ এখনই পালিয়ে বিয়ের প্রয়োজন কী ছিল? ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছে বেচারা।’

‘ মেয়ের নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল অলমোস্ট। শপিনকে নিয়ে ভীষণ পসিসিভ সে। পাগলামো করছিল, মরে টরে যাবে। আমার কথা হলো, বিয়ে করেছে ঠিক আছে। কিন্তু এখনই বাচ্চা নেওয়ার

কী দরকার ছিল? ক্যারিয়ারটা শেষ করল।’

‘ অতোকিছু কী খেয়াল থাকে?’

অন্তু অসন্তোষ কণ্ঠে বলল,

‘ থাকবে না কেন? এখন বাচ্চার ভবিষ্যতেরই বা কী হবে? এক্সিডেন্টলি হলেও তৎক্ষনাৎ একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। একটা নতুন জীবন...’

নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, উত্তর দিল না। অন্তর অনবরত বলে যাওয়া কথাগুলো শুনে চলল এক মনে। তারপরের দিনগুলো খুব দ্রুত কাটল তাদের। ভার্সিটিতে শুরু হলো সেমিস্টার ফাইনাল। পরীক্ষার হলগুলো একই থাকলেও প্রত্যেকবারের মতো একে অপরকে ফোন দিয়ে অযথা চিন্তা ঝাড়া হলো না। লাইব্রেরিতে বসে নোট বানানো

হলো না। হৈ-হুল্লোড় হলো না। আড্ডার সময় হলো না। পরীক্ষার হলে একটু আধটু দেখা। একটু আধটু দৃষ্টিবিনিময় হতে লাগল শুধু। পরীক্ষা শেষে ক্যান্টিনে বা টিএসসিতে বসা হলো না। ঘন্টার পর ঘন্টা গান, আড্ডা দেওয়া হলো না। সবাই ব্যস্ত তখন নিজ নিজ জীবন গতিতে। অতো আড্ডার সময় কই? নীরার সংসারে বিস্তর কাজ,

দু’দন্ড বসার সময় কই?অন্তুর টিউশনি, চাকরির পড়া। নম্রতার বিয়ে নিয়ে তোড়জোড়। আরফানকে সময় দেওয়ার তাড়া। নাদিম নিজের মতো ছন্নছাড়া, উদাসীন। সাইম ততদিনে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছে। ছোঁয়ার জন্য রেখে গিয়েছে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার ব্যস্ততা। দেশ থেকে পত্রপাঠ বিদায় নেওয়ার আগে একটা প্রিপারেশন

আছে না? এতো এতো ব্যস্ততার মাঝে বন্ধুত্বের বিকেলগুলো হয়ে উঠল নিঃসঙ্গ, রঙহীন, ফিকে। ক্যান্টিন, লাইব্রেরির চেয়ারগুলো পড়ে রইল ফাঁকা, উদাসীন।কেটে গেল একের পর এক দিন। হারিয়ে গেল উচ্ছলতা। মলিন হলো হাসি। কমে গেল দুঃখ-সুখ ভাগাভাগির গল্প। পরীক্ষাটাও ফুরিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল ভার্সিটি জীবনের দীর্ঘ চার

বছর। ফুরিয়ে এলো কী তবে দীর্ঘ বন্ধুত্বের গল্প?শাহাবাগ পার্কের এক বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নাদিম। গায়ে ঢিলাঢালা টি-শার্ট। পিঠে ঝুলন্ত গিটার। বাম হাতে বাদামের ঠোঙা। নাদিম অগোছালো চুলগুলো গোছাতে গোছাতে হাই তুলল। আশেপাশে বৃদ্ধ,বাচ্চা,যুবতীদের ভীর। বেশকিছু প্রেমীযুগলও চোখে পড়ার মতো।

নাদিম কৌতূহলী চোখে রাস্তার ওপাশে তাকিয়ে আছে। লাল টকটকে শাড়ি পরা মেয়েটা ক্ষেপে আছে প্রায় ঘন্টাখানেক। নিরীহ প্রেমিক অসহায় মুখে রাগ ভাঙানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। চেষ্টা কাজে আসছে না। নাদিম আগ্রহ নিয়ে শেষটা দেখার অপেক্ষায় রইল। অপেক্ষা শেষ হচ্ছে না। মেয়েটির রাগ ভাঙছে না। নাদিম বিরক্ত ভঙ্গিতে বাদাম

মুখে নিল। খোসাসমেত বাদাম চিবোতে চিবোতে আবারও তাদের দিকে তাকাল। নাদিমের কোনো ব্যস্ততা নেই।প্রেমিকের রাগ ভাঙানোর ঘটনাটা আরও ঘন্টাখানেক দেখা যেতে পারে। তারপর ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড হিসেব করে তাদেরকে চমকে দেওয়া যেতে পারে। নাদিম যদি মেয়েটির রাগ ভাঙার সাথে সাথেই

গিয়ে বলে, আপু?আপনি ঠিক এক ঘন্টা বিশ মিনিট তিপ্পান্ন সেকেন্ড রেগে ছিলেন। রাগ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আপনার উচিত বেশি বেশি রাগ করা। তাহলে কী মেয়েটি চমকে তাকাবে না? নাদিমের ভাবনার মাঝেই চট করে কান ধরে ফেলল ছেলেটি। এমন জনসমাগম রাস্তায় দুই একবার উঠবসও করে ফেলল সে। ঠিক সেই সময়ই রাস্তার

পাশে এসে দাঁড়াল লাল রঙা মার্সিডিস। প্রেমীযুগল গাড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল।নাদিম তখন ভয়ানক বিরক্ত। গাড়ি থেকে গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে আসা মানবীকে দেখেও বিরক্তি কাটল না। মেয়েটিকে আজ বড় বড় লাগছে। লাগারই কথা। মৌশি এখন বড় হয়েছে। অনার্স পড়ুয়া কোনো মেয়েকে পিচ্চি বলা যায় না।

ভার্সিটির ফটকে পা দিতেই মেয়েদের মধ্যে ‘পিচ্চি বলবি তো কেটে ফেলব’ ধরনের মনোভাব চলে আসে। চাল-চলনে দেখা যায় বিস্তর তফাৎ। মৌশির চাল-চলনেও বিস্তর পরিবর্তন চোখে পড়ছে। মেয়েটি আজ শাড়ি পরেছে। গোলাপি আর সাদার মিশেল শাড়িতে মৌশিকে ভয়াবহ সুন্দর লাগছে। সারা গা’জুড়ে নারীত্বের সাথে সাথে ফুটে উঠেছে

তীব্র সপ্রতিভ ভাব। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্বাস। মৌশি গুটি গুটি পায়ে নাদিমের পাশে এসে দাঁড়াল। নাদিম সুন্দর করে হাসল। পাশের জায়গাটুকু দেখিয়ে বলল,' এখানে বসতে সমস্যা?'

মৌশি জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে পড়ল। নাদিম হেসে বলল,

' কেমন আছো মৌশি?'

মৌশি জবাব দিল না। নাদিম অবাক হয়ে খেয়াল করল, তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্বাসী মেয়েটির চোখ জলে টলমল করছে। মৌশি কান্না আটকানোর চেষ্টা করছে। চেষ্টা সফল হচ্ছে না। নাদিম চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। মৌশিকে সামলে নেওয়ার সুযোগ দিয়ে বলল,

‘ শুনলাম জাহাঙ্গীরনগর ভর্তি হয়েছ। জিওলজি ভালো সাবজেক্ট। অল দ্যা বেস্ট।’

মৌশি তাচ্ছিল্য নিয়ে বলল,

‘ বাহ! আমার খবরও রাখেন নাকি আজকাল?’

নাদিম হাসল,‘ বাদাম খাবে?’

মৌশি নিষ্পলক চেয়ে রইল, হ্যাঁ-না কিছু বলল না। নাদিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী মৌশি? কতটুকু জানো আমায়?’

‘ এই প্রশ্ন করতে ডেকেছেন?’

‘ উঁহু। গল্প করতে ডেকেছি। দীর্ঘ গল্প। সেই গল্পের সূচনা এই প্রশ্ন দিয়ে। আপাতত প্রশ্নের উত্তরটা দাও।’

মৌশি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। নাদিমের দিকে চেয়ে নির্দ্বিধায় বলল,

‘ আমার জানার পরিধি খুব সীমিত। সেই সীমিত জানার মাঝে দুটো বাক্যেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। এক. আমার আপনাকে ভীষণ দরকার। দুই.আপনাকে আমার চাইই চাই।’

মৌশির উত্তরে হেসে ফেলল নাদিম। আকাশের দিকে চেয়ে ভীষণ মজার গল্প বলছে এমন ভাব নিয়ে কথা শুরু করল,‘ সাইকোলজির দিক থেকে চিন্তা করলে আমার

বাবা,আদিব হোসেন ছিলেন একজন মানসিক রোগী। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি চমৎকার একজন মানুষ। তাঁর কাছে জীবনের সজ্ঞাটাই ছিল ভিন্ন রকম। অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তিনি। নামের পাশে ডক্টর শব্দটা জ্বলজ্বল করলেও তার সম্মানীয় কোনো জীবিকা ছিল না। তার একমাত্র কাজ ছিল

যাযাবরের মতো ঘুরাঘুরি করা। এই রহস্যময় পৃথিবীর যতটা পারা যায় দেখে নেওয়া। এই পৃথিবীর মানুষগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। তাদের ভেতরকার রহস্যগুলো যতটা পারা যায় জেনে ফেলা। বাবা প্রচন্ড উদাসীন ছিলেন। সেই সাথে প্রচন্ড বুদ্ধিমানও। তাঁর উদ্ভট কর্মকান্ডের অধিকাংশেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই।অনেক ভেবেও ব্যাখ্যা

দাঁড় করাতে পারিনি। বাবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু তার পরিবারটা কোথায়? তাদের পরিচয়ই-বা কী ছিল? তার কোনো হদিশ আমি পাইনি। বাবা নিজের সম্পর্কে বলতে পছন্দ করতেন না। তিনি এমন ধরনের মানুষ ছিলেন, যে কিনা নিজের ইচ্ছের বাইরে একটা আঙ্গুলও নাড়তেন না। কথা বলতেন কম। চাহনী ছিল

আকর্ষণীয়। আমার মা হঠাৎ এই অদ্ভুত, উদাসীন মানুষটাকেই ভালোবেসে ফেললেন। শুধু ভালোবেসেই থামলেন না, রীতিমতো পাগলামো শুরু করলেন। এক অপরিচিত যুবকের প্রতি মায়ের এমন পাগলামোতে বিপাকে পড়ে গেলেন নানাজান। আদরের কন্যাকে শান্ত করতে গ্রামে বেড়াতে আসা সেই অপরিচিত যুবককে ধরে

আনলেন বিয়ে পড়াবেন বলে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, বাবা রাজি হয়ে গেলেন। যে মানুষটিকে পরিবার, বাবা-মা, অর্থ-সম্পদ কোনো কিছুই বেঁধে রাখতে পারেনি। সেই মানুষটিকে ভালোবাসার পাগলামোতে বেঁধে ফেললেন মা। আর বাবাও স্বইচ্ছায় বাঁধা পড়লেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?’

মৌশি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। নাদিমের প্রশ্নে খানিক থমকাল। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ অদ্ভুত কেন হবে? ভালোবাসা দিয়ে বেঁধে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। আপনার বাবা নিশ্চয় ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তাই...’

নাদিম হাসল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আমিও একসময় এমনই ভাবতাম মৌশি। বয়স হলে বুঝতে পারলাম, আমার ভাবনাটা ঠিক হচ্ছে না। মা বাবাকে বেঁধে ফেলেছিল এই ভাবনাটা সঠিক নয়। বাবার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বেঁধে ফেলা যায় না। মাকে বিয়ে করার পেছনেও প্রচ্ছন্ন কোনো উদ্দেশ্য তাঁর নিশ্চয় ছিল। বাবা তাঁর জীবনটাকে একটা এক্সপেরিমেন্টের মতো দেখতেন। মা

ছিলেন তারই একটা গিনিপিগ মাত্র। আমার ধারণা, তিনি মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে খেলতে পছন্দ করতেন। বাবা-মার সংসার জীবন ছিল দীর্ঘ চৌদ্দ বছর। এই চৌদ্দ বছরে বাবাকে কখনও উঁচু গলায় কথা বলতে দেখা যায়নি। তাঁর আচার-আচরণ বলত তিনি মাকে ভালোবাসেন। কিন্তু বয়স হয়ে বুঝতে পারলাম, বাবা মাকে ভালোবেসেও ভালোবাসেনি। মাকে

নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। প্রচন্ড ভালোবাসতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু নিজে বাসেননি। তার কারণ হয়ত তিনি নারী ভালোবাসার শেষ পর্যায়টা দেখতে চাচ্ছিলেন।'মৌশি অবাক চোখে চেয়ে রইল। হতভম্ব কণ্ঠে বলল,

' আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। কোনো মানুষ এই ছোট্ট

একটা বিষয় নিয়ে এতোগুলো বছর নষ্ট করবে না।’

‘ কোনো মানুষ আর আমার বাবা এক নয় মৌশি। উনি ছিলেন ভিন্ন রকম। একদম আলাদা। বাবা বিস্তৃত ভালোবাসায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের ভালোবাসা পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর ভাবনা। কারো প্রতি কম বা বেশি নয়। আমি আর

মিষ্টি বাবার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রতি বিশেষ টান তাঁর ছিল না। তবুও আমাদের দুজনেরই প্রিয় ছিলেন বাবা। তার কারণ তাঁর আকর্ষণ শক্তি।’

মৌশি অসহায় চোখে চেয়ে রইল। নাদিম মুখ ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে বলল,‘ আমি বোধহয় ব্যাপারটাকে কমপ্লিকেট করে ফেলছি। ঘটনা বর্ননার ক্ষেত্রে উল্টোপাল্টা সমীকরণ

টানছি। আচ্ছা, যেখানে ছিলাম। বাবা-মার বিয়েটা এক রকম অদ্ভুত ভাবেই হলো। নানাজান নিজের সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ মায়ের নামে লিখে দিয়ে সেই গ্রামেই তাদের থাকার জায়গা করে দিলেন। বাবা কোনো প্রতিবাদ করলেন না। বিয়ের এক বছরের মাথায় আমি হলাম। দিনকে দিন বাবার প্রতি মায়ের ভালোবাসা বাড়তে লাগল। সেই

ভালোবাসা যখন শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল তখন হঠাৎ একদিন এক মাসের বাচ্চা কোলে বাড়ি ফিরলেন বাবা। আমার বয়স তখন ছয় কী সাত বছর।বাবা বাচ্চাটাকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বললেন, 'শী ইজ মাই ডটার।' এর বাইরে আর একটি কথাও বললেন না। মায়ের ভালোবাসা, বিশ্বাস প্রচন্ড এক ধাক্কা খেল। প্রথম কিছুদিন চিল্লাপাল্লা করে

বাবার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না পেয়ে শান্ত হয়ে গেলেন। মিষ্টি অর্থাৎ বাবার মেয়ের ঠিকঠাক দেখাশোনা করতে লাগলেন। তার ঠিক ছয়-সাত বছর পর কোনো এক দুপুর বেলায় গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করলেন মা। ফর্সা মা চোখের পলকে পুড়ে যাওয়া রক্তাক্ত লাশে পরিণত হলো। আমি আর বাবা তা চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তার

ঠিক এক সপ্তাহ পর আমাকে আর মিষ্টিকে ফেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন বাবা। তাঁকে কাছে পেলে চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করতাম, সত্যিই কী ভালোবেসেছিলে মাকে? কিন্তু সেই সুযোগটি নেই। বাবা কোথায় আছেন জানা নেই। বেঁচে আছেন কী-না তাও বলা যাচ্ছে না।'মৌশি কোনো কথা খুঁজে পেল না। নাদিমের কোনো কথারই মর্মার্থ

করতে পারা যাচ্ছে না। মাথার ভেতর এলোমেলো হয়ে প্যাঁচ লেগে যাচ্ছে সব। মৌশির ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারল নাদিম। ফুঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,

' তোমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন জাগছে নিশ্চয়? এই প্রশ্নগুলো আমার মনেও জেগেছিল খুব। বড় হওয়ার সাথে সাথে সেই

প্রশ্নগুলোকে জিইয়ে রেখেছিলাম আমি। তার মাঝে কিছু উত্তর খুঁজে পেয়েছি। কিছু এখনও অস্পষ্ট, ঘোলাটে। বাবা মিষ্টিকে আনার এক সপ্তাহ পরেই মায়ের অভিযোগ কমে এসেছিল। সংসারে ঝামেলা তেমন হতো না। তবুও মা আত্মহত্যা করল কেন? মিষ্টিকে বাড়ি আনার উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? মিষ্টি কী সত্যিই বাবার মেয়ে ছিল? আমার বোন ছিল?

এমন অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরে বেড়াত আমার। তার কিছু উত্তর এখন আমার জানা। অনেকে বলে মা মানসিকভাবে স্টেবল ছিলেন না। মানসিক সমস্যার কারণেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আমার ধারণা ব্যাপারটা সঠিক নয়। বাবা ধীরে ধীরে মাকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করেছেন। মাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছেন। আ শার্প

মার্ডার।’মৌশি চমকে উঠল। নাদিম বলল,

‘ বিয়ের পর মাকে ভালোবাসার শেষ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে মিষ্টির মাধ্যমে এই ধাক্কাটা দেওয়া ছিল বাবার ইচ্ছেকৃত। শুধুমাত্র মায়ের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যই কোনো এক মহিলার সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। সেই মহিলার মাধ্যমে মিষ্টিকে জন্ম দেওয়ায় ছিল বাবার উদ্দেশ্য, এছাড়া

কিছুই না। তিনি অবৈধ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইলে মিষ্টিকে বাড়ি আনার প্রয়োজন ছিল না। মিষ্টির প্রতি দায়িত্ববোধ বা ভালোবাসা থেকে বাড়ি আনা হয়েছিল এমনটাও নয়। মিষ্টির প্রতি বাবার বিশেষ কোনো টান ছিল না। বাবার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মাকে প্রচন্ড ধাক্কা দেওয়া এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা।'মৌশি আর্তনাদ করে বলল,

‘ উনি কী পাগল?’

নাদিম হেসে ফেলে বলল,

‘ তোমাকে তো প্রথমেই বলেছি মৌশি। সাইকোলজির ভাষায় তিনি একজন মানসিক রোগী।’

মৌশি কোনো কথা খুঁজে পেল না। নাদিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল,‘ তোমাকে একটা ঘটনা বলি। তখন মিষ্টির ছয় মাস বা এক বছর চলছে। মা মিষ্টিকে খাওয়াচ্ছেন।

হঠাৎ কী হলো জানি না, মা মিষ্টিকে ছুঁড়ে ফেললেন মাটিতে। মিষ্টি তারস্বরে কাঁদছে। তার কপাল কেঁটে রক্ত পড়ছে। বাবা বারান্দায় বসে পুরো ব্যাপারটা দেখলেন অথচ উঠে আসলেন না। আমি দৌঁড়ে গিয়ে মিষ্টিকে কোলে তুললাম। মা আশেপাশের সব কিছু ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর থেকে শুরু হলো মায়ের এই হঠাৎ রেগে যাওয়ার

সমস্যা। মিষ্টি যতই বড় হতে লাগল, মায়ের এই সমস্যা বাড়তে লাগল। মিষ্টির দিকে চেয়ে হঠাৎই তিনি রেগে যান। চিল্লাচিল্লি করেন। বাবার দিকে এটা ওটা ছুঁড়ে মারেন। তারপর হাউমাউ করে কাঁদেন। বাবা কোনো প্রতিবাদ করতেন না।মায়ের দিকে শান্ত চোখে চেয়ে থাকতেন। সেই ছোট্ট বেলায়, মায়ের প্রতি খুব ক্ষোভ জন্মাতো আমার। ভীষণ নিরীহ

বাবার উপর এই অত্যাচারে ভয়াবহ রাগ লাগত। কিন্তু এই এতো বছর পর, ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম মায়ের সেই মানসিক বিপর্যয়ের কারণটা ছিলেন স্বয়ং বাবা। মিষ্টির চেহারা দেখতে বাবার মতো। তার দিকে চাইলেই বুঝে ফেলা যায়, সে আদিব হোসেনের মেয়ে। মা মিষ্টির দেখাশোনা করতেন ঠিক। কিন্তু মিষ্টির বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার

চেহারায় বাবার স্পষ্ট ছাপটা মেনে নিতে পারতেন না। বাবার প্রতি মায়ের প্রচন্ড ভালোবাসা আর বাবার বিশ্বাসহানী মিষ্টির মুখটা দেখলেই মনে পড়ে যেত একের পর এক। বাবাও হয়ত এমনটাই চাইতো। মায়ের মন ও মস্তিষ্কের যুদ্ধের শেষটা দেখায় ছিল বাবার উদ্দেশ্য। মায়ের ধৈর্যশক্তির শেষটা ঠিক কোথায়? মানুষ ঠিক কতটা সহ্য

করতে পারে? সহ্যশক্তির পরিমান কত? বাবার এমনই কিছু উত্তরের প্রয়োজন ছিল। শারিরীক দিক থেকে অত্যাচার না করলেও, এ ছিল বাবার দেওয়া তীব্র মানসিক অত্যাচার। মা প্রতিনিয়ত কতটা অত্যাচারিত হয়েছে বুঝতে পারছ?’

মৌশির মাথা ধপধপ করছে। সে একহাতে কপাল চেপে ধরে বলল,‘ আপনার মা উনাকে ছেড়ে দেননি

কেন? উনার তো বাবার সাপোর্ট ছিল। তিনি চাইলেই তাকে ছাড়তে পারতেন।'

' তুমি হয়তো মায়ের ভালোবাসার তীব্রতাটা বুঝতে পারোনি মৌশি। আমি তোমাকে বলেছি, মা বাবাকে প্রচন্ড ভালোবাসত। এটাই বাবার এক্সপেরিমেন্টের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মা এমন একটা পরিস্থিতিতে ছিলেন যেখানে বাবাকে ছেড়ে দেওয়া বা

আঁকড়ে ধরা কোনটাই তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। মস্তিষ্ক ও মনের ভয়াবহ যুদ্ধ নিয়েই কেটেছে তাঁর সাত সাতটা বছর।'মৌশি দুই হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে রইল। নাদিমের বলা কথাগুলো তার মস্তিষ্কে এলোমেলো প্যাঁচ লেগে গিয়েছে। মস্তিষ্ক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাদিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ পুরো ব্যাপারটা আমি গুছিয়ে বলতে পারিনি বলে দুঃখিত মৌশি। বাবার ঘটনাগুলো ভাবতে গেলেও এলোমেলো হয়ে পড়ি। ধারাবাহিকতা থাকে না। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি আমার বাবার উদ্ভট মানসিক ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। বুঝতে পারছ না?’

মৌশি মাথা নাড়ল। নাদিম মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ গুড।’

একটু থেমে আবারও বলল,‘ সবাই বলে এবং আমিও বিশ্বাস করি, আমি অনেক ক্ষেত্রেই আমার বাবার মতো হয়েছি। বড় মামার মতে আমাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, আচরণ,চাহনী একই। বাবা হারিয়ে যাওয়ার আগে আমার মাঝে নিজের বীজটা বুনে যেতে পুরোপুরি সমর্থ্য হয়েছেন। এইযে, বাবার এই ভয়াবহ মানসিক

এক্সপেরিমেন্টে এতোগুলো জীবন এলোমেলো হয়ে গেল। তবুও আমি বাবাকে ঘৃণা করতে পারি না। বাবাকে আমি মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসি।’

নাদিম একটু থেমে বলল,‘ আমার এই গল্পটা গুটিকতক মানুষ ছাড়া কেউ জানে না। যারা জানে তাদের কাছেও গল্পটা বড় অস্পষ্ট। না-জানার মতোই। এই অস্পষ্ট গল্পটা

স্পষ্ট করে তোমাকেই প্রথম বলছি। কারণটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ মৌশি? প্রকৃতি ঘটনার পুনরাবৃত্তি পছন্দ করলেও আমি তা পছন্দ করি না। বুঝতে পারছ, আমি কী বলছি?’

মৌশি তাকাল। ছলছল করে উঠল তার দৃষ্টি। ফিসফিসানোর মতো করে বলল,

‘ স্টিল, আমি আপনাকে চাইছি। পরিণতি সম্পর্কে জেনেও চাইছি।’

নাদিম হেসে ফেলল। মৌশির দিকে খানিকটা সরে বসে বলল,

‘ বাবার প্রতি মায়ের ভালোবাসার তীব্রতাটা এখন বুঝতে পারছ মৌশি?’

মৌশির চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই ডুকরে উঠে বলল,

‘ আমার কেন এমন হচ্ছে? দুটো বছর থেকে ঘুমোতে পারছি না।

খেতে পারছি না। আপনাকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি আপনাকে ভালোবাসবো না ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসছে। প্লিজ প্লিজ, আমি মারা যাচ্ছি!'নাদিমের মন খারাপ হয়ে গেল। প্রথমবারের মতো মৌশির মাথায় হাত রেখে খুব নরম কণ্ঠে বলল,

‘ ইউ আর আ ওয়ান্ডাফুল গার্ল। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমায় খুব ভালোবাসি মৌশি। তুমি এখন এডাল্ট। বুঝার চেষ্টা করো, আমি তোমার জন্য পার্ফেক্ট নই। কখনও পার্ফেক্ট ছিলাম না। ইউ ডিজার্ভ মোর এন্ড মোর বেটার দেন মি। পাগলামো নয়। তোমাকে মুভ অন করতে হবে। নিজেকে এতো অবহেলা না করে ভালোবাসো।

সবার থেকে বেশি ভালো নিজেকে বাসো। আমি জানি তুমি পারবে।'

মৌশি ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে দিল। বেঞ্চিতে পা তুলে বসে দুই হাঁটুতে মাথা রেখে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। নাদিম অপ্রস্তুত বসে রইল। এতোদিন পরও মৌশির এমন ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হবে জানলে কখনোই পার্কে ডেকে পাঠাত না। নাদিম কাঁধ থেকে গিটারটা নিয়ে

কোলের উপর রাখল। শাড়ি পরিহিতা অসম্ভব রূপবতী এক মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারপাশে বসে বাউণ্ডুলে, ফালতু এক ছেলে নির্বিকার গান গাইছে। বিষয়টা অদ্ভুত না? নাদিমের অদ্ভুত কাজটা করে ফেলতে ইচ্ছে করল। গিটারে সুর তুলে কোনো একটা গানের মাঝ থেকেই গাইতে লাগল হঠাৎ,‘যদি তুমি ভালোবাসো,

ভালো করে ভেবে এসো
খেলে ধরা কোনোখানে রবে না
আমি ছুঁয়ে দিলে পরে,
অকালেই যাবে ঝরে
গলে যাবে যে বরফ গলে না
আমি গলা বেচে খাবো,
কানের আশেপাশে রবো
ঠোঁটে ঠোঁটে রেখে কথা হবে না
কারো একদিন হবো,
কারো একরাত হবো

এর বেশি কারো রুচি হবে না...’নাদিমের গানে চোখ তুলে তাকাল মৌশি। এমন একটা সময়ে এমন উদ্ভট গান শুনে ভ্যা ভ্যা করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে মৌশির। নাদিম এমন কেন? কেন এতো অনুভূতিহীন? মানুষের কষ্ট কী তাকে স্পর্শ করে না? মৌশির ঠোঁট ভেঙে কান্না আসছে। এই মানুষটিকে ভালোবাসার অপরাধে নিজেকে

ভয়াবহ কিছু শাস্তি দিতে মন চাইছে। পরমুহূর্তেই এই মানুষটিকে ভালোবেসেই মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আহ! জীবনে এতো কষ্ট কেন? ভালোবেসেও না পাওয়ার কষ্ট এত জ্বালায় কেন? মৌশির বুকে বেয়ে উতলে উঠল এক আকাশ কান্না। চোখদুটো ভারী হয়ে এলো। এই আচ্ছন্ন কান্নার কারণ মৌশি জানে না। শুধু জানে এই কান্না

তাকে কাঁদতে হবে। নয়তো বেঁচে থাকা যাবে না। মরে যাবে। একদম নিঃশেষ হয়ে যাবে! মৌশি কাঁদতে কাঁদতেই নাদিমের গান শুনল,

'আমার এই বাজে স্বভাব

কোনোদিন যাবে না।'রোজ বিকেলে পাশের বাড়ির ভাবি-চাচিদের হামলাটা ভীষণ বিশ্রী লাগে নীরার। ঘরদোর ফেলে শরীর মেলে গল্প করতে বসে যেতে দেখলেই গা জ্বলে

যায় তার। নীরা বিরক্তি নিয়ে চা বানাল। চায়ের ট্রেটা বসার ঘরে নিয়ে যেতেই এক মহিলা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার মতো ভঙ্গিমা করে বলল,

‘ ছেলের বিয়ের তো অনেকদিন হলো ভাবি। নাতি-নাতনি আসবে কবে? এখনও কোনো খোঁজ নেই যে? কোনো সমস্যা টমস্যা নেই তো আবার?’

জাহানারা তৎক্ষনাৎ জ্বলে উঠলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,

‘ সমস্যা আছে। সমস্যাটা হলো, আমাদের নাতি-নাতনীর দরকার নাই। আর এখনই নাতি-নাতনী কিসের? আমরা কী মরে যাচ্ছি? পোলা-বউ কী বুড়ো হয়ে গেছে?এই বয়সে তো ছেলেই বিয়ে করাতে চাই নাই। যা হয়েছে, তা হয়েছে। আগে ছেলের পড়াশোনা শেষ হোক।

চাকরি-বাকরি পাক তারপর নাতি-নাতনীর চিন্তা। বিয়ে করেই ছেলের যে পেরেশানি যাচ্ছে... ‘জাহানারার আলাপের মাঝেই বাড়ি ফিরল অন্ত। থমথমে মুখে সোজাসুজি ঢুকে গেল নিজের ঘরে। নীরা এক পা দুই পা করে সরে এসেই নিজের ঘরে দৌঁড় লাগাল। অন্ত ফাইলটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে শার্টের বোতাম খুলছে।

মেজাজ তার তিরিক্ষি। নীরা আসতেই বলল,

‘ চাকরি-বাকরি কিছু হবে না বুঝছিস? যত্তসব ফালতু সিস্টেম। শুধু শুধু তো মানুষ দেশ ছাড়ে না। জ্বালায় পড়ে ছাড়ে। আছেটা কী এই দেশে? দূর্নীতি আর ক্ষমতার দাপট ছাড়া কিছুই না।’

নীরা উত্তর দিল না। বুঝতে পারল, অন্তর ইন্টারভিউ সন্তোষজনক

হয়নি। অন্তু দুইহাতে মুখ ঢেকে নীরব বসে রইল। নীরা ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাত রাখল অন্তুর চুলে। অন্তু মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল। দুই হাতে নীরার কোমর জড়িয়ে ধরে ক্লান্ত মাথা এলিয়ে দিল বুকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,' যে তিনটা টিউশনি ছিল সব কটা স্টুডেন্টই এবার ভার্সিটিতে পা রাখল। নতুন কোনো টিউশনিই

পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে চাকরির ব্যাপারগুলোও এগুচ্ছে না। মাস্টার্সেও ভর্তি হতে হবে। অনেকগুলো জবের শর্তই থাকে মাস্টার্স এন্ড এক্সপেরিয়েন্সড।'

অন্তু মাথা তুলে তাকাল। চিন্তিত কণ্ঠে বলল,

' দুজনের মাস্টার্স ভর্তি হতে প্রায় তেরো চৌদ্দ হাজার টাকা লেগে যাবে, তাই না?'

নীরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ভীষণ মন খারাপ লাগছে তার। সামনের দিনগুলো যে ভয়াবহ ধাক্কা নিয়ে আসছে তা বুঝতে বাকি রইল না তার।'নম্রতার বিয়ের সপ্তাহ খানেক আগে মারাত্মক এক দূর্ঘটনা ঘটে গেল। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেল নাদিম। ফোন বন্ধ। সোশ্যাল মিডিয়াতে নেই। ভার্সিটি হলের নির্দিষ্ট ঘরটাও ফাঁকা। অগোছালো

জামা কাপড় পড়ে আছে বিছানাজুড়ে। নম্রতা যেন অকূল পাথারে পড়ল। এই ব্যস্ত শহর থেকে হুট করেই এক জলজ্যান্ত মানুষ উধাও! কারো চোখে পড়ল না! কেউ খবর রাখল না? আশ্চর্য! এমন ভয়াবহ দুশ্চিন্তার মাঝেই ফোন করল নীরা। তখন সকাল গড়িয়ে দুপুর নেমেছে। সারা শহরে তীব্র ঠান্ডার পর মিষ্টি রোদের ছোঁয়া। নম্রতা

ফোন ধরতেই বলল,‘ জলদি একটু মেডিকেলে আসতে পারবি? প্লিজ?’

নম্রতার সবে ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙেই এমন এক আবদারে ভরকে গেল সে। ঘুম ঘুম কন্ঠে তৎক্ষনাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ কেন? মেডিকেলে কেন? কারো কিছু হয়েছে? এনি ব্যাড নিউজ?’

নীরা ক্লান্ত কন্ঠে বলল,

‘ তুই আয়, বলছি। জলদি আয়। দেরী করিস না।’

নম্রতা ছিটকে উঠে বসল। হাজার ধরনের বাজে চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘন্টাখানেকের মাথায় গিয়ে পৌঁছাল মেডিকেল। নীরা মেডিকেলের করিডোরেই দাঁড়িয়ে আছে। চোখ-মুখ শুকনো। দৃষ্টি অস্থির। নম্রতা এদিক ওদিক চেয়ে ব্যস্ত কন্ঠে বলল,‘ আর কাউকে দেখছি না যে?

নাদিমের কোনো খোঁজ পেলি? হঠাৎ হসপিটালেই বা আসতে বললি কেন?’

নীরা তটস্থ চোখে চাইল। নম্রতা অবাক হয়ে খেয়াল করল, নীরা দরদর করে ঘামছে। এই শীতকালেও ঘামের নহর বেয়ে পড়ছে কপাল জুড়ে। নীরা ডানহাতের পিঠ দিয়ে মুখ আর

গলার ঘাম মুছে ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলল,

‘ আমি অ্যাবোরশন করাব নমু। কিভাবে কী করব কিছু বুঝ উঠতে পারছি না। তুই একটু হেল্প করবি?’

নম্রতা প্রথম দফায় কথাটা ঠিক ধরতে পারল না। নীরার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে বোকা বোকা কণ্ঠে বলল,

‘ অ্যাবোরশন? কীসের অ্যাবোরশন? কার কথা বলছিস?’

নীরা কপালের ঘাম মুছল। শুকিয়ে থাকা ঠোঁটটা জিহ্বা দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল,‘ আমি। আমার কথা বলছি।’

নম্রতা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল,

‘ অ্যাবোরশন! তারমানে বেবি? ওহ মাই গড! তুই প্রেগন্যান্ট নীরু?

আল্লাহ! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে একটা পুচকো আসবে? ওহ গড! ওহ গড! আমার তো পার্টি করতে মন চাইছে.... '

পরমুহূর্তেই উচ্ছ্বাসে ভাঁটা এলো নম্রতার। মাঝপথেই থেমে গেল তার কণ্ঠস্বর। চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে নীরার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলল,' অ্যাবোরশন? তুই এইমাত্র

অ্যাবোরশনের কথা বললি না? তুই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাইছিস নীরু?'

নীরা অসহায় চোখে তাকাল। নম্রতার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলল,

' এটা খুব প্রয়োজন নমু। খুব খুব প্রয়োজন। তুই একটু হেল্প কর আমায়। আমার কাছে অতো টাকা নেই। এই বিষয়ে কিছু জানিও না।

আরফান ভাইকে বলে এতটুকু ম্যানেজ করে দে। প্লিজ নমু।’

নম্রতা কী বলবে বুঝে পেল না। নীরার মতো বুঝদার একটা মেয়ে এমন ফালতু একটা সিদ্ধান্ত নেয় কী করে? নম্রতা রাগ নিয়ে বলল,‘ পাগল তুই? নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলতে চাইছিস? আমি কাউকে অন্যায় হত্যায় সাহায্য করতে পারি না। নীরু! নীরু.. বুঝার চেষ্টা কর, ও

তোর বাচ্চা। তোর নিজের বাচ্চা! এই মুহূর্তে বাসায় যাবি তুই। এসব কোন ধরনের পাগলামো, বল তো? অন্তু জানে এসব?’

নীরা অসহায় কণ্ঠে বিড়বিড় করল,

‘ অন্তু বা ওর পরিবার কেউই বাচ্চাটাকে চাই না নমু। ওর আসা ঠিক হবে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে ওর আসা উচিত নয়।’

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,

‘ অন্তু বাচ্চা চাইছে না? ও এমনটা বলেছে তোকে? আমি জাস্ট বিশ্বাস করতে পারছি না! দাঁড়া, আমি ওই ফাজিলটার সাথে কথা বলছি....

‘নম্রতাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই উদভ্রান্তের মতো বলল নীরা,

‘ না। খবরদার অন্তুকে কিছু বলবি না। অন্তুকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তুই আমায় হেল্প করবি কী-না বল। হেল্প না করলে সরাসরি বলে

দে। এসব নাটকের প্রয়োজন নেই। আমি নিজে নিজেই ম্যানেজ করে নেব।’

নম্রতার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। নীরার শুকনো মুখটির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। নীরার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারল, তার অস্থির লাগছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। স্পষ্ট কিছু চিন্তা করা যাচ্ছে না। ঠিক সেই

মুহূর্তে, বন্ধুদের অভাববোধটা তীক্ষ্ণ ফলার মতোই বুকে গিয়ে বিঁধল নম্রতার। আজ নাদিম, রঞ্জন থাকলে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত না। নাদিমের মাথায় নিশ্চয় কোনো সমাধান থাকত? অথবা রঞ্জনের কথার ভাঁজে? নম্রতা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দূর দূর ভেবেও কোনো সমাধান না পেয়ে দপ করে বসে পড়ল পাশের এক চেয়ারে।

নম্রতার আকাশ-পাতাল ভাবনার মাঝেই দৌঁড়ে গিয়ে বার দুয়েক বমি করল নীরা। দুইবার বমি করেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেল শরীর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল ফ্লোরে। দুইহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল,‘ প্লিজ নমু! একটু হেল্প কর। প্লিজ!’

নম্রতার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। সে দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল। নাহ! কোনো সুন্দর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। নম্রতা উঠে দাঁড়াল। নীরাকে তুলে চেয়ারে বসিয়ে স্থির চেয়ে রইল নীরার মুখে। এতো এতো দুশ্চিন্তায় শরীরটা ঠান্ডা হয়ে আসছে তার। নম্রতা জোরে জোরে শ্বাস নিল। এদিক-ওদিক পায়চারি করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

সম্ভাব্য কোনো সমাধান ভাবার চেষ্টা করল। এই মুহূর্তে নাদিম, রঞ্জনের সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। ছোঁয়া অস্ট্রেলিয়ায়, তার থেকেও কোনো সাহায্য আশা করা যায় না। নীরার শ্বশুর বাড়িতে কী চলছে তাও নম্রতা জানে না। অন্তুর মনোভাবের ব্যাপারেও স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। সুতরাং হুট করেই অন্তুকে ফোন করা যাবে না। কোনো অপশনই

সচল না দেখে হতাশ নিঃশ্বাস ফেলল নম্রতা। হঠাৎ আরফানের কথা মনে পড়তেই শেষ ভরসা হিসেবে আরফানকেই ফোন লাগাল সে। আরফান ফোন তুলতেই কিছুটা দূরে গিয়ে ফিসফিস করে বলল,‘ আপনি কোথায়?’

‘ কোথায় আবার? হসপিটালেই আছি।’

নম্রতা অস্থির কণ্ঠে বলল,

‘ হসপিটাল! হ্যাঁ, আমিও হসপিটালেই আছি।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,

‘ ভোররাতেই তো কথা হলো। হসপিটালে আসবেন, বলেননি তো।’

‘ তখন কী জানতাম যে এমন বিপদে পড়ব?’

আরফান ব্যস্ত কণ্ঠে বলল,

‘ বিপদ মানে? কী হয়েছে? ঠিক আছেন আপনি? কোথায় আছেন এখন? আমি আসছি।’

‘ উফ ডক্টর! আমার কিছু হয়নি। আমি ঠিকঠাক আছি। সমস্যাটা আসলে নীরাকে নিয়ে। শুধু সমস্যা নয় ভয়ানক সমস্যা।’আরফান এবার শান্ত হলো। স্বভাবসলুভ গাম্ভীর্যের সাথে বলল,

‘ ভয়ানক সমস্যাটা কী?’

নম্রতা প্রায় ফিসফিস করে বলল,

‘ নীরা প্রেগন্যান্ট।’

আরফান বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ এই কথাটা এতো ফিসফিস করে বলার কী আছে নম্রতা? নীরা বিবাহিত। বিবাহিত মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে ভয়ানক সমস্যা কিছু তো দেখছি না।’

নম্রতা অধৈর্য হয়ে বলল,‘ আমার কথাটা ধৈর্য নিয়ে না শুনলে সমস্যাটা বুঝবেন কীভাবে? এতো এতো ভিজিট নিয়ে রুগী দেখেন অথচ ধৈর্য বলতে কিচ্ছু নেই। এইজন্য আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার এই অবস্থা!’

‘ আপনি আবার আমার ভিজিট নিয়ে ফোঁড়ন কাটছেন নম্রতা!’

নম্রতা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় কথাবার্তা সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মেইন পয়েন্ট ঠিক রাখা যাচ্ছে না। নম্রতা সরাসরি প্রসঙ্গ টেনে বলল,

‘ নীরা অ্যাবোরশন করতে চাইছে। ওর শরীরের কন্ডিশনও খুব একটা ভালো লাগছে না। আমি কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না ডক্টর।’

আরফান অবাক হয়ে বলল,‘ এটা না ওদের ফার্স্ট বেবি? ওদের তো খুশি হওয়া উচিত। তা না হয়ে, অ্যাবোরশন করবে কেন? ওর হাজবেন্ড মানে আপনার ফ্রেন্ড কোথায়?’

‘ অন্তু যে কোথায় তা আমি নিজেও জানি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। এতো প্রশ্ন না করে, দ্রুত একটা সমাধান

দিন ডক্টর। আমার প্রচন্ড টেনশন হচ্ছে। প্রেশার ফল করছে। জ্বর জ্বর লাগছে। এই টেনশন বেশিক্ষণ চললে নির্ঘাত হার্টফেল টার্টফেল করে ফেলব ডক্টর।'

' হার্টফেল করার প্রয়োজন নেই। নীরাকে নিয়ে আমার চেম্বারে আসুন। আমি দেখছি। অযথা টেনশন করে অসুস্থ হবেন তো খবর আছে।'আরফানের চেম্বারে মুখোমুখি

চেয়ারে বসে আছে নীরা। চোখ-মুখ ফ্যাকাশে। দৃষ্টি অস্থির। আরফান পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে নীরার মুখের দিকে চাইল। খুব সূক্ষ্ম চোখে খেয়াল করল, মেয়েটির শরীর কাঁপছে। ভীষণ ভয়ে হাসফাস করছে। দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তায় শুকিয়ে গেছে মুখ। আরফান হালকা কেশে বলল,

‘ পানি খাবে?’

নীরা আরফানের দিকে তাকাল। কাঁপা হাতে গ্লাসটা নিয়ে চুপ করে বসে রইল, চুমুক দিল না। কম্পনরত ঠোঁটজোড়া চেপে ধরে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কোলের উপর রাখা নিস্তেজ হাতে। নম্রতা অধৈর্য চোখে একবার আরফান তো একবার নীরার দিকে তাকাচ্ছে। আরফান বেশ রয়ে সয়ে প্রশ্ন করল,‘

নম্রতা বলছিল, তুমি অ্যাবোরশন করতে চাইছ। সত্যিই চাইছ?’

নীরা চোখ তুলে তাকাল। পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদু মাথা নাড়ল।

‘ কিন্তু কেন চাইছ?’

নীরা উত্তর দিল না। আরফান ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ দেখো নীরা, তুমি যে কাজটা করতে চাইছ তা আইনত অপরাধ।

আমাদের দেশে বহু অপরাধ হচ্ছে। তুমি আরেকটি অপরাধ করলে দেশের উন্নতিতে আহামরি কোনো সমস্যা হবে না। যা সমস্যা হওয়ার তোমারই হবে।অনেক সময় দেখা যায় অ্যাবোরশনের পর অনেকেই মা হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেকেন্ড টাইম প্রেগন্যান্সিতে কমপ্লিকেশন দেখা দেয়। অনেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য মারাও

যায়। সবার ক্ষেত্রে এমন হয়, তা নয়। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে নিজেদের দিকটা ক্লিয়ার রাখা জরুরি। কাজটা যেহেতু অনৈতিক এবং ডাক্তারদেরও রিস্ক নিয়েই করতে হচ্ছে সেহেতু টাকাও লাগবে প্রচুর। কমপক্ষে চার থেকে সাত হাজার টাকা। ঘাবড়ে যেও না, এসব ছিল ডাক্তারী কথা।'

নীরা দ্বিধান্বিত চোখে চেয়ে রইল। আরফান একটু থেমে বলল,'

ডাক্তারী কথা পাশে রেখে শুভাকাঙ্ক্ষী বা বড় ভাইয়ের মতো কিছু কথা বলি নীরা? আমি জানি না তুমি কেন এমন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে আফসোস করতে হতে পারে। এটা তোমার প্রথম প্রেগন্যান্সি। মাতৃগর্ভে নিশ্চিন্ত থাকা প্রাণটির পৃথিবীতে আসার পূর্ণ অধিকার আছে। অনাগত সন্তানটাকে পৃথিবীতে আসার সুযোগ

না দিয়ে বাড়ি ফিরে শান্তি পাবে নীরা? আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি। আজকে এই ঘটনাটা ঘটে গেলে জীবনের বাকি রাতগুলো তুমি ঘুমোতে পারবে না।আফসোস আর তীব্র অপরাধবোধে জীবনের কোনো পর্যায়েই শান্তি পাবে না। পার্সোনালি এবোরশন বিষয়টা আমার পছন্দ নয়। তবুও আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তার আগে, তোমায়

ভাবতে বলব। তুমি একটু সময় নিয়ে ভাবো নীরা। তোমার হাজবেন্ডের সাথে আলোচনা করো। তাছাড়া তোমার শরীরের কন্ডিশনও সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। এই অবস্থায় এবোরশন করা সম্ভব নয়।’ এটুকু বলে থামল আরফান। নম্রতাকে একবার দেখে নিয়ে খুব সাবধানে জিগ্যেস করল,‘ এনিওয়ে,

তোমার হাজবেন্ড কী পুরো ব্যাপারটা জানেন নীরা? তাকে বলেছ?’

নীরা অসহায় চোখে তাকাল। আরফান নরম কণ্ঠে বলল,

‘ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ব্যাপারটা তাকে জানাওনি। কিন্তু জানানো উচিত ছিল। বাচ্চাটা তোমার একার নয়। বাচ্চা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বাবা-মা দুজনেরই সমান। তুমি কী কোনো

সমস্যায় পড়েছ নীরা? সমস্যাটা খোলে বলো। আমাকে বলতে সমস্যা হলে এটলিস্ট নম্রতাকে বলো।'

নীরা ভয়ার্ত চোখে তাকাল। ক্ষণিকের মাঝেই টলমল করে উঠল চোখ। পাতলা ঠোঁটদুটো ভেঙে এলো কান্নায়। হঠাৎই দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট কণ্ঠে আওড়াতে লাগল,' আমি আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চাইনা

ভাইয়া। চাইনা। ও বেঁচে থাকুক। অনেক বছর বাঁচুক।’

নম্রতা উঠে গিয়ে দুই হাতে আগলে নিল তাকে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শান্ত করার চেষ্টা করল। আরফান তাকে সামলে নেওয়ার সুযোগ দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। নীরার হাত-পা ক্রমাগত কাঁপছে। নীরা যে ভাবনাচিন্তা না করে মানসিক চাপের মুখে হঠাৎই এমন

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তা বেশ বুঝতে পারছে আরফান। নীরা কিছুটা শান্ত হতেই বলল,‘ তাহলে অ্যাবোরশনের কথা ভাবছ কেন?’

নীরা উদভ্রান্তের মতো চাইল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ আমার সবকিছু এলোমেলো লাগছে ভাইয়া। রোজ রোজ অন্তর মুখে বাচ্চা নিয়ে অসন্তোষ। সাংসারিক টানাপোড়েন, দুশ্চিন্তা, শাশুড়ি মায়ের

বিতৃষ্ণা এসব দেখে দেখে মনে হচ্ছিল অ্যাবোরশন ছাড়া উপায় নেই। আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি স্পষ্ট কিছু ভাবতে পারছিলাম না। এমন একটা পরিস্থিতিতে কনসিভ করেছি শুনলে কেউ খুশি হবে না ভাইয়া। অন্তু হয়তো রাগারাগি করবে। বড় ধরনের ঝামেলা হবে। হঠাৎ মনে হলো বাচ্চাটাকে এই ঝামেলার

সংসারে আনা উচিত হবে না। সবাই নিশ্চয় তার সাথে ‘আনওয়েন্টেট’ বাচ্চার মতো ট্রিট করবে। বার বার মনে হচ্ছিল, ওর ভবিষ্যৎ কী হবে? কিভাবে কী হবে? আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না।’আরফান শান্ত চোখে চেয়ে রইল। নীরার এলোমেলো কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ সবকিছু এতো নেগেটিভভাবে কেন ভাবছ নীরা? এতো প্রেশারই-বা কেন নিচ্ছ? প্রেশার নেওয়ার জন্য অন্তু আছে। ট্রাস্ট মি, এই অসাধারণ খবরটা শুনলে বিন্দুমাত্র রাগ করবে না অন্তু। আমি নিজে একজন পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, বাবা হওয়ার মতো আনন্দের খবর আর কিছু হতেই পারে না। অন্তুকে এতোবড়

সারপ্রাইজ থেকে বঞ্চিত করো না। তাকে বাবা হওয়ার অনুভূতিটা অনুভব করতে দাও। আর ঝামেলার কী আছে?কোনো ঝামেলাই কী সারাজীবন থাকে? আর্থিক টানাপোড়েন আজ আছে, কাল থাকবে না।কিন্তু সেই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে বাচ্চাটাকে হারিয়ে ফেললে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সাংসারিক চিন্তা ছেড়ে শুধু

বাচ্চাটার কথা ভাবো। মা হওয়ার অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতিটা উপভোগ করো। যে তোমার মাঝে আছে তার কাছে এখন থেকেই তুমি সুপার উইমেন। সে এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, তার মা তাকে সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তার মা কী তার বিশ্বাসটা ধরে রাখবে না? ওর জন্য এসব ছোটোখাটো প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসতে পারবে না? এসব

অযৌক্তিক চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো নীরা। এমন পাগলামো সিদ্ধান্ত তোমায় শোভা পায় না।'

নীরা আচ্ছন্নের মতো কাঁদতে লাগল। দুশ্চিন্তার ঘোরে এমন একটা বিশ্রী সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অপরাধবোধে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে মন। সে-ই বা কী করবে? বারবার মুড সুয়িং হচ্ছিল। শারিরীক দুর্বলতা আর এতো এতো দুশ্চিন্তায় স্পষ্ট কোনো ভাবনা

আসছিলই না। সরি বাবু! মা সরি! হঠাৎ করেই অন্তুর ব্যাপারটা মাথায় এলো নীরার। আরফানের কথাটা যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয় অ্যাবোরশনের কথাটা শুনলে ভয়ানক রেগে যাবে অন্তু? নীরাকে একদম খুন করে ফেলবে সে! নীরার আবারও কান্না পেয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড অপরাধবোধ আর ভয়ে চারপাশটা কেমন অসহায় লাগছে।তখন দুপুর।

আকাশ ভর্তি ঝলমল করছে রোদ। বেশিক্ষণ রোদে থাকায় তাতিয়ে উঠেছে পিঠ। অন্তু যখন বাইক নিয়ে বাড়ির পাশের রাস্তাটা ধরল ঠিক তখনই পেছনের এক রিকশা থেকে ডেকে উঠল কেউ। মহিলাগোছের মানুষ। অন্তু প্রথমে খেয়াল না করলেও লুকিং গ্লাসে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়াল। বাইক থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই রিকশাটা এসে

থামল তার পাশে। অন্তু অবাক হয়ে বলল,‘ আমাকে ডাকছিলেন?’

ভদ্রমহিলা ঠোঁট ভরা হাসি নিয়ে বলল,

‘ হ্যাঁ। তুমি নয়তো আর কে?’

অন্তু কপাল কুঁচকে বলল,

‘ জি, বলুন।’

ভদ্রমহিলা এক আকাশ বিস্ময় নিয়ে বলল,

‘ বলুন মানে? তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের সামনের বাসাতেই থাকি। তোমার সাবিনা আন্টি। তোমাদের বাসায় তো প্রায়ই যাই। দেখোনি?’অন্তু ঠোঁট টেনে ভদ্রতার হাসি হাসল। ভদ্রমহিলা রিকশা থেকে মাথা বের করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন,

‘ তোমার বউ যে কনসিভ করেছে আগে বলোনি তো! তোমার মাকে

সেদিনও জিজ্ঞেস করলাম, সাফ মানা করে দিলেন। বুঝলাম অ্যাবোরশন করাবে। তাই বলে বলা যাবে না? আমি কী পর? মেডিকেলে পরিচিত ডাক্তার আছে আমার। আমাকে বললে হাফ খরচে হয়ে যেত।'

ভদ্রমহিলার বাঁধনহারা, নির্লজ্জ আলাপে স্তব্ধ হয়ে গেল অন্তু। তার থেকেও স্তব্ধ হয়ে গেল আলোচনার

বিষয়বস্তু জেনে। কিছুক্ষণ পলকহীন, হতভম্ব চোখে চেয়ে থেকে বলল, ‘ আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে আন্টি। এমন কোনো ব্যাপার নেই।’ ভদ্রমহিলা দ্বিগুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল,‘ ওমা! আমার থেকে লুকচ্ছ কেন বাবা? আমি কী তোমাদের ক্ষতি চাই নাকি? কেউ বলতে পারবে কখনও কারো ক্ষতি টতি করেছি? নেহাৎ তোমার বউকে

মেডিকেলে দেখে এলাম। কোনো দরকার টরকার লাগতে পারে, তাই নিজ থেকেই জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের আপন ভাবি বলেই তো জিজ্ঞেস করেছি নাকি?'

অন্তর কপাল কুঁচকে এলো। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল,'আপনি নীরার কথা বলছেন?'

ভদ্রমহিলা মাত্রাতিরিক্ত বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ তা নয়তো কে? আমার ননদের মেয়ের সিজার হলো আজ। আলহামদুলিল্লাহ, ছেলে বাচ্চা হয়েছে। ওখানেই, সি সেকশনেই তোমার বউকে দেখলাম এক নার্সের সঙ্গে কথা টথা বলছে। আমি ভাবলাম, কোনো রোগী টোগী দেখতে এসেছে বোধহয়। পরে নার্সকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, নীরা অ্যাবোরশন করাতে চায়।

অ্যাবোরশন কোথায় করে। কিভাবে কী করতে হয়। কত টাকা লাগে হেনতেন নাকি জিজ্ঞেস করছিল।’

অন্তু ভদ্রমহিলার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, কথা খুঁজে পেল না। ভদ্রমহিলা গলার স্বর আরও একটু নামিয়ে বলল,‘ কোনো সমস্যা টমস্যা হয়েছে নাকি বাবা? আজকালকার বউদের একটু ছুঁকছুঁক স্বভাব থাকে। শুনেছিলাম তোমার

বউয়ের নাকি অন্য এক জায়গায় বিয়ে ভেঙেছিল? অন্য...’

বাকি কথাগুলো যেন কান পর্যন্ত পৌঁছাল না তার। অবাক চোখে ভদ্রমহিলার থলথলে মুখের দিকে চেয়ে রইল অন্ত। একটা মানুষ মুখের উপর এত নির্লজ্জ কথাবার্তা কিভাবে বলতে পারে, তা যেন বুঝে আসল না তার। প্রচন্ড রাগে শরীরটা রি রি করে উঠল। ভদ্রমহিলা অন্তর

লাল চোখ, আর থমথমে মুখ দেখে থেমে গেলেও অন্তুর রাগ থামল না। মাথাটা ধপধপ করতে লাগল। মনে জাগতে লাগল একটিই প্রশ্ন,‘ নারী প্রেগন্যান্ট? নীরা অ্যাবোরশন করাতে চায়? এতোকিছু হয়ে গেল অথচ ওকে একটিবার বলার প্রয়োজন মনে করল না? আশ্চর্য!’

শীতের দুপুরের মতোই ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হতে লাগল

অন্তর রাগ,জেদ। মাথাভর্তি দুর্দমনীয় রাগ নিয়েই বাড়ি ফিরল অন্ত। জাহানারা বেগম দরজা খুলতেই ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়ল,

‘ আম্মা নীরা কই?’

জাহানারা বিরক্ত চোখে তাকালেন, জবাব দিলেন না। অন্ত ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মনেপ্রাণে চাইতে লাগল, নীরা যেন বাসাতেই থাকে। সেই মহিলার সকল কথা যেন মিথ্যে

হয়। অকাট্য মিথ্যে! বসার ঘরে নীরাকে না দেখে নিজের ঘরে গেল অন্ত। ঘরে না পেয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।‘ আম্মা নীরা কই?’

জাহানারা এবারও উত্তর না দেওয়ায় রাগটা আর ধরে রাখতে পারল না অন্ত। কেবিনেটের উপর থাকা তরকারির বাটি, থালা সবই আছড়ে ফেলল মেঝেতে। প্রচন্ড ঝনঝন

শব্দে চমকে উঠলেন জাহানারা। হলুদ গুঁড়োর কৌটাটা হাতের কাছে পেয়ে সেটাও ছুঁড়ে ফেলল অন্তু। তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ তুলে ভেঙে গেল কাচের বয়াম। রান্নাঘর জুরে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচা হলুদ গুঁড়ো। অন্তু উঁচু কন্ঠে বলল,

‘ কখন থেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি? ঠিকঠাক জবাব দিতে পারো না? নীরা কই? বাসায় নাই কেন?’

জাহানারা ছেলের দিকে শান্ত চোখে চেয়ে থেকে ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললেন,‘ তোর বউ কই গেছে ওইডা আমারে জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি তোর বউয়ের কামলা খাটি? তোর বউ কই কই যাইতাছে তার লিস্ট রাখতে হবো এখন আমার? তোর বউ তুই সামলাতে পারছ না? সেই সকাল বেলা এক ঘন্টার নাম কইরা বের হইছে। এখনও ফেরার নাম গন্ধ

নাই। দুইদিন ধরে নাকি শরীর খারাপ লাগে। এটা খাইতে পারে না, ওটা খাইতে পারে না। ভাত খাইতে মন চায় না। কাজ করতে মন চায় না। এখন বাইরে ঢিং ঢিং করে ঘুরাতাছে কেমনে? এইটা তার শরীর খারাপের নমুনা? তোর বউয়ের তো রঙ ঢঙের অভাব নাই। রঙ ঢঙ করতে গেছে।’

অন্তু প্রত্যুত্তর করল না। ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় লাথি দিয়ে চেয়ারটা উল্টে ফেলল শুধু। জাহানারা শান্ত চোখে ছেলের কর্মকান্ড দেখলেন। নীরা যখন বাড়ি ফিরল তখন সব শান্ত। বাড়িতে কোনো হৈ-চৈ নেই। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। নিঝুম দুপুরে ঘুমন্ত পুরীর মতোই নিস্তব্ধ সব। অয়ন দরজা খুলে দিয়েই নিজের ঘরে দোর দিল। বসার ঘর ফাঁকা।

জাহানারারও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় বুকটা কেমন ধুকপুক করে উঠল নীরার। এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। বিছানার উপর অন্তকে বসে থাকতে দেখেই চমকে উঠল সে। অন্তর তো এখন ফেরার কথা না! নীরা ভয়ে ভয়ে অন্তর দিকে তাকাল। অন্ত আগের মতোই

বসে আছে। চোখ-মুখ শান্ত, থমথমে। নীরাকে দেখতে পেয়েই বলল,‘ কোথায় গিয়েছিলি?’

নীরা থতমত খেয়ে গেল। ঘামতে লাগল কপাল। আমতা আমতা করে বলল,

‘ ন ন নমুর বাসায় গিয়েছিলাম। আন্টি না খেয়ে আসতেই দিল না।’

অন্তু হেসে বলল,

‘ আচ্ছা?’

নীরা ঢোক গিলল। ঠোঁটে হাসি টানার চেষ্টা করে মাথা নাড়ল। অন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

‘ হাতে এগুলো কী? নমুর বাসা থেকে আনলি বুঝি? দেখি।’নীরা চমকে হাতের দিকে তাকাল। বাম হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের উপরের ঘাম মুছে অসহায় চোখে তাকাল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল। তার আগেই

আল্ট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টটা ছিনিয়ে নিল অন্তু। নীরা কপালের ঘাম মুছে ভয়ে ভয়ে তাকাল। অন্তু গোটা রিপোর্টটা মন দিয়ে পড়ল। ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ প্রগন্যান্সি পজিটিভ!’

কথাটা বলে নিজস্ব ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টাল অন্তু। রিপোর্টটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে খুব স্বাভাবিক কন্ঠে বলল,

‘ তোহ! অ্যাবোরশন কমপ্লিট ম্যাম?’
নীরা চমকে উঠে বলল,‘ মানে?’
অন্তু এবার চোখ তুলে তাকাল। অন্তুর রক্তলাল চাহনী দেখেই আত্মা কেঁপে গেল নীরার। অন্তু রিপোর্টটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে নীরার কাছাকাছি দাঁড়াল। শীতল কণ্ঠে বলল,
‘ বাচ্চাটা কার? আমার না?’
নীরা হতভম্ব কণ্ঠে বলল,

‘ এটা কোন ধরনের প্রশ্ন?’

‘ বাচ্চাটা যেহেতু আমার সেহেতু তার সম্পর্কে জানার অধিকার সর্বাপেক্ষা আমার, তাই না?’

নীরা উত্তর দিল না। অন্ত তার ডানহাতের বাহু খামচে ধরে বলল, ‘ তোর সাহস কীভাবে হলো আমাকে না জানিয়ে আমার বাচ্চা মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার? সমস্যা কী তোর? ওকে মারতে চাস কেন? ওহ,

বদলা নিচ্ছিস? তোকে জোর করে বিয়ে করেছি বলে বদলা?’

নীরার চোখ টলমল করে উঠল। অন্তর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল,

‘ ও আমারও বাচ্চা অন্ত।’

অন্ত দাঁতে দাঁত চেপে বলল,‘ তোর বাচ্চা? অসম্ভব। তোর বাচ্চা হয় কী করে? তোর বাচ্চা হলে তো অ্যাবোরশনের চিন্তা মাথায় আসতো

না। আসলে তোর সমস্যাটা কোথায়? আমার বাচ্চা জন্ম দিতে সমস্যা? এতোই যদি সমস্যা তাহলে বিয়ে করেছিস কেন আমাকে? আমার কাছে আসার জেদ তো তোরই বেশি ছিল। তখন মনে হয়নি এসব?'

নীরার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অন্তকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতেই অন্তর পা গিয়ে লাগল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। অন্তর রাগ

বেড়ে গেল। নীরার ডানহাতটা মোচড়ে ধরে বলল,

‘ কথায় কথায় হাত চলে কেন এত? মানা করছি না?’

নীরা ব্যথায় ককিয়ে উঠল। ডুকরে কেঁদে উঠে বলল,

‘ ব্যথা পাচ্ছি।’অন্ত তৎক্ষনাৎ হাত ছেড়ে দূরে সরে দাঁড়াল। নীরার কান্না দেখে রাগ বেড়ে যেন আকাশ ছুঁলো। প্রচন্ড রাগে লাথি দিল ড্রেসিং

টেবিলের ড্রয়ারে। ড্রেসিং টেবিল থরথর করে কাঁপতে লাগল। টেবিলের উপর থাকা ফুলদানিটা ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠে বলল,

‘ খবরদার কাঁদবি না। চুপ! একদম চুপ!’

নীরা দুই হাতে মুখ চেপে ফুপিয়ে উঠল। রেগে গেলে অন্তর মাথা ঠিক থাকে না। এই মুহূর্তে নীরার কোনো কথায় সে বুঝবে না। বুঝার চেষ্টা

করবে না। শান্ত অন্তু যতটা বুঝদার, যত্নশীল। অশান্ত অন্তু ততটাই অবুঝ, ভয়ানক। নীরা ভয়ার্ত চোখে চেয়ে এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দেখতে লাগল। অন্তু হঠাৎ তার দিকে তেড়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। তাকে আগাগোড়া নিরক্ষণ করে বলল,‘ অ্যাবোরশনের জন্য কোনো ঔষধ টৌষধ খেয়েছিস? কোনো স্টেপ

নিয়েছিস? ও আছে নাকি মরে গেছে নীরু?’

অন্তর শেষ কথাটা খুব অসহায়ের মতো শুনাল এবার। নীরা কাঁপা কণ্ঠে বলল,

‘ আছে। ও ঠিক আছে। কিছু করিনি আমি।’

অন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ সত্যি?’

নীরা মাথা নাড়ল। অন্তু পরমুহূর্তেই হুঙ্কার দিয়ে বলল,

‘ কিছু করিসনি! যদি কিছু করে ফেলতি তখন কী হতো?’

কথাটা বলেই খুব শক্ত করে বাহু চেপে ধরল অন্তু। নীরা অসহায় চোখে তাকাতেই গাল চেপে ধরে ভীষণ ক্রোধ নিয়ে বলল,‘ আজ যদি কোনো অঘটন ঘটে যেত, আমি তোকে খুন করে ফেলতাম নীরু।

বাচ্চা আমার অথচ তুই বাচ্চার জীবন মরণ নিয়ে আলোচনা করিস অন্য লোকের সাথে? বুক কাঁপে না? কাঁপে না বুক?’

ছেলের ঘরে অত্যাধিক চেঁচামেচিতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন জাহানারা। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ভয়ে জড়োসড়ো অয়ন। ছেলেকে এই অবস্থায় দেখে কয়েক সেকেন্ড বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইলেন জাহানারা।

পরমুহূর্তেই দুই ঘা বসিয়ে দিলেন ছেলের পিঠে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

‘ এই হারামির বাচ্চা! বউয়ের গায়ে হাত তুলিস। এতো সাহস! বাপের থেকে শিখছিস এগুলো? হ্যাঁ! বাপের থেকে শিখছিস? বের হ আমার বাড়ি থেকে। বের হ।’

অন্তু নীরাকে ছেড়ে দিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ যাদের কাছে গিয়েছিলি তাদের কাছেই যা। আমার সাথে থাকার দরকার তোর নাই। মেইন পয়েন্ট হলো, আমাকেই তোর দরকার নাই।’

জাহানারা বেগম চেঁচিয়ে উঠে বললেন,‘ এই হারামির বাচ্চা তুই বের হ। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে তুই বউয়ের গায়ে হাত তুলিস। কুলাঙ্গার। বের হ তুই।’

এতো চিৎকার চেঁচামেচিতে মাথা চেপে ফ্লোরে বসে পড়ল নীরা। অন্তু রাগ করে বাসা থেকে বেরিয়ে যেতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নীরা। পৃথিবী সমান দুঃখগুলো ভেসে উঠল তার আর্ত চিৎকারে। জাহানারা বেগম এই প্রথমবারের মতো নীরার মাথায় হাত রাখলেন পরম স্নেহে। হঠাৎ করেই পাশের মানুষটিতে নিজের মাকে দেখতে পেল নীরা।

নীরার কান্না বেড়ে গেল। ঘেমে নেয়ে আচ্ছন্নের মতো কাঁদতে লাগল সে। অন্তু, নম্রতার প্রতি জন্মাল রাজ্যের ক্ষোভ। কেন এতো রাগ অন্তুর? কেন এতো জেদ? একটুও কী বুঝার চেষ্টা করা যায় না? নম্রতায় নিশ্চয় বলেছে সব? আর তো কেউ জানত না। এর আগেও ভালোবাসার কথাটা জানিয়ে দিয়েছিল নম্রতা। এবারও জানাল। না জানালে কী চলত না?

ও কী জানে না, অন্তু কতটা ডেস্পারেট? একটুতেই মাথা গরম করা ছেলে? তবুও কেন জানাল সে? প্রতিবারই নীরার সুখ-সংসার এভাবেই কেন জ্বালিয়ে দেয় সে? কেন?সেদিন রাতে আর বাড়ি ফিরল না অন্তু। সবটা শোনার পর জাহানারা বেগমও হ্যাঁ, না কিছু বললেন না। তার চেহারায় উচ্ছ্বাস যেমন দেখা গেল না। তেমনই দেখা

গেল না কোনো বিষণ্নতা। নিজের মতো রান্নাবান্না সারলেন। ঘরের কাজ গোছালেন। কিন্তু পরেরদিন সকালেই নীরাকে অবাক করে দিয়ে, নীরাকে বগলদাবা করে পৌঁছে গেলেন হসপিটালে। বাচ্চা ঠিক আছে কি-না চেকআপ করালেন। নীরা ভীষণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল শুধু। জীবন কখনোও রূপকথা হয় না। সুন্দর সকাল গুলো সবসময়ই স্বপ্নের

মতো রঙ মাখায় না। প্রিয় মানুষগুলো রঙ পাল্টায়। দূরত্ব বাড়ে। হঠাৎ করেই খুব দূরের বনে যায়। হয়ে যায় অপরিচিত। অভিমান বাড়ে। মান-অভিমানের পাল্লায় হারিয়ে যায় সম্পর্কের সুতো। হাসাপাতালের সামনে ঠিক এমনই এক সময়ে এসে দাঁড়াল দুই বন্ধু। নীরব অভিমান নামক ধারালো ছুরির আঘাতে আচমকায় কেটে গেল সেই

সুতো। ছেঁড়া সুতোর এক কোণা ধরে কেউ একজন হতবিহ্বল কান্নায় ভেঙে পড়ল, তো কেউ অভিমানের পাল্লা নিয়ে রিকশায় হুড তুলল। কমলা রঙের দুপুরটা দাঁড়িয়ে রইল নির্বিকার। দুপুরের চোখে জল নেই। সে বুঝি জানতো এসব হবে? নম্রতা ভীষণ ক্ষোভ নিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দুপুরটাকে দেখল। ঝুড়ি ভর্তি অভিমান নিয়ে নীরব মাথা রাখল

আরফানের বুকে।নম্রতার বিয়ের তখন দিন তিনেক বাকি। হাসপাতালের ফটকের কাছে আরফানের অপেক্ষায় ছিল সে। বিয়ের আগে উদ্দাম ঘুরে বেড়ানোর আজকেই শেষ সুযোগ। নম্রতার জেদের কাছে কাজকর্মে সাময়িক অব্যহতি দিয়ে আরফানও রাজি। হঠাৎই ফটকের কাছে নীরাকে

দেখতে পেয়ে ছুটে গেল নম্রতা। চোখে-মুখে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল,

‘ নীরু! তুই এখানে? চেকআপ করতে এসেছিলি?’

নীরা অসন্তোষ চোখে তাকাল। নম্রতার হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে জোরপূর্বক উত্তর দিল,

‘ হু।’

নীরার বিরক্তিকে খুব একটা পাত্তা দিল না নম্রতা। চির পরিচিত

চঞ্চলতা নিয়ে মুখ ফুলাল। রাগ নিয়ে বলল,‘ কাল থেকে ফোন দিতে দিতে অস্থির হয়ে গেলাম তবু তোর খোঁজ নেই। ফোন কই রাখিস তুই?’ পরমুহূর্তেই গলার স্বর নিচু করে বলল,

‘ আচ্ছা? অন্তু তোকে কাল অ্যাবোরশন নিয়ে খুব বকাঝকা করেছিল নাকি রে? জানিস আমাকে...’

নম্রতার কথার মাঝপথেই অয়নের হাত চেপে ধরে রিকশা ডাকল নীরা। রিকশাতে উঠার প্রস্তুতি নিতেই আবারও খপ করে হাত চেপে ধরল নম্রতা। খানিকটা অবাক হয়ে বলল, ‘ আরেহ! কথার মাঝে কোথায় চললি?’

নীরা বিরক্ত কণ্ঠে বলল,‘ আমার কথা বলার সময় নেই। সামনের

এক ফার্মেসীতে শাশুড়ী মা আপেক্ষা করছেন। যেতে হবে।’

নম্রতা জেদ ধরা কণ্ঠে বলল,

‘ উহু। এখন কোথাও যাওয়া টাওয়া হবে না তোর। কত কথা জমে আছে জানিস? অয়নকে পাঠিয়ে দে। আমি আন্টিকে ফোন দিয়ে অনুমতি নিচ্ছি। খালামণি হয়ে যাচ্ছি এই খুশিতে একটা উপহার তো তোকে দেওয়া চাইই চাই। বাসায় গিয়েই ঢাক-ঢোল

পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছি সবাইকে। আম্মু কত খুশি হয়েছে জানিস? আজ তোর প্রিয় খাবারগুলো হেল্থি হেল্থি উপায়ে রান্না চলবে বাসায়। প্লিজ, বাসায় চল। প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!’

নীরা ঝাটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,

‘ তোর এসব ঢং আরফান ভাইয়ের সামনে গিয়ে কর নমু। আমার

সামনে না। উনার তোকে বাচ্চাদের মতো প্যাম্পার করার ধৈর্য থাকলেও আমার নেই। সবাই তো আর আরফান ভাইয়ের মতো নয় যে তোকে খুশি করার জন্য যা চাইবি তাই করবে।’

নম্রতা অবাক হয়ে বলল,‘ আমাদের কথার মাঝে নিষ্প্রভকে কেন টানছিস নীরা?’

‘ কেন টানব না? সোনায় সোহাগায় ভালোবাসার মানুষ পেয়েছিস। তাকে পেয়েই তো চারপাশের মানুষের সুখ-শান্তি সহ্য হচ্ছে না। পা দুটো আকাশে নিয়ে ঘুরছিস। অন্যের জীবন অগোছালো করার নিরন্তর অবসরও পেয়ে যাচ্ছিস। উনি নিশ্চয় বাহবা দিচ্ছেন? দেওয়ারই কথা। উনি তো আবার তুই বলতে অন্ধ।’

নম্রতা ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে রইল। প্রচন্ড বিস্ময় নিয়ে বলল,
‘ পাগল হয়ে গিয়েছিস তুই? কী সব বলছিস? কিছু বলার হলে আমাকে বল। বারবার ওকে কেন টানছিস?’
নীরা প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে বলল,‘ তোর ‘ওকে’ টানার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। শুধু বলব, আমার থেকে দূরে থাক। আমার সামনে এসব নাটক, ফাটক, ন্যাকামোর

প্রয়োজন নেই। আমার জীবনের এতোসব সমস্যার মূলীভূত কারণটা একমাত্র তুই-ই নমু। এখন আর সহ্য হচ্ছে না, আমি ক্লান্ত। বিয়ের আগে গোপন কথাগুলো বলে ঝামেলা পাকিয়েছিস। বিয়ের পর বাচ্চার কথা। আমাকে নিয়ে এতো ভাবতে কে বলেছে তোকে? আমি বলেছিলাম? কে বলেছে এতো ভালো করতে আমার? আমার ভালো আমি

বুঝি। দয়া করে আমার ভালো বুঝাটা বন্ধ কর। তার আগে অন্তর সাথে যোগাযোগটা বন্ধ কর। খবরদার ওর সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ রাখবি না তুই। সবারই সহ্যের সীমা থাকে নমু। তোরা সবাই মিলে জীবনটা নরক করে তুলেছিস আমার। তোর মতো পেট পাতলা বন্ধু থাকতে শত্রুর কী কাজ? বিশ্বাসঘাতক।’নম্রতা

হতবিহ্বল চোখে চেয়ে রইল। নীরার কঠিন কঠিন কথাগুলো মস্তিষ্কে বলের মতো ঢপ খেতে লাগল বরংবার। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। নীরা তাকে এভাবে বলতে পারল? এতো নিষ্ঠুরভাবে? নম্রতা নিজেকে ধাতস্থ করে নীরাকে বুঝানোর চেষ্টা করল। ঠিক তখনই হাসপাতালের গেইটের কাছে আরফানকে দেখতে পেল নীরা।

আরফান নীরাকে দেখে মৃদু হাসল। নীরার চোখে মুখে তখন রাজ্যের বিরক্তি। নম্রতা নীরার হাতটা আবারও ধরতেই অপ্রত্যাশিত এক কাজ করে বসল নীরা। নম্রতার হাতটা প্রচন্ড ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে রিকশার দিকে এগিয়ে গেল। নম্রতাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রিকশার হুড তুলল। হঠাৎ নীরার এমন ব্যবহারে থমকে দাঁড়াল আরফান।

ভ্রু কুঁচকে নম্রতার দিকে তাকাল। নম্রতা কনুই চেপে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা ধাক্কা দেওয়ায় ডানহাতের কনুইটা লেগেছে চলতি রিকশার হুডে। চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে। আরফান নম্রতার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল,

' হাতটা নাড়ানোর চেষ্টা করুন নম্রতা। চামড়া কেটে গিয়েছে।

শীতের দিন এই ব্যথাটুকুই কতো ভোগাবে জানেন?'

নম্রতা উত্তর দিল না। আরফান ধমক দিয়ে বলল,' আপনাকে বলেছিলাম না গাড়ির কাছে দাঁড়াতে? এখানে কেন এসেছেন? বিয়ের দিন "হাত ব্যথা" "হাত ব্যথা" করে চিল্লাবেন তো খবর আছে। সম্পূর্ণ হাত কেটে দিয়ে আসব।'

নম্রতা ছলছল চোখে চাইল। কনুইয়ের ব্যথার থেকেও পীড়াদায়ক এক ব্যথা ফোটে উঠল তার চোখে-মুখে। আরফান নরম কণ্ঠে বলল, ‘ আপনি দাঁড়ান। আমি গাড়িটা আনছি। ড্রেসিং করতে হবে হাতে।’নম্রতা উত্তর দিল না। নীরার কথাগুলো এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। সবকিছু কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে। নীরার পক্ষেও এভাবে কথা

বলা সম্ভব? সত্যিই সম্ভব? আরফান গাড়িটা পাশে দাঁড় করিয়ে দরজা খুলে দিল। নম্রতা চুপচাপ গাড়িতে গিয়ে বসল। আরফান দরজাটা লাগিয়ে সিট বেল্ট বেঁধে দিতেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল নম্রতা। আরফান সিট বেল্ট বাঁধতে বাঁধতেই চোখ তুলে তাকাল। নম্রতাকে কাঁদতে দিয়ে ডানহাতটা কাছে টেনে ড্রেসিং করল। ব্যান্ডেজটা লাগিয়ে

দিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। ড্রাইভিং হুইলে এক হাত রেখে চুপচাপ চেয়ে রইল নম্রতার মুখে। নম্রতা যখন কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলে ফেলল তখন হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিল তাকে। খোলা চুলে আলতো হাত বুলাতে বুলাতে বলল,‘ আর কত কাঁদে? ইট’স ওকে। বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য হলে এতো কাঁদতে হয়?’

নম্রতা উত্তর দিল না। বার কয়েক হেঁচকি তুলে বলল,
‘ স্কুল লাইফ থেকে এখন পর্যন্ত যতটা সম্ভব হয়েছে নীরার পাশে থাকার চেষ্টা করেছি আমি। নীরার যখন পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনও একা, একমাত্র ওর পাশে ছিলাম আমি। মানছি, ওর অনুভূতির কথা বলে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। কিন্তু কথাগুলো বলে

দিয়েছিলাম বলেই তো একে অপরকে পাওয়ার স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে ওদের। নীরা কীভাবে অতগুলো কথা শুনাতে পারল আমায়? ওর কী একটুও কষ্ট হলো না? এতোদিনের বন্ধুত্বকে চোখের পলকে বিশ্বাসঘাতক বলে ফেলল? ও কীভাবে বলতে পারল, আমি যেন অন্তুর সাথে যোগাযোগ না রাখি? অন্তু কী আমার বন্ধু নয়? কাল রাতে

অন্তুও ফোন দিয়ে কতগুলো কথা শুনিয়ে দিল। বকাবকি করল। নীরার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারে জেনেও কেন তাকে জানাইনি ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা আমাকে পেয়েছেটা কী?’

আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হাসার চেষ্টা করে বলল,‘ আপনি তো জানেনে, নীরা প্রেগন্যান্ট। কনসিভ করলে মুড সুয়িং হয়। মেজাজ খারাপ থাকে। নীরাও হয়তো

আপসেট ছিল। এই সময় কী এতো ভেবেচিন্তে কথা বলে? আপনি ফ্রেন্ড হয়েই যদি রাগ করে বসে থাকেন তাহলে কীভাবে হবে? ওর মানসিক অবস্থাটাও তো বুঝতে হবে তাই না? নীরা নিশ্চয় ইচ্ছে করে বলেনি। হয়ে গিয়েছে, ইট'স ওকে। আর কান্নাকাটি করে নারে বাবা।'

' আপসেট থাকলেই এমন হার্ট করে কথা বলতে হয়? আমি তো কখনও

বলি না। তবু মানলাম ওর মন খারাপ ছিল। আমাকে যা ইচ্ছে বলেছে। বলার অধিকার আছে। কিন্তু শুধু শুধু আপনাকে টেনে কথা কেন বলল? আমি তো কখনও অন্তুকে টেনে কিছু বলি না।'

আরফান এবার হেসে ফেলল। নম্রতা চোখ মুছে সরে বসল। কপট রাগ নিয়ে বলল,

‘ একদম হাসবেন না। হাসার মতো কিছু হয়নি। ও বলে, আপনি নাকি... ‘

নম্রতাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরফান। নম্রতার আহত হাতটা আলতো করে নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল,‘ আপনার বন্ধু আমাকে নিয়ে আপনাকে কী বলেছে সেটা আপনার আর আপনার বন্ধুর ব্যাপার। সেখানে আমি কেউ

নই। অন্যের বলা কথা তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে আমি শুনব না। নীরার শুনানোর হলে আমার সামনেই বলত। সে যেহেতু শুনাতে চাইনি সেহেতু আপনি বলবেন না। আমিও শুনব না। এতে নীরাকে অসম্মান করে হবে। আর আমার শ্যামলতা কাউকে অসম্মান করে কথা বলতেই পারে না। তাই না?’

নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বলল,

‘ উহু, ভুল ধারণা। আপনার শ্যামলতা অত্যন্ত বেয়াদব। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না।’

আরফান ঠোঁট টিপে হেসে বলল,

‘ তা তো দেখলামই। ধাক্কা খেয়ে হাত কেটে বাচ্চাদের মতো কেঁদে ফেলেও কোনো প্রত্যুত্তর এলো না। মহারাণীর সব তেজ, অভিযোগ শুধু আমার সাথে।’

নম্রতা মন খারাপ করে বলল,

‘ আমি ভীষণ রেগে আছি। নীরা ‘সরি’ না বললে ওর সাথে একদম কথা বলব না।’

আরফান হাসল। মাথা এগিয়ে নম্রতার কপালে আলতো ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল,‘ আচ্ছা। বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি রাগ করতে নেই। তবে, অল্প অল্প রাগ করা যেতে পারে। আপনি বরং অল্প একটু রেগে থাকুন।’

নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বসে রইল, উত্তর দিল না। কিছুটা সময় নীরব কাটল। আরফান গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তা ধরেই প্রশ্ন করল,

‘ বাসর রাতে উপহার দেওয়া নাকি বাধ্যতামূলক নম্রতা? আমার এই বিষয়ে কোনো আইডিয়া নেই। আপনি বলুন, উপহারে কী চান?’

নম্রতা সিটে গা এলিয়ে উদাস কণ্ঠে বলল,‘ কী দিতে চান?’

‘ আপনি যা চাইবেন তাই।’

নম্রতা এক পলক তাকাল। স্থির চেয়ে থেকে বিড়বিড় করল,

‘ যা চাইব তাই?’

নম্রতা উত্তর না দেওয়ায় ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আরফান। ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ কী হলো? বলুন, কী চাই?’

‘ কিছু না।’

আরফান কপাল কুঁচকে বলল,

‘ কিছু না কেন?’

‘ উপহারটা তোলা থাকুক। আমি ভেবেচিন্তে চাইব।’

আরফান সন্দিহান চোখে চাইল। পরমুহূর্তেই হেসে বলল,

‘ আচ্ছা। রাজা উপহারটা তোলা থাকুক। সেটা যখন চাইবেন তখনই দেব। এখন একটা পেয়াদা উপহারের কথা বলুন নাহয়।’

নম্রতা কপাল কুঁচকে হাসল,‘ পেয়াদা উপহার আবার কী?’

আরফানের সাথে থাকা সময়টুকু হাসিখুশি কাটলেও বাড়ি ফিরেই মন খারাপ হয়ে গেল নম্রতার। রাতে থেকে থেকেই কান্না পেল। আরফান ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন দেওয়ার পরও মন ভালো হলো না। প্রচন্ড অভিমান নিয়েই শক্ত এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, বিয়েতে নীরার সাথে কথা

টথা কিছু বলবে না। চুপচাপ বসে থাকবে। ডাকলেও তাকাবে না। নম্রতার প্রতিজ্ঞা বেশিক্ষণ টিকল না। নম্রতাকে অবাক করে দিয়ে অন্তু-নীরা বিয়েতেই এলো না। নাদিম নিরুদ্দেশ। ছোঁয়া, রঞ্জন ভিডিও কলে শুভেচ্ছা জানালেও অন্তুর ফোনটা এলো বিয়ের দিন সকালে। ভীষণ মন খারাপ কণ্ঠে বুঝাল, ‘ কিছুদিন আগে চাকরীর পরীক্ষা দিয়েছিল তার

ইন্টারভিউ কার্ড এসেছে। ইন্টারভিউ ডেইট আজই। ইন্টারভিউ রেখে বিয়েতে যাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে নীরাও অসুস্থ। ওকেও একা বিয়েতে যেতে দিতে পারছে না। নম্রতা যেন রাগ না করে।'প্রায় সাথে সাথেই রাগ নিয়ে ফোন কাটল নম্রতা। তার বারবার মনে হতে লাগল, ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ কিছু নয়। নীরার সাথে ঝগড়া হয়েছে বলেই আসছে না

ওরা। পুরো বন্ধুমহলের প্রতি ক্ষোভ জন্মাল নম্রতার। সবচেয়ে ক্ষোভ জন্মাল নাদিমের উপর। হঠাৎ কেন হারিয়ে গেল সে? ছোঁয়ার বিয়েতে নাদিম বলেছিল, নম্রতার বিয়েতে মোটা অঙ্কের টাকা উশুল করবে সে। সেই টাকা ভাগাভাগি করা নিয়েই বন্ধুদের মধ্যে কত বাকবিতণ্ডা হয়েছিল সেদিন! একদম বন্ধুহীনভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল

নম্রতার। আরফানের চেষ্টায় মন খারাপ ভাবটা তাড়া না করলেও অভিমান-অভিযোগে একবিন্দু ছাড় দিল না নম্রতা। রাগ করে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করল। নীরা-অন্তর খোঁজ টোজও রাখল না আর। কঠিন সিদ্ধান্ত, কারো সাথে কথা টথা বলবে না। একদম না।নম্রতার বিয়ের পরে সময়গুলো যেন হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগল। হাওয়াই

মিঠাইয়ের মতো মিলিয়ে যেতে লাগল সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা। নতুন সংসার সামলানো। নতুন সম্পর্কেগুলোতে মানিয়ে নেওয়া এসবেই কেটে গেল বেশ কয়েক মাস। এসবের মাঝে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগটা আর রইল না। সবাই সবার মতো ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা আর এক ঝাঁক অভিমানে নম্রতাও যোগাযোগের চেষ্টা করল না। বিয়ের

প্রায় চার-পাঁচ মাস পর মাস্টার্সের ক্লাস জয়েন করতে গিয়ে হঠাৎ এক খবরে থমকে গেল নম্রতা। পরিচিত এক ক্লাসমেটের কাছে জানতে পারল, নীরার বাচ্চাটা বেঁচে নেই। প্রেগন্যাসির বিশ-বাইশ সপ্তাহেই মিসক্যারেজ হয়ে গেছে তার। অন্ত-নীরা কেউই এখন ঢাকায় নেই। অন্তর চাকরিটা চট্টগ্রামে। নীরাকে নিয়ে সেখানেই তার বাস। প্রায় এক

দুই মাস আগে চট্টগ্রামের এক মার্কেটে দেখা হয়েছিল তাদের। পুরো খবরটা শুনে মনটা ভেঙে গেল নম্রতার। বুকের কোথাও চিনচিনে ব্যথা করে উঠল! বুক বেয়ে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস। এক সময়কার মজবুত সম্পর্কগুলো চোখের সম্মুখেই শিথিল হয়ে এলো। ছিঁড়ে গেল সুতো। আঁকড়ে ধরার চেষ্টাটা আর রইলো না। ব্যস্ততা, বাস্তবতা

আর মান-অভিমানের করাঘাতে জীবনের কোমল ধারাগুলো অচেনা সাগরে ডুব দিল । মিশে গেল অতলে....রাত এগারোটা কী বারোটা বাজে। আষাঢ় মাস। চারদিক অন্ধকার করা বৃষ্টি। শহরজুড়ে লোডশেডিং। ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলছে না। রাস্তায় হাঁটু পানি জল। পথঘাট ফাঁকা। গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া দুষ্কর। এমন আষাঢ়ে নিঝুম রাতে

রিকশায় বসে আছে আরফান। রিকশার পাতলা কাগজ জড়িয়েও লাভ বিশেষ হচ্ছে না। হাতের ঘড়ি, ফোন সব ভিজে একাকার। ভেজা চুল থেকে টুপটাপ জল গড়াচ্ছে। রিকশা চালক উদ্দাম গতিতে ছুটছে। আশেপাশে কিছু দেখছে বলে মনে হচ্ছে না। আধা হাত জলে ঢাকা রাস্তায় টর্চ লাইটের অল্প আলোতে কীভাবে রাস্তা নির্ধারণ করা হচ্ছে

জানা নেই আরফানের। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঝড়ের গতি বাড়ছে। যেকোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তিনগুণ টাকা দিয়ে ভাড়া করা রিকশাটা ছিটকে গিয়ে পড়তে পারে বিশাল কোনো নর্দমায়। আরফান কপাল কুঁচকে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল, দেখা যাচ্ছে না। ঘড়িটা এখনও ঠিকঠাক সময় দিচ্ছে কী-না সেও ভালো বুঝা যাচ্ছে না। রিকশা

চালকের বয়স অল্প। ছটফটে কথা বলার অভ্যাস। ঝড়ের ঝাপটা পাড়ি দিতে দিতেই চেঁচিয়ে বলল সে,‘ এই ঝড়, বৃষ্টির রাইতে বাড়াইছেন ক্যান স্যার? আপনের জন্যে আমারও আইতে হইল। একটা ঠাডা পড়লেই কেল্লা ফতে। আজকাল বৃষ্টির থাইকা ঠাডার খবরই শুনি বেশি। এই ঝড়ের মধ্যে বাইর হওন উচিত হয় নাই।’

আরফান জবাব দিল না। তার কপাল কুঁচকে আছে। মাথায় চলছে অসংখ্য চিন্তা। তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হলো, নম্রতা। নম্রতা রাতে ভয় পায়। নিশ্চয় এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে ভয়ে সিটিয়ে আছে সে? মেয়েটা ভীষণ জেদী। ভয় পাবে তবু নিচে নামবে না। মায়ের কাছে বসবে না। ভয় নিয়েই আরফানের জন্য অপেক্ষা করবে। আরফান পৌঁছানোর

পর ইচ্ছেমতো রাগ দেখিয়ে মায়ের কাছে ঘুমোতে যাবে। নম্রতা কোথায় ঘুমাচ্ছে তা নিয়ে আরফানের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তার আসল মাথা ব্যথাটা নিজের ঘুম নিয়ে।বিয়ের পর ভীষণ বাজে একটা অভ্যাস হয়েছে তার। নম্রতা আশেপাশে না থাকলে ঘুম হয় না। হাসফাস লাগে। মন ছটফট করে। সকাল হতেই মাথা ভার। মেজাজ

খারাপ। প্রচন্ড হ্যাডেক। বিগত দুই বছরে সমস্যাটা তরতর করে বাড়ছে। এই নিয়ে, বিয়ের ছয় মাসের মাথায় বাজে একটা কান্ডও ঘটিয়ে ফেলেছিল আরফান। নম্রতা তখন বাবার বাড়ি থাকছে। আরফান প্রথম রাত ঠিকঠাক কাটাল। দ্বিতীয় রাতে নম্রতার সাথে চাপা রাগ দেখাল। তৃতীয় দিনে, রাত দুটোর সময় পৌঁছে গেল শ্বশুর বাড়ি।

নুরুল সাহেব হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মেহরুমাও বিস্মিত। বাড়ির জামাই মাঝরাতে বউ নিতে চলে এসেছে, কী আশ্চর্য! আরফান লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না। এদিকে নম্রতার হাসি থামে না। আরফানের সে-কি রাগ। আরফানের হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। আজও নিশ্চয় ভয়ানক রেগে আছে নম্রতা? গটগট করে মায়ের কাছে চলে যাবে

আবার? উফ, যন্ত্রণা! আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অশান্ত মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে বিরবির করল, প্রিয় অর্ধাঙ্গীনী, তোমাকে ছাড়া ঘুমটা আমার অসম্ভব টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি।আরফান যখন ভেজা জবজবে শরীরে বাড়ি পৌঁছাল তখন প্রায় একটা বাজে। ছাদের পটাতনে টলটলে বৃষ্টির পানি। ঝড়ের তালে তালে অল্প অল্প ঢেউ। অন্ধকার ছাদে

নূরের মতো আলো ছড়াচ্ছে অসংখ্য বেলীফুল। বৃষ্টিকন্যার আদর পেয়েই লজ্জাবতী কিশোরীর মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে কচি পাতা। ঝমঝমে, নিরন্তর বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে ঘরের চালা। ভীষণ অন্ধকারে এক টুকরো হলদে আলো ছড়াচ্ছে দেয়ালে টাঙানো হারিকেন। আরফান ছাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মুগ্ধ দৃষ্টিজোড়া গিয়ে পড়ল বারান্দার

দ্বারে। বারান্দার দ্বার ঘেঁষে, উদাসী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নম্রতা। হারিকেনের হলদে আলো এসে পড়ছে তার ডান গালে, অগোছালো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। আরফানের শরীর শিরশির করে উঠল। বৃষ্টিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। নম্রতা আগের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে রইল। ফিরেও তাকাল না। আরফান ভেজা জবজবে

শরীর নিয়ে বারান্দায় উঠে আসতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠল ডাকপাখি,‘কে তুমি? কে তুমি? পাজি! পাজি!’

আরফান হতাশ চোখে চাইল। ডাকপাখিটা আজকাল খুব বেয়াদব হচ্ছে। নম্রতা তাকে উদ্ভট উদ্ভট কথা শেখাচ্ছে। সেই কথাগুলো আরফানকে দেখামাত্রই উগরে দেওয়া হয়ে উঠেছে ডাকপাখির ভৃত্যগত দায়িত্ব। আরফান মাথাটা

হালকা ঝুঁকিয়ে আলতো ফু দিল নম্রতার কানে। আরফানের চেষ্টা ব্যর্থ হলো, নম্রতার সাড়া পাওয়া গেল না। আরফান ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে, ভেজা হাত বাড়িয়ে নম্রতার কপালের চুলগুলো কানের পাশে গুজল। ভিজে যাওয়া ডাক্তারী ব্যাগটা পাশে রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ খুব বেশি রেগে আছেন, ম্যাডাম?’

নম্রতা উত্তর দিল না। ডাকপাখি কী বুঝে বরংবার একই শব্দ আওড়াতে লাগল,

‘ মন খারাপ। মন খারাপ। মন খারাপ।’

আরফান ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। ডাকপাখি তার বিরক্তি ধরতে পারল বলে মনে হলো না। আরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,‘ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতের ডিউটি না

হলেও কাজ থাকে না বলুন? হঠাৎ ইমার্জেন্সি পড়লে তো পেশেন্ট রেখে আসা যায় না নম্রতা।'

নম্রতা উত্তর দিল না। আরফান আচমকা তার হাত টেনে নিজের দিকে ফেরাল। হালকা কাছে টেনে ভেজা হাতটা নম্রতার গালের উপর রাখল। ছোট্ট করে বলল,

' আমি সরি। আর হবে না। খুব বেশি ভয় পেয়েছিলেন?'

নম্রতা হাতটা সরিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই পেছন থেকে আঁচল টেনে ধরল আরফান। ভেজা শরীরেই দুই বাহু বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বলল,‘ এই মহারাণী? কথা বলছেন না কেন? বললাম তো, আর হবে না। ব্যারেস্টার সাহেবের মেয়েকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে সরি জানাচ্ছে এই মাসুম, নিরাপরাদ

ডাক্তার। এবারের মতো ক্ষমা করুন প্লিজ।’

নম্রতার মন গলল না। আরফানের শক্ত বাঁধন ছাড়িয়ে চুপচাপ ঘরে ঢুকে গেল সে। আরফান খুব ভালো করেই জানে, বউ আজ ঘরে থাকবে না। দেরী করার শাস্তি স্বরূপ ছাতা হাতে সুর সুর করে শাশুড়ীর ঘরে বিছানা পাতবে। আরফান দ্রুত ভাবার চেষ্টা করল। নম্রতা ছাতা

হাতে বেরিয়ে দেখল, আরফান নেই। বারান্দা পেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারেই আশেপাশে চোখ বুলাল। কোথায় গেল আরফান? নম্রতাকে চমকে দিয়ে আচমকাই পেছন থেকে পাঁজাকোলে তুলল আরফান। নম্রতার হাতের ছাতা সরে গেল। ঝমঝমে বৃষ্টিতে ভিজে গেল সারা গা। নম্রতা চোখ-মুখ কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল,‘

আরেহ! কী করছেন? নামান। ভিজে গেলাম।'

আরফান নম্রতাকে কোলে নিয়েই দুই একটা চক্কর দিল ছাদে। ছপছপ করে উঠল জমে থাকা জল। নম্রতা বেকায়দায় পড়ে ছাতা ফেলে দুইহাতে গলা জড়িয়ে ধরল। বৃষ্টির দাপটে চোখদুটো ছোট ছোট করে বলল,

' কী হচ্ছে?'

আরফান আচমকা চুমু খেল নম্রতার ঠোঁটে। নম্রতা অবাক চোখে চেয়ে রইল। এলোমেলো হয়ে গেল চিন্তা। আরফান ঠোঁট টিপে হাসল। দ্বিতীয় চুমুটা দিয়ে ফিসফিস করে বলল,

‘ আপনার জন্য টানা দেড় ঘন্টা ধরে বৃষ্টিতে ভিজছি ম্যাডাম। এতো সহজে ছেড়ে দেব, ভাবলেন কী করে? আজ সারারাত বর্ষণ চলবে। সহ্য করার দায় আপনার।’নম্রতা

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে হাত-পা ছুড়াছুড়ি জুড়ে দিল। দুই একটা শক্ত ধাক্কা লাগল আরফানের বুকে। তার বিদ্রোহী মন এতো সহজে হার মানবে? কিছুতেই না। নম্রতার বাচ্চামোতে হেসে ফেলল আরফান। নম্রতাকে নামিয়ে দিয়ে বিদ্রোহী হাতদুটোকে এক হাতে পিছুমোড়া করে চেপে ধরল আরফান। ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ এতো লাফালাফি করে লাভ নেই সুন্দরী। আপনাকে বাঁচানোর জন্য কোনো রাজকুমার ছুটে আসবে না। তার থেকে বরং রাজদ্রোহীকেই মেনে নিন। রাজদ্রোহীও কম সুদর্শন নয় মহারাণী। একটা সুযোগ অন্তত দিন।’

কথাটা বলে হাসল আরফান। নম্রতা ভাব নিয়ে বলল,‘ এতো সহজ?

মহারাণীকে মুক্ত করে তো দেখুন। রাজদ্রোহীর গর্দান যাবে।’

আরফান উত্তর দিল না। নম্রতার ভেজা জবজবে চুলগুলোতে আঙ্গুল বুলাল। চুলগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে গোছাল। দুই আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পাশের গাছ থেকে দুটো বেলীফুল তুলে এনে খুব যত্ন করে গুজে দিল নম্রতার কানের পাশে। আরও কিছু ফুল ছিঁড়ে নিয়ে আলতো চুমু খেলো

নম্রতার কপালে। নম্রতার হাতদুটো মুক্ত করে ভেজা চুলে একের পর এক ফুল গুজতে লাগল আরফান। কালো চুলগুলো শুভ্র ফুলে সাজাতে ব্যস্ত আরফানের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল নম্রতা। অসম্ভব সুন্দর চোখদুটোর কুঞ্চন, প্রসারণে বিমোহিত হলো দৃষ্টি। রাগ, অভিমান ধুয়ে গেল। অন্যরকম অনুভূতিতে ধুকপুক করে উঠল বুক। প্রেয়সীকে

মন মতো সাজিয়ে নিয়ে চোখ তুলে তাকাল আরফান। মিষ্টি হেসে চুমু খেল প্রিয়তমার চোখে। নম্রতা চোখ বোজল। ছাড়া পেয়েও নম্রতাকে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাঁকা হাসল আরফান। শিকার বস মেনেছে বুঝতে পেরে, ঘাড় নুইয়ে ফিসফিস করে বলল,‘ মুক্ত করেছি। গর্দান নিবেন না, মহারাণী?’

নম্রতা এক পলক চেয়েই মাথা নিচু করল। ভীষণ লাজুক মুখটি তুলে বলল,

‘ উহু। মহারাণী গর্দান নয়, বর্ষণ চাই।’

আরফানের হাসি বিস্তৃত হলো। ভেজা, শীতল হাতদুটো নম্রতার মসৃন কোমরের উপর রাখল। নম্রতাকে কাছে টেনে নিতে নিতে আষাঢ়ে আকাশের দিকে চাইল।

পরমুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে চোখ রাখল প্রিয়তমার চোখে। ফিসফিসিয়ে বলল, প্রেমময় বর্ষণ এতো সুন্দর কেন শ্যামলতা?ঘড়িতে দশটা বাজে। আরফান বিছানা ছেড়েছে প্রায় ঘন্টাখানেক হলো। অথচ নম্রতার খবর নেই। সারা বিছানাজুড়ে এলোমেলো ঘুমোচ্ছে। আরফান হাসপাতালের জন্য তৈরি হয়ে নম্রতার মাথার কাছে বসল।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ চেয়ে থেকে কাঁথা টেনে ঢেকে দিল নিরাবরণ গা। আরফান মাথা নুইয়ে জুতো পরতে পরতে নরম কন্ঠে ডাকল,

‘ নম্রতা? নম্রতা উঠুন। বেলা হয়েছে। মা নিচে অপেক্ষা করছে।’

নম্রতার সাড়া নেই। আরফান আবার ডাকতেই নড়েচড়ে উঠল নম্রতা। ঘুমঘুম কন্ঠে বলল,

‘ আরেকটু ঘুমাব, প্লিজ।’

‘ আপনার অফিস নয়টায়। এখন দশটা বাজছে। চাকরী থাকবে?’নম্রতা চোখ পিটপিট করে তাকাল। আলস্য নিয়ে উঠে বসে মৃদু হাসল। আরফানের জুতো পরা শেষ। নম্রতার মুখোমুখি পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। নম্রতার দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে থেকে মৃদু গলা খাঁকারি দিল

আরফান। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবারও চাইল। ভ্রু নাচিয়ে বলল,

‘ ব্যাপার কী?’

‘ ব্যাপার ভয়াবহ। ভাবছি চাকরীটা ছেড়ে দেব। চাকরী-বাকরী ভালো লাগছে না। দুই বছর চাকরী করে শখ মিটে গিয়েছে। ভাবছি কিছুদিন বরের টাকায় খাব। চলবে না?’

আরফান হেসে ফেলল। বিছানার পাশ থেকে সরে আয়নার সামনে

গিয়ে দাঁড়াল। টাই ঠিক করতে করতে নম্রতার দিকে তাকাল,‘ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত?’

নম্রতা আবারও হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁথায় নাক-মুখ ঢেকে আবারও উঁকি দিল বাইরে। ঠোঁট উল্টে অলস ভঙ্গিতে বলল,

‘ আপনি ট্রিপিক্যাল হাজবেন্ড হলে জেদ ধরে চাকরি-বাকরি করা যেত। মাও ট্রিপিক্যাল না। তাই চাকরি

করে মজা পাচ্ছি না। তার থেকে বরং ঘুমাই। গুড ফর হেল্থ।’

কথাটা বলেই চোখ বন্ধ করে ফেলল নম্রতা। আরফান টাই,চুল ঠিক করতে করতে আবারও নম্রতার দিকে তাকাল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে মাথা নুইয়ে নম্রতার কপালে হালকা চুমু দিতেই চোখ মেলে হেসে ফেলল নম্রতা। আরফান নম্রতার ডান গালে আলতো স্পর্শ করে

বলল,‘ ফ্রেশ হয়ে, খাওয়া-দাওয়া সেড়ে তারপর ঘুমোন। বেশিক্ষণ বিছানায় থাকবেন না। সাড়ে দশটার আগে খাবার খাওয়া চাই। আমি ঠিক এগারোটায় ফোন দেব। আসছি। আল্লাহ হাফেজ।’

নম্রতা মিষ্টি করে হাসল। আরফান বেরিয়ে যেতেই কাঁথায় চোখ-মুখ ঢেকে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিল সে। ঘুম হলো না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে অথচ ঘুম

আসছে না। মহা বিপদ। নম্রতা এপাশ ওপাশ করতে করতেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসল। হুট করে মনে পড়ে গেল ডাকপিয়নের কথা। আরফান নিশ্চয় চিঠি রেখেছে আজও? নম্রতার ঘুম ছুটে গেল। আরফানের চিঠি পড়ার লোভে দৌড়ে বিছানা ছাড়ল। আচ্ছা, কী থাকতে পারে চিঠিতে?‘শ্যামলতা,

ঘড়িতে এখন দুটো বেজে বিশ মিনিট। তীব্র ঠান্ডার রাত। রুম হিটারের বদৌলতে কুঁকড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে আছি কোনো রকম। বাইরে সন্ধ্যে থেকেই ভয়াবহ তুষারপাত। আলী আর এলিক্স কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি ঘুমোতে পারছি না। চোখ বোজলেই রাজ্যের সব কষ্টগুলো চেপে ধরছে বুক। শান্তি পাচ্ছি না। ভয় করছে। ভীষণ

ভয়। তোমার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার আজ সাতশো ষাট তম দিন। তোমার নামে তিনশো চার নাম্বার চিঠিটা লিখতে বসে বুঝতে পারছি, তোমাকে ছাড়া আসলে আমার চলবে না। এই যে চিঠি পাওয়ার পরও একটা বার আমায় ফোন করার প্রয়োজনবোধ করলে না, এই অভিমানটা আমি ধরে রাখতে পারছি না। পুরুষিত সব

ইগো পাশে রেখে বারবারই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, তুমি কী সত্যিই ভুলে গেলে আমায় শ্যামলতা? তাহলে আমি কেন পারছি না?আমার খুব একা লাগছে আজ। এই বিশাল পৃথিবীতে বড্ড অসহায় একজন। মাস খানেক হলো বাবা মারা গিয়েছেন। মা যখন ফোন দিয়ে বলল, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। ভিডিও কলে বাবার সাদা কাপড়ে

মোড়া সেই প্রতিচ্ছবিটা এখনও চোখে ভাসে। গায়ে কাটা দেয়। আমার বাবাটা কত অভাগা দেখ? শেষ সময়ে এসে দুই ছেলের কারো কাঁধেই ভর ছাড়তে পারলেন না। বাবা আমাকে অসংখ্যবার কাঁধে উঠালেও আমি বাবাকে কাঁধে উঠাতে পারলাম না।এই কষ্টটা যে কিছুতেই ভুলে যাওয়া যাচ্ছে না, শ্যামলতা। এই ভিনদেশটাকে হঠাৎ ভীষণ

বিষাক্ত ঠেকছে। অসহ্য ঠেকছে সব। বারবার মনে হচ্ছে, সব ছেড়েছুড়ে দেশে পাড়ি জমায় আবার। সেই দেশটাতে, যেখানে অপেক্ষায় আছে আমার অসহায় মা, অবুঝ নিদু আর তুমি। এলিক্সের ধারণা আমার এই চিঠি লেখা, অপেক্ষা এসব ভীষণ পাগলামো আলাপ। তবে আলীর মত ভিন্ন। সে তোমায় কী নামে ডাকে জানো? সে তোমায় বলে ‘ম্যাজিক

এঞ্জেল'। তার ধারণা তুমি আমার মন ভালো করার ম্যাজিক। এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর হুট করে একদিন ফিরে এসে আমার সব মন খারাপ ভাসিয়ে দেবার অভাবনীয় ম্যাজিক হবে তুমি। এই নিয়ে এলিক্স আর আলীর মাঝে সে-কী তর্ক!আচ্ছা? এলিক্স আর আলীর পরিচয়টা এর আগে দিয়েছিলাম তোমায়? আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। এলিক্স,

আলী আমার ভিনদেশী বন্ধু। এখানে এসেই পরিচয়। এলিক্স আমেরিকান আর আলী তুর্কিশ যুবক। দুজনেই বন্ধু হিসেবে দূর্দান্ত।’

এটুকু পড়ে থামল নম্রতা। আরফান ইউএস থাকাকালীন তার জন্য লেখা পুরাতন চিঠিগুলো পড়তে বরাবরই ভালো লাগে নম্রতার। মনে পড়ে যায় হাজারও স্মৃতি। কিন্তু আজ ভালো লাগছে না। হঠাৎ করেই ভীষণ মন

খারাপ লাগছে। আজকাল ভীষণ মুড সুয়িং-ও হচ্ছে। কখনও অযথায় ফুরফুরে লাগছে। কখনও-বা অযথায় কেঁদে কেটে চোখ ভাসাতে ইচ্ছে করছে। নম্রতা চিঠি হাতে বারান্দার দোলনায় ঠাঁই বসে রইল। বর্ষার শিরশিরে বাতাসে শীত শীত লাগছে। রাতভর বৃষ্টি হওয়ায় ঝকঝক করছে চারপাশ। নম্রতা আশপাশে চেয়ে আবারও কোলের

উপর রাখা চিঠির দিকে তাকাল। চিঠির পাতায় শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থম ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ। চোখ তুলে পাশে ঝুলানো ডাকপাখির খাঁচার দিকে চেয়ে বলল,‘ আমার ভীষণ মন খারাপ লাগছে ডাকপাখি। তুই জানিস? প্রচন্ড মন খারাপ হলে কী করতে হয়? প্রচন্ড মন খারাপ হলে কেঁদে ফেলতে হয়। তুই

আমাকে কেঁদে ফেলার মতো কোনো কষ্ট মনে করিয়ে দিতে পারবি?’

ডাকপাখি নম্রতার কথা বুঝলো-কী-বুঝলো না বুঝা গেল না। সে স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাতে লাগল,

‘ মন খারাপ। মন খারাপ। মন খারাপ।’নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ করেই চোখদুটো টলমল করে উঠল তার। সেদিন নীরার খবরটা

শুনেই থমকে গিয়েছিল নম্রতা। এতোবড় দূর্ঘটনা, শহর ছেড়ে যাওয়ার মতো এতোবড় ঘটনা তাকে জানানো হয়নি বলে মন খারাপ হলো। তার থেকেও মন খারাপ হলো, নীরার বাচ্চাটির জন্য। বাচ্চাটি কী তাদের এই মান-অভিমানের প্রগাঢ়তায় অভিমান করেই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত পাল্টাল? নম্রতা বাড়ি ফিরে সারাটা দিন ফোন হাতে

বসেছিল সেদিন। বারবার ডায়াল করতে নিয়েও ডায়াল করা হয়ে উঠেনি। ফোন দিয়ে কী বলবে সে? এতো বড় দূর্ঘটনার এতোদিন পর কী খবর নিবে নীরার? নীরা যদি ফট করে বলে ফেলে, বাচ্চাটা তো নষ্ট হয়েছে। এবার খুশি হয়েছিস? তবে কী সহ্য করতে পারত নম্রতা? সেদিন রাতে ঘুম হলো না নম্রতার। ডাকপাখির খাঁচাটা কোলে নিয়ে

বারান্দার দোলনাটাতেই বসে রইল সারারাত। তারপর কীভাবে কীভাবে যেন কেটে গেল প্রায় তিন তিনটি বছর। হাজারও অস্বস্তি, অনিশ্চিয়তার বেড়াজালে পরিচিত নাম্বারটিতে আর ডায়াল করা হয়ে উঠল না। নিরুদ্দেশ নাদিমকেও আর ফিরে পাওয়া হলো না। কোথায় হারিয়ে গেল ছেলেটা? নাদিম হারিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন বেশ

ভালোই যোগাযোগ রেখেছিল রঞ্জন। ওখানে থেকেই চেষ্টা করেছিল, চেষ্টা সফল হলো না। নাদিমকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নম্রতা তখনই অবাক হয়ে খেয়াল করল, নাদিমের দাদাবাড়ি বা আত্মীয় স্বজন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র তথ্য তাড়া জানে না। অন্তর বিয়ের সময় ‘বড়মামা’ নামে কারো কথা শুনেছিল কিন্তু সেই বড় মামার বসতি সম্পর্কেও কোনো রকম

সন্ধান তারা জানে না।রঞ্জনের ধারণা ময়মনসিংহের কোথাও হবে। কিন্তু ময়মনসিংহ তো ছোট শহর নয়। অতোবড় বিভাগ থেকে নির্দিষ্ট একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া আদৌ সম্ভব? তারওপর নাদিম সত্যিই সেখানে আছে কি-না তারই তো কেনো নিশ্চয়তা নেই। কীসের ভিত্তিতে খুঁজে বেড়াবে তারা? নাদিমের মুখে শুধু একজনের কথায় শুনা যেত। সে

হলো নাদিমের বোন। নাদিম কথার ফাঁকে মাঝে মাঝে বলত, তার একটা বোন আছে। কিন্তু সেই বোনের নাম-ধাম, ঠিকানা কিছুই বলতে শুনেনি তারা। বোনটা আদৌ বেঁচে আছে কি-না কে জানে? নাদিম নিখোঁজ হওয়ার দ্বিতীয় দিন মৌশির কাছেও খোঁজ নিয়েছিল অন্তু। মৌশি অবাক চোখে চেয়েছিল। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল কিন্তু কোনো

খোঁজ দিতে পারেনি। নম্রতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারান্দার লতানো গাছে হাত বুলাল। ভেজা পাতার স্পর্শ পেতেই টপ করে গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। দোলনায় মাথা ঠেকিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। নম্রতা জানে নাদিমকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজ ইচ্ছেই হারিয়ে যাওয়া মানুষকে কখনও

খুঁজে পাওয়া যায় না।‘ তোমার শরীর খারাপ, আম্মু?’

বারান্দার দরজা থেকে শাশুড়ী মায়ের কন্ঠ ভেসে আসতেই সোজা হয়ে বসল নম্রতা। ঠোঁটে হাসি টেনে নিয়ে বলল,

‘ না মা। মাত্র বিছানা ছাড়লাম। মাথাটা একটু ভার ভার লাগছিল, এই যা। তেমন কিছু নয়। পাশে বসো।’

ভদ্রমহিলা মৃদু হাসলেন। দোলনায় নম্রতার পাশে বসতে বসতে বললেন,

‘ অফিস নেই আজ? নাস্তাও করোনি এখনও। নিষ্প্রভ ফোন দিলে কিন্তু আমি একদম মিথ্যা বলতে পারব না।’

নম্রতা হাসল। শাশুড়ী মাকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে বলল,

‘ অফিস আপাতত বাদ। ভাবছি রান্নাঘরে তোমার এসিস্ট্যান্ট হব আজ। মা? আজ তোমার পছন্দের খাবারগুলো রান্না করলে কেমন হয়?’ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন,

‘ আমার পছন্দের খাবার কেন?’

নম্রতা হেসে বলল,

‘ কারণ তুমি মা।’

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। নম্রতা হঠাৎ গম্ভীর কন্ঠে বলল,

‘ শুনো মা? তুমি কিন্তু নিদ্রা আপুর কাছে যাওয়ার চিন্তাও করবে না। তুমি ওখানে গেলেই নিদ্রা আপু তোমাকে চার পাঁচ মাসের জন্য রেখে দেয়। এসব কী? আমি তোমাকে যেতে টেতে দিচ্ছি না, ব্যস। তার থেকে বরং নিদ্রা আপুকে চলে আসতে বলো। আমি তাকে তার পছন্দের খাবারগুলো রান্না করে খাওয়াব। আমি অলরেডি

অনেকগুলো রান্না শিখে ফেলেছি। নিদ্রা আপুর সবচেয়ে প্রিয় খাবার কী মা?" সরিষা ইলিশ। ঝাল ঝাল কলিজা ভূনা। ছোট মাছ ভাজি।'

নম্রতা গল্প করতে করতেই দোলনায় পা তুলে বসল। খুব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল,

' সরিষা ইলিশ? নীরা খুব ভালো সরিষা ইলিশ করতে পারত। ওর লাইফে ও একটাই খাবার ঠিকঠাক

রান্না করতে পারতো সেটা হলো সরিষা ইলিশ। একবার কী হলো জানো? নীরা বাড়ি থেকে ফেরার সময় বাটি ভর্তি সরিষা ইলিশ রান্না করে আনল। জীবনের প্রথম রান্না করেছে, প্রচন্ড উচ্ছ্বসিত। আমরা ক্যাফেটেরিয়াতে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দৌঁড়ে এসে বাটিটা বের করতে করতে বলল, জানিস আজ আমি কী এনেছি? নীরার কথা শেষ

হওয়ার আগেই হাতের বাটি উধাও। আমি আর ছোঁয়া অবাক হয়ে চেয়ে আছি। নিরীহ বাটিটা নাদিমের হাত থেকে টানা-হেঁচড়া করতে করতে চলে গেল অন্তর দখলে। অন্তর হাত থেকে রঞ্জন। আমি আর ছোঁয়াই বা বসে থাকব কেন? লেগে পড়লাম ভয়াবহ যুদ্ধে। সবার টানাহেঁচড়াতে তরকারির বাটি উল্টে সাধের সরিষা ইলিশ গিয়ে পড়ল মাটিতে। নীরার

সে-কী রাগ। অন্তু, নাদিম, রঞ্জনকে পুরো ভার্সিটি দৌঁড় করিয়েছিল সেদিন।'এটুকু বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল নম্রতা। ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বলল,

' নীরা কে? তোমার বন্ধু বুঝি?'

হঠাৎ হাসি মিইয়ে গেল নম্রতার। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

' আমার বেস্টফ্রেন্ড।'

কথাটা বলেই চুপ করে রইল নম্রতা। শাশুড়ী মা সরল মনে প্রশ্ন করলেন,

‘ তোমার বিয়েতে এসেছিল? আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দাওনি তো? এখন কোথায় ওরা? একদিন নিয়ে এসো বাসায়। নীরার হাতে সরিষা ইলিশ খাব।’

নম্রতা নিরুত্তর চেয়ে রইল শাশুড়ী মায়ের মুখে। বুকের ভেতর চাপা পড়ল তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম নিয়মগুলোর একটি হলো হারিয়ে যাওয়া। আলো হারিয়ে যায় অন্ধকার রাতে। বর্তমান হারিয়ে যায় অতীতে। অতীত হারিয়ে যায় প্রগাঢ় কোনো অতীতে। মানুষ হারিয়ে যায় সময়ের বেড়াজালে। কিন্তু বন্ধুত্ব হারায় না। জীবনের

প্রতিটি পর্যায়ে সুন্দর স্মৃতি হয়ে হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠে মনে। প্রকাশ করে নিজের প্রগাঢ় অস্তিত্বের। মায়ার সুতো টেনে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, 'তোমরা আমাকে হারাতে দিয়েছ। মলিন হতে দিয়েছ। অথচ আমি এখনও যৌবনে ছুটছি। তোমার স্মৃতির পাতায় হাস্যোজ্জ্বল যৌবন হয়েই ফুটে রয়েছি আজীবন!'বৃষ্টিহীন চমৎকার রাত।

ছাদ জুড়ে হালকা ঝিরিঝিরে বাতাস। আরফান অযথায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল আজ। বারান্দায় দাঁড়াতেই ডাকপাখির স্বভাবসুলভ ডাক কানে এলো। কিন্তু নম্রতার সাড়া পাওয়া গেল না। আরফানের কুঞ্চিত চোখ প্রথমেই গিয়ে পড়ল ডাকপিয়নের গায়ে। ডাকপিয়নের উপর তাজা বেলীফুলের মালা। আরফান বুঝল চিঠির নিমন্ত্রণ। হাতের ব্যাগটা

দোলনার উপর রেখে ডাকপিয়ন থেকে উদ্ধার করে আনল নীল রঙের মোটা খাম। খামটা খুলতেই বেরিয়ে এলো আরও একটি খাম। আরফান ভ্রু কুঁচকাল। দ্বিতীয় খাম থেকেও একইরকম খাম বেরিয়ে আসতেই ব্যাপারটাকে নম্রতার বাচ্চামো বলে ধরে নিল আরফান। খুব অবহেলা ভরেই চতুর্থ খামটা খুলতেই চমকে উঠল সে। মসৃন হয়ে গেল কুঞ্চিত

ভ্রু। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল হাতে থাকা খামটির ভেতর। এমন সময় নুপুর বাজল। মলিন অথচ স্নিগ্ধ চেহারার নম্রতা এসে দাঁড়াল দরজা জুড়ে। আরফান বাকরূদ্ধ চোখে চেয়ে থেকে আবারও খামের দিকে তাকাল। খামের ভেতরে থাকা প্রেগন্যান্সি স্ট্রিপে জ্বলজ্বল করছে পাশাপাশি রঙিন দুটো লাইন। আরফানের শরীর

কাঁপছে। খামটা আলতো হাতে ডাকবাক্সের উপর রেখে দোলনায় বসে পড়ল আরফান। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল,‘ সত্যি?’

নম্রতা হাসছে। ডাকপিয়নের উপর থাকা বেলীফুলের মালাটা হাতে জড়াতে জড়াতে মজা করে বলল,

‘ আমায় কী দিবেন বলুন? বিয়ের রাতের উপহারও কিন্তু নেওয়া হয়নি এখনও। ডাবল উপহার চাই এবার।’

আরফান হাসল। দোলনা থেকে উঠে নম্রতার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে-পা এখনও মৃদু কাঁপছে তার। অতিরিক্ত আনন্দে দিশেহারা হয়ে ন্যূনতম আনন্দটুকু প্রকাশ করা যাচ্ছে না। নম্রতাকে পৃথিবীর সকল সুখ,আনন্দটুকু উপহার দিতে ইচ্ছে করছে হঠাৎ। আরফান ডানহাতটা নম্রতার মাথায় রেখে নরম কণ্ঠে বলল,‘ কী চান?’

নম্রতা ছলছল চোখে তাকাল। আনন্দসিক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ চিরকুট। নীল চিরকুট। এমন একটি চিরকুট যে চিরকুটে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর প্রতিচ্ছবিগুলো থাকবে। থাকবে আমার খুশি। যে চিরকুট পেয়ে হাসি-আনন্দ গুলিয়ে ফেলে হাউমাউ করে কাঁদব! সুখ সুখ ব্যথা নিয়ে দুঃখ বিলাস করব। হবে? হবে কি এমন চিঠি?’রাতের কালচে

আঁধার শুষে নিয়েছে সন্ধ্যা। রাস্তার পাশে জ্বলে উঠেছে হলদে ল্যাম্পপোস্ট। আগ্রাবাদের ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে ট্যা ট্যা করে বাজছে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। নীরা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। মন-মেজাজ চূড়ান্ত খারাপ। ফ্লোরের মাঝামাঝি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাপের ভাঙা টুকরো আর দুধ। তার পাশেই মহা আনন্দে হাত-পা ছুড়াছুড়ি করছে দেড়

বছরের পুত্র আরশ। হাত-পায়ে দুধ মেখে বিশ্রী অবস্থা। রাগে সারা শরীর জ্বালা করছে নীরার। ছেলেকে তুলে শক্ত দুটো চড় বসাতে ইচ্ছে করছে। নীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুই পা এগিয়ে যেতেই লাফালাফি, ছুড়োছুড়ি বেড়ে গেল তার। মাকে কাছে আসতে দেখেই পিছুতে পিছুতে সোফার নিচে ঢুকে যাওয়ার জোগার। কিছুতেই মায়ের হাতে ধরা

দেওয়া যাবে না। নীরা হাত বাড়াতেই ছেলের ত্যাঁদড়ামো বেড়ে গেল আরও। ত্যাঁদড়ামোর ফলাফল স্বরূপ সোফায় মাথা লেগে ব্যথা পাওয়াও হয়ে গেল ইন্সট্যান্ট।নীরা অবাক হয়ে খেয়াল করল, ছেলে তার একটুও বিচলিত হচ্ছে না। এতটুকু ব্যথা পেয়েও আগের মতোই চিৎপটাং শুয়ে আছে। তার এক জেদ, মায়ের কোলে সে উঠবে না।

ততক্ষণে মাথা ফুলে ঢোল। নীরা রাগ ধরে রাখতে না পেরে সটান এক চড় বসিয়ে দিল ছেলের গালে। এবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল আরশ। কান্নার দাপটে হৃষ্টপুষ্ট মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে তার। নীরা তাকে জোরপূর্বক কোলে নিতেই কান্নার আওয়াজ বাড়িয়ে দিল আরশ। হাতের কাছে টেলিভিশনের রিমোট পেয়ে তাই ছুঁড়ে মারল মেঝেতে।

নীরা শান্ত চোখে রিমোটটাকে টুকরো হতে দেখল। ছেলের জেদী মুখের দিকে চেয়ে আরেকটা চড় বসাল গালে। ছেলেটা ঠিক বাবার মতো হয়েছে। গায়ের রং থেকে শুরু করে রাগ,জেদ সবকিছুতেই অন্তুর দূর্দান্ত নকল।এতটুকুন বয়সেই রাগ হলে মাথা ঠিক থাকে না তার। হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ফেলে। ফ্লোরে গড়াগড়ির সাথে ভয়াবহ কান্না।

বাবার মতো এক হিসেব, চাই মানে চাই। নিষেধ করলেই মাথা নষ্ট। অন্তু ফিরল রাত দশটায়। ছেলে এখনও কাঁদছে। কান্নার দাপটে চোখ-মুখ খিঁচে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলের এমন অবস্থায় আতঙ্কিত নীরাও ফুপিয়ে উঠছে বারবার। বাসায় ফিরে বউ, বাচ্চার এই অবস্থা দেখে বিস্মিত হলো না অন্তু। সপ্তাহে অন্তত দুই-একবার

ছেলের এই জেদের মুখোমুখি হতে হয় তাকে। অন্তু অফিস ব্যাগটা রেখে ছেলের সামনে যেতেই দুইহাত বাড়িয়ে দিল আরশ। দীর্ঘসময়ের কান্নাকাটিতে ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা। ঘন ঘন হেঁচকি উঠায় নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। অন্তু ছেলেকে দুই হাতে বুকে চেপে ধরতেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ল আরশ। ছোট্ট ছোট্ট হাতদুটো দিয়ে

বাবার গলা জড়িয়ে ধরে চুপ হয়ে গেল। বাইরের পোশাক পরেই ছেলেকে নিয়ে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করল অন্ত। ক্লান্ত ছেলে ঘুমিয়ে পড়তেই ভয়াবহ রাগ প্রকাশ পেলো তার। আরশের কোমল গালে আঙ্গুলের ছাপ দেখে নীরার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল,‘ একটা থাপ্পড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব। তুই আবারও ওকে মেরেছিস। কথায়

কথায় গায়ে হাত তোলার স্বভাব যায়নি এখনও? একটু জেদ ধরলেই মারতে হবে? এই তুই ব্যাগ গোছা। তোকে আজকেই বাপের বাড়ি দিয়ে আসব। আমার ছেলের আশেপাশে থাকার দরকার তোর নেই। এতটুকু বাচ্চাকে কেউ মারে? ইচ্ছে তো করছে...’

নীরা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে

চেয়ে দুনিয়া ভেঙে কান্না আসছে তার। ছেলেটা সন্ধ্যা থেকে কিচ্ছু খায়নি। একটু সহ্য করে নিলেই পারত। কী দরকার ছিল গায়ে হাত তোলার? অন্তত রাগারাগি এখনও চলছে। ঘুমানোর আগ পর্যন্ত চলবে। নীরা এবার ফুঁসে উঠে বলল,‘ আমাকে বকার মানে কী? ছেলের বাবার জন্যই ছেলের আজ এই দশা। রক্ত তো ওই একই।’

অন্তু আকাশসময় বিস্ময় নিয়ে বলল, ‘ এখন আমার দোষ? ছেলেকে ধরে ইচ্ছেমতো পিটাও তুমি আর দোষের বেলা আমি?’

‘ তা নয়ত কী? দেড় বছরের বাচ্চা আমার। এখন অব্দি কথা ফোটেনি মুখে অথচ বাবার মতো তেজ। সন্ধ্যা থেকে জেদ ধরেছে চা খাবে। ঠান্ডা হলে চলবে না গরম চা দিতে হবে। আমি কাপে করে কুসুম গরম দুধ

দিলাম। তেজের চোটে সেই কাপ উল্টে কাপ ভাঙল। দুধটুকু নষ্ট করল। রিমোট ভাঙল। এসব কার স্বভাব?’

অন্তু জবাব দিল না। ছেলের স্বভাব চরিত্র আসলেই তার মতো হয়েছে। কিন্তু তাতে তো অন্তুর কোনো দোষ থাকার কথা না। অন্তু নিশ্চয় ছেলেকে তার মতো হতে বলেনি? পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে

জেনেটিক্যালি। জেনেটিক বিষয়-আশয়ে অন্তুকে টানার মানে কী? অন্তু কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,‘ ছেলে আমার মতো হয়েছে বলেই মারতে হবে? স্বৈরাচারী মহিলা। একটা কাপ ভেঙেছে তো কী হয়েছে? আমার কী কাপ কেনার টাকা নেই? কাল আমি ছেলেকে এক ডজন কাপ এনে দেব। সে যত ইচ্ছে ভাঙবে। আরাম করে বসে,

বাপের টাকায় কেনা কাপ ভাঙবে। ছেলের গায়ে হাত তুলবি না খবরদার।'

নীরা স্থির চোখে চেয়ে রইল। কোনোরূপ প্রত্যুত্তর করল না। কথার পিঠে কথা বলতে গেলেই রেগে যাবে অন্তু। তারপর আবারও সেই একই কাহিনী। একই গল্প। নীরাকে চুপচাপ বেরিয়ে যেতে দেখে ভ্রু কুঁচকাল অন্তু। গলাটা খানিক

উঁচিয়ে বলল,‘ আশ্চর্য! কথা বলছিস না কেন? আমাকে মানুষ বলে মনে হয় না?’

নীরা উত্তর দিল না। অন্তু ফ্রেশ হয়ে খাবার খাওয়া পর্যন্ত কোনোরূপ কথা বলল না নীরা। খাওয়া শেষে টেলিভিশন অন করতে গিয়েই বিপদে পড়ে গেল অন্তু। ছেলে রিমোট ভেঙে ফেলেছে। টেলিভিশন অন করা যাচ্ছে না। অন্তুর মেজাজ

খারাপ লাগছে। বাসায় এত জিনিস থাকতে দেখে দেখে টেলিভিশনের রিমোটটাই ভাঙতে হলো কেন? মায়ের মতোই ষড়যন্ত্রকারী। রাত বারোটার দিকে ভিডিও কলে এলো অয়ন। অন্তু যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে বলল,

‘ তোর কী আক্কেলজ্ঞান নেই? এই মাঝরাতে কেউ ভিডিও কল দেয়?

আর কয়েক মিনিট পরেই তো ঘুমিয়ে পড়তাম।’

অয়ন দাঁত বের করে হেসে বলল,‘ আজকে ফুটবল ম্যাচ আছে না? ঘুমাবে কেন? নারীপু কই? আর আমাদের ছোটে উস্তাদ কোথায়?’

‘ নীরাপু মানে কী? নীরা তোর আপু হবে কেন?’

‘ ওই একই হলো। ভাবী, আরশ ওরা কই?’

অন্তু বালিশে ঠেস দিয়ে বসল। ঘুমন্ত ছেলের দিকে একবার চেয়ে বলল,

‘ আরশ ঘুমায়। মায়ের হাতে বিশাল মাইর খেয়েছে আজ।তোর ভাবী রান্না ঘরে। আমার সাথে তার ঝগড়ার দ্বিতীয় পর্ব চলছে। কথা-টথা বন্ধ।’

অন্তুর কথার মাঝেই ঘরে এলো নীরা। কোনোরকম কথাবার্তা না বলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে

বসল। অন্তু নীরাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,‘ অয়ু? ফ্রীতে একটা সাজেশন দিই, মনোযোগ দিয়ে শোন। প্রেম করতে হলে, শান্তশিষ্ট, কচি মেয়ে দেখে প্রেম করবি। আমার মতো ভুল করিস না।’

নীরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অন্তু কথাটা মজা করে বললেও হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল নীরার। চোখ

টলমল করে উঠল, কান্না পাচ্ছে। অয়ন হাসছে। হাসিমুখেই বলল,
‘ আরশকে ঘুম থেকে উঠাও একটু। ওর সাথে কথা বলব।’
‘ এখন উঠালে সারারাত জ্বালাবে।’
‘ প্লিজ ভাইয়া। একটু জ্বালালে কিছু হবে না।’অন্তু আরশের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। ছেলের ঘুম ঘন। ঘুমুলে জাগানো মুশকিল। অন্তু বহু কসরত করে জাগিয়ে তুলতেই ঠোঁট

ভেঙে কেঁদে উঠার প্রস্তুতি নিল আরশ। মুখের উপর বাবার চেহারা দেখতেই কান্না থেমে চোখ গোলগোল করে তাকাল। অন্ত একটু আদর করতেই হাত-পা ছুড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল আরশ। উপর-নিচে ছয়টা দাঁত উঠেছে তার। বাবার গালের উপর কঁচি হাত রেখে বলল,

‘ বা-বা। বাবা।’

‘ হ্যাঁ বাবা। দেখো তো এটা কে?’ আরশ চাইল। মোবাইল স্ক্রিনে অয়নের চেহারা দেখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে থেকে আবারও হেসে উঠল সে। হাত বাড়িয়ে ফোন নিয়ে ঠোঁট কুঁচকে নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল,

‘ চাচু।’অয়নের চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। নীরার যখন প্রথমবার মিসক্যারেজ হলো সেদিন ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল তার।

রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল পর্যন্ত। বাচ্চাটার জন্য কতকিছু ভেবে রেখেছিল সে। তাদের বাসায় বাবু আসবে ভাবতেই দূর্দমনীয় আনন্দ হতো তার। এতো মায়া, এতো আদর কাটিয়ে হঠাৎ শুনলো বাচ্চাটা আর আসবে না। হি ইজ ডেড। অয়ন ভীষণ আনন্দিত কণ্ঠে বলল,‘ আব্বু? তুমি আসবে না? দাদু আর চাচ্চু তোমার জন্য অনেকগুলো

ব্যাট,বল কিনেছে। পু পু গাড়ি কিনেছে.... '

নীরাকে আশেপাশে না দেখে বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় উঁকি দিল অন্তু। বারান্দার এক কোণায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নীরা। দুই হাত চুলে বিনুনি করতে ব্যস্ত। চোখদুটো স্থির হয়ে আছে রাস্তার অন্ধকারে। অন্তু ধীর পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

নীরার হাতে থাকা চুল নিজের হাতে নিয়ে একটু টেনে ধরে বলল,

‘ এটা কোনো বিনুনি হলো? আমি এর থেকে ভালো পারি। আমি করে দিচ্ছি।’

নীরা শান্ত রাগ নিয়ে তাকাল। চুল ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলল,

‘ লাগবে না। শান্তশিষ্ট, কচি মেয়ে বিয়ে করে বিনুনি গেঁথে দে, যা। আমি কচি নই।’

অন্তু বিস্ময় নিয়ে বলল,‘ ছিঃ হাজবেন্ডের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে? ডিরেক্ট তুই? বন্ধুদের মতো তুই তোকারি না করে একটু বউ বউ ভাব নিয়ে কথা বললে কী হয়?’ নীরা অবাক চোখে তাকাল। নিজে সারাদিন এভাবে কথা বলে এখন তার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে? নীরা মুখ কালো করে বলল,

‘ আমাকে বউ মানছে কে? যে যেভাবে কথা বলে তার সাথে সেভাবেই কথা বলা উচিত। আমি পারি না বলেই আজ আমার এই অবস্থা।’

‘ বলে কী! আচ্ছা যা। হাজবেন্ডের মতোই কথা বলব এবার।’

এটুকু বলেই হঠাৎ নীরার হাত চেপে ধরল অন্ত। আদুরে কণ্ঠে বলল,

‘নীরু জান? কাছে এসো। তুমি কেন কষ্ট করবে? আমি আছি না? আমি বিনুনি গেঁথে দিব। আহা! কী সুন্দর চুল। এই চুল দেখেই নিশ্চয় কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ,“চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের ’পর

হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা... ”

অন্তুর ঢং দেখে চোখ গরম করে তাকাল নীরা। অন্তু হেসে ফেলল। সেই হাসির দিকে চেয়েই মন ভালো হয়ে গেল নীরার। ছেলেটা এতো সুন্দর করে হাসে কী করে? আরশের হাসিও সুন্দর। বাবার মতোই ঠোঁট ভেঙে হাসে সে। ছেলের হাসি দেখলেই নিজেকে

পাগল পাগল লাগে নীরার। বিশ্বাসই হয় না, এই মিষ্টি হাস্য ছেলেটি তার। অন্তু হাসি নিয়েই বলল,‘ হাজবেন্ড টাইপ প্রেম আসছে না। তবে তোর জন্য বিরাট একটা সারপ্রাইজ আছে।’

নীরা আড়চোখে তাকাল। মুখ গুমরা করে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে চুপ করে রইল। অন্তু নীরার আধ বিনুনি করা চুলগুলো এলোমেলো করে

দিয়ে কাছে টানল। দুইহাতে কোমর জড়িয়ে থুতনি রাখল কাঁধে। ফিসফিসিয়ে বলল,

‘ বিশ্বাস হচ্ছে না?’

নীরা জবাব দিল না। অন্তু ঘরে গিয়ে দুই মিনিটের মাথায় ফিরে এলো। নীরার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলল,

‘ স্বামীর কথা বিশ্বাস করতে শিখো সুন্দরী।’

নীরা অবাক চোখে খামের দিকে চেয়ে রইল। খামটা উল্টেপাল্টে দেখে বলল,

‘ এটা কী?’

‘ খুলে দেখো।’অন্তু মিটিমিটি হাসছে। নীরা তার মুখপানে চেয়ে থেকেই খাম খুলল। বাদামী খামের ভেতর থেকে নীল রঙা এক খাম বেরিয়ে এলো আবার। তাতে গুটিগুটি অক্ষরে লেখা ‘নীল

চিরকুট’। নীরা যার-পর-নাই অবাক হয়ে নীল খাম খুললো। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছয় বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল এক ছবি। তার সাথে ছোট্ট এক চিরকুট,

‘ অভিমানী বন্ধুত্ব এবার জেদ ধরেছে। গিটার আর হাসির সুর টিএসসি, ক্যাফেটেরিয়া আর লাইব্রেরি কোণায় গুমরে মরছে। এবার তারা মুক্ত হোক। হাসুক,

বাঁচুক। ব্যস্ততা ভুলে আবার তাদের দেখা হোক। স্বাধীন পাখিদের দুয়ারে তাই নীল চিরকুটের আমন্ত্রণ।'নীরা হতবিহ্বল চোখ চাইল। টলমল করে উঠল চোখ। ছোট্ট এই জীবনটাতে বহু চড়াই-উতরাই পাড় করতে হয়েছে তাদের। জীবনের প্রতিটি সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে খেয়ে জমেছে হাজারখানেক অভিমান-অভিযোগ। নম্রতার সাথে কথা কাটাকাটির

কিছুদিন পরই নিজের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল নীরার। বিভিন্ন টেনশন, ম্যান্টাল প্রেশার আর নম্রতাকে কী বলা যায়? এসবের চিন্তাতেই নম্রতার মুখোমুখি হওয়া হয়নি আর। তারপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। তারপরের জীবনটা ছিল ভয়াবহ। নীরার চোখ থেকে টপ করে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ কে?’অন্তু মাথা নেড়ে জানাল, জানে না। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বলল,

‘ হঠাৎ অফিসের ঠিকানায় চিঠি এলো। একই রকম দুটো চিঠি। একটি তোর, অপরটি আমার। খামে প্রেরকের নাম, ধাম কিছু নেই। ওদের মধ্যে থেকেই কেউ হবে নিশ্চয়। আমি অফিসে ছুটির কথা বলে দিয়েছি। তুই স্কুল থেকে

সপ্তাহখানেকের ছুটি নিতে পারবি না? আমরা সামনের সপ্তাহেই ঢাকা ফিরছি।'

খুশিতে আত্মহারা নীরা উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না। হাত-পা মৃদু কাঁপছে। নীরা অন্তুর ডানহাতটা চেপে ধরে কাঁধে মাথা রাখল। থেমে থেমে বলল,' ছুটি পাই আর না পাই। চাকরি ছুটে গেলেও পরোয়া নেই। ঢাকা আমি যাচ্ছিই।'

এটুকু বলে থামল নীরা। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

‘ নমু কী এখনও রেগে আছে? ও আমার সাথে কথা বলবে না?’অন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নীরাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল। চোখের সামনে ভেসে উঠল একের পর এক কষ্টমাখা রাত। একদিকে অন্তুর চাকরী নেই, অন্যদিকে নীরার অসুস্থতা। তারসাথে আবার অনাগত

বাচ্চার চিন্তা। বারবার ডাক্তার দেখানোর জন্য বিশাল অঙ্কের টাকাও চাই। নাদিম নিরুদ্দেশ। এতোকিছুর মাঝে নম্রতার সাথে যোগাযোগ করে ওর বিয়ের আনন্দ, নতুন সংসারের আনন্দ নষ্ট করতে চায়নি অন্তু। হয়তো সুযোগটাও ছিল না। অন্তু তার যথাসাধ্য করেছিল। নীরাও সুস্থ হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। তারপর হঠাৎই, একদম আচমকা

মিসক্যারেজ হয়ে গেল নীরার। একদিকে বাচ্চা হারানোর কষ্ট অন্যদিকে নীরার পাগলামো। নীরা মানসিকভাবে এতোটা অসুস্থ হয়ে পড়ল যে, অন্ত হঠাৎ কোনো দিশা খুঁজে পাচ্ছিল না। ভীষণ অন্ধকারে একলা পথিকের মতো অসহায় লাগছিল সব। নীরাকে রূপগঞ্জ, তার মায়ের কাছে রেখে এসেও স্বস্তি নেই।বারবার সুইসাইড এট্যাম্পের

চেষ্টা করে সে। তার ধারণা এবোরশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেই বাচ্চাটা এলো না। সে আর মা হতে পারবে না। তার বাচ্চা মারা যাওয়ার জন্য একমাত্র সে-ই দায়ী। সে সকল দিনগুলোর কথা ভাবলেও শরীর কেঁপে উঠে অন্তর। এমন বিভৎস দিনগুলোর মাঝে হঠাৎই এক ভালো সংবাদ এলো। নম্রতার বিয়ের দিনে দেওয়া ইন্টারভিউটা

কাজে লেগে গেল। ব্যাংকের চাকরিটা হয়ে গেল। পোস্টিং হলো চট্টগ্রাম। অন্তু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নীরাকে এই শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার। অন্তুর নিজেরও তখন বিষাক্ত লাগছে এই শহরের বাতাস। জয়েনিং-এর দুই সপ্তাহ আগেই নীরাকে নিয়ে পাড়ি জমাল চট্টগ্রামের পথে।চট্টগ্রাম আসার কয়েক মাসের মাথায় আবার

কনসিভ করল নীরা। আচার-আচরণেও স্বাভাবিকতা এলো। চাকরির জন্য পড়াশোনা শুরু করল। বিস্ময়করভাবে প্রাইমারি স্কুলের চাকরিটা হয়েও গেল। এই বিশাল ঝড়-ঝাপটার মাঝে জীবনটা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এতোটা বিতৃষ্ণা আর কষ্টের গল্প জমে গিয়েছিল যে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকানোর সময় হয়নি কারো।

তবে নম্রতা আর নীরার ঝামেলার ব্যাপারটা অন্তু জেনেছিল নীরার চাকরি হওয়ার পর। ততদিনে বিশাল গ্যাপ পড়ে গিয়েছে। নম্রতার সাথে যোগাযোগ হয় না অনেকদিন। এতোদিন পর হঠাৎ সরি বলার জন্য ফোন দেওয়াটা ভীষণ অস্বস্তির ছিল তাদের জন্য। আজ হঠাৎ এই নীল চিরকুটের নিমন্ত্রণ তাদের জন্য বিশাল অপেক্ষার সমাপ্তি। বিশাল

এক আনন্দের চাবি। আহ! কতদিন দেখা হয় না সেই ভালোবাসাগুলোর সাথে। অন্তর বুক কাঁপছে। কষ্টের স্মৃতি ছাপিয়ে স্মৃতির পাতা ছুটে চলেছে ক্যাম্পাসের মাঠে। মামার চায়ের দোকানে, ক্যাফেটেরিয়া আর সেই লাইব্রেরিটাতে। যেখানে নীরার হাত চেপে ধরেছিল প্রচন্ড জেদে! নিউইয়র্কে গ্রীষ্মকাল চলছে। শীতের জীর্ণতা কাটিয়ে সজীব হয়ে উঠেছে

গাছ, লতা। বাড়ির আঙিনা আর বারান্দাগুলো সেজে উঠেছে বাহারি ফুলে। রাস্তায় উৎফুল্ল যুবক-যুবতীর পদচারণ। সবার ঠোঁটেই এক চিলতে সৌজন্যতার হাসি। গ্রীষ্মের শুরুতে মন-মেজাজ প্রফুল্ল। রঞ্জন খুব ভোরে দৌঁড়াতে বেরিয়েছিল। পরনে ছাইরঙা হাফপ্যান্ট, সাদা টি-শার্ট আর স্পোর্টস শো। গলায় ঝুলছে টকটকে লাল রঙের

হেডফোন। রঞ্জন দৌঁড়ে এসে নিজের এপার্টমেন্টের সামনে থামতেই এগিয়ে এলো মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক। গায়ে তার ভিন্ন ধরনের ইউনিফর্ম। মুখভর্তি প্রফুল্লতার হাসি। রঞ্জন ফাঁপাতে ফাঁপাতেই সৌজন্যতার হাসি হাসল। ছোট্ট করে বলল,‘ হেই, গুড মর্নিং।’

‘ মর্নিং। আর ইউ রেনজ্যান চ্যাকরাবার্তি?’

‘ ইট’স রঞ্জন। এনিওয়ে হোয়াট’স দ্যা ম্যাটার?’

‘ ইউ হ্যাভ আ লেটার ফ্রম বাংলোডেশ।’

‘ লেটার?’

অবাক হলো রঞ্জন। দেশ থেকে চিঠি পাঠানোর মতো মানুষ তার নেই। তাছাড়া, এই যুগে এসে চিঠি লিখতে বসবেই বা কে? টেক্সট, মেইল এসব ছেড়ে চিঠি? আশ্চর্য! রঞ্জন

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। ফর্মালিটিস শেষ হতেই মুখভর্তি হাসি উপহার দিলেন ভদ্রলোক। উৎফুল্ল মনে বললেন,

‘ ওয়াও, হোয়াট আ বিউটিফুল ডে। এনজয় ইউরসেলফ।’

রঞ্জন ঠোঁট টেনে হাসল,

‘ইয়াহ, ইট্স রিয়েলি বিউটিফুল! হ্যাভ ফান।’গেইট পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চিঠিটা উল্টেপাল্টে

দেখল রঞ্জন। রেজিস্ট্রি করা চিঠি। প্রেরকের নাম, ঠিকানা বৃত্তান্ত নেই। রঞ্জন কাউচে বসে খাম খুলল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আরও একটি নীল রঙা খাম। তাতে গুটি গুটি অক্ষরে লেখা, 'নীল চিরকুট'। রঞ্জনের বিস্ময় যেন আকাশ ছুঁলো। নীল চিরকুট মানে কী? কেউ এতোদূর থেকে চিঠি পাঠিয়ে ফাজলামো নিশ্চয় করবে না? রঞ্জন

কৌতূহল নিয়ে খাম খুলল। নীল খামটা খুলতেই বেরিয়ে এলো একই ফ্রেমে আবদ্ধ ছয় বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল ছবি। টিএসসির চা স্টলে বসে আছে সবাই। নাদিমের হাতে চিরচেনা গিটার। রঞ্জন হতভম্ব চোখে চেয়ে রইল। সাথে থাকা চিরকুটটা পড়ে হৃদস্পন্দন থেমে গেল তার। উত্তেজনায় কেঁপে উঠল শরীর। ঘন্টাখানেক ঠাঁই বসে থেকে লাফিয়ে

উঠল সে। কম্পিত হাতে ফোন লাগাল দেশে। দেশে তখন সন্ধ্যা নেমেছে মাত্র। পূজা মাত্রই ধূপকাঠি জ্বলেছে। এমন সময় রঞ্জনের ফোন পেয়ে অবাক হলো সে। মায়ের সামনে থেকে সরে এসে ফোন তুলতেই ওপাশ থেকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জন,‘ আই এ্যাম কামিং পূজা। আমি নেক্সট উইকেই ফ্লাইট ধরছি।’

পূজা অবাক হয়ে বলল,
‘ কিন্তু তুমি যে বললে আসবে না? একদম বিয়ের ডেইট ফিক্সড হলে ফিরবে।’
রঞ্জন উত্তেজনা নিয়ে বলল,
‘ আগে যা বলেছি ভুলে যাও, সুইটহার্ট। ডিসিশন চেইঞ্জ হয়েছে। আমি অবশ্যই ফিরছি এবং নেক্সট উইকের মধ্যেই ফিরছি।’
পূজা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল,

‘ কিন্তু হঠাৎ কী হলো? তোমার কণ্ঠও অন্যরকম শুনাচ্ছে। ঠিক আছো?’

রঞ্জন হেসে বলল,‘ না। ঠিক নেই। আমার দুয়ারে নীল চিরকুটের আমন্ত্রণ এসে গেছে পূজা। আমি ঠিক থাকতে পারছি না। তোমাকে এই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। কাছে নেই বলে পারছি না। দেশে ফেরার পর

অবশ্যই মনে করিয়ে দেবে, ওকে?’পূজা বিস্ময়ে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। দেশে এখন আষাঢ়িয়া কান্না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা পূজার শরীর মাখামাখি হচ্ছে মিষ্টি শীতল জলে। সেই জলে হাত ভিজিয়েই ফিসফিস করে বলল সে,

‘ তুমি কী পাগল হয়ে গিয়েছ রঞ্জন? আমার তোমাকে স্বাভাবিক মনে

হচ্ছে না।’ভরা বর্ষা। আকাশটা ছেয়ে আছে কালো মেঘে। পাহাড়ি গা’জুড়ে ভয়াবহ ঝুম বৃষ্টি। সরু আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলোর পাশ বেয়ে ছুটে যাচ্ছে ফুলে-ফেঁপে থাকা ঝিরি। আষাঢ়ে কান্নায় ধুয়েমুছে আরও খানিকটা পবিত্র হয়ে উঠেছে রূপসী পাহাড়ের অঙ্গ। সেই সরু,পিচ্ছিল লাল মাটির রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে মধ্যবয়স্ক এক উপজাতি। মাথায় তার কালো

ছাতা। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, ছাতাটা বুঝি ঠেকে গিয়েছে কালো,অন্ধকার মেঘরাজ্যে। পা জোড়া খালি, জুতো নেই। হাঁটু সমান লুঙ্গি আর ঢিলেঢালা ফতুয়ার অধিকাংশই ভেজা।পিঠে মাঝারি আকারের ঝুড়ি। লোকটি নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছেন। ভীষণ পরিচিত পাহাড়ি জঙ্গলা ভেঙে উঠে যাচ্ছেন পাহাড়ের চূড়ায় থাকা ছোট্ট,

ছিমছাম বাড়িটির দিকে। বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়িটি চোখে পড়ছে না। কালো মেঘ আর পাহাড়ি গাছে ঢেকে আছে তার অস্তিত্ব। লোকটি চূড়ায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যে নামল। বৃষ্টি বাড়ছে। বাইরের চটানে রাখা বালতি থেকে পা ধুয়ে ভেতরে ঢুকল বাহাদুর। দরজা খোলা। ভেতর থেকে অদ্ভুত সুরেলা শব্দ আসছে। বৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে অসাধারণ

শোনাচ্ছে কানে। ঝুড়িটা বাইরের ঘরে রাখতেই ভেতর থেকে কোমল কণ্ঠ শুনতে পেল বাহাদুর। বাবু গাইছে। আজও নিশ্চয় সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা নিয়ে বসেছে বাবু? বাহাদুর ভেতরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।‘

আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে
মনে পড়লো তোমায়
অশ্রু ভরা দুটি চোখ
তুমি ব্যথার কাজল মেখে

লুকিয়েছিলে ঐ মুখ
বেদনাকে সাথী করে
পাখা মেলে দিয়েছো তুমি
কত দূরে যাবে বলো
কত দূরে যাবে বলো
তোমার পথের সাথী হবো আমি...'

গানটা থেমে গেল হঠাৎ। জানালার পাশে বসে থাকা নাদিম ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল,

‘ কী অবস্থা বাহাদুর? ভিজে গিয়েছ দেখছি। বৃষ্টি সারলেই আসতে পারতে।’বাহাদুর মুখ কাঁচুমাচু করে নিজের দিকে তাকাল। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে ভয়াবহ অপরাধ করে ফেলেছে। নাদিম গিটারে সুর তুললো। টুংটাং শব্দ তুলে বলল,

‘ বেশি করে চিনি দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে ফেলো তো বাহাদুর। ফটাফট বানাবে। পারবে না?’

বাহাদুর মাথা নাড়ল। তারপর কী ভেবে বলল,

‘ ঘরত দুধ নেই বাবু।’

‘ দুধ না থাকলে রং চা বানাবে। চিনিটা একটু বেশি দিবে। দুধ থাকতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।’

বাহাদুর মাথা নাড়ল। ফিরে যেতে নিয়েও থেমে গেল হঠাৎ। নাদিম গিটার থেকে হাত সরিয়ে তার দিকে চাইল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,‘ কিছু বলতে চাও বাহাদুর?’

বাহাদুর মাথা নাড়ল। নাদিম গিটারটা পাশে রেখে সোজা হয়ে বসল,

‘ বলে ফেলো।’

‘ ত নামে চিঠি ইজজি।’

নাদিম জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল। বাহাদুর নাদিমের বছর বাঁধা ভৃত্য। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে বাজারঘাট সবই করে সে পুরোদমে। শক্তসমর্থ শরীরে পরিশ্রম করার অসাধারণ স্পৃহা। কিন্তু সমস্যা হলো, বাহাদুর খুব একটা বাংলা বলতে পারে না। নাদিমের ধারণা, বাহাদুর বাংলাটা ইচ্ছে করেই বলে না। বাংলা বুঝা সত্ত্বেও বাংলা বলতে না-

পারাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নাদিম কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল,

‘ আমার নামে চিঠি? আমাকে কে চিঠি পাঠাবে বাহাদুর? তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে। চিঠিটা অবশ্যই আমার নামে নয়।’বাহাদুর কিছু বলার আগেই গিটার তুলে নিল নাদিম। গিটারের দিকে চেয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল,

‘ বাংলায় কথা বলো বাহাদুর। তোমার অধিকাংশ শব্দ আমি বুঝি না।’

বাহাদুর এবার বাংলায় কথা বলল। ভাঙা বাংলা আর তার নিজস্ব ভাষায় যতটুকু বলল তাতে, চিঠিতে নাদিমের নামই লেখা আছে। সিভিল সার্জন অফিসে এসেছিল। বড় বাবু শহর থেকে কেউ একজনকে দিয়ে থানচি পাঠিয়েছে। বাহাদুর সেই চিঠি

নিতেই শহরে গিয়েছিল আজ। নাদিমের কপাল কুঁচকে এলো। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে বলল,

‘ চিঠিটা কোথায়?’

বাহাদুর ফতুয়ার পকেট থেকে পলিথিন কাগজে মোড়ানো একটা খাম বের করল। খামটা নাদিমের দিকে এগিয়ে দিতেই চোখ দিয়ে টেবিলের উপর রাখতে ইশারা করল নাদিম। বাহাদুর চিঠিটা টেবিলে

নামিয়ে রেখে বলল,‘ হি হেবে? হি রানিম, বাবু?’

নাদিম চিঠিটির দিকে চেয়ে থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল,

‘ কিছু রান্না করতে হবে না। দুটো ডিম ভেজে ফেলো তাতেই হবে।’

‘ ঘরত বডা নাই, বাবু।’

নাদিম বিরক্ত চোখে চাইল,

‘ ডিম না থাকলে যা আছে তাই রান্না করো। আমার মেজাজ ভালো

নেই। আমাকে বিরক্ত করবে না।'সহজ-সরল বাহাদুর ভীতমুখে মাথা নাড়ল। বাহাদুর চলে যেতেই চিঠিটা হাতে নিল নাদিম। দীর্ঘক্ষণ চিঠির দিকে ভ্রু কুঁচকে চেয়ে রইল সে। খামের গায়ে প্রেরকের নাম ঠিকানা নেই। তবে এসেছে ঢাকা থেকে। নাদিম খামটা উল্টেপাল্টে দেখল। চিঠিটা যে পাঠিয়েছে সে নিশ্চয় খুব বুদ্ধিমান। নয়তো

নাদিমকে খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। নাদিম নিজেকে ঢেকে রাখার চেষ্টা যেমন করেনি। তেমনই কারো ধরা-ছোঁয়ার মাঝেও নিজেকে রাখেনি। ঢাকা শহরটা একঘেয়ে, অসহ্য লাগছিল বলেই হঠাৎ এক গন্তব্যহীন রাতের ট্রেনে উঠে পড়েছিল নাদিম। সেই ট্রেনে করেই এসে পৌঁছাল রাজশাহী। প্রথম দুই-তিনমাস রাজশাহীর আনাচে কানাচে ঘুরে

বেড়াল নাদিম।তারপর ঢাকা থেকে কাগজপত্র জোগাড় করে মাস্টার্সটা শেষ করল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহীর হাওয়া অসহ্য ঠেকতেই পিছুটানহীন নাদিম পাড়ি জমাল চট্টগ্রামের পথে। চট্রগ্রামের সিভিল সার্জন অফিসে হেল্থ প্রোগ্রাম প্রজেক্টে অস্থায়ী সাইকোলিক্যাল কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত সে। দুই বছরের ধরা বাঁধা চাকরি। এরপর

আবারও অন্য কোনো শহরে গা ভাসানোর তাড়া। নাদিমের মতো উড়ো পাখির জন্য এ এক অসাধারণ কাজ। নাদিম কৌতূহল নিয়ে খাম খুলল। খামের ভেতর থেকে নীল চিরকুট লেখা খামটা বেরিয়ে আসতেই চট করে বুঝে ফেলল, এটা অবশ্যই আরফানের কাজ। নম্রতা অত বুদ্ধিমতী নয়। কিন্তু আরফান হঠাৎ তাকে চিঠি পাঠাবে

কেন? হাজারও প্রশ্ন নিয়ে নীল খামটা ছিঁড়ে ভেতরের ছবিটা বের করতেই কপালের কুঞ্চন গাঢ় হলো তার। সাথে থাকা চিরকুটটা বার কয়েক পড়ে টেবিলের উপর রেখে দিল। গিটারটা হাতে নিয়ে এক মনে সুর তুললো তাতে। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে গেয়ে উঠল তার কণ্ঠ,'আজ

এই বৃষ্টির কান্না দেখে

মনে পড়লো তোমায়

অশ্রু ভরা দুটি চোখ
তুমি ব্যথার কাজল মেখে
লুকিয়েছিলে ঐ মুখ...'

গান বেশিদূর এগোল না। গিটারের শব্দও থেমে গেল হঠাৎ। নাদিম হঠাৎ উপলব্ধি করল, এই সুন্দর পাহাড়ী বৃষ্টি, মুক্ত জীবন তার ভালো লাগছে না। বুক ভার লাগছে। হাত-পা মৃদু কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসছে বারবার। নাদিম গিটার

নামিয়ে রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ভরাট কণ্ঠে বাহাদুরকে ডাকল। বাহাদুর ভীত চোখে দরজার কাছে উঁকি দিতেই হাতের ইশারায় ভেতরে ডাকল নাদিম। চেয়ার টেনে বসতে বলে বলল,‘ তোমার ছেলে মেয়ে ক’জন বাহাদুর?’

অবাঞ্চিত প্রশ্ন। নাদিম জানে বহাদুরের দুই মেয়ে এক ছেলে। জানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে হয়

না। তবুও কেন জিজ্ঞেস করল জানা নেই। শুধু জানে, কথা বলতে হবে। এইযে হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। কিছু একটা পেয়ে যাওয়ার আনন্দে হাত-পা কাঁপছে। এই কম্পন থামাতে হবে। বাহাদুর বিরস কণ্ঠে বলল,

‘ মর দিবি জি আর দিবি পো।’

নাদিম বুক ভরে শ্বাস নিল। মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ তোমাদের ভাষায় বন্ধুদের কী বলে বাহাদুর?’

‘ সোমাজসি, বাবু।’

নাদিম হাসল। জানালার বাইরে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বিরবিরিয়ে বলল,‘ সোমাজসি! বাহ! সুন্দর তো।’.

একটু থেমে আবারও বলল,

‘ আমাকে ঢাকা যেতে হবে বাহাদুর। কালকেই যেতে হবে। তুমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো।’

বাহাদুর অবাক হয়ে বলল,

‘বারে বেজ ঝড় দেড়। পদট পুট উটটি। গাড়ি ন পেব।’ [বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টিতে রাস্তা কাদা। গাড়ি পাওয়া যাবে না।]

নাদিম আনমনা কণ্ঠে বলল,

‘ তবুও যেতে হবে। যেতেই হবে বাহাদুর।’

বাহাদুর কী বুঝে বলল,

‘ আচ্চা বাবু।’

নাদিম হঠাৎ সুর তুলল। ভীষণ করুণ কণ্ঠে গাইল,

‘ আমার ধূলাবালি জমা বই
আমার বন্ধুরা সব কই
আমার ভাল্লাগেনা এই মিথ্যে শহর
রাতের আড়ালে রই।’বাহাদুরের হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। নাদিমের কণ্ঠে ভেসে আসা কাতরতা যেন আকাশের কান্না হয়ে বৃষ্টির

শব্দে কণ্ঠ মেলাল। নাদিম গান থামিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল,

‘ ভালোবাসাকে তোমরা কী বল বাহাদুর?’

‘ হোজপানা।’

নাদিম উঠে বসল। হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা জ্যাকেটটা পরতে পরতে মৃদু হাসল। বাহাদুরকে অবাক করে দিয়ে বলল,

‘ তর তেই হোজপানা বাহাদুর।’ [তোমার জন্য ভালোবাসা বাহাদুর।] বাহাদুরের সহজ-সরল গাল লজ্জায় রাঙা হলো। পরমুহূর্তেই বিস্ময় নিয়ে বলল,‘ কোতায় যাচ্চেন বাবু?’

‘ ঢাকা যাচ্ছি বাহাদুর। এখনই যেতে হবে। আমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।’

‘বারে বেজ ঝড় দেড়, বাবু।’

নাদিম অমায়িক হেসে বলল,

‘ ঝড়ে কিছু ক্ষতি হবে না বাহাদুর। ঝড়ের ভয়ে এখানে বসে থাকলেই বরং ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। উত্তেজনায় ঘুম হবে না। নিঃশ্বাস নিতে পারব না।’

বাহাদুর আকাশসম বিস্ময় নিয়ে দেখল, একা এক সুদর্শন যুবক রাতের অন্ধকারে ভয়াবহ ঝড়ের মুখে উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেল। পিঠে তার ঝুলন্ত গিটার আর কালো

ব্যাগ। বুক ভরা সাহস। গন্তব্য বহুদূর। এতো সাহস কোথায় পায় সে? কোথায় পায় এতো তেজ! অস্ট্রেলিয়ায় হাড় কাঁপানো শীত। আবহাওয়ার তাপমাত্রা -৪ এর কাছাকাছি। পথঘাট শুভ্র বরফে আচ্ছন্ন। ছোঁয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে তার খয়েরী রঙের হুডি। হাতে-পায়ে মোজা তবুও তিরতির করে কাঁপছে শরীর।

সাইমের গাড়িটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বরফে ডুবে থাকা ছোঁয়ার টয়োটোর পাশেই পার্ক করা হলো গাড়ি। খুব ভোরে গাড়ির হিটার অন করে, বোতল থেকে পানি ঢেলে, ওয়াইপার চালিয়ে সামনের বরফ পরিষ্কার করেছিল ছোঁয়া। কিন্তু লাভ বিশেষ হয়নি। আবারও বরফ কুঁচিতে ভরে গিয়েছে গাড়ির গ্লাস। সাইম গাড়ি থেকে নেমেই হাত

নাড়ল। ছোঁয়া উত্তরে মুচকি হাসল। ঘরে ঢুকে গায়ের মোটা জ্যাকেট আর হাত মোজা খুলতে খুলতে সোফায় বসল সাইম। একটা খাবারের প্যাকেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল,‘ উড ইউ লাইক টু ইট গ্রিলড চিকেন, চিপস এবং গারলিক সস নাউ?’

ছোঁয়া হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে হাসি হাসি চোখে চাইল। প্যাকেটটা পাশে রেখে বলল,

‘ আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি সাইম। উড ইউ লাইক টু গো উইদ মি?’

সাইম অবাক চোখে তাকাল,

‘ বাংলাদেশ মানে? হঠাৎ বাংলাদেশে কেন? নো প্ল্যানস্, নো রিজনস্, হোয়াই ডিড ইউ মেইক দিস ডিসিশন? আমার ছুটি নেই ছোঁয়া।

ইভেন তোমারও ছুটি থাকার কথা নয়।’

ছোঁয়া ভ্রু কুঁচকে চাইল। সাইমের সামনের টেবিলটাতে বসে পড়ে তার কলার ধরে কাছে টেনে আনল আচমকা। সাইম বিস্ময়ে হতবাক চোখে চেয়ে রইল। সাইমের বিস্ময় আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েই মুখ খুলল ছোঁয়া,

‘ এইযে লায়ক শাকিব খান? সারাদিন অস্ট্রেলিয়ান গরুদের মতো প্ল্যানিং, রিজনস্ ক্যান খুঁজো? তুমি বাঙালী না? বাঙালীদের কোনো পরিকল্পনা ফরিকল্পনা থাকে না। তাদের কর্মকান্ড হবে হুটহাট, এটাই নিয়ম।’

সাইম বিস্ময়ে কথা খুঁজে পেল না। কয়েক সেকেন্ড চোখ বড় বড় করে

চেয়ে থেকে বলল,‘ এভাবে কথা বলছ কেন তুমি? আর ইউ ওকে?’

‘ অবশ্যই ঠিক আছে? ক্যান? আমারে দেইখা রোগী রোগী মনে হইতাছে তোমার? তুমি কইতে চাও আমি রোগী?’

সাইম স্তব্ধ। সাইমের হতভম্ব চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ছোঁয়া। সাইমের বিস্ময় এবার আকাশ ছুঁলো। ছোঁয়া

সাধারণত শব্দ করে হাসে না। এমন উদ্ভট কথা তো কখনোই বলে না। ছোঁয়া কথা বলে মেপে মেপে। মার্জিত ভঙ্গিতে। আজ হঠাৎ কী হলো তার? সাইম উদ্বিগ্ন চোখে ডানহাতটা বাড়িয়ে ছোঁয়ার কপালের উপর রাখল। কপাল কুঁচকে বলল,' 'তোমার কী জ্বর হয়েছে? তুমি ঠিক আছো?'

ছোঁয়া সাইমের হাতটা সরিয়ে নিজের হাতে নিল। ঠোঁটভরা হাসি নিয়ে বলল,

‘ আমি ঠিক আছি। আই ওয়াজ ইঞ্জয়েনিং দিজ ল্যাঙ্গুয়েজ সাইম। আমার ফ্রেন্ডদের চিনো? ওরা এভাবে কথা বলত। ওরা আমার মতো ভিতু নয়। আমার মতো গোছালোও নয়। তবুও তারা পার্ফেক্ট? একবার নাদিম কী করেছিল জানো? হঠাৎ স্যারের

সামনে পরীক্ষার খাতা ছিঁড়ে ফেলে বলে ফেলল, ধূর বাল! সময় শেষ হওয়ার আগেই খাতা টানাটানি। পরীক্ষায় দিতাম না। ফেইল দিলে ফেইল। এইসব ছাতার পাশ মার্ক আমার লাগতো না। বালের পরীক্ষা!'

এটুকু বলে আবারও খিলখিল করে হেসে ফেলল ছোঁয়া। তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনমনা হয়ে গেল। সাইম কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে

চুপ করে বসে রইল। ছোঁয়া উঠে গিয়ে সাইমের পাশ ঘেঁষে বসল। হয়তো এই প্রথম বারের মতো ভীষণ অনুভূতি নিয়ে বাহু চেপে ধরে কাঁধে মাথা রাখল। বিরবির করে বলল,‘ আমি বাংলাদেশে যাব সাইম। আমাকে যেতেই হবে। ওরা আমার অপেক্ষায় আছে। আই উইল ম্যানেজ আনাদার জব। বাট আই কান্ট গেইট আনাদার অপরচুনিটি। আমার

জীবনের সব থেকে কনফিডেন্ট ডিসিশন এটা। এই ডিসিশন নিয়ে আমার কোনো কনফিউশান নেই। একটুও না...’

সাইম অবাক চোখে চেয়ে রইল। ছোঁয়ার পূর্ণ আত্মবিশ্বাস দেখেই হয়ত ছোট্ট একটা চুমু খেল ডানহাতের পিঠে। মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ ওকে। গো এন্ড ইঞ্জয়।’বাইরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। নম্রতা

রান্নার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ তার ঝাল ঝাল খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে। শাশুড়ী মা ঘুমাচ্ছে। কাজের মেয়েটাও ভাত ঘুমে। নম্রতার প্রেগনেন্সির পর থেকে হুটহাট বাড়ি চলে আসে আরফান। আজও এলো। নিজের ঘরে নম্রতার খোঁজ না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে রান্না ঘরে এসে উঁকি দিল। বউকে কোমরে ওড়না বেঁধে রান্না করতে দেখে দরজায় ঠেস

দিয়ে দাঁড়াল সে। হালকা একটু কেশে বলল,

‘ হ্যালো মিসেস নিম পাতা। কী চলছে?’

হঠাৎ আরফানের ডাকে চমকে তাকাল নম্রতা। ভীত মুখে বলল,

‘ দেখুন! আপনি এখন মানা করবেন না। মানা করলেও আমি শুনব না। রান্না প্রায় হয়ে গিয়েছে। সারাদিন বসে থাকতে ভালো লাগে না।’

আরফান হাসল। কেবিনেটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বলল,‘ মানা কেন করব? যা মন চাই তাই করবেন। শুধু ভারী কিছু না করলেই হলো। সারাদিন শুয়ে-বসে থাকলে এমনিই শরীর খারাপ করবে। মুড সুয়িংও করবে বেশি বেশি। তার থেকে একটু আধটু কাজ করুন। তবে কাজ করার সময় আশেপাশে

কাউকে রাখবেন। একা একা পন্ডিতি করতে যাবেন না।’

নম্রতা মুখ কালো করে চুলোর আঁচ কমাল। আড়চোখে আরফানকে দেখে নিয়ে বলল,

‘ আম্মু ফোন দিয়েছিল। বলেছে এক দুই মাসের মধ্যে আমায় নিয়ে যাবে। ডেলিভারি হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানে....’

নম্রতার কথা শেষ না হতেই বাঁধ সাধল আরফান,

‘ অসম্ভব। আমি অনুমতি দেব না।’

‘ অনুমতি দিবেন না মানে? আমি বাবা-মার সাথে দেখা করতে যাব না?’

‘ দেখা করবেন না, তা তো বলিনি। তবে ওখানে গিয়েও থাকতে পারবেন না। এ বাড়িতে আমার

সামনেই থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আর একটা কথাও নয়।’

নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বলল,‘ আমি যাবই। কেন শুনব আপনার কথা? আমার উপহার কই? দুই সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে অথচ উপহারের খোঁজ নেই। নিশ্চয় ভুলে বসে আছেন?’

আরফান কেবিনেট থেকে নেমে ফ্রিজ খুলল। পানির বোতল বের করতে করতে বলল,

‘ ভুলিনি। আর চারদিন পর পাবেন। আমাদের তৃতীয় বিবাহ বার্ষিকির সকাল বেলায়।’

নম্রতা চোখ বড় বড় করে বলল,

‘ এক উপহারে তিন অকেশন পাড় করে দিতে চাইছেন? এতো কিপ্টা আপনি? এইজন্য ডাক্তার বিয়ে করতে চাইনি। আম্মু ঠিকই বলেছিল। ডাক্তাররা এতো কিপ্টা!’

আরফান হাসল। পানির বোতলটা পাশে রেখে নম্রতার পেছনে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। খাবারের ঢাকনা খুলতে খুলতে ফিসফিস করে বলল,‘ বিয়ের রাতের উপহার বিয়ের দিন ছাড়া তো দেওয়া যায় না নম্রতা। আর আফসোস করেই বা কী হবে? ডাক্তার বিয়ে করে জুনিয়র ডাক্তারের ঘন্টীও তো বাজিয়ে ফেলেছেন। এখন এসব আফসোস টাফসোস

বাদ দিয়ে কাজ করুন। স্বামীকে খাইয়ে দিয়ে স্বামীসেবা করুন। খাবারটা লোভনীয় দেখাচ্ছে।'

নম্রতা মুখ ফুলিয়ে বলল,

' যে পুরুষ একটা চিরকুট লিখতে তিন সপ্তাহ লাগায় তাকে আমি খাইয়ে দিই না।'

আরফান হাসছে। হাসিমুখেই বলল,

' দিবেন না মানে? দিতে বাধ্য। আমি জোর করে পেতে জানি,

মহারাণী নিম পাতা।’তখন মাঝরাত। অভিমানী কিশোরীর মতোই মুখ ভার করে রেখেছে আষাঢ়ে আকাশ। চাঁদ তারাহীন আকাশের নিচে শীতলপাটিতে শুয়ে আছে একজোড়া মানব-মানবী।ঝিরিঝিরি ঠান্ডা বাতাসে উড়ছে মানবীর এলো চুল। ছড়িয়ে রাখা শাড়ির আঁচল। ছাদের পাটাতনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভেজা বেলী ফুল। বারান্দায় জ্বালিয়ে

রাখা হারিকেনের আলো এসে পড়ছে শীতলপাটির একাংশে। মৃদু হলদে আলোয় কী ভীষণ মায়াবী দেখাচ্ছে প্রিয়তমার মুখ। আরফান এক হাতে ভর করে নির্নিমেষ চেয়ে আছে নম্রতার চোখে। নিকষ অন্ধকারেও খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রিয়তমার অপ্রকাশিত, সুপ্ত সৌন্দর্য। নম্রতা আকাশের কী চেয়ে ছিল। আরফানকে স্থির চেয়ে থাকতে দেখে

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আকাশে বিকট শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। নম্রতা চমকে গিয়ে চোখ কুঁচকে বন্ধ করে আবারও পিটপিট করে তাকাল। ঠোঁট ভর্তি হাসি নিয়ে বলল,‘ কী দেখছেন?’

আরফান উত্তর দেওয়ার আগেই ঝুম বৃষ্টি নামল ছাদে। নম্রতার হাসি বিস্তৃত হলো। দুই বাহু দু’পাশে মেলে দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের দিকে

তাকানোর চেষ্টা করল। তাকানো যাচ্ছে না। বৃষ্টির তোড়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখের পাতা। শীতলপাটিটা ডুবে যাচ্ছে ঠান্ডা শীতল জলে। ভাসমান বেলীগুলো তীব্র সুবাস ছড়াচ্ছে আষাঢ়ে হাওয়ায়। কিছুক্ষণের মাঝেই পানি জমল ছাদে। নম্রতার ছড়িয়ে রাখা লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে সাঁতারে নামল। আরফান নম্রতার দিকে চেয়ে

থাকতে থাকতেই ডানহাত বাড়িয়ে হাতটা রাখল নম্রতার চোখের ওপর। নম্রতা এবার চোখ পিটপিট করে তাকাল। শীতে কাঁপতে কাঁপতেই খিলখিল করে হাসল। আরফান কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল,

‘ আজকের এই দিনটিতেই প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম আমি। আজকের এই দিনটিতেই হাত ভর্তি খুশি নিয়ে

আমার নামে বধূ সেজেছিলে তুমি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খুশি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ মহারাণী। মহারাণীকে বিবাহ বার্ষিকির প্রথম প্রহরের শুভেচ্ছা।’নম্রতা থমকে গেল। চোখ ফিরিয়ে অন্ধকারে ঢাকা আবছা চেহারাটির দিকে তাকাল। আজকেই প্রথম চিঠি পেয়েছিল আরফান? তার এখনও মনে আছে? কই? নম্রতার তো চিঠি দেওয়ার

দিনক্ষণ খেয়াল নেই। আরফান কী করে খেয়াল রাখল?ঠিক ঠিক সেই দিনে গিয়েই বিয়ের তারিখ ঠিক করাল। বিয়েও হলো সেই একই দিনে। এই অসাধারণ কথাটা এতোদিন কেন প্রকাশ করেনি আরফান? আজ বলে চমকে দিবে বলে? নম্রতার ধারণা আরফানের কাছে চমক ঝুলি আছে। হঠাৎ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু করে চমকে

দেওয়ার অসাধারণ এক ক্ষমতা আছে তার সারা শরীরজুড়ে। নম্রতার বৃষ্টিস্নান মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল আরফান। ঝুম বৃষ্টির রাত্রিবেলা ভীষণ আবেশে দীর্ঘ এক চুমু খেল নম্রতার বৃষ্টিভেজা ওষ্ঠে। আষাঢ়ে আকাশ বুঝি লজ্জা পেল? নাকি আকাশ জুড়ে তীক্ষ্ণ আলো আর বিকট শব্দ ছড়িয়ে ফ্রেমবন্দী করল সেই আষাঢ়ে চুমু?ঘুমের

মাঝেই কানে সুড়সুড়ি টের পেলো নম্রতা। প্রথম দফায় চোখ বোজেই কান চুলকাল সে। দ্বিতীয়বারও একই কান্ড ঘটায় চোখ পিটপিট করে তাকাল। মুখের উপর ফর্মাল পোশাক পরা আরফানকে ঝুঁকে থাকতে দেখে পাশ ফিরতে ফিরতে বিরক্ত কণ্ঠে বলল,

‘ জ্বালাচ্ছেন কেন ডক্টর?’

আরফান মৃদু হেসে বলল,

‘ ডাক্তার যে তাই। অনেক ঘুমিয়েছেন এখন উঠুন। আমি হসপিটালে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে প্রেশার চেইক করব। খাওয়া দাওয়া শেষে আদা চা খাবেন। টেবিলের উপর পানির জার রাখা আছে। আধ ঘন্টা পর পর পানি খাবেন। আজ গোসলের প্রয়োজন নেই। কাল বৃষ্টিতে ভিজেছেন। জ্বর হতে পারে। আপনার কিন্তু মেডিসিন নেওয়া

এলাউ নয়। জ্বর জ্বর ফিল হলে আমায় জানাবেন।'

নম্রতা কম্বলে চোখমুখ ডেকে বলল,' উফ! ডাক্তার বর হলে এই এক সমস্যা। সব সময় ডাক্তারি শুরু করে দেন। বাসায় এসব ডাক্তারী ফাক্তারী চলবে না ডক্টর। আমাকে ঘুমুতে দিন। আমি ঘুমোব।'

আরফান ভ্রু কুঁচকে তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

‘ আচ্ছা। আপনি তবে ঘুমুতেই থাকুন। আপনার উপহারটা তাহলে ক্যান্সেল।’

নম্রতা লাফিয়ে উঠে বসল। আরফান হাত ভাঁজ করে ভ্রু উঁচিয়ে চেয়ে আছে। নম্রতা চোখ ছোট ছোট করে চেয়ে বলল,‘ আমার উপহার কোথায়?’

আরফান চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘ উপহার ক্যান্সেল।’

নম্রতা আর্তনাদ করে বলল,

‘ মানে কী?’

আরফান হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল,

‘ বাচ্চাদের মতো জেদ ধরার পানিশমেন্ট।’নম্রতার মন খারাপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ মুখ ফুলিয়ে বসে থেকে ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য দৌঁড়ে গেল বারান্দায়। ডাকবাক্স

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো চিঠি পাওয়া গেল না। বারান্দায় থাকা ফুলের টব। ডাকবাক্সে পেছন সব জায়গায় খুঁজে নিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়ল দোলনায়। আরফান তবে সত্যিই উপহারটা রেখে যায়নি? নম্রতার মন খারাপ ভাব তরতর করে বাড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় বারান্দার দরজায় এসে দাঁড়াল যুবতী

কাজের মেয়েটা। নম্রতার দিকে বাদামী এক খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘ ছোট ভাবী? আপনার নামে চিঠি আসছে।’নম্রতা ভ্রু কুঁচকে চিঠির দিকে তাকাল। এই বাড়িতে শুরু থেকেই কনিষ্ঠ পুত্রবধূর দৃষ্টিতে দেখা হয় তাকে। কোনো অনুষ্ঠান বা উৎসবে পুত্রবধূর উপহার হিসেবে বরাবরই একই রকম দুটো উপহার কেনা হয়। একটি নম্রতাকে দিয়ে

অপরটি পাঠানো হয় যশোরে থাকা স্নিগ্ধার কাছে। প্রথমে ব্যাপারটি বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছে। নেহালের মৃত্যুর পর জোর করেও বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়নি স্নিগ্ধাকে। নিজেকে নেহালের নামের সাথে জড়িয়ে রাখতেই সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে স্নিগ্ধা। ছোট্ট একটা বাচ্চা দত্তক নিয়ে যশোরের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে একা এক

সংসার গড়ে তুলেছে সে। যশোর কলেজে অধ্যাপনা আর ছোট্ট বাচ্চার ব্যস্ততা নিয়েই পাড় করে দিচ্ছে অসহনীয় রাত-দিন, চব্বিশ ঘন্টা। নম্রতা হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। ঠোঁট উল্টে বলল,‘ এটা কী তোমার নিষ্প্রভ ভাইয়া দিয়েছে?’

যুবতী মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল,

‘ না ছোটভাবী। চিঠি তো পিয়নে দিয়া গেল সকালে।’

নম্রতা অবাক হলো। সত্যি সত্যি পিয়ন দিয়ে গেল চিঠি? কী আশ্চর্য! নম্রতাকে কে পাঠাবে চিঠি? নম্রতা যুবতী মেয়েটিকে যেতে বলে কৌতুহল নিয়ে চেয়ে রইল খামে। রেজিস্ট্রি করা চিঠি। প্রেরকের নাম ঠিকানা নেই। নম্রতা দম আটকে খাম খুলল। ভেতর থেকে নীল

চিরকুট নামে খামটা বেরিয়ে আসতেই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল নম্রতার। মনটা খুশিতে নেচে উঠল হঠাৎ। নিশ্চয় সেই উপহারটাই পাঠিয়েছে আরফান? কিন্তু ডাকবাক্সে না রেখে এভাবে পাঠাল কেন? হাজারও প্রশ্ন নিয়ে নীল রঙা খামটা খুলতেই বাকরুদ্ধ হয়ে গেল নম্রতা। ছয় বন্ধুর ফ্রেমেবন্ধী ঝলমলে ছবি আর ছোট্ট চিরকুট দেখে সব কেমন

এলোমেলো হয়ে গেল নম্রতার। কী করবে, কী হচ্ছে কিছু বুঝতে না পেরে চিঠি কোলে স্থির বসে রইল কিছুক্ষণ। ছবির পিঠে গামে আটকানো আরেকটি চিঠি পেয়ে ভ্রু বাঁকাল নম্রতা। নীল কাগজের মাঝ বরাবর মাঝারি আকারের চিঠি।‘ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে একটি হলো আনন্দাশ্রু। আপনি কী চিঠিটা পেয়ে আনন্দে হাউমাউ করে

কাঁদবেন নম্রতা? যখন জানবেন আপনার খুব প্রিয় মানুষগুলো টিএসসির পুরনো সেই চা স্টলটাতেই দীর্ঘ অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষার প্রহরগুলোতে আপনাকেই খুঁজছে, আপনাকেই ভাবছে তবে কী ভীষণ আনন্দে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন আপনি? এই চিরকুটটাকে হাসি-আনন্দের চিরকুট বলে স্বীকৃতি দিবেন?’

নম্রতা শক্ত হয়ে বসে রইল। এসবের মানে কী? বন্ধুরা টিএসসিতে অপেক্ষা করছে মানে? নাদিম,রঞ্জন, নীরা ওরা সত্যিই এসেছে? এসব আদৌ সম্ভব? নম্রতার মস্তিষ্ক বিশ্বাস করতে না চাইলেও কোমল মনটা যেন থরথর করে কাঁপছে। সেই সাথে কাঁপছে গোটা শরীর। নম্রতা এক ছুটে নিজের ঘরে গেল। আরফানের

নাম্বারে ডায়াল করতেই উত্তেজনায় ধুকপুক করতে লাগল বুক। আরফান ফোন ধরেই বলল,‘ বাসার বাইরে রিকশা অপেক্ষা করছে নম্রতা। আর টিএসসিতে বন্ধুরা। জলদি করুন নাকি উপহারটা পছন্দ হচ্ছে না?’

নম্রতা বিস্ময়ে এক হাতে মুখ চেপে ধরল। টলমলে জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। উত্তেজনায় আটকে গেল

কথা। বহু কসরত করে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ ওরা ওরা সত্যি?’

আরফান হেসে ফেলল এবার। স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলল,

‘ ভালোবাসি নম্রতা। আগে কখনও বলা হয়নি বোধহয়। আজ বলছি, ভালোবাসি ভালোবাসি।’

নম্রতা ডুকরে কেঁদে উঠল এবার। আরফান হাসছে। নম্রতা হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘ আমি আপনাকে একদম ভালোবাসি না ডক্টর। একদম না।’নম্রতার হাউমাউ কান্নায় দু’তলা থেকে ছুটে এলেন শাশুড়ী মা। বিস্ময় আর উদ্বেগ নিয়ে বললেন,

‘ কাঁদছ কেন মা? মুড সুয়িং হচ্ছে? শরীর খারাপ লাগছে? বাবাকে মনে পড়ছে আম্মু?’

নম্রতা ফোনটা বিছানায় ফেলে দুই হাতে মুখ ডেকে ফুপিয়ে উঠল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ তোমার ছেলেকে আমি একদম ভালোবাসি না মা।’

ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা ধরতে না পেরে অবাক হয়ে চাইলেন। বিছানা থেকে

ফোনটা তুলে নিয়ে লাউডস্পিকার দিতেই ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো কানে। আরফান হাসছে। ভদ্রমহিলা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,‘ কী ব্যাপার নিষ্প্রভ?’

‘ তোমার বউমাকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি মা।’

ছেলের কথায় হেসে ফেললেন ভদ্রমহিলা। ফোনটা নম্রতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মাথায় আলতো হাত

বুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওপাশ থেকে উচ্ছল ভরাট কণ্ঠে বলে উঠল, ‘ ভালোবাসি। ভালোবাসি নিম পাতা। নীল চিরকুটের থেকে বেশি, শ্যামলতার থেকে একটু কম।’ভরা দুপুর। সূর্যের উত্তাপ নেই। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় এখানে সেখানে কাঁদামাখা জল। নাদিম চিরপরিচিত চায়ের স্টলে বসে আছে। গায়ে চেইক শার্ট। কোলের উপর রাখা

গিটার। নাদিম আগ্রহ নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আজ তিন বছর পর ঢাকায় ফিরেছে সে। চিরপরিচিত জায়গাটা আজও একই রকম। কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন থাকলেও সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা নাদিম ধরতে পারছে না। নাদিম ধোঁয়া উঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতেই রাস্তার বাঁকে চিরচেনা একজনকে চোখে পড়ল হঠাৎ।

নাদিম চায়ে চুমুক দিতে গিয়েও থেমে গেল। চায়ের কাপ মুখের কাছে নিয়েই স্থির চেয়ে রইল রাস্তার বাঁকে। চেহারাটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো। সামনের মানুষটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল নাদিমও। দু'জনের ঠোঁটই বিস্তৃত হলো ধীরে ধীরে। তারপর.... তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার মতোই ছুটে এলো দুজনে। কয়েক সেকেন্ডের

সেই আলিঙ্গনেই গুচে গেল বছর তিনেকের দূরত্ব। প্রতিদিনই দেখা হচ্ছে এমন ভাব নিয়ে মুখ ছুটল তাদের,‘ এক ঘন্টা ধইরা অপেক্ষা করতাছি বাল। এতো দেরী করলি ক্যান? রাস্তায় কোনো সুন্দরী মাইয়া দেইখ্যা আটকায় পড়ছিলি নাকি মামা?এখনও ভালো হইতে পারলি না? আফসোস!’

রঞ্জন হেসে ফেলল। নাদিমের পিঠে শক্ত কিল বসিয়ে বলল,

‘ নিজের গুণ আমার উপর ঝাড়ছিস? এক ঘন্টা যাবৎ এখানে এমনি বসে বসে মশা মারতেছিলা তুমি? বললি আর বিশ্বাস করলাম? তোকে আমি খুব ভালো করে চিনি। গত এক ঘন্টায় এই রাস্তা দিয়ে কয়টা মেয়ে গিয়েছে তা সিসিটিভি

ফুটেজ থেকেও ভালো বলতে পারবি তুই। কোনোটা পছন্দ হয়েছে মামা?’ নাদিম উত্তর দেওয়ার আগেই অন্তর বাইক এসে থামল পাশে। বাইক থামিয়ে এক রকম লাফিয়ে নেমে পড়ল অন্ত। নাদিম রঞ্জনও যেন একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সবার মুখেই উপচে পড়া হাসি। অযথায় হাসছে তার। সবার শরীরেই কম্পীয়মান উত্তেজনা। অন্তকে ছেড়ে

নীরার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল নাদিম। নীরার বেণী করে রাখা চুল টেনে দিয়ে বলল,‘ কয় প্যাকেট আটা ময়দা লাগাইছিস সত্যি কইরা ক তো ভতী। ময়দার যন্ত্রণায় তোরে তো দেখা যাইতাছে না রে।’

নীরা চোখ গরম করে তাকাল। অন্তু নীরার মাথায় একটা চাটি মেরে বলল,

‘ কমপক্ষে তিন-চার ব্যাগ তো লাগাইছেই। জামাইয়ের টাকা ধ্বংস করে ফেললি ফাজিল মাইয়া।’

অন্তুর কথায় হুহা করে হেসে উঠল সবাই। নীরা কোমরে হাত রেখে চোখ-নাক ফুলিয়ে তাকাল। রঞ্জন নীরাকে এক হাতে আলতো জড়িয়ে ধরে বলল,

‘ বেচারীকে সহজ-সরল পেয়ে এভাবে জ্বালাচ্ছিস কেন তোরা?

নাহয় দুই তিন ব্যাগ লাগিয়েছেই। দশ, পনেরো তো আর ক্রস করেনি? নীরু তুই এদের কথায় কান দিস না তো। নিশ্চিন্তে আটা ময়দা লাগিয়ে যা। সমস্যা নেই।’

নীরা চেঁচিয়ে উঠে বলল,‘ রঞ্জন তুইও?’

অন্তু, নাদিম হাসিতে গড়াগড়ি খেলো এবার। নীরা একে একে তিনজনের দিকেই রাগান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ

করছে। কিন্তু লাভ বিশেষ হচ্ছে না। বন্ধুরা তার রাগকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। বন্ধুদের হাসি মজার মাঝেই নম্রতা এসে পৌঁছাল। বন্ধুদের একসাথে দেখে রিকশা থেকে নেমেই এক হাতে মুখ চেপে চেঁচিয়ে উঠল সে। নম্রতাকে দেখেই চোখ টলমল করে উঠল নীরার। নম্রতা সেখানেই মুখ চেপে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল। নীরা ছুটে গিয়ে

জড়িয়ে ধরতেই দু’জনেই ডুকরে কেঁদে উঠল একই তালে। এতো আনন্দ! এতো আনন্দ! এতো আনন্দ কান্না ছাড়া আর কী করে প্রকাশ করা যায়? নম্রতা রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,‘ হারামি! তুই এখনও আমারে সরি বলছ নাই। বেয়াইন হওয়ার চিন্তা বাদ দে। আমি তোরে মেয়ে টেয়ে দিব না।’

নীরা কাঁদতে কাঁদতেই হেসে ফেলল। রঞ্জন, নাদিম, অন্তুও এগিয়ে এলো এবার। রঞ্জন মন খারাপ ভাব নিয়ে বলল,

‘ কলিজা? তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে এই মহিলার জন্য কেঁদে ভাসিয়ে ফেলছ। এটা তো ঠিক না। আমি কষ্ট পেয়েছি।’

তৎক্ষনাৎ হেসে ফেলল নম্রতা। রঞ্জনের পেটে শক্ত ঘুষি দিয়ে বলল,

‘ এ্যাহ! এখন কলিজা? যাহ্ ফুট!’ রঞ্জন পেট চেপে ধরে বলল,

‘ আরফান ভাই কী তোরে লোহা টোহা খাওয়ায় নাকি নমু? এক ঘুষিতে কলিজা বের করে ফেলেছিস অত্যাচারী মহিলা।’এবার দৃশ্যপটে এলো নীল রঙা অত্যাধুনিক এক টয়েটো গাড়ি। আশেপাশে কাঁদা ছিটিয়ে রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়াল। ড্রাইভার ছুটে এসে দরজাটা খুলে দিতেই

বেরিয়ে এলো ছোঁয়া। গায়ে তার জিন্স আর নীল রঙা কূর্তি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের দিকে চেয়ে কয়েক সেকেন্ড থমকে দাঁড়াল সে। বন্ধুরা ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে। সবার ঠোঁটেই হাসি। ছোঁয়া ধীরেস্থিরে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বিস্তৃত হাসল নাদিম। ঘাড় কাঁধ করে বলল,

‘ চেনা চেনা লাগে। এটা আমাদের ইংরেজ বলদ না?’

ছোঁয়া হাসল। নাদিম হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ আয়, আয়।’

ছোঁয়া নাদিমের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আচমকাই ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর ঢলে পড়ল নাদিমের বুকে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,

‘ আই মিসড ইউ সো মাচ।’হতবাক নাদিম চূড়ান্ত বিরক্তি নিয়ে বলল,

‘ মিস করছিস ভালা কথা। কিন্তু কাইন্দা কাইট্টা আমার শার্ট নষ্ট করার মানে কী? বিয়ার দিনও তুই আমার পাঞ্জাবি নষ্ট করছিস হারামি। এই দূরে যাইয়া খাড়া। হাড় মাংস দলা পাকায় গেল ইংরেজের বাচ্চা।’

ছোঁয়া রাগান্বিত চোখে চেয়ে সরে দাঁড়াল। রাগ নিয়ে বলল,

‘ মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। তোর কথার প্যাটার্ন শুনলে যে কারো বমি পেয়ে যাবে।’

নাদিম ডোন্ট কেয়ার নিয়ে বলল,

‘ তো তুই হুনছ কেন? কান বন্ধ কইরা রাখ। ইংরেজ বলদ গো কানের প্রয়োজন নাই। এরা কান থাকলেও বলদ, না থাকলেও বলদ।’তখন বিকেল। সারাদিন ভার্সিটিজুড়ে হৈ-হুল্লোড় করে আগের

মতো সিএনজি ধরে রমনা পার্কে গিয়ে বসল তারা। লেকের পারে শান বাঁধানো বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে নাদিম। আজও বেঞ্চ ভেজা। অন্তু আর রঞ্জন কাগজ জোগাড় করে তার উপর বসে আছে। বাকিরা এখানে ওখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। সবার হাতেই বাদামের ঠোঙা। অন্তু ভীষণ আয়েশ করে বাদাম চিবোতে চিবোতে বলল,

‘ মৌশির কোনো খবর জানিস নাদিম?’

নাদিম খোসাসহ বাদাম হাওয়ায় ছুঁড়ে মেরে মুখ দিয়ে লুফে নিতে নিতে বলল,

‘ আমার জানার কথা নাকি?’

অন্তু অবাক হয়ে বলল,

‘ একসময় তোর হাফ প্রেমিকা ছিল। তো জানার কথা না? তুই চাইলে আমি খবর নিয়ে দিতে পারি।

কী খাওয়াবি বল?" আমার টেহা বেশি হয় নাই। সুখে থাকতে ভূতে কিলাই? ওরে দিয়া আমি করমুডা কী?'

' কী করবি মানে? বিয়ে করবি। বিয়ে না করলে প্রেম করবি। তারপর যা করা লাগে তাই করবি। মেয়েটা ভীষণ পছন্দ করত তোকে। আমি ড্যাম শিওর এখনও প্রচন্ড পছন্দ করে তোকে।

নাদিম কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল,

‘ গুড। আমাকে প্রচন্ড পছন্দ করার জন্য তাকে ধন্যবাদ। এখন এসব আজাইরা পেঁচাল বন্ধ কর।’

অন্তু হতাশ কণ্ঠে বলল,

‘ অন্যের অনুভূতির গুরুত্ব দিতে শিখলি না। মেয়েটা মারাত্মক সুন্দরী ছিল।’

নাদিম বাদাম খাওয়ায় মনোযোগী হয়ে বলল,

‘ তোর এতো রঙ লাগলে তুই নে গা। আমার রঙ লাগে নাই। আমার ওরে দরকারও নাই।’

অন্তু দুঃখী দুঃখী কণ্ঠে বলল,‘ রঙ তো লেগেছিলোই বন্ধু। কিন্তু তুমি তো পাত্তা দিলা না। আমার একমাত্র প্রেমটা নির্দয়ের মতো বানচাল করে দিছিস তুই। তোর বোন....’

এটুকু বলতেই শক্ত এক কিল পড়ল অন্তুর পিঠে। নাদিম দ্বিতীয় লাথিটা দিয়ে বলল,

‘ শালা তুই আসলেই চরিত্রহীন। বউ রাইখা অন্য মাইয়া গো দিকে নজর দিস।’

নীরা কুটিল দৃষ্টিতে চেয়ে বলল,

‘ আরও একটা দে। বেয়াদব পুরুষ মানুষ।’

অন্তু পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,
‘ নীরুর বাচ্চা! তোরে যদি আমি আছাড় না মারছি তবে আমার নাম অন্তু না।’
নাদিম বাদামের ঠোঙাটা ছুড়ে ফেলে গিটার তুলল হাতে। টুংটাং সুর বাজল গিটারের তারে তারে। বন্ধুদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠল স্মৃতিময় বিকেল। কণ্ঠে কণ্ঠে

গেয়ে উঠল বহু পুরোনো এক গান,'
আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে
মনে পড়লো তোমায়
অশ্রু ভরা দুটি চোখ
তুমি ব্যথার কাজল মেখে
লুকিয়েছিলে ঐ মুখ....'

[পুনশ্চঃ রাউন্ড শেষ করে সন্ধ্যার কিছু আগে চেম্বারে ফিরল আরফান। পাঁচটা থেকে রোগী দেখার সময়। প্রথম রোগী চেম্বার ঢুকার পাঁচ

মিনিট পরই দরজায় টোকা দিল সাঈদ। ভীষণ বিনয়ী কণ্ঠে বলল, ‘ আপনার নামে একটা পার্সেল আসছে স্যার।’আরফান অবাক হয়ে তাকাল। পার্সেল মানে? তার কাছে তো কোনো পার্সেল আসার কথা না। আর আসলেই বা হাসপাতালের ঠিকানায় কে পাঠাবে পার্সেল? আরফান ইশারায় পার্সেলটা টেবিলের উপর রাখতে বলল।

সাইজ দেখে বুঝা যাচ্ছে বেশ ভারী একটি পার্সেল। আরফান রোগীর কথায় মনোযোগী হতে পারছে না। চোখ দুটো বারবার পার্সেলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মাথায় ঘুরছে একটায় প্রশ্ন , কী আছে পার্সেলে? কে পাঠাল? রোগীকে প্রেসক্রাইভ করেই প্রচন্ড কৌতূহল নিয়ে পার্সেল খুলল আরফান। পার্সেল খুলেই প্রচন্ড ধাক্কায় হতভম্ব হয়ে গেল সে।

পার্সেলের ভিতর একটা বই। যেনতেন কোনো বই নয়। গ্রন্থাগারের সেই স্মৃতিজড়িত দর্শনের বই। আরফান বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল দর্শনের সেই বইয়ে। অভ্যাস বশত বইয়ের মলাটের নিচে হাত দিতেই বেরিয়ে এলো ছোট্ট এক নীল চিরকুট।” কিশোরী বয়সে প্রথম চিরকুটের সাক্ষী হয়েছিল এই বই। নিজ দায়িত্বে মুড়িয়ে নিয়েছিল

নীল চিরকুটের শত গোপন, নির্লজ্জ কথা। আজ বইটিকে আবারও সেই দায়িত্ব ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার জীবন্ত চিরকুটটাকে আমার নির্লজ্জা আবদারে মুড়িয়ে নিয়ে পুরো পৃথিবী থেকে ঢেকে রাখার দায়িত্ব দিচ্ছি। আমার জীবন্ত নীল চিরকুট হওয়ার জন্য ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। কিশোরী বয়সে আমার হয়েছিলন, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত

নীল চিরকুট হয়েই থাকবেন প্লিজ। আমি কিন্তু আপনাকে ভালো টালো বাসি না। একটুও না। শুধুমাত্র জীবন্ত নীল চিরকুটটাকে ছাড়া নিঃশ্বাস নিতে পারি না। দমবন্ধ লাগে। মৃত্যু অবধারিত মনে হয়, এই যা!

ইতি

নীল চিরকুটের শ্যামলতা ”